সাহাবা চরিত

মূল উর্দূ ঃ হযরত মাওলানা হাফিয আলহাজ্ব মোহাম্মদ যাকারিয়া (রহঃ)

অনুবাদক ঃ ডক্টর মুহাম্মদ নাছির উদ্দিন
সহকারী অধ্যাপক
আল কুরআন এন্ড ইসলামিক স্ট্যাডিজ বিভাগ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

সাহাবা চরিতের বৈশিষ্ট্য

দ্বিতীয় অধ্যায়

দ্বীনের জন্য কষ্ট ভোগ ও নির্যাতন সহ্য

তৃতীয় অধ্যায়

রাসূল (সাঃ) ও সাহাবা (রাঃ)–এর আল্লাহ্‌ভীতি

চতুর্দশ অধ্যায়

সিয়াহ–সিত্তার হাদীস সংকলন

চতুর্থ অধ্যায়

সাহাবায়ে কিরামের পরহেজগারী ও দারিদ্র

পঞ্চম অধ্যায়

সাহাবী (রাঃ)–দের পরহেযগারী ও তাকওয়া

ষষ্ঠ অধ্যায়

নামাযে অনুরাগ ও বিনয়

সপ্তম অধ্যায়

সাহাবীদের দয়া ও পরোপকার

অষ্টম অধ্যায়

বীরত্ব ও সাহসিকতা এবং মৃত্যুর প্রস্তুতি

নবম অধ্যায়

সাহাবায়ে কিরামের যুগে জ্ঞানচর্চা

দশম অধ্যায়

মহিলাদের শিক্ষাদান পদ্ধতি ও নানা ঘটনা

একাদশ অধ্যায়

সাহাবা যুগে শিশুদের ধর্মীয় ভাবধারা

দ্বাদশ অধ্যায়

নবী প্রেমের কয়েকটি অপূর্ব কাহিনী

ত্রয়োদশ অধ্যায়

কয়েকজন নিষ্ঠাবান সাহাবা পরিচিতি

প্রকাশকের কথা

পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি। সমস্ত প্রশংসা একমাত্র সুমহান আল্লাহর জন্য। অগণিত দরুদ ও সালাম প্রিয় রাসুল (সাঃ)-এর প্রতি ও তার আহলে বাইত এবং তাঁর প্রশংসিত সাহাবায়ে কিরামের প্রতি।

মূল উর্‌দু পুস্তক হেকায়েতে সাহাবা (রাঃ)-এর ভাবানুবাদ "সাহাবা চরিত" নামে আত্মপ্রকাশ করছে। ইসলাম মহান আল্লাহর একমাত্র মনোনীত ধর্ম যার যাবতীয় সব কিছুই সত্য ও ইতিহাস নির্ভর। কল্পনার প্রসূত কোন কাহিনী বা অতিরঞ্জিত কোন বিষয় ইসলামে নেই। কোরআন হাদীসে যে সমস্ত বানী বিবৃত হয়েছে তার বাস্তবতা নিখুঁত ভাবে ইসলামের ইতিহাসের পাতায় সুসংহতভাবে যুগে যুগে রক্ষিত হয়েছে।

আমাদের আলোচ্য গ্রন্থে রাসূল (সাঃ)-এর বাস্তব জীবনে সংঘটিত বিষয়গুলোই উপস্থাপন করছি। আমাদের সমাজ ব্যবস্থা আজ অপসংস্কৃতির সয়লাবে পরিপূর্ণ। চরিত্র গঠনমূলক কাজে উৎসাহ প্রদান করার মত মানুষ পাওয়া সত্যিই দুষ্কর। মানুষের মন পরিবর্তনশীল, আর এই পরিবর্তন আনয়ন করতে হলে কোরআন-হাদীসের আলোকে আলোচনা একান্ত প্রয়োজন। এই গ্রন্থে রাসূল (সাঃ)-এর প্রদর্শিত পথে সাহাবায়ে কিরামের কাহিনীগুলোই তুলে ধরা হয়েছে। কোন পাঠক তা থেকে নির্দেশনা পেয়ে সুন্দর জীবন গঠনে পরিচালিত হলে আমাদের অর্থাৎ এই গ্রন্থের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের নাযাতের উসীলা হবে। আমাদের প্রচেষ্টা স্বত্ত্বেও ভুল-ক্রটি থাকা অস্বাভাবিক নয়। যদি কোন পাঠকের এরকম ভুল-ক্রটি দৃষ্টিগোচর হয় তা জানালে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করা হবে-ইনশাল্লাহ্।

বিনীত
প্রকাশক

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রথম অধ্যায়

সাহাবা চরিতের বৈশিষ্ট্য

সুহবত আরবী শব্দের বহুবচনে সাহাবী শব্দের উৎপত্তি। বাংলা ভাষায় এর আভিধানিক অর্থ হল সাথী, সংগী, সহচর অর্থাৎ আত্মনিবেদিত প্রাণ। যে সমস্ত আত্মনিবেদিত সহচর ব্যক্তিগণ ঈমানের সাথে এক মুহূর্ত আল্লাহ্‌র নবী-রাসূল (সাঃ)-এর সঙ্গ লাভে জীবন অতিবাহিত করে ঈমানী হৃদয়ে মৃত্যু বরণ করেছেন, তাঁদেরকে ইসলামী পরিভাষায় সাহাবা নামে আখ্যায়িত করা হয়। সাহাবাদের পরিচয় দিতে গিয়ে অনেকেই বিভিন্ন ধরনের অভিমত ব্যক্তি করে সাহাবা বলে চিহ্নিত করার জন্য অনেক শর্তারোপ করেছেন। তবে সার্বিক বিশ্লেষণে যে সংজ্ঞাটি অত্যন্ত সুপ্রসিদ্ধ, যুক্তিসম্মত এবং সর্বজন স্বীকৃত তা হল আল্লামা ইব্‌নে হাজার (রহঃ)-এর সংজ্ঞা। তিনি বলেন, "যিনি রাসূল (সাঃ)-এর উপর ঈমান সহকারে তাঁর সাক্ষাত লাভ করেছেন এবং ইসলামের উপর মৃত্যু বরণ করেছেন তিনিই সাহাবী বলে পরিগণিত হবেন। এ সংজ্ঞাটি পর্যালোচনা করলে যা দাঁড়ায় তা হল, প্রথমতঃ যাঁরা রাসূল (সাঃ)-এর দর্শন লাভ করেছে কিন্তু তাঁর উপর ঈমান আনেনি, এমন লোক সাহাবী হিসাবে গণ্য হবে না। যেমন আবু জাহল, আবু লাহাব প্রমুখ সে সময়ের কাফেরবৃন্দ। দ্বিতীয়তঃ যাঁরা ঈমান অবস্থায় রাসূল (সাঃ)-এর সাক্ষাত লাভ করেছেন কিন্তু অন্ধত্ব বা এ ধরনের কোন কারণে তাঁকে চোখে দেখতে পারেননি, তাঁরাও সাহাবী হিসাবে গণ্য হবেন। যেমন অন্ধ সাহাবী আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে উম্মে মাখতুম (রাঃ)। তৃতীয়তঃ যাঁরা ঈমানী সহকারে রাসূল (সাঃ)-এর সাক্ষাত লাভ করেছেন, কিন্তু পরে মুরতাদ হয়েছে, পুণরায় মুসলমান হয়ে ইসলামে মৃত্যু বরণ করেছেন, এ দ্বিতীয় বার ইসলাম গ্রহণের পর রাসূল (সাঃ)-এর সাক্ষাত লাভ না করলেও তাঁরাও সাহাবীদের মধ্যে পরিগণিত হবেন। যেমন হযরত আশয়াস ইব্‌নে কায়েস (রাঃ)। এ আলোচনায় সার সংক্ষেপ হিসাবে বলা চলে, যাঁরা ঈমান সহকারে অল্প বা বেশী সময় রাসূল (সাঃ)-এর সাক্ষাত করেছেন। তাঁরা রাসূল (সাঃ) থেকে কোন যুদ্ধে শরীক থাকেন বা নাই থাকেন, এমনকি যাঁরা সামান্য সময়ের জন্য রাসূল (সাঃ) -এর সাক্ষাত লাভ করে ঈমানী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন তাঁরা সবাই সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত। এটাই হল ইসলামী চিন্তাবিদদের সর্বসম্মত অভিমত।

সাহাবীদের সংখ্যা ঃ রাসূল (সাঃ)-এর কতজন সাহাবী ছিলেন তা সুনির্দ্দিষ্ট করে বলা দূরহ ব্যাপার। কেননা রাসূল (সাঃ)-এর রেসালাতি যুগে অগণিত লোক ইসলাম গ্রহণ করে তাঁর সান্নিধ্যে আসেন তাঁরা সকলেই সাহাবী। ইমাম আবু মা'রআ (রাঃ)-এর এক বর্ণনায় দেখা যায়, রাসূল (সাঃ) থেকে শুধু হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীদের সংখ্যাই এক লাক্ষের উপরে। তাহলে যে সকল সাহাবী কোন হাদীস বর্ণনা করেনি তাঁদের সংখ্যা যে কত বিপুল তা সহজেই অনুমেয়। কোন কোন বর্ণনায় দেখা যায়, দশম হিজরীতে অনুষ্ঠিত বিদায় হজ্বে দশ লাক্ষেরও বেশী সাহাবীদের সমাগম হয়েছিল। অতএব নির্দ্দিষ্টভাবে সাহাবীদের সঠিক সংখ্যা নির্ধারন করা অসম্ভব ।

সাহাবীদের মর্যাদা ও গুরুত্ব ঃ তাঁদের মর্যাদা অসাধারণ পর্যায়ের ছিল। রাসূল (সাঃ) -এর সাহচার্য লাভে সাহাবীগণ যে নূর লাভ করেছিলেন সে নূর বা আলো সাহাবীদের আসাধারণ মর্যাদার উৎস। তাঁদের সমাজ ছিল একটি আদর্শ মানব সমাজ। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁদের সততা, বিশ্বস্ততা,ভদ্রতা, আত্মত্যাগ, সদাচারণ, আল্লাহভীতি, তাকওয়া, ইহসান, সহানুভূতি, বীরত্ব , সাহসীকতা সবই ছিল নজীর বিহীন। তাঁরা ছিলেন নিষ্কলুষ ও পবিত্র চরিত্রের অধিকারী। এক কথায় বলা চলে রাসূল (সাঃ) যে সর্বোত্তম সমাজের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন, সাহাবায়ে কিরাম হচ্ছেন সে সমাজের মর্যাদার অধিকারী। সাহবাগণ হলেন সর্বকালের সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ মানব এবং হযরত রাসূল (সাঃ) -এর আদর্শের মূর্ত প্রতীক। রাসূল(সাঃ)-এর সান্নিধ্যে, তাঁর সংস্পর্ষে সাহাবীগণ পরিণত হন আর্দশমানবে। কথায় কাজে, বক্তৃতায়, ভাষণে, চলনে ফেরনে, উঠা-বসায়, আচার-আচরণে, ব্যবহারে এক কথায় যাবতীয় কর্মে রাসূল (সাঃ) -এর আদর্শ তাঁদের মাঝে প্রতিফলিত হয়। তাঁরা ছিলেন রাসূল (সাঃ) -এর বাস্তব অনুকরণ ও অনুসরনীয় ব্যক্তি। এ কারণেই তাঁদের চরিত্রে এমন সামান্যতম কলংক ঢুকেনি যার কারণে তাঁদের সমালোচনা করা যেতে পারে । অতএব রাসূল (সাঃ)-এর কোন সাহাবীর সমলোচনা করা অত্যন্ত গর্হিত কাজ। মহান আল্লাহ্ যাঁদের প্রতি সর্বোতভাবে নিজে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন, তাঁদের সমালোচনা করার অবকাশ থাকতে পারেনা। তাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন সত্য এবং ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সকল প্রকার সমালোচনার উর্ধ্বে।

সাহাবাদের মর্যাদার সমকক্ষ পরবর্তী যুগের কোন মুসলমানই তাঁদের সমমর্যাদা লাভ করতে পারেন নাই, কুরআন-সুন্নাহ এবং বিশ্ব মুসলিমের এ বিষয়ে কোন দ্বিমত নাই। সাহাবীগণ ছাত্র হিসাবে রাসূলের কাছে আল্লাহ্র

কালাম অধ্যয়ন করেন। আল্লাহ্ এবং রাসূল কর্তৃক পরবর্তী উম্মতের জন্য মনোনীত এবং ঘোষিত হয়েছেন আদর্শ শিক্ষক এবং সত্যের মানদণ্ড রূপে। তাঁরাই প্রথম সূত্র রাসূল (সাঃ) -এর উম্মতের । পরবর্তী উম্মত আল্লাহ্র কুরআনের ব্যাখ্যা ভাষ্য, রাসূলের পূণ্য পরিচয়, শিক্ষা, পবিত্র জীবনাদর্শ, তাঁদেরই মাধ্যমেই আমরা পেয়েছি। উম্মতের মধ্যেকার এ সূত্র উপেক্ষা করলে, স্বকীয়তা বিনষ্ট হলে স্বয়ং রাসূল (সাঃ)-এর পূণ্য পরিচয়, এমন কি কুরআন পর্যন্ত নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। তাই রাসূল (সাঃ) পূর্বাহ্নেই সাহাবাদের মান-মর্যাদার অসাধারণ গুরুত্ব ও প্রয়োজন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছেন। তাঁদের ঈমানের মত না হলে হিদায়াত নাই, মূল্য নাই; একমাত্র তাঁদের ঈমানের মত ঈমানই নির্ভরযোগ্য, হিদায়াতের মানদণ্ড; তাঁদের আদর্শের অনুসরণেই পরবর্তীরা আল্লাহ্র প্রসন্নতা লাভ করতে পারে। সাহাবাদের মর্যাদা সম্পর্কে কুরআনের ঘোষণা–

(১) আল্লাহ্ তাঁদের অন্তরের তাক্ওয়ার পরীক্ষা নিয়েছেন। –(সূরা হুজুরাত)

(২) আল্লাহ্ তাক্ওয়ার সত্যকে তাঁদের অবিচ্ছেদ্য অংশ করে দিয়েছেন। –(সূরা ফাতাহ)

(৩) সাহাবাদের সম্বোধন করে আল্লাহ্ বলেছেনঃ "আল্লাহ্ ঈমানকে তোমাদের প্রিয় এবং তোমাদের মনে ঈমানকে শোভা-সুন্দর করে দিয়েছেন; কুফুর, পাপ এবং আল্লাহ্র নাফরমানী তোমাদের কাছে অপ্রিয় করে রেখেছেন। –(সূরা হুজুরাত)

(৪) " হে আল্লাহ্ আমাদেরকে সে সিরাতে মুস্তাকীমে পরিচালিত কর; তোমার অনুগ্রহ প্রার্থীরা যে পথে চলেছেন।" সূরা ফাতিহাতে বিশ্ব মুসলিমকে যাঁদের পথে চলার জন্য আল্লাহ্র দরবারে প্রার্থনা করার এ নির্দেশ দিয়েছেন, বলা বাহুল্য সাহাবাগণই সে শ্রেষ্ঠতম বা অনুগ্রহ ভাজনদের অন্যতম।

(৫) "লোকেরা যেভাবে ঈমান এনেছে, তোমরা সে ভাবে তাঁদের মতই ঈমান আন; যখন তাঁদের বলা হয়, তখন তাঁরা বলে আমরা ঈমান এনেছি"–সূরা বাকারার আয়াতটিতে মুনাফিক এবং অন্যান্য অমুসলিমদিগকে বলা হয়েছে যে, তোমরা সাহাবাদের ঈমানের মত খাঁটি ঈমান আনয়ন কর; আয়াতটি সাহাবাদের উদ্দেশ্যই ইংগিত করা হয়েছে।

(৬) "মুনাফিকরা যদি তোমাদের ঈমানের মত ঈমান আনয়ন করে তাহলে তাঁরা হিদায়াত লাভ করবে।"

লক্ষ্য করুন সাহাবাদের ঈমানকে কি ভাবে অন্যান্যদের ঈমানের, হিদায়াতের মানদণ্ড রূপে ঘোষণা করা হয়েছে।" প্রথম পর্যায়ের মুহাজির, আনসার এবং তাঁদের আদর্শে উত্তম রূপে অনুসারীদের প্রতি আল্লাহ্ প্রসন্ন রয়েছেন এবং তাঁরাও আল্লাহ্র প্রতি প্রসন্ন। সাহাবাদের আদর্শ কিভাবে আল্লাহ্র প্রসন্নতার মানদণ্ড রূপে ঘোষণা করা হয়েছে। আল্লাহ্ তাঁদের প্রতি প্রসন্ন হয়েছেন, তাঁরাও আল্লাহ্র প্রতি প্রসন্ন রয়েছেন, তাঁদের জন্য জান্নাতের সু-সংবাদ দেয়া হয়েছে, চিরস্থায়ী জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দান করা হয়েছে।

"তোমাদেরকে শ্রেষ্ঠতম উম্মতরূপে তৈরী করা হয়েছে। অন্যান্যদের ক্ষেত্রে তোমরাই সাক্ষী নিযুক্ত হবে।" বলাবাহুল্য সাহাবারাই আয়াতে বর্ণিত "শ্রেষ্ঠতম উম্মতের" শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন এতে কোন সন্দেহ নাই।

(৭) জনসাধারণের জন্য শ্রেষ্ঠতম উম্মত হিসাবেই তোমাদের সৃষ্টি বা আত্ম প্রকাশ" এখানেও বর্ণিত "শ্রেষ্ঠতম উম্মত" এর শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন সাহাবাবৃন্দই।

(৮) "তাঁরাই হিদায়াতপ্রাপ্ত" সঠিক পথে; আয়াতটিকে সাহাবাদের সম্পর্কেই ঘোষণা করা হয়েছে। স্বয়ং আল্লাহ্ তাঁদেরকে হিদায়াতের সনদ দান করেছেন।

(৯) "তাঁরাই সত্যনিষ্ঠ" (সূরা হাশর) প্রথম দিকে মুহাযির সাহাবাদের গুণাবলী বর্ণনার পর তাঁদেরকে "সাদিক" বা সত্যনিষ্ঠ বলে আল্লাহ্ ঘোষণা করেছেন।

(১০) "তারাই সফল মনোরথ" (সূরা হাশর) বাক্যটির প্রথমাংশে আন্সার ও সাহাবাদের প্রশংসা করে আয়াতটিতে আল্লাহ্ সফল মনোরথ বলে তাঁদেরকেই চিহ্নিত করেছেন।

সাহাবা (রাঃ)-গণ সমালোচনার উর্ধ্বেঃ পবিত্র কুরআনে সাহাবাদের সম্পর্কে উপরোল্লেখিত ঘোষণা এবং প্রশংসার পর কোন মুসলমানই তাঁদের সম্বন্ধে বিরূপ ধারণা বা সমালোচনা করতে পারে না। স্বয়ং আল্লাহ্ যাঁদের প্রশংসা করে সততা, হিদায়াত ও ন্যায়নিষ্ঠ প্রভৃতির উপাধী এবং সাক্ষ্য শাহাদত ঘোষণা করেছেন, তাঁদের সম্বন্ধে বিপরীত ধারণা, সমালোচনা এবং ভাল-মন্দ বিচার করতে যাওয়া সুস্পষ্টতঃ আল্লাহ্র ঘোষণায় অনাস্থা ব্যতিত আর কিছুই নয় এবং বলা বাহুল্য যে, কোন মুসলমানই এ ধরণের অভিশপ্ত ধারণা এবং দুঃসাহস করতে পারে না।

রাসূল (সাঃ)-এর দৃষ্টিতে সাহাবায়ে কিরামগণঃ পবিত্র কুরআনে

সাহাবাদের উচ্চ প্রসংশা করে তাঁদেরকে হিদায়েতের মানদন্ড বলে ঘোষণা করে, তাঁদের ঈমান ও আদর্শকে পরবর্তীদের ঈমান আমলের শুদ্ধাশুদ্ধির কষ্টিপাথর রূপে নির্ণীত করেছে, এটাই শেষ নয়, বরং রাসূল (সাঃ) ও অনুরূপ সুস্পষ্টভাবে সাহাবাদের উচ্চ প্রশংসা করে তাঁদের আদর্শ অবশ্যই উম্মতকে অনুসরণ করার নির্দেশ প্রদান করেছেন। তাঁদের সমালোচনা ও স্বকীয়তা বিনষ্ট করার অভিশপ্ত প্রচেষ্টা হতে রাসূল (সাঃ)-এর অনুসারীগণকে বিরত থাকতে সুস্পষ্ট ভাষায় কঠোর ভাবে নির্দেশ প্রদান করেছেন।

হযরত উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত-একদিন রাসূল (সাঃ) সাহাবাদের অন্তর্বিরোধ সর্ম্পকে আল্লাহ্র কাছে জিজ্ঞেস করলে ওহী আসে "মুহাম্মদ! তোমার সাহাবাগণ আমার কাছে আসমানের প্রতীক; যে কেহ তাঁদের কোন আদর্শ অনুসরণ করবে, সে-সুনিশ্চিত হিদায়াত লাভ করবে।" রাসূল (সাঃ) ঘোষণা করে বলেন-আমার সাহাবাগণ নক্ষত্র সদৃশ; তাঁদের যে কোন জনের অনুসরণে তোমরা হিদায়াত লাভ করবে। রাসূল (সাঃ) বলেন- আমার উম্মতের মধ্যে একটি আদর্শের অনুসরণেই নিশ্চিত জান্নাত এবং মুক্তি লাভ করবে। সাহাবাদের এ জিজ্ঞাসার উত্তরে তিনি বলেন-যাঁরা আমার উম্মত এবং আমার সাহাবাদের আদর্শে সুপ্রষ্ঠিত পথে অবিচলিত রয়েছে। (মিশকাত) তিনি আরও বলেন-আমার অর্বতমানে তোমরা আবু বকর ও উমর (রাঃ)-এর অনুসরণ করবে।

রাসূল (সাঃ) সাহাবাদের সমালোচনা নিষিদ্ধ করে বলেন, আল্লাহ্র দোহাই দিয়ে বলছি, তোমরা আমার সাহাবাদের সমলোচনা করবে না। মনে রেখ তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ ,ভালবাসা প্রকান্তরে আমার প্রতিই বিদ্বেষ, ভালবাসা বই কিছু নয় ।- (তিরমিযী ; শিফা)।

আমার সাহাবাদিগকে তোমরা গালি দেবে না । মনে রাখবে আল্লাহ্র পথে তাঁদের যে কেহ মুষ্টিমেয় যব দান করেছেন, তোমরা ভুবন ভরা স্বর্ণ, রৌপ্য দান করেও তাঁদের সে এক মুষ্টি যবের মর্যাদা লাভ করে পারবে না। -(তিরমিযী)

এক হাদীসে রাসূল (সাঃ) বলেন- আমার সাহাবাদিগকে কেহ গালমন্দ দিচ্ছে যদি দেখ, তাহলে বল, তোমাদের এ জঘণ্য কাজে আল্লাহ্র লানত হোক। (তিরমিযী)

প্রসিদ্ধ সীরাত গ্রন্থ "শিফা" তে বর্ণিত রয়েছে রাসূল (সাঃ) বলেন, আমার সাহাবাদের আলোচনা কালে সংযত থাক। আমার সাহাবাদিগকে যে কেহ মন্দ বলবে তার উপর আল্লাহ্ ফেরেশতা এবং বিশ্বমানবের লানত পড়বে, তার কোন

সৎকর্মই আল্লাহ্‌র দরবারে কবুল হবে না। সমগ্র বিশ্বমানবের মধ্যে আমার, সাহাবারা আল্লাহ্‌র কাছে সর্বাপেক্ষা প্রিয় এবং হযরত আবু বকর, উমর, উসমান, আলী (রাঃ) তাঁদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। আমার সাহাবা মাত্রই পূণ্যের প্রতীক। তিনি (সাঃ) আরও বলেন–যে আমার সাহাবাদের ব্যাপারে হিফাযত করবে, কিয়ামতের দিন আমি তার হিফাযত করব। বলাবাহুল্য সাহাবাদের মান-মর্যাদার হিফা্যতই প্রকৃতপক্ষে রাসূল (সাঃ)-এর হিফাযত এবং এ জন্যই এর এত গুরুত্ব। তিনি (সাঃ) আরও বলেন, যে আমার সাহাবাদের ব্যাপারে যে আমার কথা রাখবে, সে কিয়ামতের দিন হাউযে কাওসারে আমার কাছে আসবে, পক্ষান্তরে যে তা রাখবে না, সে হাউযে কাওসারে আমার কাছে উপস্থিত হতে পারবে না। – (শিফা)

আল্লাহ্ রাসূল (সাঃ)-এর নির্দেশে ইসলামী চিন্তাবিদগণ প্রথম যুগ হতে এখন পর্যন্ত সকলেই একবাক্যে সিদ্ধান্ত নিয়াছেন, সাহাবারা সমালোচনার উর্ধ্বে, তাঁদের দোষ-ক্রুটির বিচার, স্বকীয়তা বিনষ্ট এমন উক্তি বা আচরণ নিঃসন্দেহে ইসলাম দ্রোহীতা। এতে ঈমান, আখিরাত উভয়েই বিনষ্ট হয়। যারা একাজে প্রবৃত্ত হয় তাদের মুসলমান বলা যায় না।

সহীহ্ বোখারীর বর্ণনায় রয়েছে, হিজরী দ্বিতীয় শতকের বিখ্যাত মুহাদ্দীস মুআফা ইব্‌নে ইমরান (রাঃ) বলেন- পরবর্তী যুগের যত বড় মণীষীই হন না কেন, সাহাবাদের সাথে কারও তুলনা হয় না। এমন কি হযরত উমর ইব্‌নে আবদুল আযীয (রহঃ) তাঁর অতুলনীয় মহত্ব সত্ত্বেও আমীর মুআবিয়া (রাঃ)-এর সম মর্যাদা সম্পন্ন হওয়া ত দূরের কথা, তাঁর ধারে কাছেও যেতে পারেন না।"

হযরত সহল ইব্‌নে আবদুল্লাহ্ তসতরী (রাঃ) বলেন, "যে ব্যক্তি সাহাবাদের সম্মান করে না এবং তাঁদের নির্দেশাবলীর গুরুত্ব দেয় না, সে কখনও প্রকৃত মুমিন মুসলমান হতে পারে না।"

মুহাদ্দীস হযরত আইয়ুব সখ্‌তীয়ানী বলেন– যে ব্যক্তি হযরত আবু বকর (রাঃ)-কে ভালবেসেছেন, সে তাঁর দ্বীনকে মযবুত করে নিয়েছেন; যে ব্যক্তি হযরত উমর (রাঃ)-কে ভালবেসেছেন, সে নিজের মুক্তিপথ পরিস্কার করেছেন। যে ব্যক্তি হযরত উসমান (রাঃ)-কে ভালবেসেছেন, সে আল্লাহ্‌র নূরের আলো লাভ করেছেন; আর যে ব্যক্তি হযরত আলী (রাঃ)কে ভালবেসেছেন, সে সুদৃঢ় রজ্জু আকড়িয়ে ধরেছেন। আর যে কেহ রাসূল (সাঃ)-কে প্রশংসা ও সম্মান করেছেন, সে নিফাক থেকে মুক্তি লাভ করেছেন। আর যে ব্যক্তি কোন একজন

সাহাবাদের অবমাননা করেছে, সে দ্বীনভ্রষ্ট, সুন্নাত-বিরোধী; বলে পরিগণিত হয়েছে, সুতরাং তার কোন আমলেই আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না বলে আমার আশংকা।–(শিফা)

মুহাদ্দীস হাফিয ইব্‌নে হযর (রহঃ) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "ইসাবা"র প্রথম খন্ডে প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস হাফিয আবু যরআ রাযী (রহঃ)-এর বর্ণনা উদ্ধৃত করে বলেনঃ যখন দেখবে যে, কোন একজন সাহাবার অবমাননা করছে, তখন তাকে জানবে নির্ঘাত অমুসলমান বলে। এদের আসল উদ্দেশ্য হল দ্বীন ইসলামের সত্যতার সাক্ষী বিনষ্ট করে সমাজে বিশৃংখলা সৃষ্টি করা।" এরা উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়েই এমন অপকর্ম এবং ধৃষ্টতা, দুরভিসন্ধি করে ইসলামের ভিত্তিমূলে আঘাত হানতে সচেষ্ট হয়।"

হযরত উসমান (রাঃ)-এর খিলাফত আমলে আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে সাবা নামক এক বিশিষ্ট ইহুদী মুসলমানের ছদ্মবেশে সমালোচনার এ বীজটি বপনের সূত্রপাত করেছিল। ইসলাম দ্রোহীর, পরবর্তীতে যুগে যুগে সুকৌশলে এ ধারাই সূক্ষ্মভাবে ব্যবহার করে আসছে মুসলমানরা যাতে এ দূরভিসন্ধি এবং চক্রান্তের শিকারে পরিণত না হয়, এজন্যই ইসলামের সূচনাতে আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ) সাহাবাদের মান মর্যাদা ঘোষণা করে তাঁদেরকে বিচার সমালোচনার উর্ধ্বে ঘোষণা করেছেন। সাহাবাদের সম্পর্কে এমন ধৃষ্টতা প্রদর্শনে বিরত থাকতে মুসলিম উম্মাহকে কঠোরভাবে নির্দেশ প্রদান করেছেন। কারও দোষগুন, ভালমন্দ বিচার করতে হলে তার ব্যক্তিত্ব বিতর্কিত, স্বকীয়তা আহত এবং জনমনে তার প্রতি আস্থা দুর্বল হতে বাধ্য। যারা সাহাবাদের সমালোচনা করতে যায়, তারা প্রকৃতপক্ষে সাহাবাদের পরিবেশিত সত্যতাকে অনিশ্চিত, করাই তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। আমরা আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্‌র রাসূলের পরিচয় জেনেছি সাহাবাদের মাধ্যমেই; তাঁরাই আমাদের মধ্যসূত্র, সর্বশ্রেষ্ঠ সূত্র; উৎস যদি সন্দেহাতীত না হয় তাহলে পরিচয়ের সত্যতা সম্বন্ধে নিশ্চয়তা কখনও সম্ভব হতে পারে না। তাই যুগে যুগে শত্রুরা ইসলামের নামে ইসলামের মূলে আঘাত হেনে প্রচারণা সৃষ্টি করেছে এবং এ ধারা এখনো অব্যাহত রেখেছে। "আল্লাহ্‌র রাসূল ব্যতীত কেহই সত্যের মানদন্ড হতে পারেনা, কেহই সমালোচনার উর্ধ্বে হতে পারেনা" এ মানসিকতার আকীদা প্রচারই তাদের ইতিপূর্বে উল্লেখিত কুরআনের বর্ণনার পরও যদি বলা হয় যে, সাহাবারা রক্ত-মাংসের মানুষ; ভুল-ক্রুটি, পাপ-অপরাধ যে তাঁদের হয় নাই কিংবা হতে পারে না এমন নিশ্চয়তা কোথায়? অতএব তাঁরা সত্যের মানদন্ড এবং বিচার-সমালোচনার উর্ধ্বে হবেন কেমন করে? আর তাঁদেরকে উম্মতের অনুসরণীয় আদর্শ রূপে নির্বিচারে নির্দ্বিধায় মেনে নেয়া যেতে পারে কিরূপে?

সাহাবাদের সমালোচনা বা তাঁদের বিচার করতে যাবে কে? ইতিহাস? আপনার কিংবা ইতিহাসের বিচার যে নির্ভুল, তার প্রমাণ কি? আপনার কিংবা ঐতিহাসিকের বিচার যে সন্দেহাতীত, ভুল-ত্রুটির ঊর্ধ্বে সে সত্যতা কোথায়? এক্ষেত্রে কি দিয়ে ভুলের বিচার করবেন, এ অধিকার কে দিয়েছে? এখানে স্বয়ং আপনার বিচার বুদ্ধি, ফয়সালার নির্ভুলতা অনিশ্চিত, সেখানে আপনি মহান সাহাবাদের বিচার করবেন, কোন যুক্তিতে? সমালোচনার আদালতে তাঁদের উপস্থিত করে ইতিহাসের সাক্ষী কোথায় পাওয়া যাবে? আপনার বিচার-বুদ্ধি, ইতিহাসের মন্তব্য যখন ভুলভ্রান্তি-সম্ভাবনাময়, সমালোচনা, বিচার সাপেক্ষ, তখন আপনার কিংবা ইতিহাসের পক্ষে সাহাবাদের মহান আদর্শের বিচার করার অধিকার যে আপনার নেই, নির্বিচারে, নির্দ্বিধায় মেনে অনুসরণই যুক্তিসম্মত, কল্যাণজনক, একথা অস্বীকার করতে পারবেন কি?

এক কথায় সাহাবাদের ভুল-বিচ্যুতি, ভাল-মন্দ বিচার করার অধিকার ও যোগ্যতা আপনি, আমি এবং ইতিহাস কারও নেই, একথা নেহাত যুক্তিতর্ক ও ন্যায়ের খাতিরেই স্বীকার করতেই হবে। সমালোচনায় স্বভাবতঃই সমালোচিতের স্বকীয়তায় আহত হওয়ার সম্ভাবনা বেশী; জনমনে পূর্ব-পরিচিত মর্যাদা ক্ষুণ্ন হতে চায়; এমতাবস্থায় আপনার-আমার পক্ষে সাহাবাদের সমালোচনা, তাঁদের স্বকীয়তার উপর যে পরোক্ষ আক্রমণ এবং ইসলামের মূল ভিত্তির সত্যতা, বিশুদ্ধতাই প্রচন্ডভাবে আহত ও আক্রান্ত হতে বাধ্য। একটু চিন্তা করলেই একথা দিবালোকের মত সুস্পষ্ট হয়ে যায়; এমতাবস্থায় সাহাবাদের সমালোচনায় বিরত থাকাই প্রতিটি মুসলমানের যুক্তিতর্কের খাতিরেই এ কথা স্বীকার করতেই হবে। সে জন্যই এটা অযথা এবং অনধিকার চর্চা। সাহাবাদের ভুল-ত্রুটির বিচার, সমালোচনার অবকাশই নাই বলে কারও সে অধিকারও নাই; সাহাবাদের সমালোচনা ও সংশোধন আল্লাহ্ ও রাসূলের আদালতে হয়ে গিয়েছে। অন্তর্যামী আল্লাহ্ জ্ঞানে জ্ঞান-সমৃদ্ধ, আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ) সাহাবাদের শিক্ষা-দীক্ষা, স্বভাব-চরিত্র, ইসলাম-প্রীতি ও মানসিকতা, তাঁদেরকে উম্মতের অনুসৃত শিক্ষকরূপে মনোনীত করেছেন। তাঁদের সার্বিক আদর্শ বিচারে মন্তব্য করেছেন যে তাঁরাই সুপথগামী, সত্যবাদী, সত্যনিষ্ট, তাঁদের প্রত্যেকেই জান্নাতবাসী; প্রত্যেককেই আল্লাহ্ তায়ালা পূণ্য পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তাঁদের অনুসরণ উম্মতের পক্ষে অবশ্য জরুরী এবং বলাবাহুল্য যে কোন বিষয়ে আল্লাহ্ এবং রাসূলের বিচার, সিদ্ধান্ত ঘোষিত হওয়ার পর তাতে অন্যথা করার অধিকার কোন মুমিন মুসলমানের নাই।" এমন কি বিতর্কিত বিষয়েও আল্লাহ্র রাসূলের

বিচার প্রার্থী না হলে এবং তাঁর বিচার অম্লান বদনে মেনে না নিলে ঈমান থাকে না। এমতাবস্থায় মুসলমান বলে দাবী করলেও সে মুসলমান থাকে না। রাসূল (সাঃ) জামানায় অনুরূপ ঘটনায় জনৈক মুসলমানকে হযরত উমর (রাঃ) কতল করলে পবিত্র কুরআনের সূরা নিসার এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় এবং ঘোষণা করে যে আল্লাহ্র রাসূলের বিচারকে অমান্য করা তো বড় কথা, তাঁর বিচার সম্পর্কে যদি অন্তরে অনুমাত্র দ্বিধা-দ্বন্ধ থাকে তবুও ঈমান বিনষ্ট হয়ে যায় এবং এ রূপ ব্যক্তি নিজকে যতই মুসলমান বলে পরিচয় দিক না কেন, কখনও প্রকৃত মোমিন নয়। সাহাবাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ এবং রাসূলের ঘোষণা, তাঁরা সমালোচনার ঊর্ধে এবং সত্যের মানদণ্ড বলে বার বার নির্দেশের পর তাঁদের বিচার সমালোচনা করার আগে নিজের ঈমানের খবর নিতে হবে। যতক্ষণ না কারও ঈমানে ঘুন না ধরেছে, সে কখনও আল্লাহ্, রাসূলের বিচারের পর সাহাবাদের সমালোচনার মত ধৃষ্টতা করতে পারে না। সাহাবাদের ভুল-ত্রুটি হয়েছিল কিনা এবং হতে পারে কিনা, সেটা প্রশ্ন নয় বরং দেখতে হবে উম্মতের আদর্শ-অনুসৃত হিসেবে তাঁদেরকে মনোনীত করেছেন?

মানুষের মনোনয়ন নির্বাচনে নির্বাচক যতই জ্ঞানী-গুণী হোন না কেন ভুল-ত্রুটি থাকতে পারে; কিন্তু আল্লাহ্ এবং রাসূলের মনোনয়নে ভুল-ত্রুটির সম্ভবনাও মুমিন মুসলমানের কল্পনাতীত। মনোনীত এবং নির্বাচিতের ভুল-ত্রুটি এবং অযোগ্যতা প্রকৃতপক্ষে যে মনোনয়নকারী এবং নির্বাচকেরই বিচারের ভুল, জ্ঞানাভাব এবং অযোগ্যতাই প্রমাণ করে একথা কে না জানে। নির্বাচিত মনোনীতের পুনর্বিচার এবং সমালোচনা যে প্রকারান্তরে বিচারক এবং মনোনয়নকারীরই সুবিচার, অবিচার এবং যোগ্যতা, অযোগ্যতার বিচার, মনোনীত এবং নির্বাচিতের সমালোচনা এবং অবমাননা, তাঁদের স্বকীয়তা বিনষ্ট হয় এমন আচরণ ও আলোচনা যে প্রকৃতপক্ষে স্বয়ং বিচারক এবং মনোনয়নকারীর যোগ্যতার প্রতিই কটাক্ষ এবং তার স্বকীয়তার উপর নির্লজ্জ আক্রমণ তাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। বলাবাহুল্য কুরআন এবং হাদীসের সুস্পষ্ট ঘোষণায় আল্লাহ্ এবং রাসূলই সাহাবাগণকে উম্মতের হিদায়াতের ধ্রুবতারা, অবশ্য অনুকরণীয়, আদর্শ-অনুসরনীয় যোগ্যতার বিচার পরীক্ষা করে তাঁদের সত্যের, ঈমানের মানদন্ড এবং সমালোচনার ঊর্ধে বলে রায় দিয়েছেন।

ইতিহাসের সূত্র ধরে অনেকেই সাহাবাদের সমালোচনা করে, তারা অনেকেই ইতিহাসের সঠিক মর্যাদা সম্বন্ধে সচেতন নয়। তাই ইতিহাস পরিবেশিত বর্ণনাকে সত্য বলে মনে করে বিভ্রান্ত হয়। অনুরূপ ভাবেই কুরআন, সুন্নাহ্র প্রকৃত মর্যাদা ও গুরুত্ব যথাযথভাবে উপলব্ধি না করে সব কিছুকেই

একাকার সমপর্যায়ের ভেবে ইতিহাস এবং কুরআন, সুন্নাহ্ উভয়ের প্রতিই অবিচার করে থাকে। তারা ভুলে যায়, কোন বিষয় স্থির সিদ্ধান্ত নেয়ার পূর্বে বর্ণনার নির্ভুলতা, নির্ভরতা, নিরপেক্ষতা সম্বন্ধে স্থির নিশ্চিত হতে হবে; বলা বাহুল্য ইতিহাস আমাদিগকে এ নিশ্চয়তা দিতে পারে না। কেননা ইতিহাস বহুরূপী, কখনও একচোখা'; ঐতিহাসিকের দৃষ্টিভংগী এবং মানসিকতার প্রভাব এড়িয়ে চলার সাধ্য ইতিহাসের নাই; এজন্যই একই ঘটনার পরস্পর বিরোধী বর্ণনা ইতিহাসের পাতায় দেখতে পাওয়া যায়; এ চরিত্রের বিভিন্ন চিত্র অংকিত হয় ইতিহাসের তুলিকায়; একের তুলিতে যে ব্যক্তিত্ব, যে চরিত্র অনন্য মহিমাময় মহান, অন্যের তুলনায় সে চরিত্রই কুৎসিত, কদর্যহীন, শয়তানের প্রতীক; এহেন দৃশ্য নিত্য-নৈমিত্তিক সত্য। বন্ধুর তুলিতে অতি কুৎসিত চরিত্রও অনিন্দ সুন্দর, আবার শত্রুর তুলিতে অতি সুন্দরও অতি কুৎসিত হয়ে যায়; তাই সঠিক সত্য উদ্ধার করা প্রকৃতপক্ষে বড়ই কঠিন। এ জন্যই জ্ঞানীরা বলেন- ইতিহাস জানা যত সহজ, ইতিহাস বুঝা ততই কঠিন। ইতিহাস কাউকেও কখনও ডুবিয়েছে, ভাসিয়েছে, উঠিয়েছে, নামিয়েছে, তাই অনেক সাধ্য-সাধনা এবং অক্লান্ত পরিশ্রম করেও কেহ প্রকৃত সত্য যে কি তা সুনিশ্চিত এবং সঠিক বলতে পারে না। ইতিহাসের এ ছলনার, গোলক ধাঁধায় আটকে গিয়ে অনেকেরই ভরাডুবি হয়েছে। শত সাধ্য-সাধনা করেও ইতিহাসের বর্ণনাকে অনেক সময় সন্দেহাতীত এবং সঠিক বলে মন্তব্য করা যায় না।

ইতিহাসের কোন গুরুত্ব নাই ঃ ইতিহাসের কোন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা মানব জীবনে নাই। শুধু বলা যায় ইতিহাসের পথ বড়ই পিচ্ছিল। মুহূর্তের অসাবধনতায় পদে পদে একেবারে বিভ্রান্তির গহীন খাদে পতিত হওয়ার আশংকা রয়েছে; তাই ইতিহাসের পথে পথিককে অতি সন্তর্পণে চলতে হয়। আল্লাহ্, রাসূল এবং ঐতিহাসিকের মধ্যে যে ব্যবধান কুরআন, সুন্নাহ্র এবং ইতিহাসের মধ্যেও তদ্রুপ আকাশ পাতাল ব্যবধান। আল্লাহ্, রাসূলের সাথে যেমন ঐতিহাসিকের তুলনা হয় না, কুরআন হাদীসের বর্ণনাকেও তেমনি ঐতিহাসিকের বর্ণনায় সমপর্যায় ভুক্ত করা যায় না। এমতাবস্থায় ইতিহাস যদি এ বর্ণনার বিরোধিতা করে, তাহলে সত্য এবং যুক্তির আলোকে ইতিহাসকেই কুরআন, সুন্নাহ্র অনুকূলে আত্মসমর্পণ করতে হবে, নতুবা ইতিহাস চির উপেক্ষিতই থেকে যাবে। যদি ঐতিহাসিকের বর্ণনা কুরআন, সুন্নাহ্র বিরোধী হয়, তাহলে বুঝতে হবে ইতিহাসে চাপা পড়ে রয়েছে। সঠিক তথ্য পরিবেশিত হয় নাই; প্রকৃত সত্য ঐতিহাসিকের অজ্ঞতায় যদি পূর্বোল্লিখিত কুরআন,

হাদীসের বর্ণনার বিপরীত হয়, তাহলে নির্দ্বিধায় স্বীকার করতে হবে ঐতিহাসিকের ভুল হয়েছে, আল্লাহ্ ও রাসূলের ভুল হতে পারে না। এমতাবস্থায় হাদীসের অনুকূলে ইতিহাসের ব্যাখ্যা করে উভয়ের মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তি করে ঈমান বাঁচাতে হবে। ইতিহাসের বিশ্লেষণে কোন মতেই কুরআন, সুন্নাহকে বিসর্জন দেয়া চলবে না। এক কথায় বিরোধের ক্ষেত্রে কুরআন, সুন্নাহ্ হবে বিচারের মানদণ্ড, ইতিহাস নয়। ইতিহাসের কিছু কিছু বর্ণনা সাহাবা চরিত্রের উচ্চ মর্যাদা, উন্নত আদর্শ সম্পর্কে, সাধারণ পাঠকের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সঞ্চার করে থাকে। যেমন ইমাম হাসান (রাঃ)-এর মৃত্যু, কারবালার ঘটনা, হযরত আমীর মুয়াবিয়া (রাঃ) ইত্যাদি সম্পর্কে। বলাবাহুল্য আল্লাহ্ রাসূল বর্ণিত সাহাবাদের মর্যাদা সম্পর্কে যথোচিত সচেতনতার এবং ইতিহাস ও পরিস্থিতির সঠিক মূল্যায়নের অভাবই এ বিভ্রান্তির মূল কারণ।

এরূপ ক্ষেত্রে প্রথমেই মনে রাখতে হবে যে, সাহাবাদের উচ্চ মর্যাদা আল্লাহ্-রাসূল কর্তৃক বর্ণিত বর্ণনা পক্ষান্তরে এর পরিপন্থী বর্ণনা ও ঘটনা ইতিহাস বা ঐতিহাসিকের পরিবেশনা অসত্য। কুরআন-হাদীস বলে তাঁরা ভাল; ঐতিহাসিক এবং ইতিহাস বলে না, তাঁরা নিখুঁত নয়, অন্যান্যদের মত তাঁদেরও দোষগুণ, ভালমন্দের সমাবেশ রয়েছে। এমতাবস্থায় চিন্তা করে স্থির করতে হবে কে ভুল, কে শুদ্ধ? স্বীকার করতে হবে, আল্লাহ্-রাসূল ভুল করেছেন, নয় ইতিহাস ভুল করেছে, সঠিক সত্য পরিবেশনে অক্ষম রয়েছে। শরীয়তের পরিভাষায় এরূপ আইনসম্মত বিচারকে ইজতিহাদ বলা হয় এবং বিচারককে বলা হয় মুজতাহিদ। মুজতাহিদ তিনি তো ঠিকই, যিনি ভুল করেন তিনিও ঠিক; তাঁদের যে কোন একজনের সিদ্ধান্ত ও বিচার মেনে চলা যেমন শরীয়তসম্মত, পক্ষান্তরে কারও মত, কারও বিচার মেনে না নেয়া কিংবা অমান্য করে চলাও তেমনি বে-আইনী এবং মারাত্মক অপরাধ বলে বিবেচিত। বলাবাহুল্য বিচারক এবং শাস্ত্রবিদদের এ ধরনের ভুল হলেও তা সাধারণেরও ভুলের মত নয়; একে বলা হয় ইজতেহাদী ভুল; তাঁদের এ ভুলও প্রশংসনীয় ও কল্যাণকর। এ তথ্যের প্রতি ইংগিত করে বর্ণিত, রয়েছে যাঁর ইজতিহাদ বা বিচারে ভুল হয়েছে তিনিও পুরস্কারে বঞ্চিত হবেন না। তিনিও একটি পুরস্কার পাবেন, পক্ষান্তরে যাঁর ইজতিহাদ সঠিক হয়েছে, তিনি পাবেন দু'টি পুরস্কার। একটি সঠিক সিদ্ধান্তে জন্য, যথাসাধ্য সাধনায় পৌছার জন্য, অপরটি সঠিক সিদ্ধান্তের জন্য। (বোখারী-মুসলিম)

সাহাবাদের মতবিরোধও এ পর্যায়েরই ছিল। তাঁদের বিচারে বিরোধ কিংবা

ব্যবধান থাকলেও তা ছিল আইনসম্মত, কারও বিচারে ভুল থাকলেও তিনি ছিলেন নিরাপরাধ। ইসলামের সেবায়, ইসলামেরই বিধি-বিধান অনুযায়ী ন্যায়ের প্রতিষ্ঠায়, অন্যায়ের প্রতিকারেই ছিল তাঁদের একে অন্যের বিরোধ। ইসলামী দৃষ্টি-ভংগিতেই তাঁরা নিজেকে ন্যায় এবং প্রতিপক্ষকে অন্যায় ভেবেছেন, অসৎ মনে করেন নাই। পরিস্থিতির জটিলতায় ভুল বুঝাবুঝিই এর মূল; ইতিহাস জানে-মদীনার মুনাফিক এবং তাদের উত্তরসূরীরা ইসলামের যে ক্ষতি করেছে; অন্যান্য অমুসলমান এবং মুশরিক রাষ্ট্রও ততখানি ক্ষতি করতে পারে নাই। রাসূল (সাঃ)-এর বর্তমানে মুনাফিকরা ততখানি সফল হতে না পারলেও তাদের চেষ্টার ত্রুটি করে নাই। বলাবাহুল্য এরা ছিল জাতে ইহুদী। রাসূল (সাঃ) -এর পর হযরত উমর (রাঃ)-এর খিলাফত আমল পর্যন্ত তারা মাথা তুলতে না পারলেও হযরত উসমান (রাঃ) হত্যার নেপথ্য কুখ্যাত ইহুদী আবদুল্লাহ্ ইব্নে সাবা এ মুনাফিকদেরই উত্তরসূরী। মুখে ইসলামের মুখোশে মুসলমানদের ছদ্মবেশে সততা ও ধর্মপরায়ণতার অভিনয় করে মুসলমানদের মধ্যে জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং সাহাবদের বিশেষ করে হযরত উসমান (রাঃ)-এর স্বকীয়তা ও চরিত্র হননের অভিযান চালায়। হিজাজ থেকে এ ঘৃণিত প্রচার চালাতে থাকে অতি সুকৌশলে। সাধারণরা তো দূরের কথা, অনেক বিশিষ্টদের পক্ষেও তার এ দূরভিসন্ধি অনুমান করা সম্ভব হয় নাই। কুখ্যাত আবদুল্লাহ্ ইবনে সাবা যে বিষবৃক্ষ রোপন করেছিল, হযরত উসমান (রাঃ)-এর শাহাদত তাঁর অন্যতম মর্মন্তুদ পরিণতি; এখানেই ইতি হয় নাই, বরং জমল যুদ্ধ, সিফ্ফীন যুদ্ধ প্রভৃতির পরবর্তী ঘটনাবলীই এর মর্মান্তিক পরিণাম। বলাবাহুল্য এ কুখ্যাত আবদুল্লাহ্ ইব্নে সাবার উত্তরসূরীরা আজও ইসলাম বিধ্বংসী কর্মকাণ্ডে সক্রিয় রয়েছে। এরা যুগে যুগে, দেশে দেশে, নানাবেশে ইসলাম দ্রোহিতায় পঞ্চম বাহিনীর ভুমিকা পালন করে চলেছে। এরা যে কত সূক্ষ্মভাবে তাদের এ প্রচার অভিযান চালায়; হযরত উসমান (রাঃ)-এর শাহাদাত এবং পরবর্তী ঘটনাবলী এর জ্বলন্ত নিদর্শন; তারা সূক্ষ্ম সুকৌশলে ধারণাতীত ভাবে পরিস্থিতি এমনভাবে বিষাক্ত এবং ঘোলাটে করে, জনমনকে এমনি উত্তেজিত করে যে, সঠিক অবস্থার মূল্যায়ন করার মত মানসিকতা পর্যন্তও উত্তেজিতদের তখন লোপ পেয়ে যায়। বিচক্ষণ সাহাবাগণ হযরত উসমান (রাঃ)-এর হত্যার পরিস্থিতি মুকাবিলা করতে অসহায় হয়ে পড়েন। দূর্বৃত্তরা ভিতরে ভিতরে তাঁদের স্বকীয়তায় এমনভাবে প্রচন্ড আঘাত হানে যে; তাদের কথা বিক্ষুদ্ধ উত্তেজিত জনতা শুনতেই প্রস্তুত নয়। একমাত্র রাষ্ট্রশক্তিই তা দমন করতে পারে; কিন্তু হযরত উসমান (রাঃ) যে নিজে প্রাণ দিতে প্রস্তুত, তবুও একজন মুসলমানেরও রক্তপাতে উদ্যোগী ছিলেন

না। ব্যক্তিগতভাবে হযরত উসমান (রাঃ) দূরাত্মা আবদুল্লাহ্ ইব্নে সাবার দল দের লক্ষ্য ছিল না, মূল খিলাফত বরং দ্বীন ইসলামই ছিল তাদের লক্ষ্য। তাদের কাছে উসমান (রাঃ) ও যেমন, আলী (রাঃ) ও তেমন। অতঃপরও তাদের এ নির্মম খেলা চলতে থাকে। এরা ছিল জমল যুদ্ধের, সিফ্ফীন যুদ্ধের নেপথ্যের মূল নায়ক। হযরত উসমান (রাঃ)-এর পর হযরত আলী (রাঃ) খলীফা নির্বাচিত হলে উসমান (রাঃ) হত্যাকারী এ দূরাত্মারাই উসমান (রাঃ) দরদী হয়ে হযরত আলী (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে। শেষ হযরত আলী (রাঃ) নিজে খলীফা হবার জন্য উসমান (রাঃ) হত্যায় জড়িত ছিলেন বলে সুকৌশলে নেপথ্যে রটনা দ্বারা হযরত আলী (রাঃ) বিরুদ্ধে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত এবং বিক্ষুদ্ধ করতে থাকে। এতদুদ্দেশ্যে গুজবের পর গুজব ছড়ায়; দাবী উঠে- হযরত উসমান (রাঃ)-এর হত্যাকারীদের কিসাস নিতে হবে। এর জন্যই জমল এবং সিফ্ফীন যুদ্ধে প্রতিপক্ষের নিহতদের সম্পর্কে হযরত আলী (রাঃ)-কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, তাঁদের যে কেহ শুদ্ধচিত্তে, ন্যায়-প্রেরণার নির্মলচিত্তে, নিষকলুষ অন্তরে নিহত হয়েছেন, তাঁরা জান্নাতে যাবেন! (মুকদ্দিমা ইব্নে খালদুন ২১৫ পৃঃ)।

সিফ্ফিন যুদ্ধ প্রত্যাবর্তনের পর কেহ হযরত আলী (রাঃ)-এর সম্মুখে আমীর মুআবিয়া (রাঃ)-এর বিরূপ সমালোচনা করলে তিনি বলেন, জেনে রাখ, আমীর মুআবিয়াকে হারালে তোমাদের মাথা বাঁচাতে পারবে না। মাকাল ফলের মত কর্তিত মস্তক ধড় হতে টপ টপ করে মাটিতে পড়তে থাকবে। বিশিষ্ট মণীষী আবু মুসলিম খাওলানী (রাঃ) সদলে আমীর মুআবিয়া (রাঃ)-এর সমীপে হাযির হয়ে বলেন, তুমি কি আলী (রাঃ)-এর চেয়ে বড় যে তাঁর বিরোধিতা করছ? তদুত্তরে তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ, হযরত আলী (রাঃ) যে আমার অপেক্ষা অনেক উত্তম এবং শ্রেষ্ঠ তাতে সন্দেহ নাই। "উসমান (রাঃ) হত্যার কিসাস" ব্যতীত তাঁর সাথে আমার কোন বিরোধ নাই; তিনি আমার চাচাত ভাই, তাঁর "কিসাস'' নেয়ার ন্যায্য অধিকার আমার রয়েছে। আলী (রাঃ) যদি হত্যাকারীগণকে আমার হাতে ছেড়ে দেন, তাহলে সর্বপ্রথম আমিই তাঁর অনুগত্যের শপথ নিব। (আল-বিদায়া ৮ম খন্ড ১৩১ পৃঃ) । বলাবাহুল্য সাহাবা জীবনের এ সমস্ত ঘটনাবলী আল্লাহ্ পূর্বাহ্নেই ইংগিত দিয়েছিলেন; রাসূল (সাঃ) যে তা জানতেন না এমন নয়; বিভিন্ন হাদীসে হযরত উসমান (রাঃ)-এর শাহাদত পূর্ব হতে আরম্ভ করে সিফ্ফীন যুদ্ধ এবং নেপথ্যের খলনায়ক আবদুল্লাহ্ ইব্নে সাবা ও তদীয় পঞ্চম বাহিনী খারিজীদের কীর্তিকলাপ সম্বন্ধে তিনি সুস্পষ্ট আভাষ এবং যথোচিত নির্দেশ প্রদান করেছেন।

যাই হোক সাহাবাদের এ ইজতিহাদি মত বিরোধ অপরাধ নয়, তাই সাহাবাদিগকে নির্দোষী নিরপরাধ, উন্নত-আদর্শ, উম্মত-শ্রেষ্ঠ, উম্মতের পথিকৃত এবং অবশ্য অনুকরণীয় আদর্শ, মুক্তিপথের মানদণ্ড, সত্যের এবং ন্যায়ের পরাকাষ্ঠা বলে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছেন। যেহেতু সাহাবা জীবনের এ ধারনের মত বিরোধ বিচার-পার্থক্য এবং ন্যায়-দ্বন্দ্বকে ইসলাম দ্রোহীরা তাদের জঘন্য উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য সুপরিকল্পিত এবং নিপুণভাবে ব্যবহার করবে, এর দ্বারা সাহাবাদের স্বকীয়তা বিনষ্ট ও চরিত্র হননের অপপ্রয়াস পাবে, এমতাবস্থায় মুসলমানেরা যাতে সাহাবাদের প্রতি শ্রদ্ধা হারায়, তাঁদের সম্পর্কে অসতর্ক, অসংযত আলোচনা করে নিজের দ্বীন দুনিয়া বিনষ্ট না করে, তজ্জন্যই পূর্বাহ্নেই কঠোর নির্দেশ প্রদান করে রাসূল (সাঃ) বলেছেনঃ "আল্লাহ্‌র দোহাই, "তোমরা আমার সাহাবাদের প্রতি বাক্যবাণ নিক্ষেপ কর না। তাঁদেরকে শ্রদ্ধা করবে, ভালবাসবে; তাঁদের প্রতি বিরূপ মনোভাব এবং বিদ্বেষ পোষণে বিরত থাকবে। মনে রাখবে তাঁদের প্রতিটি আচরণ, বিদ্বেষ, ভালবাসা এবং বিরূপ মনোভাব প্রকৃতপক্ষে আমারই মধ্যে পরিগণিত হবে। আমার সাহাবাদের আলোচনায় তোমরা সতর্ক ও সংযত থাক। আমার সাহাবাদের ইজ্জত-সম্মান রক্ষা করে চল। আমি কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে রক্ষা করব।"

আহ্‌লে বাইতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ঃ রাসূল (সাঃ)-এর সম্মানের পর তাঁর পরিবারবর্গকেও সম্মানের অন্তর্ভূক্ত করেছেন। মহান আল্লাহ্ কুরআনে রাসূল (সাঃ)-এর আহলে বাইতের প্রশংসায় বলেন-"আল্লাহ্ চান হে আহলে বাইত! তোমাদের থেকে পঙ্কিলতাকে দূরে রাখতে এবং তোমাদেরকে পাক-পবিত্র রাখতে।" হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌নে আব্বাস (রাঃ) ও হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত রয়েছেঃ "রাসূল (সাঃ)-এর সমস্ত সহধর্মিনীগণ, আহলে বাইতের অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।" আল্লাহ্ রাসূল (সাঃ)-এর সহধর্মিনীগণের মর্যাদা বর্ণনায় বলেন-"আর তাঁর সহধর্মিনীগণ তাঁদের (মুমিনদের) মা।" আয়াতের ব্যাখ্যায় রাসূল (সাঃ)-এর সহধর্মীনীগণকে মুমিনদের মা বলে আখ্যায়িত করার প্রকৃত অর্থ মায়ের সম্মান ও শ্রদ্ধা যেমন অপরিহার্য তদ্রুপ তাঁদের সম্মান এবং শ্রদ্ধাও তেমনি অপরিহার্য।হযরত যায়েদ ইব্‌নে আরকাম (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (সাঃ) বলেছেন-"আমি তোমাদেরকে আমার আহলে বাইতের সম্মান করা এবং তাঁদের সাথে সদাচার করার জন্য আল্লাহ্‌র কসম দিচ্ছি।" এ বাক্যটি তিনবার রাসূল (সাঃ) উচ্চারণ করেছেন।

কারা আহ্‌লে বাইত ঃ লোকেরা যায়েদ ইব্‌নে আরকাম (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল, আহলে বাইত কারা? তিনি বলনে, আলী (রাঃ)-এর বংশধর, যা'ফর (রাঃ)-এর বংশধর, আকীল (রাঃ)-এর বংশধর ও আব্বাস (রাঃ)-এর বংশধরগণ। আহলে বাইতকে চিনার অর্থ রাসূল (সাঃ)-এর সাথে তাঁদের বংশগত এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক কি ধরনের তা জানা। যাতে সে অনুপাতে তাঁদের সম্মান করা যেতে পারে। রাসূল (সাঃ) বলেছেন- "আমি তোমাদের মাঝে দু'টি বিষয় রেখে যাচ্ছি, যতক্ষণ এ দু'টিকে আঁকড়িয়ে ধরবে ততক্ষণ তোমরা গোমরাহ হবে না। কিতাবুল্লাহ এবং আমার আহলে বাইত। অতএব তোমরা চিন্তা কর আমার পর তাঁদের হক আদায়ের ব্যাপারে তোমরা কিরূপ আচরণ করবে? "রাসূল (সাঃ) আহলে বাইতকে চিনা জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভের ওসীলা। তাঁদেরকে ভালবাসা পুলসিরাত অতি সহজে অতিক্রম করার কারণ এবং তাঁদের সাহায্য করা আযাব থেকে পরিত্রাণ লাভের উপায় বলে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। বহু হাদীসে আহলে বাইতের মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করা হয়েছে এবং সেগুলো দ্বারা তাঁদের সম্মান করা জরুরী বলে প্রমাণিত হয়েছে।

আহলে বায়তের প্রতি সম্মানঃ হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ হাসান (রহঃ) বর্ণনা করেন, আমি কোন এক প্রয়োজনে উমর ইব্‌নে আবদুল আযীয (রহঃ)-এর কাছে যাওয়াতে আমাকে দেখে তিনি বললেন, আপনার কোন প্রয়োজন দেখা দিলে অন্য কাউকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিবেন অথবা একটি লিখে পাঠাবেন। আপনি নিজে কষ্ট করে আসবেন না। কেননা আল্লাহ্ আপনাকে আমার দরজায় দেখবেন অথবা আমি আপনাকে আমার দরজায় দেখব এটা আল্লাহ্‌র দরবারে আমার জন্য সত্যিই লজ্জার বিষয়।

হাকেম শা'বী বর্ণনা করেন, যায়েদ ইব্‌নে সাবিত (রাঃ) আপন মায়ের জানাযা আদায় করলেন। নামাযান্তে তাঁর সওয়ারী আনা হল। ইব্‌নে আব্বাস (রাঃ) সওয়ারীর লাগাম ধরলেন। তখন যায়েদ ইব্‌নে সাবিত (রাঃ) তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন, 'হে রাসূলুল্লাহ্‌র চাচাত ভাই! আপনি লাগাম ছেড়ে দিন। তখন ইব্‌নে আব্বাস (রাঃ) বললেন, আমাদেরকে আলেমদের এরূপ সম্মান করতেই আদেশ করা হয়েছে।' যায়েদ ইব্‌নে সাবিত (রাঃ)-এটা শুনে তাঁর হাত চুম্বন করে বললেন, আমাদেরকেও আহলে বাইতের প্রতি এরূপ সম্মান করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে উমর (রাঃ)-এর ঘটনা ঃ আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে ওমর (রাঃ) একদিন মুহাম্মদ ইব্‌নে উসামাকে দেখে বললেন, এ যদি আমার গোলাম হত! জনৈক ব্যক্তি বলল, এত উসামার পুত্র। একথা শুনে তিনি লজ্জায় মাথা নত করে অনুতপ্ত হয়ে মাটি খুঁড়তে শুরু করে বললেন, যদি রাসূল (সাঃ) তাঁকে দেখতেন তাহলে অত্যন্ত ভালবাসতেন। যেহেতু তাঁর পিতা ও পিতামহকেও তিনি ভালবেসেছেন। বিখ্যাত ঐতিহাসিক ইব্‌নে আসাকির লিখেন, উসামা (রাঃ)-এর কন্যা একদিন ওমর ইব্‌নে আবদুল আযীয (রাঃ)-এর কাছে গেলেন। বার্ধক্যজনিত দুর্বলতার কারণে তাঁর গোলাম তাঁকে হাত ধরে নিয়ে যায়। উমর ইব্‌নে আবদুল আযীয (রহঃ) তাঁকে দেখামাত্রই দাঁড়িয়ে সংবর্ধনা জানিয়ে নিজের জায়গায় বসিয়ে তাঁর প্রয়োজনাদি মিটালেন। আহ্‌লে বাইতের সাথে রাসূল (সাঃ)-এর মধ্যে তাঁর সাহাবী (রাঃ)-গণের সম্মানও অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। কুরআন-হাদীসে যদি তাঁদের ফযীলত ও মহত্ত্বের বিষয় বর্ণনা নাও করা হত, তথাপি তাঁদের সম্মান অপরিহার্য হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট ছিল যে, তাঁরা ছিলেন রাসূল (সাঃ)-এর অন্তরঙ্গ সহচর।

তাঁদের সম্পর্কে আল্লাহ্ ঘোষণা করেছেন–"আল্লাহ্ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট আর তাঁরাও আল্লাহ্‌র প্রতি সন্তুষ্ট।" আল্লাহ্ বলেন–"মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহ্ রাসূল। আর যাঁরা তাঁর সাহচর্য লাভ করেছে তাঁরা কাফেরদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত কঠোর আর নিজেদের পরস্পরে অত্যন্ত সদয়। তুমি তাঁদেরকে দেখতে পাবে কখনও রুকু করছে; কখনও সিজদা করছে। তাঁরা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি অর্জনে ব্যাপৃত। সিজদার দরুন তাঁদের চেহারায় বিশেষ নিদর্শন দীপ্তিমান। যাঁরা ঈমান এনে নেক কাজ করেছে তাঁদের সম্পর্কে আল্লাহ্ মাগফিরাত এবং বিরাট প্রতিদানের ওয়াদা করেছেন।" "আর যারা তাঁর সাহচর্য লাভ করেছে" এ বাক্যে আল্লাহ্ সাহাবায়ে কিরামের জন্য রাসূল (সাঃ) সাহাচর্য যে অতি মর্যাদার বিষয় তা বর্ণনা করেছেন। আর এটা এমন মর্যাদা যার সমতুল্য আর কিছু নেই। আর আয়াতে কারীমায় সাহচর্য ও সঙ্গ দ্বারা কায়িক ও কালিক সঙ্গ বুঝানো হয় নাই। কারণ এটা তো কাফেরদেরও লাভ হয়েছিল। বরং বিশেষ সঙ্গ বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ ঈমান আনয়নের সাথে সাথে তাঁরা সাহায্য-সহযোগিতায়ও রাসূল (সাঃ)-এর সাথে রয়েছেন। এ বিষয় অবশ্য অন্য বাক্য দ্বারাও ব্যক্ত করা যেত

কিন্তু বিশেষ করে উপরোক্ত বাক্য দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তাঁরা সারা জীবন প্রতি মুহূর্তে কায়িক, আর্থিক সর্বপ্রকার সাহায্য-সহযোগিতায় রাসূল (সাঃ)-এর সাথে রয়েছেন। অন্য কোন বাক্য দ্বারা এটা লাভ হত না। "কাফেরদের বিরুদ্ধে অতি কঠোর" এ বাক্যটি দ্বারা সাহাবায়ে কিরামের প্রচেষ্টা, জিহাদ ও ত্যাগের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এছাড়া আল্লাহ্‌র উপর তাঁদের পূর্ণ তাওয়াক্কুল বা ভরসা থাকার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। কারণ সংখ্যায় মুক্তিমেয় এবং অস্ত্রে অপ্রতুল হওয়া সত্ত্বেও সর্বপ্রকার অস্ত্রে-শস্ত্রে সজ্জিত কয়েক গুণ বেশী কাফেরদের বিরুদ্ধে কঠোর হওয়া আল্লাহ্‌র উপর পূর্ণ বিশ্বাস থাকা ব্যতীত সম্ভব নয়। এ বিষয়টিও অন্য বাক্য দ্বারা ব্যক্ত করা যেত কিন্তু বিশেষ করে বিশেষ্যবাচক বাক্য এনে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, তাঁরা সারা জীবনই উক্ত গুণে গুণান্বিত ছিলেন। এমন নয় যে, কখনও উক্ত গুণ প্রকাশ পেল আবার কখনও প্রকাশ পেল না। "তারা পরস্পর অত্যন্ত সদয় ছিল" এতে আল্লাহ্ তায়ালা সাহাবায়ে কিরামের পরস্পর ভালবাসা, সম্প্রীতি, দয়া প্রভৃতি সুসম্পর্কের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। এক্ষেত্রেও বিশেষ্যবাচক বাক্য আনয়ন করতঃ ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তাঁরা সারাজীবন পরস্পর ভালবাসা, দয়া ও হৃদ্যতার ভিতর দিয়ে কাটিয়েছেন। জীবনের প্রতি মুহূর্তে এগুণে গুণান্বিত ছিলেন। কখনও এ গুণ থেকে বিচ্যুত হন নাই। কখনও যদি তাঁদের পরস্পরে কোন মতপার্থক্যের সৃষ্টি হয়ে থাকে তবে তা ছিল ইজতেহাদী। অর্থাৎ প্রত্যেকেই নিজকে হকের উপর মনে করেছেন। আর এর পিছনে তাঁদের যুক্তিও ছিল। শুধু প্রবৃত্তির তাড়নায় করেছেন তা নয়। আর এটা কারো পক্ষে তখনই সম্ভব যখন সমস্ত মন্দ চরিত্র যথা, অহংকার, কার্পণ্য, ক্রোধ, হিংসা, লোভ, মর্যাদা, মোহ ইত্যাদি থেকে মুক্ত হয়ে উত্তম চরিত্র যথা, বিনয়, দানশীলতা, অল্পেতুষ্টি, ইখলাস প্রভৃতি দ্বারা সুসজ্জিত হতে পারে এবং এগুলো তার অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। উল্লেখিত বর্ণনায় সাহাবায়ে কিরামের মন্দ চরিত্রসমূহ থেকে মুক্ত হওয়া এবং উত্তম চরিত্রসমূহ্ দ্বারা সুসজ্জিত হওয়া প্রমাণিত হচ্ছে। "তুমি তাঁদের দেখতে পাবে রুকু করছে, সিজদা করছে" এ বর্ণনায় সাহাবায়ে কিরামের ইবাদতের অধিক্য বর্ণনা করেছেন যে, তুমি তাদেরকে যখনই দেখ তখন তাদেরকে ইবাদতরত দেখতে পাবে। ইবাদতের আধিক্য তখনই সম্ভব যখন ইবাদতে স্বাদ অনুভব

হয়। আর ইবাদতে স্বাদ অনুভব হয় ইহসানের মাধ্যমে। ইহসানের অর্থ হচ্ছে, ইবাদত এভাবে করা যেন আমি আল্লাহ্কে স্বচক্ষে দেখছি। এ অবস্থা সৃষ্টি না করতে পারলে কমপক্ষে এতটুকু হওয়া চাই যে, আল্লাহ্ তায়ালা আমাকে দেখছেন। যখন বান্দার মধ্যে এ অবস্থার পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে যায় তখন সে ইবাদতে স্বাদ অনুভব করে। আর তখনই অধিক পরিমাণে ইবাদত করতে পারে। অনন্তর তার মধ্যে এমন এক স্থায়ী অবস্থার সৃষ্টি হয়ে যায়, যার ফলে গোনাহর প্রতি ঘৃণা ও নেক কাজের প্রতি আগ্রহ জন্মে। তখন সর্ব কাজে তার একমাত্র লক্ষ্য থাকে আল্লাহ্ সন্তুষ্টি। এখানে এটাই বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ "তাঁদের জীবনের লক্ষ্যই ছিল আল্লাহ্র অনুগ্রহ এবং সন্তুষ্টি অর্জন। এটাই ছিল তাঁদের প্রত্যেক কাজের উদ্দেশ্য। যদি তাঁদের পরস্পরে কখনও মতপার্থক্যের সৃষ্টি হত তাহলে সেক্ষেত্রে প্রত্যেকের লক্ষ্য থাকত আল্লাহ্র সন্তুষ্টি। আর নিয়ত থাকত সম্পূর্ণ নির্ভেজাল। তাঁদের প্রত্যেক কাজে ইখলাস ও সৎ নিয়ত থাকার বিষয়টি কোরআনের আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় "সিজদার দরুণ তাঁদের চেহারায় বিশেষ নিদর্শন দীপ্তিমান।" কোরআনের আয়াতে অধিক ইবাদত ও ইখলাসের দরুণ সাহাবায়ে কিরামের চেহারায় যে রূপ চমকাত তা বর্ণনা করা হয়েছে। "যাতে তাঁদের দ্বারা কাফেরদেরকে ক্ষুব্ধ করেন" কোরআনে বর্ণিত এ বাক্য দ্বারা বুঝা যাচ্ছে, আল্লাহ্র উদ্দেশ্য সাহাবায়ে কিরামের মাধ্যমে কাফেরদেরকে ক্ষুব্ধ করা। অতএব কাফেররা সাহাবায়ে কিরামের প্রতি সর্বদা ক্ষুব্ধ থাকবে এবং তাঁদের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করবে। "যারা ঈমান এনেছে ও নেক কাজ করেছে" কোরআনে বর্ণিত এ বাক্যে সাহাবায়ে কিরামের ঈমান ও সমস্ত আমল আল্লাহ্র দরবারে গৃহীত হওয়ার প্রমাণ রয়েছে। "তাঁদের সম্পর্কে আল্লাহ্ মাগফিরাত ও বিরাট প্রতিদানের ওয়াদা করেছেন" এ বাক্যে সাহাবায়ে কিরাম থেকে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির পরিপন্থী কোন কাজ হলে তা ক্ষমা করে দেয়ার ওয়াদা এবং ক্ষমার সাথে সাথে বিরাট প্রতিদান দেয়ার প্রতিশ্রুতিও করা হয়েছে। আর আল্লাহ্ যাঁদেরকে বিরাট প্রতিদানে আখ্যা দিয়েছেন, তা কত মহান হবে সেটা কল্পনাও করা যায় না।

সাহাবায়ে কিরাম অনুসৃত ব্যক্তিবর্গ এবং সত্যের মাপকাঠি ঃ আল্লাহ্ বলেনঃ "আর সেসব মুহাজির ও আনসার ঈমান আনয়নের ব্যাপারে প্রবীণ ও

প্রথম পর্যায়ের এবং যাঁরা ইখলাসের সাথে তাঁদের অনুসরণ করেছে, আল্লাহ্ তাঁদের সবার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তাঁদের জন্য এমন বাগানসমূহ তৈরী করে রেখেছেন যেগুলোর তলদেশে ঝর্না প্রবাহিত হবে, যেগুলোতে তাঁরা চিরকাল অবস্থান করবে। এটা অতি মহান কামিয়াবী।" কোরআনের উল্লেখিত আয়াতে সাহাবায়ে কিরামের মহত্ত্ব প্রমাণ হওয়ার সাথে সাথে এটাও প্রমাণ হচ্ছে যে, তাঁরা পরবর্তীদের জন্য অনুসৃত ব্যক্তিবর্গ। যাঁরা তাঁদের অনুসরণ করবে আল্লাহ্ তাঁদেরকেও আপন সন্তুষ্টি ও জান্নাতের সুসংবাদ দান করেছেন। অবশ্য প্রথম স্তরের এবং সরাসরি অনুসারী তাবেয়ীন প্রথম পর্যায়ে রয়েছেন। আর আয়াতের ব্যাপাকতার দিকে লক্ষ্য করা হলে কিয়ামত পর্যন্ত যতলোক আসবে এবং সঠিকভাবে তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে সবাই তাঁদের অনুসারী হিসাবে গণ্য এবং উক্ত সুসংবাদ করার জন্যই। অতএব প্রত্যেক সাহাবীর আদর্শ অনুসরণযোগ্য এবং সত্যের মাপকাঠি এ বিষয়টি প্রমাণিত হল। রাসূল (সাঃ) এ বিষয়টি নিম্নোক্ত হাদীসে বর্ণনা করেছেন–"আমার সাহাবীরা নক্ষত্রসদৃশ। তাঁদের মধ্যে তোমরা যে কারো অনুসরণ করবে হিদায়াত পাবে।"

সাহাবায়ে কিরামের উন্নত গুণাবলী ঃ আল্লাহ্ এবং রাসূল, পবিত্র কুরআন এবং হাদীসে শুধুমাত্র সাহাবদের সামগ্রিক প্রশংসা এবং মর্যাদা ঘোষণা করেই বিরত থাকেন নাই, সু-নির্দিষ্টভাবে অনেকের প্রশংসাও করেছেন। সাহাবী হিসাবে প্রত্যেকের মর্যাদা সমান হলেও আনুপাতিক মর্যাদা ভেদ ও স্তরভেদ তাঁদের মধ্যে রয়েছে সন্দেহ নাই। "এসব ঈমানদারের মধ্যে কতক লোক এমন রয়েছেন, যাঁরা আল্লাহ্র সাথে যে অঙ্গীকার করেছিল তাতে সত্য প্রমাণিত হয়েছে। অনন্তর তাঁদের মধ্যে কতক লোক এমন, যারা আপন মানত পূর্ণ করে ফেলেছে। আর কতক তার অপেক্ষায় রয়েছে। আর তারা সামান্য একটু পরিবর্তনও ঘটায় নাই।"এ আয়াত দ্বারা সাহাবায়ে কিরামের বহু গুণের কথা প্রমাণিত হয়েছে। যথা–

(১) সততা ও অঙ্গীকারে দৃঢ়তা। কারণ, তারা আল্লাহ্ এবং রাসূল (সাঃ)-এর সাথে যেসব ওয়াদা করেছেন সেগুলো পূরণ করেছেন।

(২) স্বীয় জান-মাল বিসর্জন দিয়ে শাহাদতের মর্যাদালাভ করা তাঁদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। কারণ "যাঁরা আপন মানত পূরণ করে ফেলেছেন।" এসব লোকের সম্বন্ধে নাযিল হয়েছে, যাঁরা শাহাদত বরণ করেছেন।

(৩) সাহাবায়ে কিরাম শাহাদাত বরণ করার জন্য উৎসুক ও প্রতীক্ষমান ছিলেন। "কতক তার অপেক্ষায় রয়েছে" এতে এটাই বর্ণনা করা হয়েছে।

(৪) এসব গুণ তাঁদের মধ্যে সাময়িকভাবে ছিল না বরং স্থায়ীভাবে ছিল। আমরণ তাঁরা এসব গুণে গুণান্বিত ছিলেন। এতে কোনরূপ পরিবর্তন আসে নাই : "তাঁরা সামান্য একটু পরিবর্তনও ঘটায় নাই।'–এর দ্বারা এটাই বর্ণনা করা হয়েছে।

সাহাবায়ে কিরামের আরও কয়েকটি মহৎ গুণঃ "কিন্তু আল্লাহ্ তায়ালা তোমাদেরকে ঈমানের ভালবাসা দান করেছেন এবং তা তোমাদের অন্তরে পছন্দনীয় করে দিয়েছেন আর কুফর, এবং গোনাহকে তোমাদের কাছে অপছন্দীয় করে দিয়েছেন। বস্তুতঃ এসব লোক সরল ও সঠিক পথের উপর রয়েছে।"

উক্ত আয়াত দ্বারাও সাহাবায়ে কিরামের কতিপয় মহামান্বিত গুণ প্রমাণিত হয়েছে।

(১) আল্লাহ্ তায়ালা তাঁদের ঈমানকে প্রিয় বস্তু করে দিয়েছেন।

(২) ঈমান তাঁদের অন্তরে সুসজ্জিত করে দিয়েছিলেন।

(৩) কুফর এবং অন্যান্য সমস্ত নাফরমানীর প্রতি তাঁদের অন্তরে ঘৃণা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। যখন কারো মধ্যে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়ে যাবে তখন তার জন্য ঈমানের সমস্ত ইচ্ছা পূরণ করা এবং গোনাহ থেকে বিরত থাকা অনিবার্য বিষয় হয়ে যাবে। অতএব আল্লাহ্ যাঁদের সাথে এ ধরণের আচরণ করেছেন তাঁদের অনুসরণীয় হওয়ার ব্যাপারে এবং সত্যের মাপকাঠি হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণের কোন অবকাশ থাকতে পারে কি? "আর এমনিভাবে আমি তোমাদেরকে এক উম্মত (সম্প্রদায়) সৃষ্টি করেছেন। যাঁরা (প্রত্যেক বিষয়ে) মিতাচার।" এ সম্বোধনের প্রথম লক্ষ্য হচ্ছে সাহাবায়ে কিরাম। স্বয়ং আল্লাহ্ যাঁদের মিতাচার হওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন, তাঁরা সত্যের মাপকাঠি না হলে আর কে হবে? বোখারী শরীফে উল্লেখিত আয়াতে তাফসীরে 'ওসাতান' এর অর্থ করা হয়েছে 'ন্যায়পরায়ণ'। যদ্দ্বারা সাহাবায়ে কিরামের ন্যায়পরায়ন হওয়ার বিষয় প্রমাণিত হয়। অতএব আল্লাহ্ যাঁদের সম্পর্কে ন্যায়পরায়ণ ও মিতাচার হওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন তাঁদের সম্পর্কে দুর্নীতি পরায়ন ও অমিতাচার বলে আখ্যায়িত করা কতটুকু অন্যায় তা সামান্য ঈমান ও সাধারণ বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তিও উপলব্ধি করতে সক্ষম। "আর যারা তাঁদের পরে আসে এবং এ দো'আ করে যে, 'হে আমাদের রব! আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও এবং আমাদের সে সকল ভাইকেও ক্ষমা করে দাও যাঁরা আমাদের পূর্বে ঈমান আনয়ন করেছেন।"

সাহাবায়ে কিরামের জন্য দো'আ ঃ উল্লেখিত আয়াতে "যাঁরা আমাদের পূর্বে ঈমান আনয়ন করেছেন" দ্বারা সাহাবায়ে কিরামকে বুঝানো হয়েছে।

তাঁদের জন্য দোয়া করাকে আল্লাহ্ তায়ালা অত্যন্ত পছন্দ করেছেন। এতেও আল্লাহর্ কাছে তাঁদের বিরাট মর্যাদা রয়েছেন, সেটা প্রকাশ পাচ্ছে। কুরআনের বহু আয়াতে সাহাবায়ে কিরামের মহত্ত্ব ও মর্যাদার বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে। সাহাবা (রাঃ)-গণ শুধু রাসূল (সাঃ)-এর সহচরই ছিলেন না। তাঁদের জীবনে বিভিন্ন গুনাবলীর সমাবেশ পরিলক্ষিত হয়। যেমন তাঁরা ছিলেন রাসূল প্রেমিক, সুখ-দুঃখের সাথী, হিযরতকারী, সৈনিক, জ্ঞান বিতরণকারী, কাতেরে ওহী, কাতেরে হাদীস, কুরআন হাদীসের সংকলক, শাসক, কবি, রাষ্ট্রপরিচালক, ইসলাম প্রচারক, দূত, দোভাষী, চাষী, পরপকারী, সংসারী, দাতা, চিকিৎসক, নাবিক, সৎকাজে উৎসাহী অসৎ কাজে বাধা দানকারী, ব্যবসায়ী, বিচারক, গুপ্তচর, জিহাদে অংশগ্রহণকারী মোট কথা মানবিক যে সমস্ত গুনাবলীর প্রয়োজন সব গুলোই তাঁদের জীবনে সন্নিবেশিত হয়েছিল। এ সমস্ত মহতী কাজে রাসূল (সাঃ)- এর শুধু পুরুষ সাহাবীই সম্পৃক্ত ছিলেন না অনেক জ্ঞানী-গুণী, মহিলা সাহাবীও অন্তর্ভূক্ত ছিলেন।

সাহাবায়ে কিরাম নবীগণের পর সর্বশ্রেষ্ঠ মানব ঃ রাসূল (সাঃ) বলেছেন– "আল্লাহ্ আমার সাহাবীগণকে নবী রাসূল ছাড়া সমস্ত জগতের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। আর তন্মধ্যে আবু বকর (রাঃ), উমর (রাঃ), উসমান (রাঃ) ও আলী (রাঃ) এ চারজনকে উম্মতের জন্য মনোনীত করেছেন। তাঁদরেকে সাহাবীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ করেছেন আর আমার প্রত্যেক সাহাবীর মধ্যেই শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে।" রাসূল (সাঃ) বলছেন–আল্লাহ্ বদরের যুদ্ধে এবং হোদাইবিয়ার সন্ধিতে অংশগ্রহণ কারীদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। অতএব আমার সাহাবীগণ, আমার শ্বশুরপক্ষীয় আত্মীয়-স্বজন ও আমার জামাতাদের ব্যাপারে অমার রেয়াত কর। তাঁদের মধ্য হতে কেউ যেন কোন জুলুমের প্রতিশোধ গ্রহণের দাবী না করে। কারণ এটা এমন জুলুম, কাল-কিয়ামতের দিন যার কোন বিনিময় দেয়া সম্ভব হবে না।" এক হাদীসে আছে, রাসূল (সাঃ) বলেছেন, 'যে আমার রেয়াত করেছে আল্লাহ্ দুনিয়া ও আখিরতে তাঁকে হিফাযত করবেন। আর যে আমার রেয়াত করে নাই আল্লাহ্ তার থেকে মুক্ত। আর আল্লাহ্ যার থেকে মুক্ত থাকেন অচিরেই তাকে গ্রেফতার করবেন।'

সাহাবায়ে কিরামের প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারী কাফের ঃ ইমাম মালেক (রহঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি সাহাবায়ে কিরামের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে সে কাফের।' আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন– "তাদের দ্বারা কাফেরদেরকে ক্ষুব্ধ করেন।"

মুক্তি লাভের দু'টি বিশেষ গুণ ঃ আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে মোবারক (রহঃ) বলেন, 'যার মাঝে দু'টি বিষয় পাওয়া যাবে সে নাযাত পাবে।' একটি হচ্ছে, আল্লাহ্ এবং তাঁর সৃষ্টির শানে সততা। দ্বিতীয়টি হচ্ছে মুহাম্মদ (সাঃ) প্রতি ভালবাসা।

হযরত উসমান (রাঃ)-এর প্রতি বিদ্বেষের পরিণতি ঃ তিরমিযী শরীফের এক হাদীস বর্ণিত আছে, রাসূল (সাঃ)-এর কাছে জানাযার নামায পড়ার জন্য জনৈক ব্যক্তির লাশ আনা হল। কিন্তু তিনি ঐ ব্যক্তির জানাযার নামায পড়লেন না। এর কারণ স্বরূপ বললেন, এ ব্যক্তি উসমানের প্রতি বিদ্বেষ রেখেছে, আমিও তার প্রতি বিদ্বেষ রাখি। আনসারী সাহাবীগণ সম্বন্ধে রাসূল (সাঃ) বলেছেন, 'তোমরা তাঁদের ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করে দাও আর তাঁদের গুনাবলী স্বীকার কর।' সাহল ইব্‌নে আবদুল্লাহ বলেন–"যে ব্যক্তি রাসূল (সাঃ)-কে সম্মান করে নাই এবং তাঁর আদেশ সমূহের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে নাই সে রাসূল (সাঃ)-এর প্রতি ঈমান আনে নাই।" আলোচ্য আয়াত ও হাদীসসমূহ দ্বারা সাহাবায়ে কিরামের অগণিত গুণ-মর্যাদা ও মহত্ত্ব প্রমাণিত হয় যেগুলোর প্রতি বিশ্বাস রাখা অপরিহার্য। এরই পরিপ্রেক্ষিতে তাঁদের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা ও ভালবাসা নিবেদন একান্ত জরুরী। এর পর রাফেযী, বিদআতপন্থী, ভ্রান্তসম্প্রদায় এবং অনির্ভরযোগ্য হাদীস বর্ণনাকারীগণ সাহাবায়ে কিরামের পরস্পর মতবিরোধ সম্পর্কিত যেসব ঘটনাবলী বিকৃত ও অতিরঞ্জিত করে বর্ণনা করেছে সেগুলো প্রত্যাখ্যান করতে হবে অথবা সেগুলোর উপযুক্ত কোন ব্যাখ্যা করতে হবে। আল্লাহ্ আমাদের সবাইকে রাসূল (সাঃ) এবং তাঁর সাহাবী (রাঃ)-গণের পূর্ণ ভালবাসা ও শ্রদ্ধা নসীব করুন। আর তাঁদের সম্বন্ধে তাঁদের মান-মর্যাদার পরিপন্থী কোন একটি শব্দও উচ্চারণ করা থেকে আমাদের হিফাযত করুন। আমীন ॥ –(সংকলিত)

তথ্যসূত্রঃ

(১) সাহাবাদের মান- মাওলানা মোহাম্মদ তাহির।
(২) হুকুকুল মোস্তফা (সাঃ) অনুবাদ- মুফতী মুহাম্মদ উবাদুল্লাহ।
(৩) জীবন সায়হ্নে মানবতার রূপ- মাওলানা আবুল আলাম আযাদ।
(৪) সাহাবায়ে কিরাম সত্যের মাপকাটি।
(৫) ইসনলামের ইতিহাস- বিভিন্ন লেখক কর্তৃক লিখিত।
(৬) তারিখে খিলাফতে রাশেদা- বঙ্গানুবাদ।
(৭) তারিখে হাবীবে ইলাহ- বঙ্গানুবাদ
(৮) বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত প্রসঙ্গ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

দ্বীনের জন্য কষ্টভোগ ও নির্যাতন সহ্য ও লক্ষনীয় ঘটনা

দ্বীনের জন্য হযরত রাসূল (সাঃ) ও সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) যে নির্যাতন ও কষ্ট ভোগ করেছেন তা ভোগ করা আমাদের মত অধমদের পক্ষে অসম্ভব তো বটেই বরং চিন্তা করাও কষ্টকর। অথচ তাঁদের সে হৃদয় বিদারক ঘটনা ইতিহাসের পাতা পরিপূর্ণ। তাঁদের পদঙ্ক অনুসরণের কষ্ট ভোগ তো দূরে থাক, বরং সে সব ঈমান বর্ধক ঘটনা জানার কষ্টটুকু করতেও আমরা রাজী নই। এ অধ্যায়ে নমুনা স্বরূপ কিছু ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে, এর মধ্যে প্রথম ঘটনাটি স্বয়ং রাসূল (সাঃ)-এর বরকতের জন্য উল্লেখ করা হল। রাসূল (সাঃ)-এর নবুওয়াত প্রাপ্তির পর রাসূল (সাঃ) সুদীর্ঘ নয়টি বছর মক্কা মুকাররমায় দ্বীনের দাওয়াত দিয়ে জাতির হিদায়াত ও সংশোধনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখলেন, কিন্তু এতে অল্প সংখ্যই মসুলমান হলেন আর কিছু অমুসলমান হৃদয়বান ব্যক্তি তাঁকে সাহায্য করলেন। অধিকাংশ মক্কার কাফের-ই-তাঁকে ও তাঁর সাহাবাদেরকে নানাবিধ যন্ত্রণা ও কষ্ট দিতে থাকে। কাফেররা হাসি, ঠাট্টা ও বিদ্রূপ করে বিভিন্ন ভাবে অপমানিত করত। রাসূল (সাঃ)-এর চাচা আবু তালিবও এ নেক লোকদের অর্ন্তভূক্ত ছিলেন। যিনি অমুসলমান হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে সব ধরনের সাহায্য-সহযোগিতা সম্প্রসারিত করেছিলেন। নবুওয়তের দশম বছর যখন আপন পিতৃব্য আবু তালিবের ইন্তিকাল হয় তখন কাফেরদের শক্তি-সাহস প্রচন্ডরূপে বেড়ে যায়। তখন তাদের প্রকাশ্যে সুয়োগ সৃষ্টি হল অত্যাচার করার ও ইসলামে বাধা দেয়ার। রাসূল (সাঃ) একবার এ ভেবে তায়েফে তাশরীফ আনলেন যে, সেখানে শক্তিশালী সাকী গোত্রের লোকেরা যদি মুসলমান হয়, তাহলে মুসলমানগণ কাফেরদের অত্যাচার থেকে নিস্কৃতি পাবে এবং মুসলমানদের শক্তিও বৃদ্ধি পাবে। তিনি সেখানে পৌঁছে, সে গোত্রের তিনজন নেতার সাথে সাক্ষাত করে তাদেরক ইসলাম গ্রহণের আমন্ত্রণ জানিয়ে আল্লাহ্‌র রাসূলকে সহায়তা করার অনুরোধ করলেন। কিন্তু এরা দ্বীনের দাওয়াত গ্রহণ করা দূরে থাক, অন্তত আরবদের চিরাচরিত মেহমানদারীর প্রথার প্রতিও লক্ষ্য না করে, একজন নবাগত মেহমানের সম্মান করার প্রয়োজনটুকুও বোধ করল না বরং খুবই নির্দয় ও অভদ্রোচিত আচরণ করল এবং তাঁর অবস্থান কেউ সহ্য করতে পারল না। রাসূল (সাঃ) যাদেরকে জ্ঞানী গুণী ভেবে কথা বলেছিলেন,

তাদের মধ্যে একজন বলল "ওহে আল্লাহ্ কি শেষ পর্যন্ত তোমাকেই নবী করে পাঠালেন?" আরেকজন বলল, "আল্লাহ্ নবী করে পাঠাবার জন্য বুঝি আর লোক পেলেন না?" তৃতীয় ব্যক্তি বলল, "তোমার সাথে আমি কথা বলতে চাইনা, কেননা, যদি তুমি আমার দাবী অনুযায়ী সত্য হও, তাহলে তোমাকে অমান্য করলে ধ্বংস অবধারিত" আর যদি তুমি মিথ্যাবাদী হও তাহলে আমি এরূপ লোকের সাথে কথা বলতে চাইনা, এর পর রাসূল (সাঃ) তাদের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে অন্যাদের সাথে কথা বলতে চাইলেন। তিনি তো দৃঢ়তা ও সাহসের পাহাড় ছিলেন। কিন্তু কেহই দ্বীনের দাওয়াত গ্রহণ করল না বরং দ্বীন গ্রহণ করার পরিবর্তে তারা রাসূল (সাঃ)-কে বলল তুমি এক্ষুণি আমাদের শহর থেকে বের হয়ে যেখানে খুশি চলে যাও। রাসূল (সাঃ) যখন তাদের ব্যাপারে পুরোপুরি নিরাশ হয়ে ফিরতে লাগলেন তখন তারা শহরের ছেলেদের লেলিয়ে দিয়ে তারা হাসি ঠাট্টা করতে থাকে, তালী বাজাতে থাকে, পাথর মারতে থাকে। এ অত্যাচারে তিনি রক্তে রঙিন হয়ে গেলেন। এভাবেই তিনি ফিরছিলেন, পথিমধ্যে যখন এ দুষ্টদের থেকে পরিত্রাণ পেলেন, তখন রাসূল (সাঃ) একাগ্রচিত্তে আল্লাহ্‌র কাছে ফরিয়াদ করলেনঃ "হে আল্লাহ্! তোমার দরবারে আমার দুর্বলতা, অসহায়ত্ব এবং লোকদের মধ্যে অপমান, লাঞ্ছনার ফরিয়াদ করছি। হে আরহামুর রাহিমীন! আপনি-ই সকল দূর্বলের মালিক এবং আমার প্রতিপালক। আপনি আমাকে কার সোপর্দ করছেন? যদি আপনি আমার উপর নারাজ না থাকেন তাহলে আমি কারও প্রতি ভ্রুক্ষেপ করব না, আপনার রক্ষণাবেক্ষণই আমার জন্য যথেষ্ট। আপনার মুখের ঐ আলোকোজ্জল প্রভা যার সাহায্যে জমাট আঁধার হয় বিদূরিত। যার সাহায্যে পৃথিবীর সকল কর্ম সাধিত ও সম্পাদিত, সে আলোর আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আপনার ক্রোধ থেকে পানাহ চাই। আপনার অসুন্তুষ্টি দূর না হওয়া পর্যন্ত আমি ফরিয়াদ করেই যাব। সকল ক্ষমতা, সকল শক্তি শুধুই আপনার। রাহমাতুল্লিল আলামিনের এ ফরিয়াদ যেন দয়ার সাগর রাহমানুর রাহিমের কাছে সাদরে গৃহিত হল। সুমহান আল্লাহ্ তাঁর আবেদনে হযরত জিব্‌রাইল (আঃ)-কে পাঠালেন। তিনি এসে বললেন, আল্লাহ্ আপনার ও আপনার গোত্রের লোকদের সকল কথাবার্তা ও আপনার সাথে তাদের দুর্ব্যবহার ও অত্যাচার সম্বন্ধে ভাল ভাবেই অবগত, তাই তিনি ফেরেশতাকে প্রেরণ করেছেন, আপনি যদি ইচ্ছা করেন আদেশ করুন। অতঃপর একজন ফেরেশতা রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে সালাম করে বললেন, যা আদেশ করবেন তাই পালন করব। যদি আদেশ হয় উভয় দিকের পাহাড়গুলোকে দু'দিক থেকে চাপিয়ে দিব,

যাতে শত্রুরা সকলে পিষে যাবে নতুবা আপনি যে সাজা নির্ধারণ করেন। রাহমাতুললিল আলামীন (সাঃ) বলেন "আমি আল্লাহ্‌র কাছে আশাবাদী যদিও এরা দ্বীন কায়েম করে নাই কিন্তু তাদের বংশে এরকম লোক তৈরী হবে, যারা আল্লাহ্‌র ইবাদত বন্দেগী করবে। এ ছিল রাসূল (সাঃ)-এর চরিত্র, আমরা যাঁর উম্মত দাবী করি। কেহ অল্প একটু কষ্ট দিলে বা সামান্য গালি দিলে এমন ক্রোধান্ধ হয়ে পড়ি যে, প্রতিশোধ নিয়েই শান্ত হই। সাধারণ অত্যাচারের পরিবর্তে দ্বিগুণ অত্যাচার করি, সে সাথে নবীর উম্মত বলে দাবীও করে থাকি। নিজেদেরকে নবীর অনুসারী বলে বেড়াই। অথচ রাসূল (সাঃ) এত কঠিন যাতনা ভোগ করার পরও কতটুকু সহনশীলতার পরিচয় দিলেন এবং নিষ্পেষনের যাতাকলে পিষ্ট হয়েও প্রতিশোধ গ্রহণ করা তো দূরের কথা, সামান্যতম বদ দোয়া পর্যন্ত না করে তাদের জন্য দোয়া করলেন।

পঞ্চম মতান্তরে অষ্টম হিজরীতে ঘটনাটি ঘটেছিল। হযরত রাসূল (সাঃ) হযরত আবূ উবাইদ ইবনুল জাররাহ (রাঃ)-এর অধীনে মুহাজিদ-আনসারসহ সম্মিলিত তিনশ মুজাহিদের একটি বাহিনী মাদীনা হতে পাঁচ দিনের পথে সমুদ্র উপকূল অঞ্চলে বসবাসকারী জুহাইনা কওমের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। ঘটনাক্রমে এ যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হয়ে পড়ে। মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণ আহার্য ছিলনা বলে ক্রমশঃ তাঁদের গভীর খাদ্য সংকটে পড়তে হয়েছিল। প্রথম দিকে দৈনিক তিনটি করে উট যবেহ করা হচ্ছিল, কিন্তু সওয়ারী কমে যাওয়ার আশংকায় উট যবেহ সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেয়া হয়। তখন বরাদ্ধ হতে থাকে জনপ্রতি কিছু কিছু খেজুর কিন্তু যখন তাতেও অনটন দেখা দেয়, তখন বরাদ্ধ হল মাথাপিছু একটি খেজুর। তা চুষে পানি পান করে মুজাহিদগণ জিহাদ করতে থাকেন। যখন খেজুরও নিঃশেষ হয়ে যায়, তখন সৈনিকগণ গাছের পাতা খাওয়া শুরু করলেন। হযরত সাদ (রাঃ)-হাদীসের মধ্যে এ ঘটনারই উল্লেখ করেছেন। এ সেনাবাহিনী বলা হয় সরিয়তুল খবত। খবত শব্দের অর্থ গাছের পাতা ঝড়া। ধর্মের জন্য, সত্যের জন্য, ইসলামের জন্য আল্লাহর জন্য হযরত রাসূল (সাঃ)-এবং তাঁর সাহাবীগণ যে অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট ও অভাব-অনটনের মধ্যে দিন কাটিয়ে যেভাবে দৃঢ়তা দেখিয়েছেন, ধৈর্যাবলম্বন করেছেন–তেমন আত্মোৎসর্গের পরিচয় অন্য কোন নবী ও তাঁর উম্মতের মধ্যে পাওয়া যায়না।

জাম-এ তিরমিযী শরীফের বর্ণনা অনুযায়ী দেখা যায় হিযরতের পূর্বে একবার রাসূল (সাঃ) মক্কার বাইরে যান। ইসলাম প্রচারে ও তাবলীগের কাজ চিরতরে বন্ধ করার উদ্দেশ্যে কাফির-মুশরিকেরা সংঘবদ্ধভাবে তাঁর উপর

যেভাবে অত্যাচার-উৎপীড়ন করেছিল, যেভাবে তাঁকে ভীতি প্রদর্শন করেছিল, কষ্ট দিয়েছিল–তেমন আর কারও উপর করা হয়নি। অপরিসীম সহনশীলতা ও অতুলনীয় ধৈর্য ছিল বলেই এসব মারাত্মক হুমকি ও প্রাণ সংহারক নির্যাতন উপেক্ষা করে আপন কর্তব্যে অটল থাকা হযরত রাসূল (সাঃ)-এর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। এ জঘণ্যতম নিডীড়নের মুখে তাঁর পক্ষে মক্কা একেবারেই নিরাপদ ও অবস্থানযোগ্য ছিলনা বলেই আল্লাহ্‌র আদেশে তিনি মদীনায় হিযরত করেছিলেন, কিন্তু হিযরতের পূর্বে তিনি এক মাসের জন্য হযরত বিলাল (রাঃ)-কে সাথে নিয়ে মক্কা ত্যাগ করে বাইরে যান। সে সময় অভাব-অনটন ও অনাহারে তাঁকে যে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হয়েছিল তা বর্ণনা করা সত্যিই দুষ্কর।

রাসূল (সাঃ)-এর দাওয়াতে প্রভাবিত মদীনার প্রথম যুবক

এ সৌভাগ্যবান যুবকটি ছিলেন হযরত সোওয়াইদ (রাঃ) ইব্‌নে সালত মুহাম্মদ হুসাইন হাইকল মিসরী 'হায়াতে মুহাম্মদ' গ্রন্থে উদ্ধৃত বর্ণনা মোতাবেক ইসলামের প্রতি সোওয়াইদ (রাঃ) ইব্‌নে সালতের প্রভাবিত হওয়ার ঘটনা। তিনি ছিলেন ইয়াসরিব তথা মদীনার দূস সম্প্রদায়ের লোক। তিনি তাঁর সম্ভ্রান্ততা, জনপ্রিয়তা, কাব্যচর্চা ও সাহসিকতার জন্য নিজ সম্প্রদায়ে 'কামেল' পূর্ণাঙ্গ বা খেতাবে ভূষিত ছিলেন। তিনি রাসূল (সাঃ)-এর আবির্ভাবের সময় একবার কা'বা যিয়ারতে মক্কা এলে রাসূল (সাঃ) তাঁকে যথারীত ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত জানান। সোওয়াইদ বলেন, হয় তো আপনার কাছে সে জিনিসই থাকবে, যা আমার কাছে পূর্ব থেকেই রয়েছে। রাসূল (সাঃ) জানতে চাইলেন, তা কোন্ জিনিস? সোওয়াইদ (রাঃ) বললেন, আমার কাছে লুকমান (আঃ)-এর বাণী রয়েছে। রাসূল (সাঃ)-এর তাঁর কিছু বাণী শুনে বললেন, "এতো ভাল কথা। কিন্তু আমার কাছে এর চাইতেও ভাল জিনিস রয়েছে, যা আল্লাহ্ তাআলা আমাকে মানুষের হিদায়াতের জন্য অবতীর্ণ করেছেন; তা অত্যন্ত নূরানী সে কালাম।"

একথা বলার পর রাসূল (সাঃ) কুরআন করীমের একটি আয়াত তিলাওয়াত করে ইসলামের দাওয়াত পেশ করেন। সোওয়াইদের অন্তরে এক অভূতপূর্ব ভাবান্তর সৃষ্টি হল। তিনি নিবেদন করলেন, "এ বাণী তো অতি উত্তম বাণী।" তারপর তিনি যখন মদীনায় ফিরে এলেন, তারপর থেকে তাঁর চিন্তা-চেতনায়

কুরআন ছাড়া আর কিছুই ছিল না। তিনি যখন খাযরাজের হাতে নিহত হন, তখন তাঁর সম্প্রদায় বলল, "সোওয়াইদ মুসলমান হয়ে মরল।" ইনিই মদীনার প্রথম যুবক যিনি রাসূল (সাঃ)-এর দাওয়াত দ্বারা প্রভাবিত হয়।

ইসলামের জন্য উৎসর্গকারী প্রথম ব্যক্তি

এ গৌরবের অধিকারী ছিলেন হযরত হারেস ইব্‌নে আবী হালাহ্। তখন প্রকাশ্যে ইসলাম তবলীগ বা প্রচারের মাত্র কয়েকদিন অতিবাহিত হয়েছে। এরই মধ্যে একদিন উম্মুল মুমেনীন হযরত খাদীযা (রাঃ)-এর প্রথম স্বামী আবু হালাহ্ ইব্‌নে যারারাহর ঔরসজাত পুত্র হারেস (রাঃ) যিনি রাসূল (সাঃ)-এর পোষ্য ছিলেন নিজের ঘরে বিশ্রাম করতে গিয়ে হঠাৎ করে কা'বা ঘরের দিক থেকে হৈ-হাল্লার শব্দ শুনতে পেলেন। তিনি আঁতকে উঠে সে দিকে উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে গেলেন। তখন ক'বা ঘরে তিনশ' ষাটটি মূর্তি স্থাপিত ছিল। যে ঘরটি আল্লাহ্‌র খলীল হযরত ইবরাহীম (আঃ) আল্লাহ্‌র নির্দেশক্রমে আল্লাহ্‌র ইবাদতের উদ্দেশ্যে নির্মাণ করেছিলেন। তখন সেটি পরিণত হয়েছিল দেবালয়ে। অবস্থা এমনি শোচনীয় আকার ধারণ করেছিল যে, এর চার দেয়ালের ভেতর আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করলে তার অবমাননা গণ্য করা হত। মূর্তির অস্তিত্বে এর অবমাননা হত না উলঙ্গ তাওয়াফে কিংবা শিস দিলে ও তালি বাজালে। আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নামে বলী দিলে কিংবা পুরোহিতদের ভাতা গ্রহণ বরং এ ঘরেরই প্রকৃত মালিকের নাম উচ্চারণে হত এর অবমাননা। এমনি ছিল সেদিনকার পরিস্থিতি।

এরি মধ্যে রাসূল (সাঃ) আসমান-যমিনের পালনকর্তা আল্লাহ্ পক্ষ থেকে নির্দেশ লাভ করেছিলেন, যেন তিনি প্রকাশ্যভাবে ইসলামের দাওয়াতের কাজ চালাতে থাকেন। এতে যেন কারো পারোয়া তিনি না করেন। তাই সেদিন তিনি কা'বা চত্বরে দাঁড়িয়ে বলিষ্ঠকণ্ঠে এ ঘরের মালিকের নাম ঘোষণা করে বললেন, তোমরা সবাই বল, "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্।"

তাওহীদ ও রিসালাতের এ ঘোষণা শোনার সাথে সাথে কা'বায় উপস্থিত দুরাত্মাদের অন্তরাত্মা জ্বলে উঠল। তারা সবাই চিৎকার কর উঠল, "অবমাননা; এটা কার অবমাননা; নির্ঘাত আমাদের দেব-দেবীর অবমাননা!" চারদিক থেকে একই চিৎকার ও হৈ চৈ। এরই মাঝে দাঁড়িয়ে আছে চিরসত্য, চিরবিশ্বস্ত মহানবী (সাঃ) যাঁকে সমগ্র মক্কায় তারাই একদিন সর্বাধিক সত্যবাদী এবং সর্বাধিক আমানতদার ও পবিত্রাত্মা বলে গণ্য করত। আজ পবিত্রতার দাওয়াত ও

অন্যায়ের পার্থক্যের কথা বলার কারণে তাঁকেই আজ চারদিক থেকে অবরুদ্ধ করে ফেলা হয়েছে। তিনি সে রক্তলিপ্সু পিশচদের দ্বারা পরিবেষ্টিত। প্রতি মুহূর্তে তাঁর প্রাণাশঙ্কা। এমনি সময় হযরত হারেস (রাঃ) ইব্‌নে হালাহ্‌ সেখানে এসে ভীড় ভেদ করে তিনি রাসূল (সাঃ)-এর কাছে এসে উপনীত হন। সাথে সাথে কাফেরদর উদ্ধৃত তলোয়ার তাঁর উপর চারদিক থেকে আঘাত হানতে শুরু করে। আর তিনি সত্যের পথে নিজের প্রাণের নজরানা পেশ করে চিরদিনের জন্য নীরব হয়ে যান। এ ছিল হারেস (রাঃ) ইব্‌নে হালাহ্‌'র প্রাণ যা সর্বপ্রথম সত্যের সমর্থনে উৎসর্গিত হয়। মুসলমানদের মাঝে সর্বপ্রথম শাহাদতের মুকুট তাঁরই মস্তকের শোভা বর্ধন করে।

ইসলাম প্রচারে প্রথম যিনি তলোয়ার পরিচালনা করেন

যিনি ইসলাম প্রচারে সর্বপ্রথম তলোয়ার চালানোর এ গৌরব অর্জন করেছিলেন তিনি হলেন, হযরত যুবাইর ইব্‌নে আওয়াম। রাসূল (সাঃ) নবুওয়ত লাভের প্রাথমিক পর্যায়ে এক সন্ধ্যায় আবু তালেবের বাড়ীতে বনু হাশেম ও বনী আবুদল মুত্তালিব সমবেত হয়। অবশ্য তখন আবু জাহল উপস্থিত ছিল না। এটি ছিল তাদের পারিবারিক বৈঠক। উদ্দেশ্য ছিল রাসূল (সাঃ) সমর্থনে গোত্রীয় আত্মসম্মানবোধকে কাজে লাগানোর বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করা। বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, রাসূল (সাঃ)-কে সমর্থন করতে হবে এবং পারিবারিক মান-মর্যাদা রক্ষার স্বার্থেই শত্রুর মোকাবেলায় তাঁকে সাহায্যও করতে হবে। এতে আরো সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, ভোরে নিজেদের এ সিদ্ধান্তের ব্যাপারে রাসূল (সাঃ)-কে অবহিত করতে হবে। পরের দিন এঁরা সবাই রাসূল (সাঃ)-এর বাড়ীতে হাযির হয়ে জানতে পারে, তিনি বাড়ীতে নেই। সবার মাথা ঘুরে যায়। তখন তাঁরা তাঁর সন্ধানে বেরিয়ে পড়েন। এ দিকে গুজব রটে যায়, মুহাম্মদ রাসূল (সাঃ)-কে শহীদ করে দেয়া হয়েছে। একথা শুনতেই তাঁদের সবার বুকে প্রতিশোধের আগুন জ্বলে উঠে। তাঁরা সবাই নিজ নিজ বাড়ী গিয়ে তীক্ষ্ম, অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করে সেগুলো লুকিয়ে রেখে আবু তালেবের সাথে রাসূল (সাঃ)-এর অনুসন্ধানে বেরিয়ে পড়েন। পথে যায়েদ ইব্‌নে হারেসা (রাঃ)-এর সাথে দেখা হলে জানতে পারে, তিনি ততক্ষণে বাড়ীতে তশরীফ এনেছেন। তখন তাঁরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে রাসূল (সাঃ)-এর বাড়ীর দিকে রওয়ানা হয়ে যায়।

রাসূল (সাঃ)-এর শাহাদাতের গুজব শোনামাত্র বনু আসাদের ষোল বছর বয়সের যুবক ইবনুল আওয়াম তলোয়ার নিয়ে অত্যন্ত ক্ষিপ্রগতিতে বিরিয়ে

পড়েন এবং রাসূল (সাঃ)-এর বাড়ীর দিকে বিষয়টির যথার্থতা যাচাই করে নেয়ার জন্যে ছুটে যান। যদি দূর্ঘটনা ঘটেই থাকে, তাহলে এ তলোয়ারেই হত্যাকারীদেরকে জাহান্নামে পাঠাবেন এ ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। কিন্তু রাসূল (সাঃ)-কে বাড়ীতে দেখতে পেয়ে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হন। রাসূল (সাঃ) তাঁকে দেখে হেসে বলেন, "কি হে ভাই, এ সময়ে তুমি তলোয়ার নিয়ে, কি ব্যাপার?" হযরত যুবাইর নিবেদন করলেন, "ইয়া রাসূলুল্লাহ্‌, (সাঃ) আপনার প্রতি আমার পিতামাতা কুরবান, আমি শুনেছিলাম, আপনাকে শত্রুরা আটক কিংবা শহীদ করে দিয়েছে। তাই আমি তলোয়ার তুলে নিয়েছি। রাসূল (সাঃ) বললেন, "ঘটনাটি যদি সত্য হত, তাহলে তুমি কি করতে? তিনি বললেন," ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌, আল্লাহ্‌র কসম, তাহলে আমি মক্কাবাসীর সাথে লড়াই করে করে মরে যেতাম।" উত্তর শুনে রাসূল (সাঃ) অত্যন্ত আনন্দিত হলেন এবং তাঁর জন্য দোয়া করলেন। তাঁর সে তলোয়ারের জন্যেও দোয়া করলেন।

এটা ছিল প্রথম তলোয়ার, যা সত্যের পথে ও রাসূল (সাঃ)-এর সমর্থনে উত্থিত হয়। আর হযরত যুবাইর (রাঃ) ইব্‌নে আওয়াম ছিলেন সে তলোয়ার উত্তোলনকারী। হযরত যুবাইর রাসূল (সাঃ)এর হাওয়ারী তথা অনুচর খেতাবে খ্যাত হন। তিনি রাসূল (সাঃ) ফুফু হযরত সফিয়্যাহ (রাঃ) এর পুত্র ছিলেন এবং উম্মুল মুমেনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) বড় বোন হযরত আসমা (রাঃ)-এর স্বামী। এভাবে তিনি রাসূল (সাঃ)-এর ভায়রা ভাইও ছিলেন বটে। শৈশবেই তাঁর পিতা মারা যান। তিনি ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে প্রাথমিক পর্যায়ভূক্ত ছিলেন। গযওয়ায়ে বদর উপলক্ষ্যে তিনি অসাধারণ সাহস ও বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি বর্শার আঘাতে আবু যাত আলকর্শ নামক কাফরকে হত্যা করেন। বর্শাটি তার চোখে বিদ্ধ হয়েছিল। তিনি সেটি পায়ের জোরে বের করতে গেলে সেটি বাঁকা হয়ে যায়। রাসূল (সাঃ) সেটি তাঁর কাছ থেকে চেয়ে নেন এবং সারাজীবন নিজের কাছে সংরক্ষিত রাখেন। তার পরে সেটি একের পর এক খোলাফায়ে রাশেদীনের কাছে সংরক্ষিত হতে থাকে। পরে সেটি তাঁর পুত্র হযরত আবুদল্লাহ্‌ (রাঃ), হযরত আলী (রাঃ)-এর পরিবারের কাছ থেকে সংগ্রহ করে সারাজীবন নিজের কাছে রাখেন। গযওয়ায়ে ওহুদে তিনিও সে চৌদ্দজন সাহাবীর মধ্যে ছিলেন যাঁরা শেষ পর্যন্ত দৃঢ়পদ থাকেন। সেদিন তিনি মুশরিকদের পতাকাবাহী তালহা ইব্‌নে আবী তালহাকে হত্যা করেন। রাসূল (সাঃ)-এর সাথে প্রায় সমস্ত অভিযানেই তিনি শরীক ছিলেন।

আহযাব যুদ্ধকালে তিনি রাসূল (সাঃ)-এর নির্দেশানুযায়ী বনী কোরাইযার বিরুদ্ধে গোয়েন্দা তৎপরতা চালিয়ে তাদের সঠিক অবস্থা ও অবস্থান সম্পর্কে রাসূল (সাঃ)-কে অবহিত করেন। তাতে খুশী হয়ে রাসূল (সাঃ) বলেন, "সমস্ত নবীরই একজর অনুচর থাকত, আর যুবাইর হল আমার অনুচর। আমার পিতা-মাতা তোমার জন্য উৎসর্গিত।" রাসূল (সাঃ)-এর মুখ থেকে এ কথাটি শুধুমাত্র সাদ ইব্‌নে আবী ওক্কাসের জন্য গযওয়ায়ে ওহুদের সময় আর হযরত যুবাইর এর জন্য গযওয়ায়ে আহযাবের সময় উচ্চারিত হয়েছিল। তিনি হিযরত করে মদীনায় চলে যান। এদিকে উম্মে সালমা (রাঃ) প্রতিদিন আবতাহ নামক এক টিলায় বসে বসে কান্নাকাটি করতে থাকেন। পরে বনু মুগীরার জনৈক সহৃদয় ব্যক্তির মাধ্যমে এ বিষয়টি নিষ্পত্তি হয় এবং হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) তাঁর শিশু সন্তানসহ মদীনায় হিযরত করেন। এটা ছিল তাঁদের তৃতীয় হিযরত।

হযরত আবু সালামা ২য় হিজরীতে গযওয়ায়ে বদর এবং ২য় হিজরীতে ওহুদ যুদ্ধে শরীক হন। সেখানে এক কাফেরের বিষমিশ্রিত তীরের আঘাতে তাঁর যখম হয়। যদিও তিনি একসময় সুস্থ হয়ে উঠেন, কিন্তু ভেতরে ভেতরে বিষ তাঁর কাজ করতেই থাকে। ৩য় হিজরীর শেষ ভাগে রাসূল (সাঃ) তাঁকে একশ পঁচিশজনের অশ্বারোহী বাহিনীসহ বনু আসাদ ইবনে খোযাইমায় পাঠান। ৪র্থ হিজরীর ১লা মহররম তিনি অত্যন্ত গোপনে তাদের উপর আক্রমণ চালিয়ে বিজয় অর্জন করেন। এ অভিযানটি সারিয়্যাহ আবু সালামা অথবা সারিয়্যাহ কোতন নামে খ্যাত। তাঁর বীরত্ব ও কৃতিত্বের জন্য অত্যন্ত খুশী হয়ে রাসূল (সাঃ) তাঁকে দোয়া করেন। এ অভিযনে তাঁর পূর্বেকার যখম পুনরায় চাড়া দিয়ে উঠে এবং বহু চিকিৎসা সত্ত্বেও তা আর সুস্থ হয়নি। এরই দরুন তিনি ৪র্থ হিজরীর শুরুতে কঠিনভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। রাসূল (সাঃ) এ খবর জানতে পেরে তাঁর বাড়ীতে তশরীফ নিয়ে যান। তখন তাঁর চোখ বন্দ করে দেন এবং বলেন, "মানুষের আত্মা যখন তার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়, তখন তার চোখ সেটিকে দেখার জন্য খোলা থেকে যায়।" তাঁর স্ত্রী হযরত উম্মে সালাামা (রাঃ)-কে ধৈর্যধারণের উপদেশ দিয়ে বলেন, তাঁর মাগফিরাতের জন্য দোয়া কর এবং বল, "আয় আল্লাহ্ আমাকে তাঁর চেয়ে উত্তম স্থলাভিষিক্ত দান করুন।" আল্লাহ্ তাঁর দোয়া কবুল করেন এবং কয়েক মাস পর স্বয়ং রাসূল (সাঃ) তাঁকে বিয়ে করে নেন। তাঁর সন্তানও রাসূল (সাঃ)-এর তত্ত্বাবধানে চয়ে আসে।

হযরত আবু সালামা (রাঃ) রাসূল প্রেম, নিষ্ঠা ও বীরত্বে অতি উচ্চ মর্যাদার অধিকার ছিলেন।

প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী মহাপুরুষ

সর্বপ্রথম মহিলাদের মধ্যে ঈমান গ্রহণের গৌরব অর্জন করেছিলেন হযরত খাদীজা (রাঃ), তেমনি সচেতন পুরুষদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলামের দাওয়াত কবুল করার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন হযরত আবু বকর (রাঃ)।

রাসূল (সাঃ) বলেন, "আমি যাকেই ইসলামের দাওয়াত দিয়েছি, তার মনেই প্রথম কিছু না কিছু দ্বিধা-দ্বন্ধ সৃষ্টি হয়েছে, একমাত্র আবু বকর ব্যতীত। আমি তাঁকে ইসলামের দাওয়াত দেয়া মাত্র তিনি বিনা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব সাথে সাথে তা কবুল করেন। এক বর্ণনায় রয়েছে, রাসূল (সাঃ) যখন হেরা গুহায় ফেরশতার আগমন এবং ওহী নাযিলের ঘটনা হযরত আবু বকর (রাঃ)-কে শোনান, তখন তিনি সামান্যতম সন্দেহ-সংশয়ও প্রকাশ করেননি; নিঃসংঙ্কোচে তাঁর যাবতীয় কথা বিশ্বাস করে নেন। নির্দ্বিধায় এভাবে ইসলাম কবুল করে নেয়ার পিছনে রাসূল (সাঃ)-এর সাথে হযরত আবু বকর (রাঃ) -এর বন্ধুত্বের একটা হাত ছিল যার ফলে রাসূল (সাঃ)-কে অত্যন্ত কাছে থেকে দেখার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা তাঁর হয়েছিল। রাসূল (সাঃ)-এর অন্তরঙ্গ বন্ধু আবু কোহাফা তনয় আবু বকর ছিলেন অত্যন্ত বিজ্ঞতাসম্পন্ন উত্তম চরিত্রের অধিকারী। তখন তাঁর বয়স আটত্রিশ বছর। তাঁর সুদৃঢ় অনুভূতি ও মানসিক যোগ্যতা সম্পর্কে সবাই ছিল দ্বিধাহীন। তিনি তাঁর বন্ধু হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মুখে তওহীদ ও রিসালাতের বাণী শোনা মাত্র নির্দ্বিধায় প্রসন্নচিত্তে তা গ্রহণ করে নেন। কারণ, তিনি তখন পর্যন্ত তাঁর এ বন্ধুর যবান থেকে কোন মিথ্যা কথা শুনেননি। রাসূল (সাঃ)-এর জীবন তাঁর সামনে ছিল এক সু-উজ্জ্বল উন্মুক্ত পুস্তকের ন্যায়। তার ইসলাম গ্রহণ করে নেয়াটা ছিল এর প্রশান যে, এ পুস্তকের কোথাও কোন কলঙ্ক, কোন ত্রুটি কিংবা কোন সন্দেহ নেই। বরং এর প্রতিটি ছত্র হৃদয়গ্রাহী, প্রতিটি বর্ণ চিত্তাকর্ষক, প্রতিটি পাতা বিমোহিত এবং প্রতিটি কথা আলোকময়।

হযরত আবু বকর (রাঃ) ছিলেন অতি উত্তম চরিত্রের অধিকারী ও কোমলমতি। বুদ্ধি-বিবেচনা, দূরদর্শিতা ও চিন্তা-চেতনার বলিষ্ঠতার দিক দিয়ে সমগ্র মক্কায় অতি অল্প লোকই তাঁর সমকক্ষ ছিল। নিজ সম্প্রদায়ে তিনি ছিলেন অত্যন্ত জনপ্রিয়, বংশবিদ্যায় তিনি ছিলেন বিশেষজ্ঞ; মক্কার কোরায়েশদের সমস্ত গোত্রের ইতিহাস বংশ পরম্পরা তাঁর নখদর্পনে ছিল। তিনি সমস্ত গোত্র-গোষ্ঠীর দোষ-ত্রুটি ও গুণ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিশেষভাবে অবগত ছিলেন। এ বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে সারা কোরায়েশের কেহ তাঁর মোকাবেলা করতে পারত না। তিনি

একজন শিষ্ট, মিশুক ও সৎ ব্যবসায়ী ছিলেন। সম্প্রদায়ের সমস্ত লোক তাঁর উত্তম চরিত্র ও সদ্ব্যবহারে মুগ্ধ ছিল। আর তাঁর এসব বৈশিষ্ট্যের দরুন সবাই তাঁকে অত্যন্ত ভালবাসত। হযরত অবু বকর (রাঃ) ছিলেন তামীম গোত্রের সাথে সম্পৃক্ত। ৫৭৩ ঈসায়ীতে তাঁর জন্ম হয়। তিনি রাসূল (সাঃ)-এর চাইতে মাত্র আড়াই বছরের ছোট ছিলেন। শৈশব থেকে লেখাপড়া শিখেছিলেন। সর্ব প্রথম ইসলাম গ্রহণ করে তিনি তা নিজের বন্ধু-বান্ধবের কাছেও পৌঁছাতে শুরু করেন। এ ব্যাপারে তিনি যথেষ্ট গোপনীয়তা রক্ষা করতে থাকেন এবং দৃঢ়তা ও প্রত্যয়ের সাথে কাজ চালিয়ে যান। সুতরাং তাঁর প্রচেষ্টায় নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ যথাক্রমে ইসলাম গ্রহণ করেন।

হযরত সা'দ ইবনে আবী ওক্কাস (রাঃ), হযরত ওসমান ইব্‌নে আফফান (রাঃ), হযরত উবাইদ ইব্‌নে যায়েদ (রাঃ), হযরত তালহা ইব্‌নে উবাইদুল্লাহ্ (রাঃ), হযরত যুবাইর (রাঃ), হযরত আবদুর রহমান (রাঃ), হযরত ওসমান ইব্‌নে মাযউন (রাঃ), হযরত আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ (রাঃ), হযরত খালেদ ইব্‌নে সাঈদ (রাঃ), হযরত আবু সালামা (রাঃ)। তাঁর মাতা হযরত উম্মুল খায়ের (রাঃ) তাঁর আন্দোলনের শুরুতেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর পিতা আবু কোহাফাহ্ (রাঃ), ইসলাম গ্রহণ করেন মক্কা বিজয়ের পর। হযরত আবু বকর (রাঃ) বহু ক্রীতদাসকে খরিদ করে নিয়ে মুক্ত করে দেন। তিনি হযরত বেলাল (রাঃ)-কেও তার মালিক উমাইয়্যার কাছ থেকে খরিদ করে মুক্ত করে দিয়েছিলেন। মক্কার কঠিন ও বিপদসঙ্কুল জীবনে তিনি মহানবী (সাঃ)-কে সর্বত্র ও সর্ব অবস্থায় এমনভাবে সঙ্গদান করেন যে, ইতিহাস পর্যন্ত তার দৃষ্টান্ত উপস্থাপনে ব্যর্থ হয়ে যায়। মদীনায় হিজরত কালে তিনিই রাসূল (সাঃ)-এর সাথে থেকে সমুদয় কাজ তিনিই সম্পন্ন করেছিলেন।

তাঁর আদরের দুলালী হযরত আয়েশা (রাঃ) ছিলেন রাসূল (সাঃ)-এর পবিত্র সহধর্মিনী। হযরত আবু বকর (রাঃ) সমস্ত জিহাদে রাসূল (সাঃ)-এর সাথে থেকে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। হিজরী সনে মুসলমানগণ প্রথম যে হজ্ব পালন করেন তিনিই ছিলেন তার আমীর। তিনশ' সাহাবীর কাফেলা তাঁরই নেতৃত্ব ছিল। রাসূল (সাঃ) নিজের অসুস্থতার সময় তাঁকেই নিজের স্থলাভিষিক্ত ইমাম নিযুক্ত করেন। কাজেই তিনি ১ হিজরী ১৮ কিংবা কোন কোন বর্ণনায় অনুযায়ী ১৯শে সফর জুমাবার রাসূল (সাঃ)-এর নির্দেশক্রমে তাঁর

মুসাল্লায় দাঁড়িয়ে মুসলমানদেরকে ঈশার নামায পড়ান এবং অতঃপর জুমাবার রাত থেকে সোমবার ফযর পর্যন্ত নামাযের ইমামতি করেন। রাসূল (সাঃ)-এর ওফাতের দরুন মুসলমানদের মাঝে আতঙ্ক ও হতাশা ছড়িয়ে পড়লে তিনিই সমাবেশের মাঝে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন—"হ্যাঁ, তোমাদের মধ্যে যাঁরা মুহাম্মদ (সাঃ)-এর অনুসারী, তাঁদের জেনে রাখা উচিত যে, তাঁর মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু যাঁরা আল্লাহ্‌র বান্দা এবং তাঁরই বন্দেগী করে তাঁদের জানান উচিত, আল্লাহ্ জীবিত এবং তাঁর কখনও মৃত্যু নেই। আল্লাহ্ নিজেই তাঁর নবীকে বলেছেন, তোমার মৃত্যু হবে এবং অন্যান্যদেরও।" "রাসূল (সাঃ) একজন নবী ছাড়া আর কিছু নন। তাঁর পূর্বে আরো নবীর আসা যাওয়া হয়েছে। কাজেই তিনি যদি মৃত্যুবরণ করেন কিংবা শহীদ হয়ে যান, তবে কি তোমরা ফিরে চলে যাবে? মনে রেখ, যে ব্যক্তি ইসলাম পরিহার করে কুফরীর দিকে প্রত্যাবর্তন করবে, সে আল্লাহ্‌র কোন ক্ষতি করতে পারবে না। অবশ্য যাঁরা সর্বাস্থায় আল্লাহ্ তায়ালার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবেন, তিনি তাঁদেরকে প্রতিদান দেবেন।" তাঁর এ অন্তর্ভেদী ভাষণ শুনে সাহাবায়ে কিরামের অবস্থার পরিবর্তন হয়ে যায়। কাঁদতে কাঁদতে তাঁদের শ্বাষরুদ্ধ হয়ে এল। স্বয়ং হযরত ওমর (রাঃ)-এর অবস্থাও তাই হল। তিনি ধারাশায়ী হয়ে পড়লেন।

রাসূল (সাঃ) ওফাতের পর তিনি সাকীফায়ে বনু সায়েদার, নিতান্ত বিজ্ঞতা ও দূরদর্শিতার মাধ্যমে পরিস্থিতি সামাল দিতে সক্ষম হলেন। তাতে করে খিলাফতের সমস্যা চিরতরে সমাধান হয়ে যায়। লোকেরা তাঁকেই সর্বপ্রথম খলীফা নিযুক্ত করলেন। খিলাফত গ্রহণ করার পর তিনি যে বিজ্ঞোচিত ভাষণ দান করেছিলেন তার কিছু উদ্ধৃতি স্মরণযোগ্য।

"বন্ধুগণ! আমি তোমাদের উপর শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়েছি। অথচ আমি তোমাদের চেয়ে উত্তম নই।

আমি যদি ভাল কাজ করি, তাহলে তোমরা আমাকে সাহায্য করবে। আর যদি দেখ, মন্দের দিকে যাচ্ছি, তাহলে আমাকে সোজা করে দিবে।

হে লোক সকল! তোমাদের মধ্যে যে দুর্বল সে আমার কাছে সবল। ইনশাআল্লাহ্ আমি তার অধিকার পাইয়ে দেব।

যদি আমি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের দেখানো পথে চলি, তবে তোমরা আমার আনুগত্য কর।

কিন্তু যদি আমি আল্লাহ্ ও রাসূলের পথ ছেড়ে দিই, তাহলে তোমাদের কারো উপরই আমার হুকুম চলতে পারে না।"

তাঁরই প্রয়াসে কুরআন মজীদ লিপিবদ্ধ হয়ে একটি গ্রন্থকারে সংকলিত হয়। যে গৌরব অন্য কোন সাহাবীর অর্জিত হয়নি।

তাঁর খেলাফত কাল ছিল ২রা রবিউল আউয়াল ১১ হিজরী থেকে ২৪শে জমাদিউল আউয়ালাল ১৩ হিজরী পর্যন্ত। দু'বছর তিন মাস বাইশ দিন।

খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করার সাথে সাতেই তাঁকে নানান জটিল ও ভয়াবহ পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়। তার কয়েকটি নিম্নরূপঃ

(১) বিশিষ্ট সাহাবায়ে কিরামের মতপার্থক্য সত্ত্বেও রোম সম্রাট কায়সারের বিরুদ্ধে হযরত ওসামা (রাঃ) এর নেতৃত্বে সৈন্য সমাবেশ।

(২) নবুওয়তের মিথ্যা দাবীদার মুসাইলামাতুল কাযযাবের বিপুল শক্তি সঞ্চয়।

(৩) ইয়ামেন ও নাজদ অঞ্চলে যাকাত বিরোধী তৎপরতা।

(৪) মুর্তাদদের ভয়াবহ তৎপরতা প্রভৃতি।

কিন্তু তিনি তাঁর দৃঢ়তা, বুদ্ধিমত্তা, সৎসাহস ও বিচক্ষণতার মাধ্যমে এ সমুদয় সমস্যা একে একে সমাধান করে নিতে সক্ষম হন এবং যখন তিনি পৃথিবী থেকে বিদায় নেন, তখন সব সমস্যাই শেষ হয়েছিল। তাঁর জীবনের অন্তিম দিনগুলোতে ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছিল এবং রোমানদের সাথেও তুমুল যুদ্ধ চলছিল। তিনি এসব যুদ্ধ-বিগ্রহ, মুর্তাদ সমস্যা এবং মিথ্যা নবীদের মোকাবেলার উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত সেনাপতি ও সর্দারদেরকে নির্বাচিত করে নিজের বিচক্ষণতা ও প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁর নির্বাচিত সেনাপতিগণ ছিলেন, হযরত কা'ব ইবনে আমর (রাঃ), হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ (রাঃ), হযরত আ'লা ইবনে হাযরামী (রাঃ), হযরত মুহাজির ইবনে আবি উমাইয়া, হযরত ইকরিমা (রাঃ), হযরত হুযাইফা (রাঃ), ইবনে মুহসিন দামীরী। তিনি তাঁর অসুস্থতা যখন অনুভব করলেন তখন আল্লাহ্‌র দরবারে যাবার সময় হয়ে যায়, তখন নিজেই হযরত ওমর (রাঃ)-কে নিজের স্থলাভিষিক্ত নিয়োগ করে যথারীতি তা ঘোষণা করে দিলেন যাতে তাঁর পরে মুসলমানরা কোন রকম বিভেদ-বিভ্রান্তির শিকার না হয়। তিনি মুসলমানদেরকে বহু উপদেশও দান করলেন। তিনি ২৪ শে জমাদিউল আখের ১৩ হিজরী মোতাবেক ২২শে আগষ্ট ৬৩৪ ঈসায়ী সোমাবার সন্ধায় ইহ্‌জগত ত্যাগ করেন। তখন বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর। তাঁর নামাযে জানাযা পড়ান হযরত ওমর (রাঃ)। আর তাঁর লাশ কবরে নামিয়েছিলেন হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর (রাঃ), হযরত ওমর (রাঃ), হযরত ওসমান (রাঃ), ও হযরত তালহা (রাঃ)। হযরত আয়েশা

(রাঃ)-এর ঘরে রাসূল (সাঃ)-এর কবরে পূর্ব পাশে তাঁকে সমাহিত করা হয়। তাঁর সম্পর্কে (সাঃ) বলেছিলেন, "অমি সবার ইহসানের দায়ই শোধ করে দিয়েছি, কিন্তু আবু বকরের ইহসানের বদলা স্বয়ং আল্লাহ্ তায়ালা কিয়ামতের দিন দেবেন।" তিনি আশরা-মুবাশশারার অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। বলাবাহুল্য, তিনি ছিলেন নবীগণের পর সর্বোত্তম মানুষ।

প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী যুবক

যুবকদের সর্ব প্রথম ঈমান আনার গৌরব অর্জন করেছিলেন হযরত আলী (রাঃ)। অল্প বয়সেই তিনি ইসলামের দাওয়াত কবুল করেছিলেন। তখন তিনি রাসূল (সাঃ)-এর তত্ত্বধানে ছিলেন। তাঁর পরিচর্যার কল্যাণে ইতিমধ্যেই তাঁর ব্যক্তি সত্ত্বা বিকশিত হয়েছিল। তাই ন্যায় ও সত্যের বাণী শোনা মাত্রই তিনি তা মনে প্রাণে গ্রহণ করেন এবং সমগ্র জীবন এ পথে আত্মোৎসর্গের বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে থাকেন। তাঁর পিতার নাম আবদে মানাফ যিনি নিজের কনিয়াত তথা উপনাম আবু তালেব ডাক নামে খ্যাত ছিলেন এবং রাসূল (সাঃ)-এর আপন চাচা ছিলেন। তাঁর মায়ের নাম ছিল ফাতেমা বিন্‌তে আসাদ যিনি রাসূল (সাঃ)-এর লাল-পালনে প্রকৃষ্ট ভূমিকা পালন করেছিলেন। হযরত আলী (রাঃ)-এর পিতা আবু তালেব, রাসূল (সাঃ)-এর পিতা আবুদল্লাহ্ ও যুবাইর এ তিনজন ছিলেন সহোদর ভাই। অন্যান্যরা ছিলেন আবদুল মুত্তালিবের অন্যান্য স্ত্রীর সন্তান। হযরত আলী (রাঃ) বনু হাশেমের দাওয়াতের সময় রাসূল (সাঃ)-এর সাথে থাকার কথা ঘোষণা করেছিলেন অথচ তখনো তিনি ছিলেন কিশোর।

যেসব বর্ণনা মোতাবেক রাসূল (সাঃ) মক্কা থেকে মদীনা অভিমুখে রাতের অন্ধকারে হিজরত করার বর্ণনা করা হয়েছে, সেগুলোতে বলা হয়েছে, রাসূল (সাঃ) হযরত আলীকে নিজের বিছানায় শুইয়ে রেখে গিয়েছিলেন। তা করা হয়েছিল যাতে তাঁর কাছে রক্ষিত মানুষের আমানত সমূহ প্রত্যর্পণ করে মদীনায় হিজরত করেন। হযরত আলী (রাঃ) তাঁর জীবদ্দশায় সংঘটিত প্রায় সমস্ত যুদ্ধেই অংশগ্রহণ করে বিস্ময়ক ভূমিকা পালন করেন। তিনি বীরত্ব ও সাহসিকতার এমন অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন, যা আজো উদাহরণ হয়ে আছে। বদর যুদ্ধে তিনি তাঁর প্রতিপক্ষ শায়বাকে একই আঘাতে মৃত্যুমুখে পতিত করেন। রাসূল (সাঃ)-এর নিজ কন্যা হযরত ফাতিমা (রাঃ)-কে তাঁর সাথে বিয়ে দেন। এতে করে তিনি রাসূল (সাঃ)-এর অধিকতর ঘনিষ্ঠ হয়ে যান। খন্দক যুদ্ধে তিনি

একাই কাফেরদের হাজার সেনার সমকক্ষ আমর ইবনে আবদে বুদকে অত্যন্ত বীরত্বের সাথে হত্যা করেছিলেন। হুদায়বিয়া নামক স্থানে বাইয়াতে রিদওয়ানের চুক্তিপত্র তিনিই লিখেছিলেন। কোন কোন বর্ণনানুযায়ী খায়বর যুদ্ধে বিখ্যাত ইহুদী বীর মারহাবকে তিনিই হত্যা করেছিলেন। অবশ্য অন্যান্য ঐতিহাসিক এ ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, মারহাবের হত্যাকারী ছিলেন মুহাম্মদ ইব্‌নে সালামা (রাঃ)। গযওয়ায়ে হুনাইন ও মক্কা বিজয়ের ক্ষেত্রেও তিনি বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন। ৯ম হিজরী সালে হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর নেতৃত্বে পালিত হজ্বের সময় তিনি রাসূল (সাঃ)-এর নির্দেশক্রমে সূরা তওবার ১ম থেকে ৩৭ তম আয়াত পাঠ করে লোকদেরকে শোনান। তাতে ছিল মুক্তির ঘোষণা এবং কাফেরদেরকে হজ্ব সম্পাদনের অনুমতি দানের অস্বীকৃতি।

হযরত আনাস ইব্‌নে নযরের শাহাদত

তিনি রাসূল (সাঃ)-এর একজন সাহাবী হওয়া সত্বেও বদর যুদ্ধে শরীক হতে পারেন নাই। তাঁর এজন্য দুঃখ ছিল, তাই তিনি নিজেকে গাল মন্দ করে বলতেন, এটাই ছিল ইসলামের প্রথম যুদ্ধ, আর তুমি তাতেই অংশ গ্রহণ করতে পারলেনা। আর এ আশাও পোষণ করতেন যে, আবার কোন যুদ্ধে সুযোগ পেলে মনের এ বাসনা পূর্ণ করবেন। এজন্য বেশী দিন অপেক্ষা করতে হল না অল্পদিন পরেই উহুদ যুদ্ধের দামামা বেঁজে উঠল, যাতে তিনি অত্যন্ত সাহস ও বীরত্ব প্রদর্শন করলেন। উহুদ যুদ্ধে প্রথম দিকে মুসলমানদের বিজয় লাভ হল। কিন্তু শেষে একটি ভুলের কারণে তাঁদের সাময়িক পরাজয় বরণ করতে হয়েছিল। ভুলটি ছিল এরূপ, রাসূল (সাঃ) কিছু সাহাবীকে একটি বিশেষ জায়গায় পাহারা দেয়ার জন্য মোতায়ন করে বললেন, যতক্ষণ আমি না বলি কেহ স্বীয় স্থান ছেড়ে যাবে না। কেননা সেদিক থেকে দুশমনদের আক্রমণের ভয় ছিল। যখন প্রথম দিকে মুসলমানদের বিজয় হল এবং কাফিরগণ পলায়নরত, তখন সাহাবী সৈনিকগণ এ ভেবে তাঁরা স্বীয় স্থান ত্যাগ করলেন যে, যুদ্ধ তো শেষ হয়ে গেছে। তাই কাফিরদের ধাওয়া করা ও গনিমতের মাল জমা করা এখন একান্তই দরকার। এ অবস্থায় তাঁদের দলনেতা স্থান ত্যাগ করতে এ বলে নিষেধ করলেন যে, রাসূল (সাঃ) তোমাদেরকে এ ঘাঁটি ছেড়ে যেতে নিষেধ করেছেন, তাই তোমরা এখানেই স্থির থাক। কিন্তু তাঁরা ভাবল যে, হযরতের আদেশ শুধুমাত্র যুদ্ধ চলাকালীন সময়ের জন্যই ছিল, তাই সেখানে থেকে তাঁরা যুদ্ধের ময়দানে গিয়ে উপস্থিত হলেন। পলায়নরত কাফিরগণ এ সংরক্ষিত ঘাঁটিটি খালি দেখে

হঠাৎ হামলা করল। তখন মুসলমানগণ যেহেতু অপ্রস্তুত ছিলেন, এদিক থেকে আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না, তাই তাঁদের সাময়িক পরাজয় গ্রহণ করতে হল। তারা উভয় দিকের কাফিরদের মাঝে পড়ে দিশেহারা হয়ে দিক-বিদিক ছুটতে লাগলেন।

হযরত আনাস (রাঃ) দেখলেন, হযরত সায়াদ ইব্‌নে মুয়ায আসছেন। তিনি তাঁকে বললেন, 'হে সায়াদ কোথায় যাচ্ছ? আল্লাহ্‌র কসম! উহুদ পাহাড় থেকে জান্নাতের খুশবু আসছে।' এ বলেই তলোয়ার হাতে নিয়ে কাফিরদের মধ্যে প্রবেশ করে বীর-বিক্রমে যুদ্ধ করতে করতে শাহাদাত বরণ করলেন। শাহাদাতের পর দেখা গেল, শরীরখানা যেন চালনীর মত হয়ে গেছে। শরীরে আশি থেকেও বেশী তীর-তলোয়ারের আঘাতের চিহ্ন বিদ্যমান ছিল। তাঁর বোন লাশ সনাক্ত করেন তাঁর আঙ্গুল দেখে।

হুদায়বিয়ার সন্ধি ও হযরত আবু জানদালের ভূমিকা

ষষ্ঠ হিজরীতে রাসূল (সাঃ) মক্কায় হজ্ব করতে সংকল্প করেছিলেন। মক্কার কাফেররা এ সংবাদ অবগত হয়ে তাঁকে বাধা দিতে কৃতসংকল্প হল। হযরত রাসূল (সাঃ) তাই মক্কায় প্রবেশ না করে তাঁর সাহাবীদেরকে নিয়ে হুদায়বিয়া নামক স্থানে যাত্রাবিরতি করলেন। রাসূল (সাঃ)-এর জন্যে প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে সাহাবীদের সবাই প্রস্তুত ছিলেন। ফলে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে তাঁরা কাফেরদের মোকাবেলা করতে তৈরী হলেন। কিন্তু রাসূল (সাঃ) মক্কাবাসীদের সাথে যুদ্ধের আদেশ না দিয়ে সন্ধি স্থাপনের প্রচেষ্টা করলেন। যুদ্ধের জন্যে সাহাবীদের আন্তরিক ইচ্ছা এবং তাঁদের বীরত্বব্যঞ্জক আকুলতা থাকা সত্ত্বেও তিনি আপাতদৃষ্টিতে অবমানকর ও ক্ষতিকর মক্কাবাসীদের সন্ধির সমুদয় শর্ত মেনে নেন। সাহাবীদের সকল প্রকার আবেদন-নিবেদন ও তাঁদের মতামত উপেক্ষা করে সন্ধি শর্তে আবদ্ধ হওয়া অনেকের কাছে অসমীচীন বলে মনে হলেও রাসূল (সাঃ)-এর মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে সকলেই নীরব রইলেন।

হুদায়বিয়ার সন্ধির একটি শর্ত ছিল এরকমঃ কাফেরদের কেউ ইসলাম গ্রহণ করে মদীনায় গেলে তাঁকে মক্কায় ফেরত পাঠাতে হবে। অন্যদিকে মদীনার কোন মুসলমান ইসলাম ত্যাগ করে মক্কায় চলে গেলে তাকে আর মদীনায় ফেরত পাঠান হবেনা। তখনও সন্ধিপত্র লেখা সম্পূর্ণ হয়নি মাত্র আলোচনা করে শর্তাদি ঠিক করা হয়েছিল। এমনি সময়ে আবু জান্দাল নামক এক সাহাবী হাত-পা শৃঙ্খলিত অবস্থায় অতিকষ্টে মুসলমানদের কাছে এসে উপস্থিত হয়ে

বলেন, 'মুসলমান হওয়ার কারণে তাঁর আত্মীয়-স্বজেনরা তাঁকে নানাভাবে নির্যাতন করে।' অত্যাচার সহ্য করে তিনি এ ভেবে বাড়ি থেকে পলায়ন করেন যে, মুসলমানদের সাহায্যে তিনি নির্মম যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি লাভ করবেন। তাঁর পিতা সুহাইল। হুদায়বিয়ার সন্ধি সংক্রান্ত ব্যাপারে কাফিরদের পক্ষ অবলম্বন করেছিল। সে এসে স্বীয় পুত্র আবু জান্দালকে চপেটাঘাত করে তাকে ফিরিয়ে দেয়ার জন্যে রাসূল (সাঃ)-এর কাছে দাবী জানায়। রাসূল (সাঃ) বললেন, সন্ধিপত্রটি তো এখনও পাকাপাকি হয়নি। কাজেই এর শর্তাদি পালন করার তো এখন কোন প্রশ্ন উঠেনা।

কিন্তু সুহাইল তার দাবী ছাড়তে রাজী হল না। রাসূল (সাঃ) আবু জান্দালকে তার নিকট ভিক্ষা চাইলেন। তবু সুহাইলের মনে এতটুকু করুণার উদ্রেক হল না। তিনি করুণভাবে চিৎকার করে সাহাবীদেরকে বললেন, আমি মুসলমানদের হয়ে আপনাদের কাছে আশ্রয়ের জন্যে এসেছিলাম কিন্তু আপনারা আমাকে ফিরিয়ে দিচ্ছেন। আমাকে যে এর কত যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে, তা আপনারা কিছুই জানেন না। তাঁর আকুল আবেদন মুসলমানদের হৃদয়ে ব্যথা ও করুণা হল। কিন্তু তাঁরা তাঁকে কোন সাহায্যই করতে পারলেন না। রাসূল (সাঃ)-এর আদেশানুসারে তাঁকে অবশেষে বাড়ি ফিরে যেতে হল। বিদায়ের সময় রাসূল (সাঃ) তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, আবু জান্দাল! ধৈর্যধারণ কর; অতি তাড়াতাড়িই আল্লাহ্ তোমার মুক্তির ব্যবস্থা করবেন। সন্ধিপত্র লেখা শেষ হল।

আবু বাসীর (রাঃ) নামক একজন সাহাবী ইসলাম গ্রহণ করে মদীনায় হিজরত করলে কাফেররা তাঁকে ফিরিয়ে নেয়ার জন্যে দু'জন লোককে প্রেরণ করে। সন্ধির শর্ত মোতাবেক রাসূল (সাঃ) তাঁর প্রতি সান্ত্বনার বাণী প্রদান করে বললেন, হে আবু বাসীর! ধৈর্য অবলম্বন কর। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন খুব দ্রুতই তোমার মুক্তির পথ উন্মুক্ত করে দেবেন। আবু বাসীর (রাঃ) দু'জন কাফেরের সাথে রওয়ানা হলেন। পথে এক জায়গায় তিনি তাঁর সঙ্গীদের একজনকে বললেন, বন্ধু, তোমার তলোয়ারটি তো খুবই সুন্দর। বীর যোদ্ধা নিজের তরবারীর প্রশংসা শুনে পরিস্থিতির কথা ভুলে খাপ খুলে তা বের করে বলল, হ্যাঁ, এটি খুবই ভাল তলোয়ার। অনেকের উপরই আমি এর পরীক্ষা করেছি। এ কথা বলে সে তলোয়ারটি আবু বাসীদেরর হাতে অর্পণ করল। আবু বাসীর (রাঃ) তরবারী হাতে পেয়ে প্রথমেই মালিকের উপর তার ধার পরীক্ষা করলেন। তলোয়ারের এক আঘাতেই তরবারীর মালিক ইহলীলা সংবরণ করল।

আবু বাসীর (রাঃ)-এর দ্বিতীয় সাথী তার সঙ্গীর দুরাবস্থা দেখে মনে করল যে এবার তার পালা এসেছে। কাজেই সেখান থেকে যে দৌড়ে পালাল এবং হযরত রাসূল (সাঃ)-এর কাছে এসে বলল, আবু বাসীর আমার সঙ্গীকে হত্যা করেছে এখন সে আমাকেও হত্যা করবে। তার কথা শেষ হতে না হতেই আবু বাসীর (রাঃ) সেখানে গিয়ে উপস্থিত হয়ে রাসূল (সাঃ)-কে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি আপনার ওয়াদা পূর্ণ করে আমাকে মক্কায় পাঠিয়েছিলেন। এখন আমার সম্বন্ধে তাদের কাছে পালন করবার মত আপনার কোন প্রতিশ্রুতি অবশিষ্ট নেই। সে আমাকে আমার ধর্ম হতে বিতাড়িত করতে চায়, তাই আমি তাকে হত্যা করেছি। তাঁর কথা শুনে রাসূল (সাঃ) বললেন, যুদ্ধ বাঁধানোর ইচ্ছা আছে? এ কথা শুনে আবু বাসীর বুঝলেন যে এখনও যদি তাঁকে ফেরত নেয়ার জন্য মক্কা থেকে কোন লোক আসে তাহলে তাঁকে নিশ্চয়ই ফিরে যেতে হবে। তাই তিনি মদীনা পরিত্যাগ করে সমুদ্রের উপকূলে হাঁটতে হাঁটতে এক জঙ্গলাকীর্ণ জায়গায় গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। এ সংবাদ মক্কায় পৌঁছে যায়। আবু জান্দাল সংবাদ শুনে মক্কা ছেড়ে এসে আবু বাসীদের সাথে গিয়ে মিলিত হল।

এভাবে মক্কায় কেহ যখন ইসলামের ছায়াতলে সমবেত হতেন, তখনই বাড়ি ছেড়ে এসে সমুদ্র তীরের এ স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করতেন। ক্রমে অল্পদিনের মধ্যেই এ স্থানে এ ধরনের প্রবাসী মুসলমানদের একটি ছোট-খাট দল গড়ে উঠল। স্থানটি ছিল সমুদ্র পাড়ের গভীর জঙ্গল। সেখানে কোন জনবসতি ছিল না। সেখানে এ অবস্থায় মুসলমানদের ভীষণ কষ্টবরণ করতে হয়েছিল। মক্কার যে সব কাফেলা এ জঙ্গলের পাশ দিয়ে অতিক্রম করতে চেষ্টা করত তাদের উপর অতর্কিত আক্রমণ করে তাদের মাল-সম্পদ দখল করে শাস্তির ব্যবস্থা করতেন এ জঙ্গলবাসীরা। অল্পদিনের মধ্যেই কাফেরদের মাঝে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল। তারা দেখল যে, সমুদ্রতীর বরাবর তাদের যাতায়াত বন্ধ হওয়ায় ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ হওয়ার উপক্রম হল, তখন বাধ্য হয়ে তারা অতি বিনয় ও নম্রতার সাথে হযরত রাসূল (সাঃ)-এর কাছে আবেদন জানাল, যেন সমুদ্রতীরবর্তী জঙ্গল থেকে শাসনগন্ডি বহির্ভূত মুসলমানদের দলটিকে মদীনায় যেন ফিরিয়ে নেয়া হয়। কাফেরদের আবেদনে রাসূল (সাঃ) এ দলটিকে মদীনায় চলে আসার হুকুম পাঠালেন। সহীহ বুখারী শরীফের বর্ণনায় উল্লেখ রয়েছে, রাসূল (সাঃ)-এর এ আদেশ গিয়ে যখন এ স্থানে পৌঁছল, তখন আবু বাসীর মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করেছিলেন। তিনি রাসূল (সাঃ)-এর আদেশ নামাটি পাঠ করতে করতে মহান আল্লাহ্র সান্নিধ্যে গমন করেন।

হযরত বেলাল হাবশী (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণ

হযরত আবু আবদুল্লাহ বিলাল (রাঃ) বিন রাবাহ রাসূল (সাঃ)-এর দরবারের অন্যতম মহান মর্যাদাবান সাহাবী ছিলেন। তাঁর নাম শুনলে প্রতিটি মুসলমানের মাথা ভক্তি-শ্রদ্ধায় অবনত হয়ে পড়ে। তিবরানী (রাঃ) এবং অন্য কতিপয় ঐতিহাসিক লিখেছেন, রাবাহ প্রকৃতপক্ষে হাবশী ছিলেন। তিনি স্ত্রী হুমামাহ সমভিব্যাহারে এসে মক্কার স্থায়ী বাসিন্দা হয়েছিলেন এবং কুরাইশের বনু জুমাহ বংশের গোলামী গ্রহণ করেছিলেন। (অথবা তাঁকে গোলাম বানানো হয়েছিল)। এ গোলামী অবস্থাতে রাসূল (সাঃ) নবুওয়াত প্রাপ্তির প্রায় ২৮ বছর পূর্বে রাবাহ ও হুমামাহর পুত্র বিলাল (রাঃ) জন্মগ্রহণ করেন। বিলাল (রাঃ)-এর যখন জ্ঞান হল, তখন চারদিকে কুফর ও শিরকের ঘনঘটা দেখতে পেলেন। তাঁর মালিক উমাইয়াহ বিন খালফ জুমহিও কট্টর মুশরিক ছিল। তার গোলামীতেই তিনি জীবনের ২৮টি বছর অতিবাহিত করেছিলেন। ইত্যবসরে তাঁর কানে হকের দাওয়াতের আওয়াজ পৌঁছল। এটা ছিল নবুওয়াত প্রাপ্তির সম্পূর্ণ প্রথম যুগ, যখন রাসূল (সাঃ) অত্যন্ত গোপনীয়তার সাথে হকের তাবলীগ শুরু করেছিলেন। হযরত বিলাল (রাঃ) প্রকৃতিগতভাবে অত্যন্ত শরীফ এবং পবিত্র আত্মার মানুষ ছিলেন। সম্ভবত নবুওয়াতের পূর্বেই তিনি রাসূল (সাঃ)-এর উন্নত চরিত্রে প্রভাবিত হয়েছিলেন। বস্তুত তাওহীদের আওয়াজ শুনা মাত্র তিনি নির্ভাবনায় তাতে সাড়া দিলেন এবং নিজের মন ও প্রাণ রাসূল (সাঃ)-এর জন্য উৎসর্গ করে দিলেন। নেতৃস্থানীয় চরিতকাররা বলেছেন, তিনি সে 'সাত নেক ভাগ্যবান, ব্যক্তিত্বের অন্যতম ছিলেন যাঁরা তাওহীদের ঝাণ্ডাকে আঁকড়ে ধরেছিলেন। তিনি মদীনার মসজিদে নববীর মুয়াযযিন ও রাসূলে আকরাম (সাঃ)-এর অতি স্নেহভাজন ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর মনিব উমাইয়া বিন খালফ তাঁকে বিভিন্ন পদ্ধতিতে নির্যাতন করে লাগল। উমাইয়া বিন্ খালফ ইসলামের ঘোর শত্রু ছিল। সে তার ভৃত্য হযরত বেলাল (রাঃ)-কে ইসলাম ত্যাগ করাতে অত্যন্ত কঠোর ও নির্মম শাস্তির বন্দোবস্ত করেছিল। দুপুরের কড়া রোদে অগ্নিঝরা গরম বালির উপর সে হযরত বেলাল (রাঃ)-কে চিৎ করে শুইয়ে দিয়ে তাঁর বুকের উপর একটা বড় পাথর চাপিয়ে দিত। এর ভারে হযরত বিলাল (রাঃ) একটুও নড়তে পারতেন না। উপরে সূর্যের কড়া তাপ, নিচে আগুনের মত গরম পানি। এরকম নিষ্ঠুর অত্যাচার করার একমাত্র কারণ ছিল হয়, তিনি মৃত্যুবরণ করবেন, নয়ত ইসলাম পরিত্যাগ করবেন। কিন্তু এমন অসহনীয় নির্যাতন ভোগ করেও তিনি ইসলাম পরিত্যাগ করেননি। প্রাণ ওষ্ঠাগত প্রায়,

প্রেমের সাধক অসহ্য যাতনায় ছটফট করতে করতে মাঝে মাঝে গলা ছেড়ে চীৎকার করে বলতেন, আহাদ, আহাদ অর্থাৎ আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই। রাতেও তাঁর শান্তি ছিল না। তাঁকে তখন বেত মারা হত, ফলে আগের দিনের জখমগুলো তরতাজা হয়ে ওঠত। পরে তাঁকে যখন আবার গরম বালিরাশির উপর শুইয়ে দেয়া হত, তখন তার জখম থেকে অঝোর ধারায় রক্ত প্রবাহিত হত। তারা তাঁর গলায় দড়ি বেঁধে মক্কার রাজপথে টেনে হেচড়ে নিয়ে যেত আর সন্ধ্যার দিকে মৃতপ্রায় অবস্থায় ফিরিয়ে দিয়ে যেত। তাঁকে নির্যাতন শুধুমাত্র তাঁর মনিবই করত এমন নয়, সাথে কখনও আবু জাহল, কখনও উমাইয়া কখনও অন্য কাফেরারাও পালাক্রমে অত্যাচার করত। এত অত্যাচার নির্যাতন সত্ত্বেও তিনি কখনও তাঁর আহাদকে ভুলেননি। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) তাঁর এ করুণ অবস্থা দেখে বহু অর্থের বিনিময়ে তাঁকে আযাদ করে দেন। আরবের পৌত্তলিকরা তাদের মূর্তিগুলোকে নিজেদের মাবুদ বলে মান্য করত। ইসলামের তৌহিদ বাণী তাদের ধর্ম বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করেছিল, সে জন্যেই হযরত বিলাল (রাঃ)-কে ইসলাম থেকে বিচ্যূত করতে তাদের এত বেশী আগ্রহ ছিল। কিন্তু তৌহিদের বিশ্বাসী ইসলামের আমানতদার হযরত বেলাল (রাঃ) শত্রুর সহস্র নির্যাতন সহ্য করেও আল্লাহ্‌র একত্বকে মানুষের সামনে অক্ষয় করে ফুটিয়ে তুলতে তৎপরতা দেখিয়ে দেন। হযরত বিলাল (রাঃ) ধৈর্য এবং সত্যতা ও আন্তরিকতার যে চিত্র ইতিহাসের পাতায় অঙ্কিত করে গেছেন তা প্রতিটি মুসলমানের জন্য চিরকালের মত মশাল হিসাবে গণ্য হবে। তাঁর নাম শুনে প্রত্যেক মুসলমানের নাড়ির গতিবেগ বেড়ে যায়। হায়! সে যদি হযরত বিলাল (রাঃ)-এর রাসূল (সাঃ)-এর প্রেমের হাজার-লাখ ভাগের এক ভাগও পেত! তাহলে তার আখিরাত সুন্দর হত।

নবীবিহীন মদীনা

হযরত রাসূল (সাঃ)-এর তিরোধানের পর হযরত বেলাল (রাঃ) মদীনায় আর অবস্থান করতে পারেননি। নবী শূণ্য মদীনায় তাঁর কিভাবে থাকা সম্ভব? কাকে শোনাবেন, তিনি তাঁর মধুর আযান ধ্বনি? শোকে, দুঃখে, বিচ্ছেদ কাতরতায় একদিন তিনি মদীনা ত্যাগ করে জিহাদে জীবন দান করার মানসে দূরদেশে প্রত্যাগমন করেন। বহুদিন তিনি মদীনায় ফিরে আসেননি। একদিন স্বপ্নে রাসূল (সাঃ)-কে বলতে শুনলেন, হে বলাল! একি রকম যুলুম! তুমি যে আর আমার কাছে আসনা? স্বপ্ন ভেঙ্গে গেলে প্রেমিকের মনে পুনরায় প্রেমের ফল্গুধারা প্রবাহিত হল। ভোর হতে না হতেই মদীনার দিকে ছুটলেন। রাসূল

(সাঃ)-এর বংশধর হযরত হাসান ও হযরত হোসায়েন (রাঃ) তাঁদের অতি আপনজন হযরত বেলালকে পেয়ে যেন হারানো সম্পদ ফিরে পেলেন। তাঁরা তাঁর আযান শোনার জন্য হযরত বেলালকে অনুরোধ করলেন। অন্যদিকে নবী বংশধরের অনুরোধ উপেক্ষা করাও যে সম্ভব নয়। তিনি উদাত্তকণ্ঠে তওহীদের সুমধুর বাণী পুনরায় চারদিকে ঘোষণা করে দিলেন। মদীনার আকাশ বাতাস মুখরিত করে হযরত বেলালের আমার ধ্বনি দিক-বিগন্তে ছড়িয়ে পড়ল। মদীনার নর-নারী তাঁদের চির পরিচিত স্বর শুনে রোদন করতে করতে মসজিদে নববীর দিকে ছুটে এলেন। সেখানে হযরত বেলাল (রাঃ)-কে দেখে তাঁদের নবী শোক যেন বহুগুণে বর্দ্ধিত হয়ে উথলে উঠল। কিছুদিন মদীনায় বসবাস করার পর হযরত বেলাল (রাঃ) স্বীয় বাসস্থান দামেস্কে প্রত্যাবর্তন করেন এবং ২০ হিজরীতে সেখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। -(উসদুল গাবা)

আবুযর গিফারী (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণ

হযরত আবুযর গিফারী (রাঃ) একজন দুনিয়া বিরাগী রাসূল (সাঃ)-এর সাহাবী ছিলেন। তাঁর পূর্ব পরিচিতি ছিল এরূপ- বাইরের জগতের সাথে মক্কার সংযুক্তি ঘটিয়েছে যে, 'আদ্দান' উপত্যকাটি, সেখানেই ছিল গিফার গোত্রের বসতি। মক্কার কুরাইশদের বাণিজ্য কাফেলা ওখান দিয়ে সিরিয়া যাতায়াত করত। এসব কাফেলার নিরাপত্তার বিনিময়ে যে সামান্য অর্থ লাভ করত তা দিয়েই তারা জীবিকা নির্বাহ করত। ডাকাতি, রাহাজানিও ছিল তাদের পেশা। যখন কোন বাণিজ্য কাফেলা তাদের দাবী অনুযায়ী খাদ্যসামগ্রী বা অর্থ আদায় করত না তখন তারা লুটতরাজ চালাত। জুনদুব ইব্‌ন জুনাদাহ আবুযার নামেই যিনি পরিচিত-তিনিও ছিলেন এ কবীলারই সন্তান। বাল্যকাল থেকেই তিনি অসীম সাহস, প্রখর বুদ্ধিমত্তা ও দূরদৃষ্টির জন্য ছিলেন সকলের থেকে স্বতন্ত্র। জাহেলী যুগে জীবনের প্রথম ভাগে তাঁর পেশাও ছিল রাহাজানি। গিফার গোত্রের একজন দুঃসাহসী ডাকাত হিসেবে তিনি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তবে কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর জীবনে ঘটে যায় এক পরিবর্তন। তাঁর গোত্রীয় লোকেরা এক আল্লাহ ছাড়া যে সকল মূর্তির পূজা করত, তাতে তিনি গভীর ব্যথা অনুভব করতে শুরু করেন।

সমগ্র আরব বিশ্বে সে সময় যে, ধর্মীয় অনাচার, অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কারের সয়লাব তা তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করেন। তিনি অধীর ভাবে অপেক্ষা করতে থাকেন এমন একজন ব্যক্তির জন্য যিনি মানুষের বুদ্ধি- বিবেক ও অন্তরকে পরিচ্ছন্ন করে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে তাদের নিয়ে আসবেন।

তিনি রাহাজানি পরিত্যাগ করে একাগ্রচিত্তে আল্লাহর ইবাদাতের দিকে ঝুঁকে পড়েন, যখন সমগ্র আরব দেশ গোমরাহীর অতল গহ্বরে নিমজ্জিত ছিল। হযরত আবু মাশার বলেনঃ আবুযর জাহিলী যুগেই একত্ববাদী ছিলেন। এক আল্লাহ ছাড়া আর কাকেও তিনি উপাস্য বলে বিশ্বাস করতেন না। অন্য কোন মূর্তি বা দেব-দেবীর পূজাও করতেন না। তাঁর বিশ্বাস ও আল্লাহর ইবাদত মানুষের কাছে পরিচিত ছিল। এ কারণে, যে ব্যক্তি সর্ব প্রথম রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর আবির্ভাবের সংবাদ তাঁকে দিয়ে বলেছিলঃ আবুযর, তোমার মত মক্কায় এক ব্যক্তি "লা-ই-লাহা ইল্লাল্লাহ বলে থাকেন। তিনি কেবল মুখে মুখেই তাওহীদে বিশ্বাসী ছিলেন না, সে জাহিলী যুগে নামাযও আদায় করতেন। এ সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে সাক্ষাতের তিন বছর পূর্ব থেকেই নামায আদায় করতাম। লোকেরা জিজ্ঞেস করেছিল, কাকে উদ্দেশ্য করে? বললেন। আল্লাহকে। আবার প্রশ্ন করা হয়েছিল কোন দিকে মুখ করে? বলেছিলেন, যে দিকে আল্লাহ ইচ্ছা করতেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণের ঘটনাটিও বেশ চমকপ্রদ। ইব্‌নে হাজার "আল-ইসাবা" গ্রন্থে তাঁর ইসলাম গ্রহণের কাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। সংক্ষেপে এভাবে বলা যায়, তিনি তাঁর গোত্রের সাথে বসবাস করছিলেন।

একদিন সংবাদ পেলেন, মক্কায় এক নতুন নবীর আবির্ভাব হয়েছে, তাই তিনি তার ভাই আনিসকে ডেকে বললেন ঃ তুমি একটু মক্কায় যাবে। সেখানে যিনি নিজেকে নবী বলে দাবী করেন এবং আসমান থেকে তাঁর কাছে ওহী আসে বলে প্রচার করে থাকেন, তাঁর সম্পর্কে কিছু তথ্য সংগ্রহ করবে, তাঁর মুখের কিছু কথা শুনবে। তারপর ফিরে এসে আমাকে অবহিত করবে। আনিস মক্কায় চলে গেলেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে সাক্ষাত করে তাঁর মুখ নিঃসৃত বাণী শ্রবণ করে নিজ গোত্রে ফিরে এলেন। আবুযর খবর পেয়ে তখনই ছুটে গেলেন আনিসের কাছে। অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে নতুন নবী সম্পর্কে নানান কথা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন। আনিস বললেন ঃ কসম আল্লাহর। আমি তো লোকটিকে দেখলাম, মানুষকে তিনি মহৎ চরিত্রের দিকে আহ্বান জানাচ্ছেন। আর এমন সব কথা বলেন যা কাব্য বলেও মনে হল না। মানুষ তাঁর সম্পর্কে কি বলাবলি করে? কেহ বলে তিনি একজন যাদুকর, কেহ বলে গণক, আবার কেউ বলে কবি। আল্লাহর কসম। তুমি আমার তৃষ্ণা মেটাতে পারলে না, আমার আকাঙ্খাও পূরণ করতে সক্ষম হলে না। তুমি কি পারবে আমার পরিবারের দায়িত্বভার গ্রহণ করতে, যাতে আমি মক্কায় গিয়ে স্বচক্ষেই তাঁর অবস্থা দেখে আসতে পারি?

নিশ্চয়ই। তবে আপনি মক্কাবাসীদের সম্পর্কে সতর্ক থাকবেন। পরদিন সকালে আবুযর চললেন মক্কার উদ্দেশ্য। সাথে নিলেন কিছু পাথেয় ও এক মাশক পানি। সর্বদা তিনি শঙ্কিত , ভীত চকিত। না জানি কেহ জেনে ফেলে তাঁর উদ্দেশ্য। এ অবস্থায় তিনি পৌঁছলেন মক্কায়। কোন ব্যক্তির কাছে মুহাম্মদ সম্পর্কে কোন কথা জিজ্ঞেস করা তিনি সমীচীন মনে করলেন না। কারণ, তাঁর জানা নেই এ জিজ্ঞাসিত ব্যক্তিটি মুহাম্মদের বন্ধু না শত্রু? দিনটি কেটে গেল। রাতের আঁধার নেমে এল। তিনি ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত। বিশ্রামের উদ্দেশ্যে তিনি শুয়ে পড়লেন মাসজিদুল হারামের এক কোণে। আলী ইব্‌নে আবি তালিব যাচ্ছিলেন সে পথ দিয়েই। দেখেই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, লোকটি মুসাফির। ডাকলেন, আসুন, আমার বাড়িতে। আবুযর গেলেন তাঁর সাথে এবং সেখানেই রাতটি কাটিয়ে দিলেন।

সকাল বেলা পানির মশক ও খাবারের পুটলিটি হাতে নিয়ে আবার ফিরে এলেন মাসজিদে । তবে দু'জনের একজনও একে অপরকে কিছুই জিজ্ঞেস করলেন না। পরের দিনটিও কেটে গেল। কিন্তু নবীর সাথে পরিচয় হল না। আজও তিনি মাসজিদেই শুয়ে পড়লেন। আজও আলী (রাঃ) আবার সে পথ দিয়েই যাচ্ছিলেন। বললেন ঃ ব্যাপার কি, লোকটি আজও তাঁর গন্তব্যস্থল চিনতে পারেনি? তিনি তাঁকে আবার সাথে করে বাড়িতে নিয়ে গেলেন। এ রাতটিও সেখানে কেটে গেল। এদিনও কেহ কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা করলেন না। একইভাবেই তৃতীয় রাতটি নেমে এল। আলী (রাঃ) আজ বললেন ঃ বলুন তো আপনি কি উদ্দেশ্য মক্কায় এসেছেন? তিনি বললেন, যদি আমার কাছে অঙ্গীকার করেন আমার কাঙ্খিত বিষয়ের দিকে আপনি আমাকে পথ দেখাবেন তাহলে আমি বলতে পারি। আলী (রাঃ) অঙ্গীকার করলেন। আবুযর বললেন ঃ আমি অনেক দূর থেকে মক্কায় এসেছি নতুন নবীর সাথে সাক্ষাত করতে এবং তিনি যে সব কথা বলেন তার কিছু শুনতে। আলীর (রাঃ) মুখমন্ডল আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বললেন, আল্লাহর কসম, তিনি নিশ্চিত সত্য নবী । একথা বলে তিনি নানা ভাবে নবীর (সাঃ) পরিচয় দিলেন।

তিনি আরও বললেন, সকালে আমি যেখানে যাই, আপনি আমাকে অনুসরণ করবেন। যদি আমি আপনার জন্য আশংকাজনক কোন কিছু লক্ষ্য করি তাহলে প্রস্রাবের ভান করে দাঁড়িয়ে যাব। আবার যখন চলব, আমাকে অনুসরণ করে চলতে থাকবেন। এভাবে আমি যেখানে প্রবেশ করি আপনিও সেখানে প্রবেশ করবেন। প্রিয় নবী দর্শন লাভ ও তাঁর উপর অবতীর্ণ প্রত্যাদেশ শ্রবণ

করার প্রবল আগ্রহ ও উৎকণ্ঠায় আবুযর সারাটা রাত বিছানায় স্থির হতে পারলেন না। পরদিন সকালে মেহমান সাথে করে আলী (রাঃ) চললেন রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বাড়ির দিকে। আবুযর তাঁর পিছনে পিছনে। পথের আশ পাশের কোন কিছুর প্রতি তাঁর কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। এভাবে তাঁরা পৌঁছলেন রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে। আবুযর সালাম করলেন। আস-সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ। রাসূল (সাঃ) জবাব দিলেন, 'ওয়া আলাইকাস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া বারাকাতুহু। এভাবে আবুযর সর্বপ্রথম ইসলামী কায়দায় রাসূল (সাঃ)-কে সালাম পেশ করার গৌরব অর্জন করেন। অতঃপর সালাম বিনিময়ের এ পদ্ধতিই গৃহীত ও প্রচারিত হয়।

রাসূল (সাঃ) আবুযরকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন এবং কুরআনের কিছু আয়াত তিলাওয়াত করে শুনালেন। সেখানে বসেই আবুযর কালেমায়ে তাওহীদ পাঠ করে নতুন দ্বীনের মধ্যে প্রবেশের ঘোষণা দিলেন। এর পর ঘটনা আবুযর এভাবে বর্ণনা করছেন। ইসলাম গ্রহণের পর রাসূল (সাঃ)-এর সাথে আমি মক্কায় অবস্থান করতে লাগলাম। তিনি আমাকে ইসলামের নানান বিষয় শিক্ষা দিলেন, মক্কায় কারও কাছে তোমার ইসলাম গ্রহণের কথা বললে জীবনের আশঙ্কা রয়েছে, আমি বললাম যাঁর হাতে আমার জীবন, তাঁর শপথ করে বলছি, আমি মক্কা ছেড়ে যাবনা, যতক্ষণ না মসজিদে গিয়ে কুরাইশদের মাঝে প্রকাশ্যে সত্যের দাওয়াত দিচ্ছি। রাসূল (সাঃ) নীরব হয়ে গেলেন। আমি মসজিদে এলাম। কুরাইশরা তখন একত্রে বসে গুজব করছে। আমি তাদের মাঝে হাযির হয়ে যতদূর সম্ভব উচ্চকণ্ঠে সম্বোধন করে বললাম, 'কুরাইশ গোত্রের লোকেরা! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি এক আল্লাহ্‌ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহ্‌র রাসূল। আমার কথাগুলো তাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করতেই তারা ভীত-চকিত হয়ে পড়ল। একযোগে তারা লাফিয়ে উঠে বললঃ এ ধর্মত্যাগীকে ধর। তারা দৌঁড়ে এস আমাকে বেদম প্রহার শুরু করল। রাসূলের (সাঃ) চাচা আব্বাস আমাকে দেখে চিনলেন। তাদের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য তিনি আমার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে আমাকে তাদের হাত থেকে রক্ষা করলেন। একটু সুস্থ হয়ে আমি রাসূল্লাহর (সাঃ)-এর কাছে ফিরে গেলাম। আমার অবস্থা দেখে তিনি বললেন, তোমাকে ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করতে নিষেধ করেছিলাম না? বললাম ইয়া রাসূলাল্লাহ! নিজের মধ্যে এক প্রবল ইচ্ছা অনুভব করছিলাম। সে ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছি মাত্র। তিনি বললেন, তোমর গোত্রের কাছে ফিরে যাও। যা দেখলে এবং যা কিছু শুনলে, তাদেরকে অবহিত

করবে, তাদেরকে আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান জানাবে। হতে পারে আল্লাহ্ তোমার দ্বারা তাদের উপকৃত করবেন এবং তোমাকে প্রতিদান দিবেন । যখন তুমি জানবে, আমি প্রকাশ্য দাওয়াত দিচ্ছি, তখন আমার কাছে চলে আসবে। আমি ফিরে এলাম আমার গোত্রীয় লোকদের আবাসভূমিতে। আমার ভাই আনিস এল আমার সাথে সাক্ষাত করতে। সে জিজ্ঞেস করলঃ কি করলেন? বললাম, ইসলাম গ্রহণ করে বিশ্বাসী হয়েছি। তখনই দিলেন। সে বলল, আপনার দ্বীন প্রত্যাখ্যান করার ইচ্ছা আমার নেই। আমিও ইসলাম গ্রহণ করে বিশ্বাসী হলাম।

তারপর আমরা দু'ভাই একত্রে মায়ের কাছে গিয়ে তাঁকেও ইসলামের দাওয়াত দিলাম। তোমাদের দুভায়ের দ্বীনের প্রতি আমার কোন অনীহা নেই-একথা বলে তিনিও ইসলাম কবুল করার ঘোষণা দিলেন। সে দিন থেকে এ বিশ্বাসী পরিবার নিরলসভাবে গিফারী গোত্রের মানুষের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌছাতে থাকেন। এ কাজে কখনও তাঁরা হতাশ হননি কখনও মনোবল হারাননি। তাঁদের আপ্রাণ চেষ্টায় এ গোত্রের বিপুল সংখ্যক লোক ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তাঁদের মধ্যে নামাযের জামায়াত প্রতিষ্ঠিত হয় । তবে এক দল লোক বলে, আমরা আমাদের ধর্মের উপর অটল থাকব। রাসূলুল্লাহ মদীনায় এলে আমরা ইসলাম গ্রহণ করব। রাসূল (সাঃ) মদীনায় হিজরাতের পর তারাও ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। এ গিফার গোত্র সম্পর্কে রাসূল (সাঃ) বলেছেন, গিফার গোত্রকে আল্লাহ্ তাঁদের শান্তি ও নিরপত্তা দিয়েছেন। আবুযর মক্কা থেকে ফিরে এসে গোত্রীয় লোকদের সাথে মরুভূমিতে অবস্থান করতে থাকেন। একে একে বদর, উহুদ ও খন্দকের যুদ্ধ শেষ হয়। অতঃপর তিনি মদীনায় এলেন নিরবচ্ছিন্নভাবে রাসূলুল্লাহর (সাঃ) সাহচর্যে। তিনি রাসূলুল্লাহর কাছে আবেদন করলেন খিদমত দানের জন্য। তাঁর এ আবেদন মঞ্জুর হল। মদীনায় অবস্থানকালে সবটুকু সময় তিনি অতিবাহিত করতেন রাসূলুল্লাহর (সাঃ) সেবায়। এটাই ছিল তাঁর সর্বাধিক প্রিয় কাজ।

তিনি নিজেই বলতেনঃ রাসূলুল্লাহর (সাঃ) খিদমত করতাম, আর অবসর সময়ে মাসজিদে এসে বিশ্রাম নিতাম। ইব্‌নে ইসহাক বলেন ঃ আবুযর হিজরত করে মদীনায় এলে রাসূল (সাঃ) মুনজির ইব্‌নে আমর ও আবুযরের মধ্যে ভ্রাতৃ সম্পর্ক স্থাপন করে দিয়েছিলেন। তবে এ ব্যাপারে ঐতিহাসিক ওয়াকিদীর মত হল, আবুযর মীরাসের আয়াত নাযিল হওয়ার পর মদীনায় হিজরতের করে এসেছিলেন। সুতরাং ভ্রাতৃ-সম্পর্ক স্থাপনের নিয়মটি তখন রহিত হয়ে গিয়েছিল। রাসূলুল্লাহর (সাঃ)-এর সাথে তাঁর যুদ্ধে অংশ গ্রহণের বিস্তারিত তথ্য জানা যায়

না। তবে তাবুক যুদ্ধে অংশ গ্রহণের একটি ঘটনা আল্লামা ইব্‌নে হাজার আসকালানী আল-ইসাবা গ্রন্থে হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌নে মাসউদের সূত্রে বর্ণনা করেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন তাবুকের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন তখন লোকেরা বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে যুদ্ধে গমনের ব্যাপারে ইতস্ততা প্রকাশ করতে লাগল। কোন ব্যক্তিকে দেখা না গেলে সাহাবীরা বলতেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ অমুক আসেনি। জবাবে তিনি বলতেন, যদি তার উদ্দেশ্যে মহৎ হয় তাহলে শিগ্‌গীরই আল্লাহ্ তাকে তোমাদের সাথে মিলিত করবেন। অন্যথায় আল্লাহ্ তাকে তোমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে তোমাদের নিরাপদ করেছেন। একসময় আবুযরের নামটি উল্লেখ করে বলা হল, সেও পিঠটান দিয়েছে।

প্রকৃত ঘটনা হল, তাঁর উটনী ছিল মন্থরগতি । প্রথমে তিনি উটটিকে দ্রুত চালাবার চেষ্টা করেন; কিন্তু তাতে ব্যর্থ হয়ে জিনিসপত্র নামিয়ে নিজের কাঁধে উঠিয়ে পায়ে হাঁটা শুরু করেন এবং অগ্রবর্তী মানযিলে রাসূল (সাঃ)-এর সাথে মিলিত হন। এক সাহাবী দূর থেকে তাঁকে দেখে বলে উঠলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ রাস্তা দিয়ে কে একজন যেন আসছে। তিনি বললেনঃ আবুযরই হবে। লোকেরা গভীরভাবে নিরীক্ষণ করে চিনতে পারল। বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আল্লার কসম, এতো আবুযরই। তিনি বললেনঃ আল্লাহ্ আবুযরের উপর রহমত করুন। সে একাকী চলে, একাকীই মরবে, কিয়ামতের দিন একাই উঠবে। (তারীখুল ইসলামঃ আল্লামা যাহাবী ৩য় খন্ড) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) দ্বিতীয় ভবিষ্যদ্বাণীটি অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হয়েছে। হযরত আবুযর ছিলেন প্রকৃতিগতভাবেই সরল, সাদাসিদে, দুনিয়া বিরাগী ও নির্জনতা প্রিয় স্বভাবের। এ কারণে রাসূল (সাঃ) তাঁর উপাধী দিয়েছিলেন মসিরুল ইসলাম। রাসূল (সাঃ)-এর ওফাতের পর তিনি দুনিয়ার সাথে একেবারেই সম্পর্কহীন হয়ে পড়েন। প্রিয় নবীর বিচ্ছেদ তাঁর অন্তর অভ্যন্তরে যে দাহ শুরু হয়েছিল তা আর কখনও প্রশমিত হয়নি।

এ কারণে হযরত আবু বকরের (রাঃ) খিলাফতকালে রাষ্টের কোন কাজেই তিনি অংশ গ্রহণ করেননি। আবু বকালের ইন্তিকালে তাঁর ভগ্নহৃদয় আরও চুরমার হয়ে যায়। তাঁর দৃষ্টিতে তখন মদীনার সুবোভিত উদ্যানটি পত্র-পল্লববিহীন বলে প্রতিভাত হয়। তিনি মদীনা ত্যাগ করে শামে সিরিয়া প্রবাসী হন। আবু বকর ও উমারের (রাঃ) খিলাফতকাল পর্যন্ত ইসলামের সহজ ও সরল জীবন ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল। বিজয় ও ইসলামী খিলাফতের বিস্তৃতির

সাথে যখন ধন ও ঐশর্য্যের প্রাচুর্য দেখা দেয়, তখন স্বাভাবিক ভাবেই চাকচিক্য ও জৌলুস সে স্থান দখল করে নেয়। হযরত উসমান (রাঃ)-এর যুগেই বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে শান-শওতের সূচনা হয়। সাধারণ জনজীবনেও এর কিছুটা প্রভাব পড়ে। তাদের মধ্য রাসূল (সাঃ)-এর আমলের সরলতার পরিবর্তে ভোগ ও বিলাসিতার ছাপ ফুটে উঠে। আবুযর মানুষের কাছে রাসূল (সাঃ)-এর আমলের সে সহজ-সরল আড়ম্বহীন জীবন ধারার অনুসরণ আশা করতেন। তাঁর প্রত্যাশা ছিল সকেলই তাঁর মত ধন-দৌলতের প্রতি সম্পূর্ণ নিরাসক্ত হোক। তাঁরা আল্লাহ্ নির্ভর বিশ্বাস ও মতবাদে আগামীকারের জন্য কোন কিছুই আজ সঞ্চয় করা যাবে না। তিনি বিশ্বাস করতেন, অন্যকে অভুক্ত ও উলঙ্গ রেখে সম্পদ পুঞ্জিভূত করার কোন অধিকার কোন মুসলিমের নেই। হযরত মুআবিয়া (রাঃ) ও অন্যান্য আমীরগণ মনে করতেন, সম্পদশালী লোকদের উপর আল্লাহ্ যে যাকাত ফরয করেছেন তা সঠিকভাবে আদায় করার পর অতিরিক্ত অর্থ জমা করার ইখতিয়ার প্রতিটি মুসলিমের আছে। এ মতপার্থক্য বৃদ্ধি পেয়ে শেষ পর্যন্ত ঝগড়ারও রূপ লাভ করে। আবুযর অন্যন্ত নির্ভীভাবে এ সকল ব্যক্তির বিরুদ্ধের প্রতিবাদ করেন। প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদের অধিকারী হওয়ার কারণে তাদের কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতের লক্ষ্যবস্তু বলে গণ্য করতে থাকেন। আর যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য পুঞ্জিভূত করে এবং তা আল্লাহ্র পথে ব্যয় করেনা তাদের মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দাও। (আত্তওবাহ্)।

এ আয়াতের পূর্ববর্তী আয়াতে ইয়াহুদী ও নাসারাদের আলোচনা এনেছে। এ কারণে আমীর মু'আবিয়ার বক্তব্য ছিল, এ আয়াতের সম্পর্ক এ সব বিধর্মীদের সাথে। আর আবুযর মনে করেন, আয়াতটির উদ্দেশ্য মুসলিম অমুসলিম সকলেরই। দ্বিতীয়ত ঃ আবুযর আল্লাহ্র পথে ব্যয় না করার অর্থ এটাই বুঝতেন যে, সে নিজের ধন সম্পদ আল্লাহ্র পথে সম্পূর্ণরূপে বিলিয়ে দেয় না। আর আমীর মুআবিয়ার ধারণা ছিল, এটা কেবল যাকাতের সাথে সম্পৃক্ত । এ ভাবে হযরত আবুযর স্বীয় চিন্তা -দর্শন ও মত অনুযায়ী অত্যন্ত কঠোরভাবে সমালোচনা করেন। হযরত মুআবিয়া (রাঃ) মনে করেন, এ অবস্থা চলতে থাকলে দেশে যে কোন সময় বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে। তিনি খলিফা উসমান (রাঃ)-কে এ নাজুক অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করলেন এবং অনুরোধ করলেন তিনি যেন আবুযরকে মদীনায় তলব করেন। হযরত উসমান তাঁকে মদীনায় ডেকে পাঠান।

একদিন আবুযর বসে আছেন। তাঁর সামনে খলীফা উসমান (রাঃ) কা'ব (রাঃ) কে জিজ্ঞেস করলেন, যে ব্যক্তি সম্পদ পুঞ্জিভুত করে, তার যাকাত দেয় একং আল্লাহ্র পথে ব্যয় ও করে। এমন ব্যক্তি সম্পর্কে ভাল আশা পোষণ করা যায়? এ কথা শুনে আবুযর তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন। কা'বের মাথার উপর হাতের লাঠিটি তুলে ধরে বলালেন, আপনি আমার কাছে থাকুন, দুগ্ধবতী উটনী প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় আপনার দরজায় হাযির হবে। জবাবে তিনি বললেন ঃ তোমার এ দুনিয়ার কোন প্রয়োজন আমার নেই। একথা বলে তিনি চলে গেলেন। অবশেষে হযরত উসমান (রাঃ) তাঁকে অনুরোধ জানালেন, মদীনা থেকে বহুদুরে মরুভূমির মাঝখানে রাবজা নামক স্থানে গিয়ে বসবাস করার জন্য। অনেকের মতে, তিনি স্বেচ্ছায় সেখানে গিয়ে বসবাস করতে থাকেন। লোকালয় থেকে বহুদূরে নির্জন ভোগ বিলাসী জীবনকে পরিহার করে আল্লাহ্র রাসুল (সাঃ)-এর পরকাল আসক্ত জীবনকে কঠোরভাবে অনুসরণ করে আমরণ সেখানেই অবস্থান করেন।

হযরত আবুযর (রাঃ) ওফাতের কাহিনীটিও অত্যন্ত বেদনাদায়ক। হিজরী ৩১ মতান্তরে ৩২ সনে তিনি রাবজার মরুভুমিতে ইনতিকাল করেন। তাঁর সহধর্মিনী তাঁর অন্তিম কালীন অবস্থার বর্ণনা করেছেন এভাবে ঃ আবুয়রের অবস্থা যখন খুবই খারাপ হয়ে পড়ল, আমি তখন কাঁদতে শুরু করলাম। তিনি বললেন, কাঁদছ কেন? বললাম ঃ এক নির্জন মরুভূমিতে আপনি পরকালের দিকে যাত্রা করছেন। এখানে আমার ও আপনার ব্যবহৃত বস্ত্র ছাড়া অতিরিক্ত এমন বস্ত্র নেই যা দ্বারা আপনার কাফন দেয়া যেতে পারে। তিনি বললেন ঃ কান্না থামাও। তোমাকে একটি সুসংবাদ দিচ্ছি। রাসূল (সাঃ)-কে আমি বলতে শুনেছি, যে মুসলিমের দুটি অথবা তিনটি সন্তান মৃত্যবরণ করেছে, জান্নাতের আগুন থেকে বাঁচার জন্য তাই যথেষ্ট। তিনি কতিপয় লোকের সামনে তার মধ্যে আমিও ছিলাম বলেছিলেন ঃ তোমাদের মধ্যে একজন মরুভুমিতে মৃত্যুবরণ করবে এবং তার মরণ সময় মুসলিমদের একটি দল সেখানে অকস্মাৎ উপস্থিত হবে। আমি ছাড়া সে লোকগুলোর সকলেই লোকালয়ে ইন্তেকাল করেছে। এখন মাত্র আমিই বেঁচে আছি। তাই নিশ্চিতভাবে বলতে পারি, সে ব্যক্তি আমিই। আমি কসম করে বলেছি, আমি মিথ্যা বলছিনা এবং যিনি এ কথা বলেছিলেন তিনিও কোন মিথ্যা বলেননি। তুমি রাস্তার দিকে চেয়ে দেখ, গায়েবী সাহায্য অবশ্যই এসে যাচ্ছে। আমি বললাম ঃ না, তুমি যেয়ে দেখ।

সুতরাং এক দিকে দৌড় গিয়ে টিলার উপর উঠে দূরে তাকিয়ে দেখলাম, অপর দিকে ছুটে এসে তাঁর সেবা শুশ্রুষা করেছিলাম। এরূপ ছুটাছুটির ও অনুসন্ধান চলছিল। এমন সময় দূরে কিছু আরোহী দৃষ্টিগোচর হল। আমি তাদেরকে ইশারা করলে তারা দ্রুতগতিতে আমার কাছে এসে থেমে গেল। আবুযর সম্পর্কে তারা প্রশ্ন করল, ইনি কে? বললাম ঃ আবুযর। রাসূলুল্লাহর (সাঃ)-এর সাহাবী? বললাম ঃ হ্যাঁ। মা-বাবা কুরবান হোক, একথা বলে তারা আবুযরের কাছে গেলেন। আবুযর প্রথমে তাঁদেরকে রাসূল (সাঃ)-এর ভবিষ্যত বাণী শুনলেন। তারপর অসিয়ত করলেন, যদি আমার কাছে অথবা আমার স্ত্রীর কাছে থেকে কাফনের পরিমাণ কাপড় পাওয়া যায় তাহলে তা দিয়েই আমাকে কাফন দেবে। তারপর তাঁদেরকে কসম দিলেন, যে ব্যক্তি সরকারের ক্ষুদ্রতম পদেও অধিষ্ঠিত সে যেন তাঁকে কাফন না পরায়।

ঘটনাক্রমে এক আনসারী যুবক ছাড়া তাদের মধ্যে অন্য সকলেই কোন না কোন সরকারী দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল। আবুযর তাঁকেই কাফন পরাবার অনুমতি দিয়েছিলেন। এ কাফেলাটি ছিল ইয়ামেনী। তারা কুফা থেকে এসেছিল। আর তাঁদের সাথে ছিলেন প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) । এ কাফিলার সাথে তিনি ইরাক যাচ্ছিলেন। তিনিই আবুযরের জানাযার ইমামতি করেন এবং সকলে মিলে তাঁকে রাবজার মরুভূমিতে দাফন করেন।

হযরত আবুযর থেকে বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা মোট আটাশ। তন্মধ্যে বারোটি হাদীসে মুত্তফাক আলাইহি অর্থাৎ বুখারী ও মুসলিম উভয়ে বর্ণনা করেছেন। দুটি বুখারী ও সাতটি মুসলিম এককভাবে বর্ণনা করেছেন। অন্যদের তুলনায় তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা এত কম হওয়ার কারণ, তিনি সব সময় চুপচাপ থাকতেন, নির্জনতা পছন্দ করতেন এবং মানুষের সাথে মেলা মেশা কম করতেন। এ কারণে তাঁর জ্ঞানের তেমন প্রচার হয়নি। অথচ হযরত আনাস ইবনে মালিক, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) প্রমুখের ন্যায় বিদ্যান সাহাবীগণ তাঁর তারীখে দিমাশক গ্রন্থে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। হযরত আলী (রাঃ) কে আবুযর (রাঃ) জ্ঞানের পরিধি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল। তিনি বললেন, এমন জ্ঞান তিনি লাভ করেছেন যা মানুষ অর্জন করতে অক্ষম। তারপর সে জান আগুনে সেক দিয়ে পরীক্ষা করা হয়েছে, কিন্তু তা থেকে কোন

খাদ বের হয়নি। এ আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ) বলেছেন, আসমানের নীচে ও যমীনের উপরে আবুযর সর্বাধিক সত্যবাদী ব্যক্তি। হযরত উসমান (রাঃ) খিলাফতকালে আবুযর (রাঃ) একবার হজ্বে গেলেন। এক ব্যক্তি এসে বলল, উসমান (রাঃ) মিনায় অবস্থান কালে চার রাকাআত নামায আদায় করেছেন (অর্থাৎ কঠোর ভাষায় নিন্দা করে বললেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ), আবু বকর ও উমরের পিছনে আমি নামায আদায় করেছি। তাঁরা সকলে দু'রাকাআত পড়েছেন। একথা বলার পর তিনি নিজেই নামাযের ইমামতি করলেন এবং চার রাকাতআতেই আদায় করলেন। লোকেরা বলল, আপনিতো আমীরুল মুমিনীনের সমলোচনা করলেন আর এখন নিজেই চার রাকাআত আদায় করলেন। তিনি বললেন, মতভেদ খুবই খারাপ। রাসূল (সাঃ) বলেছেন, আমার পরে যে আমীর হবে, তাঁদের অপমান করবেনা। যে ব্যক্তি তাঁদের অপমান করার ইচ্ছা করবে সে ইসলামের সুদৃঢ় রজ্জু স্বীয় কাঁধ থেকে ছুড়ে ফেলবে এবং নিজের জন্য তওবার দরজা বন্ধ করে দেবে। (মুসনাদে আহমদ)।

রাসূলুল্লাহর (সাঃ) ইন্তিকালের পর যখনই পবিত্র নামটি তাঁর জিহ্বায় এস যেত, চোখ থেকে অঝোরে অশ্রুধারা প্রবাহিত হত। আহনাফ বিন কায়েস বর্ণনা করেন, আমি একবার বাইতুল মাকাদ্দাসে এক ব্যক্তিকে একের পর এক বিশেষ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করল। যখন দ্বিতীয়বার তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম আপনি কি বলতে পারেন আমি জোড় না বেজোড় নামায আদায় করেছি? তিনি বললেন, আমি না জানলে ও আল্লাহ্ নিশ্চয়ই জাঁনেন। তারপর বললেন ঃ আমার বন্ধু আবু কাসিম আমাকে বলেছেন এতটুকু বলেই তিনি কাঁদতে লাগলেন। তার পর বললেন ঃ আমার বন্ধু আবু কাসিম আমাকে বলেছেন এবার কান্নায় কণ্ঠরোধ হয়ে গেল। অবশেষে নিজেকে সম্বরণ করে বললেন ঃ আমার বন্ধু আবুল কাসিম (সাঃ) বলেছেন ঃ যে বান্দা আল্লাহ্‌কে একটি সিজদাহ করে, আল্লাহ্ তার একটি দরজা বৃদ্ধি করেন এবং তার একটি পাপ মোচন করে একটি নেকী লিপিবদ্ধ করেন। জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কে? তিনি বললেন ঃ আবুযর রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাহাবী। একদিন এক ব্যক্তি আবুযর (রাঃ) কাছে এসে সে তাঁর ঘরের চারদিকে চোখ ঘুরিয়ে দেখল। গৃহস্থালীর কোন সামগ্রী দেখতে না পেয়ে জিজ্ঞেস করল, আবুযর আপনার সামান পত্র কোথায়? তিনি বললেন, আখিরাতে আমার একটি বাড়ি আছে, আমার সব উৎকৃষ্ট সামগ্রী সেখানেই পাঠিয়ে দিয়েছি। একদিন সিরিয়ার আমীর তাঁর কাছে তিন'শ দীনার পাঠিয়ে বলেন আপনার প্রয়োজন পূর্ণ করুন। শামের আমীর কি আমার থেকে অধিকতর নীচ কোন আল্লাহ্‌র বান্দাকে পেল না? একথা বলেই তিনি দীনারগুলো ফেরত পাঠালেন।

হযরত সালমান ফারসী (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণ

হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) মূলত একজন পারসীক জরথূস্ত্রীয় ধর্মাবলম্বী ছিলেন। জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য সময় তিনি সে ধর্মে অতিবাহিত করেন। পরবর্তীতে জরথূস্ত্রীয় ধর্ম ত্যাগ করে তিনি খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেন। এ সময় তিনি ইহুদী ও খৃষ্টান পন্ডিতদের মুখে মদীনায় মহানবী (সাঃ)-এর হিজরত হবে বলে শুনতে পেয়ে সে দিকে যাত্রা শুরু করেন। পথিমধ্যে কয়েক জায়গায় বিক্রি হয়ে পরিশেষে এক ইহুদীর কৃতদাসে পরিণত হন। কৃতদাস থাকাকালে একদিন তিনি মহানবী (সাঃ)এর দরবারে উপস্থিত হয়ে তার সম্মুখে সামান্য কিছু পেশ করে বলেন এগুলো হচ্ছে 'সাদাকাহ'। রাসূল (সাঃ)-ইরশাদ করেন, আমি সাদাকাহ ভক্ষন করি না আমার জন্যে তা হারাম। এরপর অন্য একদিন উপস্থিত হয়ে কিছু পেশ করে বলেন, এগুলো 'হাদিয়া'। রাসূল (সাঃ) এগুলো গ্রহণ করেন। অনুরূপ অন্য একদিন উপস্থিত হয়ে তিনি রাসূল (সাঃ)এর পৃষ্ঠ মুবার 'মোহরে নবুওয়াত' প্রত্যক্ষ করেন ও সাথে সাথে ইসলাম গ্রহণ করেন। এসব করার কারণ, সালমান ফারসী (রাঃ) জানতে পেরেছিলেন যে, রাসূল (সাঃ) সাদাকাহ ভক্ষণ করবেন না, বরং তিনি হাদিয়া গ্রহণ করবেন এবং তাঁর পৃষ্ঠদেশে নুবুওয়াতের মোহর অংকিত থাকবে।

পরে রাসূল (সাঃ) হযরত সালমান ফারসীকে তার নিজের মুক্তির ব্যাপারে ভাববার কথা বলেন। ফলে তিমি নিজ মুক্তির ব্যাপারে চল্লিশ আওফিয়া (একশ পাঁচ তোলা) সোনার উপর চুক্তিবদ্ধ হন। চুক্তিতে শর্ত ছিল যে, তিনি তিনশটি খেজুর চারা রোপণ করবেন এবং এ চারাগুলোতে ফল আসার পর মুক্ত বলে বিবেচিত হবেন। রাসূল (সাঃ) নিজ হাতে সে চারাগুলো রোপণ করেন এবং ঐ বছরই সেগুলোতে ফল আসে। হযরত ওমর (রাঃ) কটিমাত্র চারা রোপণ করেছিলেন সেটিতে ফল আসল না। রাসূল (সাঃ) সেটিকে উপড়ে ফেলে পুনরায় নিজ হাতে তা রোপণ করেন, ফলে সেটিতেও ফল আসে। অপর দিকে গনীমতরূপে একটি স্বর্ণ-ডিম্ব পাওয়া গিয়েছিল। রাসূল (সাঃ) বললেন, এটি দিয়ে নিজেকে মুক্ত করে ফেল। সালমান ফারসী (রাঃ) বললেন, আমার প্রয়োজন চল্লিশ আওকিয়া তথা একশ পাঁচ তোলা। এ তো যথেষ্ট হবে না। রাসূল (সাঃ) এতে স্বীয় পবিত্র রসনার স্পর্শ দিয়ে বরকতের জন্য দু'আ করেন। সালমান ফারসী (রাঃ) বলেন, আমি সেটিকে পাল্লায় ওজন দিয়ে দেখলাম যে, তা চল্লিশ আওকিয়া হতে একটুখানি কমও হল না এবং বেশীও হল না। এর বিনিময়ে মুক্তি লাভ করার পর হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) নিজেকে রাসূল (সাঃ)-এর খিতমতে উৎসর্গ করেন।

হযরত ওমর (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণ

হযরত ওমর(রাঃ) মাতা পিতার সীমাহীন আদরে লালিত পালিত হন। তাঁর বয়স দশ বছর না হতেই দেশীয় নিয়ম অনুসারে তিনি ছাগল চরানোর জন্য মাঠে নিয়োজিত হন। তাঁর জ্ঞান ও বুদ্ধি দেখে উট চরানোর কাজে নিয়োগ। কাদীদ নামক স্থানে সারাদিন তিনি উট চরাতেন। তাঁর পিতা সু-শিক্ষিত ছিলেন বলে তিনি পিতার কাছেই শিক্ষা আরম্ভ করেন এবং সাথে সাথে তীর চালনা, কুস্তি এবং যুদ্ধ বিদ্যায়ও নৈপূণ্য অর্জন করেন। বিশ বছর বয়সে কুস্তিতে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। ওকাযের বার্ষিক বিখ্যাত মেলায় তিনি কুস্তি এবং প্রতিযোগীতায় অংশ গ্রহণ করতেন। শিক্ষা দীক্ষার পাশাপাশি বংশ পরিচয়ের জ্ঞান এবং উচ্চমানের বক্তৃতা দানের ক্ষমতাও অর্জন করেন। বংশগত নিয়ম অনুযায়ী তিনি সে যুগের ব্যবসায়ে মনোযোগী হন এবং একজন সু-প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী রূপে পরিগণিত হন।

তিনি শুধু নিজের ব্যবসাকেই উজ্জ্বল এবং উন্নত করেন নাই বরং মক্কাবাসীদের বাণিজ্য এবং রাজনৈতিক ব্যাপারে তাঁকে রাষ্ট্রদূত হিসাবেও কাজ করতে হত। ঝগড়া বিবাদের সময় তাঁকে বিচারক হিসাবে নিযুক্ত করা হত। তাঁর বিচার ব্যবস্থা উভয়পক্ষের জন্য গ্রহণযোগ্য হত। ত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি স্বীয় জ্ঞান, অতিজ্ঞতা এবং বুদ্ধি-বিবেকের ফলে এমন এক খ্যাতি লাভ করেন যে, লোকের মন হতে খাত্তাব এবং নোফাইলের নাম প্রায় মুছে যায়। কুস্তির ন্যায় অশ্বারোহনেও তিনি সু-নিপুণ ছিলেন। বক্তৃতা এবং কবিতাতেও তিনি খ্যাতি অর্জন করেন।

ইসলামের বিরোধিতা

তিনি ছিলেন জন্মসূত্রেই মূর্তিপূজক। জ্ঞান-বুদ্ধি এবং খ্যাতি ইত্যাদির বেলায় যেমন তিনি পিতার স্থলভিষিক্ত ছিলেন, মূতিপূজা এবং আল্লাহ্ দ্রোহিতায়ও তিনি পিতার উত্তরাধিকারী পেয়েছিলেন। মূর্তির প্রতি তাঁর আন্তরিকতা এবং শৈশব এবং যৌবন পর্যন্ত মূর্তির আরাধনায় জীবন অতিবাহিত করেন। হযরত যায়েদের একত্ববাদ এবং খাত্তাবের বিরোধিতা তিনি স্বচোখে অবলোকন করেছিলেন। তিনি জানতেন না যে, আল্লাহ্র নামে তাঁর ঘৃণা হচ্ছে, সে আল্লাহরই মুহব্বতে তাঁর অন্তকরণে পরিপূর্ণ হবে। রাসূল (সাঃ) যখন নবুয়তের পর ইসলামের আলো মক্কায় প্রজ্বলিত করেন, তখন হযরত তাঁর বয়স

মাত্র সাতাশ বছর। চাচাত ভাই যায়েদের কাছে যদিও তাওহীদের বাণী শুনেছিলেন কিন্তু রাসূল (সাঃ)-এর ইসলাম প্রচারে যায়েদের প্রতি তাঁর পিতা খাত্তাবের বিরোধিতার কথা স্বরণ হলে তাই তাওহীদের বাণী শোনা মাত্রই ইসলামের বিরোধিতার সকল প্রকার প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। প্রথমে এ বিরোধিতা কিছুটা শিথিল ছিল। কিন্তু মুসলমানদের সংখ্যা দিন দিনই বাড়তে থাকায় তিনি তা সহ্য করতে প.রলেন না তাই এর প্রতিরোধের জন্য নানান ফন্দি-ফিকির করতে লাগলেন। তিনি মামা আবু জাহলের সাথে আসন্ন পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা করে একে স্তব্ধ করার সর্ব প্রকার অত্যাচার নির্যাতন গ্রহণের প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। এসব ব্যাপারে সব চাইতে অগ্রগামী ছিল আবু জাহল। দু'জনের পরামর্শেই নবদীক্ষিত মুসমানদের উপর চলতে লাগল অমানুষিক নির্যাতন। লুবনিয়া নামক জনৈক দাসী ইতিমধ্যে ইসলাম গ্রহণ করলে হযরত ওমর এ খবর পেয়ে দাসীকে এত মারপিট করলেন যে, তাতে তিনি ক্লান্ত হয়ে পানি পান করে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়েছিলেন। ইসলাম গ্রহণকারী মুসলমান মামাভাগ্নাদ্বয়ের অত্যাচারে কিরূপ জর্জরিত হয়েছিলেন তা ভাষায় প্রকাশ্য করা একেবারেই অসম্ভব। তাদের এ বর্বরোচিত অত্যাচার দিন দিন বাড়তে থাকে তা সত্বেও মুনলামানদের সংখ্যা তত বেশী হতে থাকে। আবু জাহলের ঐকান্তিক সহযোগিতা সত্বেও ইসলামের বিরোধিতায় কাফেরবৃন্দ অকৃতকার্য হয়। এমনি এক পরিস্থিতিতে হযরত ওমর (রাঃ)-এর ঘরেই ইসলামের আলো প্রজ্বলিত হয়। তাঁর বোনও ভগ্নিপতি উভয়েই ইসলাম গ্রহণ করেন কিন্তু তিনি তা মোটেই অবগত ছিলেন না।

শত্রু হল ইসলামের পরম বন্ধু

রাসূল (সাঃ)-এর বিরুদ্ধবাদিতা মক্কার তিন ব্যক্তির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আবু লাহাব, আবু জাহল এবং ওমর । তাদের অন্তরে ইসলামের বিরোধিতার আগুন সর্বদাই জ্বলতে থাকে। গরীব মুসলমানদের উপর অত্যাচার করা, মক্কার অলিগলিতে ইসলাম এবং রাসূল (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে নানান কুৎসা প্রচার করা, মুসলমানদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা, লোভ দেখিয়ে ইসলাম হতে ফিরিয়ে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করা এবং ইসলাম গ্রহণে বাধাদান করা ইত্যাদি তাদের জীবনের অন্যতম উদ্দেশ্যে পরিগণিত হয়েছিল। তাঁদের এমন কিছু অত্যাচার বাকী ছিল না, যা তারা মুসলমানদের করে নাই। এখন তাদের আর

সে ধৈর্য নাই, অসহ্য হয়ে পড়েছে, তবুও মুসলমানে। ইসলাম পরিত্যাগের নাম পর্যন্ত নেয় না, এত অত্যাচারেও তারা কোন ক্রমেই পিছপা হয় না। অবশেষে একদিন তারা চরম মীমাংসার জন্য এক পরামর্শ সভার আহ্বান করল। সভায় কিছুক্ষণ তর্ক-বিতর্ক চলার পর সিদ্ধান্তে গৃহীত হল এবং সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আবু জাহল ঘোষণা করল- 'যে ব্যক্তি মুহাম্মদকে হত্যা করবে আমি তাকে একশত উট পুরস্কার দেব।

এ ঘোষণার সাথে সাথে হযরত ওমর তরবারী উঁচু করে বললেন ঃ আমি এ কাজটি সমাধা করব। আপনারা অপেক্ষা করুন। আমি এখনই মুহাম্মদকে হত্যা করে আসব। এ বলেই তিনি তরবারী হাতে চলে গেলেন। মুহাম্মদ থাকবেনা এবং তাঁর ইসলামও। এ কথায় অনেকেই উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন ইসলামের ভবিষ্যত নিয়ে। হযরত ওমর (রাঃ) ক্রোধের চরম সীমায় তখন উপনীত। তিনি সবেমাত্র দারে-আরকামের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন, এমন সময় নাঈম নামক জনৈক ব্যক্তি তাঁর সামনে উপস্থিত। ওমর (রাঃ) চেহারার ভার দেখে তিনি হতভম্ব হয়ে বুঝতে পারলেন আজ নিশ্চয়ই একটা দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। এভেবে তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ উমর কোন দিকে যাচ্ছেন। তিনি জবাব দিলেন, মুহাম্মদের মস্তক আনতে। একথা শোনমাত্র নাঈম রাসূল (সাঃ)-এর জীবন রক্ষার্থে ওমরের মন অন্যদিকে প্রবাহিত করার চেষ্টা করলেন। তিনি প্রশ্ন করলেন, আপনি তাঁকে হত্যা করবেন কেন? ওমর বলল ঃ আজ তার আর রেহাই নেই। নাঈম বললেন, এটা সত্যিই অবিচারে পরিণত হবে? আপনি একজন বিচারক হয়ে এ কাজ কেন করবেন? ওমর বললেনঃ এটা কোনক্রমেই অবিচার হবেনা। আমি সঠিক এবং উত্তম কাজটি করতে যাচ্ছি। নাঈম এবার বললেন নিজে অপরাধ করলে অপরের বিচার করার পূর্বে নিজের বিচার করতে হয়। উমর আশ্চার্যান্বিত হল, নাঈম এবার আসল ঘটনাটি ব্যক্ত করে বললেন, আপনার বোনের খোঁজ নিয়েছেন কি? ওমর বললেনঃ তাদের আবার খোঁজ খবরের কি এমন ঘটনা ঘটল। নাঈম বললেন, আপনার বোন এবং ভগ্নিপতি যে ইতিমধ্যে ইসলাম গ্রহণ করেছেন সে খবর কি আপনি রাখেন?

এ কথা শোনামাত্র ওমরের গায়ে যেন আগুন জ্বলে জ্ঞানশুন্য হয়ে বললেনঃ এরা কি সত্যিই মোহাম্মদের ধর্ম গ্রহণ করেছে? নাঈম বললেন ঃ হ্যাঁ। ওমর বললেন ঃ তাহলে সত্যিই আগে এদের বিচার করাই আমার উচিত।এ কথা বলেই বোনের বাড়ীর দিকে অগ্রসর হলেন। বোন ফাতিমা তখন কোরআনের আয়াত তিলাওয়াত করা অবস্থায় ছিলেন। তিনি ওমরের আগমন সংবাদ টের

পেয়ে তিলাওয়াত বন্ধ করলেন। আজ যে কিছু একটা অঘটন ঘটবে সে ধারণা ফাতিমা ওমরের রুক্ষ চেহারা দেখেই সন্দেহ হয়েছিল। ওমরের কানে সে তিলাওয়াতের শব্দও পৌঁছে ছিল। এতে নাঈমের কথায় তার বিশ্বাস সুদৃঢ় হল। তিনি প্রথমেই ভগ্নিপতি সাঈদকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আমি বিশ্বস্তসূত্রে জানতে পারলাম তোমরা নাকি উভয়েই ইসলাম গ্রহণ করেছ? এ কথা কি সত্যি? বলেই তিনি ভগ্নিপতিকে মারধর শুরু করলেন। ফাতিমা স্বামীকে রক্ষার্থে এগিয়ে এলে তিনিও মার খেতে লাগলেন।

এমতাবস্থায় ফাতিমা বললেন যত ইচ্ছা মারধর করুন কিন্তু কিছুতেই ইসলাম ত্যাগ করব না। আপনার যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। মারপিটের পালা তখনো শেষ হয়নি। ইতিমধ্যে ওমর কিছুটা ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। বোনের হৃদয়বিদারক কথায় ওমরের মনে সামান্যতম পরিবর্তন দেখা দিল। ওমর বললেন, তাহলে তোমরা কি পড়ছিলে তা আমাকে একবার শোনাও। ফাতিমা ওমরের কথা শুনে সূরা ত্বা-হার প্রথম কয়েকটি আয়াত শোনালেন। শুনে ওমর বললেন বড়ই সুন্দর কালাম তোমাদের, আর একবার আমাকে শোনাও। তিনি পুনর্বার আয়াতটি শোনালে ওমরের অন্তকরণে মুহূর্তেই ইসলামের নূরে আলোকিত হল। মুহূর্তের মধ্যে এক অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটে গেল। তিনি বললেন, তোমরা আমাকে মুহাম্মদের কাছে নিয়ে যাও আমিও ইসলাম গ্রহণ করব। মহান আল্লাহ্র ইচ্ছায় শত্রু হল বন্ধুতে পরিণত। ওমরের উক্তি শোনার সাথে সাথে আত্মগোপনকারী হযরত যায়েদ আনন্দে আত্মহারা হয়ে ওমরকে জড়িয়ে ধরে বললেন ঃ ওমর গতকালই রাসূল (সাঃ) দোয়া করেছিলেন যে, আল্লাহ্ ওমর অথবা আবু জাহলের মধ্যে যে কোন একজনকে ইসলাম গ্রহণের তওফীক দাও। আল্লাহ্ আপনার পক্ষেই রাসূল (সাঃ)-এর দোয়া কবুল করেছেন। ওমর দারে আরকামের দিকে এক ধ্যানের মাধ্যমে চলেছেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই খাত্তাবের স্থলাভিষিক্ত এবং ইসলামের ঘোরতর শত্রু মূর্তিপূজক রাসূল (সাঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হল। রাসূল (সাঃ)-এর চাচা হামযা (রাঃ) মাত্র তিন দিন হল ইসলাম গ্রহণ করেছেন। জনৈক সাহাবী ওমরের আগমন লক্ষ্য করে রাসূল (সাঃ)-এর কাছে ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় বললেনঃ ওমর আসছে। হযরত হামযা (রাঃ) বললেনঃ আসতে দাও। উদ্দেশ্য যদি মহৎ হয় তা হলে ভাল, নতুবা এখনই তার জীবন সাঙ্গ করে দেব। ওমর ভিতরে প্রবেশ করা

অবস্থায় রাসূল(সাঃ) তার গলায় রুমাল ধরে জিজ্ঞেস করলেন–এখানে এসেছ কি উদ্দেশ্যে। ভীতকণ্ঠে ওমর বললেন–ইসলাম গ্রহণ করতে। ইসলাম গ্রহণের সময় তাঁর বয়স হয়েছিল চৌত্রিশ। তিনি ছিলেন চল্লিশতম ইসলাম গ্রহণকারী। তাঁর ইসলাম গ্রহণের ফলে মুসলামানদের সাহস বেড়ে ক্বাবা ঘরে প্রকাশ্যে নামায আদায় করতে লাগলেন। যাঁরা এতদিন ইসলাম গ্রহণ করে গোপন ছিলেন এখন তাঁরা প্রকাশ্যে আল্লাহ্র ইবাদত করতে লাগলেন। হযরত ওমর (রাঃ) ইসলাম গ্রহণের ফলে ক্বাবা ঘরে কাফিরদের উপস্থিতিতে ইসলাম প্রকাশ্যে প্রবেশ করল। মুশরিকরা হযরত ওমর (রাঃ) এর এমন অভাবনীয় পরিবর্তন লক্ষ্য করে হিংসায় জ্বলতে লাগল।

ইসলাম প্রকাশকারী প্রথম সাহাবা খাব্বাব (রাঃ)-এর ঘটনা

যিনি প্রথম ইসলাম প্রকাশকারী প্রথম সাহাবা তিনি হলেন হযরত খাব্বাব (রাঃ) ইবনে আরাত তামীরী। তিনি যখন ইসলাম গ্রহণ করেন, যখন শুধুমাত্র পাঁচজন এ মহান ব্যক্তি দাওয়াত কবুল করেছিলেন। আর তাঁরা ছিলেন– (১) হযরত খাদীজা (রাঃ), (২) হযরত আবু বকর (রাঃ), (৩) হযরত আলী (রাঃ), (৪) হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা (রাঃ) (৫) হযরত আবু যর গেফারী (রাঃ)।

এ হিসাবে হযরত খাব্বাব (রাঃ) ছিলেন ষষ্ঠ মুসলমান। দুরবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁকে দাস বানিয়ে মক্কার বাজারে বিক্রি করা হয় এবং উম্মে নাসার বিন্তে স্যাব আল খোযারী তাঁকে খরিদ করে নেয়। তিনি মক্কায় কর্মকারের কাজ করতেন এবং তলোয়ার তৈরী করে বাজারে বিক্রি করে যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করতেন। তিনি যখন সত্য দ্বীনের পয়গাম শোনেন, তখন নির্দ্বিধায় তাতে তাড়া দেন এবং এভাবে তিনি প্রাথমিক পর্যায়ের মুসলমান দলের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যান। কিন্তু কাফেররা তাঁর প্রতি অবর্ণনীয় অত্যাচার-উৎপীড়ন চালায়। তাঁকে জ্বলন্ত কয়লার উপর শুইয়ে দিয়ে একজন বিরাট লোক তাঁর বুকের উপর চেপে বসত যাতে তিনি পাশ ফিরতে না পারেন। মদীনা মুনাওয়ারার দিনের ঘটনা। একবার আমীরুল মু'মেনীন হযরত ওমর (রাঃ) তাঁকে তাঁর দুঃখের কাহিনী বর্ণনা করতে বললে তিনি নিজের পিঠের উপর থেকে কাপড় সরিয়ে দেখালেন। হযরত ওমর তা দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন। তাঁর সমস্ত পিঠে জখমের দাগে সাদা হয়ে গিয়েছিল। তিনি বললেন, "হে আমীরুল মু'মেনীন! আগুন জ্বালিয়ে আমাকে তার উপর শুইয়ে দেয়া হত। শেষ পর্যন্ত আমার পিঠের চর্বি গলে গেলে সে

আগুন নিভে যেত।" এমনি অত্যাচার সইতে সইতে দীর্ঘ সময় কাটতে থাকলে তিনি এক সমসয় রাসূল (সাঃ)-এর কাছে নিবেদন করলেন; ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি আল্লাহ্‌র কাছে আমার জন্য দোয়া করেন না। এ কথা শুনে রাসূল (সাঃ)-এর চেহারা মোকাবরক লাল হয়ে যায়। তিনি বললেন, "তোমাদের পূর্বে অতীত যুগে এমনও লোক অতিবাহিত হয়েছেন, লোহার আঁচড়ার দ্বারা যাদের গোশত আঁচড়ে নেয়া হত। শুধুমাত্র হাড় ও রগ ছাড়া তাঁদের দেহে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকত না। এহেন কঠোরতায় ও তাঁদের দ্বীনের আকীদাকে দোদুল্যমান করতে পারেনি। তাঁদের মস্তকে করাত চালিয়ে দেয়া হয়েছে। চিরে মাঝখান দিয়ে দু'ভাগ করে দেয়া হয়েছে, তথাপি তাঁরা দ্বীনকে পরিত্যাগ করে।

আল্লাহ্ এ দ্বীনকে অবশ্যই সফল করবেন। তোমরা দেখবে, এক একজন অশ্বারোহী সানআ (ইয়ামান) থেকে হাযারা মওত পর্যন্ত চলে যাবে অথচ এক আল্লাহ্ ছাড়া কাউকে ভয় করবে না।" রাসূল (সাঃ)-এর অমীয় বাণী তাঁকে ধৈর্য ও সাহস দান করে এবং তিনি নীরবে ফিরে যান। তাঁর মালিক উম্মে নাসার লোহার দ্বারা তাঁর মাথায় দাগা দিত। একবার তিনি রাসূল (সাঃ)-এর কাছে নিবেদন করলেন, "ইয়া রাসূলুল্লাহ্, দোআ করুন, যাতে আল্লাহ্ তায়ালা আমাকে এ আযাব থেকে নাযযাত দান করেন।" রাসূল (সাঃ) দোআ করলেন, "আয় আল্লাহ্ খাব্বাবকে সাহায্য কর।" অতএব কিছুদিন পর উম্মে নাসার অসুস্থ হয়ে ছটফট করতে করতে মারা যায়। বিখ্যাত মুশরিক আস বিন ওয়ায়েলকে হযরত খাব্বাব কিছু ঋণ দিয়েছিলেন। যখন তিনি তার ঋণ পরিশোধের তাগাদা দিতেন, তখন সে বলত, "যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি মুহাম্মদ এর দ্বীন ত্যাগ না করবে তখন পর্যন্ত কিছুই দেব না।" তিনি বলতেন, "যে পর্যন্ত তুমি পুনর্জন্ম নিয়ে এ দুনিয়ায় ফিরে না আসবে আমি খাব্বাব মুহাম্মদ (সাঃ) -এর হাত ছাড়ব না।" "তাহলে অপেক্ষা কর, আমি যখন পুনর্জীবিত হয়ে আসব এবং আমার সন্তানও সম্পদের উপর উপর অধিকার লাভ করাব, তখনই তোমার ঋণ চুকিয়ে দেব।"

তিনি যখন মক্কা থেকে মদীনা অভিমুখে হিজরত করেন, তখন কাফেররা তাঁর যাবতীয় বিষয়-সম্পত্তি ছিনিয়ে নেয় এবং ঋণ পরিশোধ করতে অস্বীকার করে বসে। তিনি সে খাব্বাব যিনি রাসূল (সাঃ)-এর সময় সংঘটিত সমস্ত জিহাদে অংশগ্রহণ করেন। পরবর্তীতে তিনি স্থায়ীভাবে কুফায় বসতি স্থাপন

করেন। সেখানেই ৩৭ হিজরীতে কঠিন পেটের পীড়ায় আক্রান্ত হয়ে ইন্তিকাল করেন। মৃত্যুর সময় তিনি ওসীয়ত করেছিলেন যাতে তাঁকে শহরের বাইরে সমাহিত করা হয়। তিনি প্রাথমিক যুগেই কুরআন মজীদ পঁড়া শিক্ষা করেছিলেন। হযরত ওমরের ইসলাম গ্রহণ প্রসঙ্গে তাঁর আলোচনা আসে। তিনি হযরত ওমর (রাঃ) এর বোন ও ভগ্নিপতিকে কুরআন পড়াতেন। হযরত খাব্বাব অত্যন্ত কোমলহৃদয় ও বিনয়ী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ৩৩টি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

হযরত আম্মার (রাঃ) এবং তাঁর পিতা-মাতার কাহিনী

কাফেরদের হাতে অমানুষিক নির্যাতন ভোগ করেছিলেন হযরত আম্মার. (রাঃ) এবং তাঁর পিতা-মাতা। উত্তপ্ত মরুর বালি উপর শুইয়ে রেখে তাঁকে নির্যাতন করা হত। তার এ অবস্থা দেখে রাসূল (সাঃ) তাঁকে সবর করতে বলতেন এবং বেহেশতের সুসংবাদ দিয়ে তাকে সান্ত্বনা প্রদান করতেন। তাঁর পিতা হযরত ইয়াহিয়া কাফেরদের নির্যাতনে প্রাণত্যাগ করেন এবং তাঁর মাতা হযরত সুমাইয়া অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে মৃত্যুমুখে পতিত হন। এত নির্যাতন সত্ত্বেও তাঁরা তওহীদের বাণী কখনও ভুলে ইসলাম পরিত্যাগ করে নিজের সুখশান্তির কথা স্বপ্নেও চিন্তা করেননি। হযরত সুমাইয়া ছিলেন ইসলামের প্রথম শহীদ এবং হযরত আম্মার ইসলামের প্রথম মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করা। রাসূল (সাঃ) যখন মদীনায় হিজরত করতে যান তখন আম্মার একদিন রাসূল (সাঃ)-কে বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল, আপনার জন্যে একটা ছায়াযুক্ত স্থান তৈয়ার করা উচিত যেখানে আপনি রোদের সময় বিশ্রাম ও নামায আদায় করতে পারবো। এ কথার পর হযরত আম্মার (রাঃ) নিজেই কুবা নামক একটি পল্লীতে প্রথম মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। হযরত আম্মার (রাঃ) অত্যন্ত আগ্রহের সাথে জিহাদের যোগদান করতেন। একবার তিনি অত্যন্ত আনন্দের সাথে বলেন, এখন আমি বন্ধুদের সাথে এবং রাসূল (সাঃ) ও তাঁর জামাতের সাথে মিলিত হব। একথা বলার সাথে সাথে তাঁর তীব্র পিপাসা হলে পানির আবেদন জানালে এক ব্যক্তি তাঁকে দুধ এনে দিলে তিনি তা পান করে বললেন, আমি রাসূল (সাঃ)-এর কাছে শুনেছি যে, তুমি দুনিয়াতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের আগে দুধ পান করবে। এ কথাই বলেই তিনি অনন্তের পথে পা বাড়ালেন। চৌরানব্বই বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। –(উসদুল গাবা)

হযরত সোয়ায়েব (রাঃ)-এর ঘটনা

একত্রে হযরত শোয়ায়েব ও হযরত আম্মার (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তারা পৃথক পৃথক ভাবে রাসূল (সাঃ)-এর খিদমতে হাযির হলে উভয়েরই সাক্ষাত হল। দু'জনের কথাবার্তায় জানা যায় যে তাঁদের দুজনের উদ্দেশ্য একই। তাঁরা রাসূল (সাঃ)-এর সাথে সাক্ষাত করে ইসলাম গ্রহণ করতে ইচ্ছুক। তাঁরা ইসলাম গ্রহণ করার পর থেকেই তাঁদের উপর চলতে থাকে লোমহর্ষক অত্যাচার। অবশেষে বাধ্য হয়ে তাঁরা হিজরত করলে এটিও কাফেরদের মনঃপুত হল না। নবদীক্ষিত মুসলমানদের হিজরতের সংবাদ পেলেই কাফেররা কঠোরতম শাস্তি প্রদান করত। কাফেররা হযরত শোয়ায়েবের হিজরতের কথা জানতে পেরে একদল কাফের তাকে ধরতে যায়। তিনি তখন তীর বের করে বলেন, তোমরা নিশ্চয়ই অবগত যে, আমি তোমাদের মাঝে শ্রেষ্ঠ তীরন্দাজ, আমার হাতে একটি তীর থাকা পর্যন্ত তোমাদের কেউ আমার কাছে আসতে পারবে না। তীর শেষ হলে তরবারীর সাহায্য নেব এবং যতক্ষণ তরবারী হাতে থাকবে ততক্ষণ কেহই অমার কাছে আসতে পারবে না। তারপরও যদি তরবারীটি কোনক্রমে আমার হাতছাড়া হয়, তখন তোমরা আমাকে যা খুশি করতে পার। সেজন্যেই বলছি, যদি তোমরা আমার প্রাণের বিনিময়ে আমার সম্পদ গ্রহণ কর তাহলে তোমাদেরকে আমার সম্পদের সন্ধান দিতে পারি। মক্কাতে সম্পদসহ আমার দু'টি দাসীও রয়েছে। তাদেরকেও তোমরা নিয়ে যেতে পার। এ প্রস্তাবে কাফেররা সম্মত হলে হযরত সোয়ায়েব (রাঃ) নিজের সম্পদ দিয়ে নিজেকে মুক্ত করলেন। এ সম্বন্ধে আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন, "এমন লোকও রয়েছে যারা আল্লাহ্কে সন্তুষ্ট করার জন্যে নিজের প্রাণ খরিদ করে নেয় এবং আল্লাহ্ নিজের বান্দাদের উপর সর্বদাই দয়াশীল।"-(সূরা বাকারা ঃ ২০৭; দুররে মানসুর)। রাসূল (সাঃ) কুবা পল্লীতে অবস্থানকালে হযরত সোহায়েবের অবস্থা বিবেচনা করে তিনি বললেন, বড় লাভজনক ব্যবসাই করলে সোয়ায়েব। হযরত সোয়ায়েব (রাঃ) বললেন, রাসূল (সাঃ) তখন খেজুর খাচ্ছিলেন এবং আমার দিকে তাকিয়েছিলেন। তা দেখে আমিও তাঁর সাথে খেতে বসলাম। তখন রাসূল (সাঃ) বললেন, চোখের রোগে ভুগছ আবার খেজুরও খাচ্ছ? হযরত সোয়ায়েব বললেন, রাসূল (সাঃ) যে চোখটি ভাল আছে তা দিয়েই দেখে খাচ্ছি। তাঁর উত্তর শুনে রাসূল (সাঃ) একটু মুচকি হাসলেন। হযরত সোয়ায়েব খুব অমিতব্যয়ী ছিলেন। তিনি এত অধিক খরচ করতেন যে, একদিন হযরত ওমর (রাঃ) তাঁকে বলেন তুমি অনর্থক খরচ কর।

তখন তিনি উত্তর দিলেন আমি অন্যায়ভাবে কিছুই খরচ করি না। হযরত ওমর (রাঃ)-এর মৃত্যুর আগে অসিয়ত করেছিলেন হযরত সোয়ায়েবকে তাঁর জানাযার পড়াবার জন্য। -(উসদুল গাবা)

সাহাবাদের হাবশায় হিযরত

হযরত রাসূল (সাঃ)-এর সাহাবাবৃন্দের উপর কাফিরদের চরম নির্যাতন ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকলে তখন রাসূল আকরাম (সাঃ) তাদেরকে মক্কা ত্যাগ করার নির্দেশ প্রদান করলেন। সে মোতাবেক অনেক সাহাবী আফ্রিকার হাবশ (ইথিওপিয়া) দেশে হিযরত করলেন। হাবশ দেশের বাদশাহ ছিলেন খ্রীষ্টান। তিনি ন্যায়-পরায়ণতার জন্যে অত্যন্ত সু-প্রসিদ্ধ ছিলেন। সে জন্যে নবুয়তের পঞ্চম বছরে রযব মাসে এগার বারজন পুরুষ ও চার-পাঁচজন স্ত্রীলোকসহ একদল মুসলমান সর্বপ্রথম হাবশে হিযরত করেন। মক্কাবাসীরা তাঁদেরকে ফেরত আনার জন্যে চেষ্টা করে অকৃতকার্য হয়। মুসলমানরা সেখানে পৌঁছে সংবাদ পেলেন যে, মক্কাবাসীদের সকলেই মুসলমান হয়ে গেছেন। এটা ছিল নিতান্তই একটা গোযব। তাই তাঁরা মক্কায় ফিরে যাবার জন্যে রওয়ানা হলেন। কিন্তু মক্কার নিকটবর্তী হয়ে তাঁরা জানতে পারলেন যে, সংবাদটি কাফেরদের মিথ্যা প্ররোচনা। কাফিরদের ইসলাম গ্রহণ তো দুরের কথা বরং মুসলমানদের উপর অত্যাচারের মাত্রা আরও বহু গুণে বৃদ্ধি করেছে। এ সংবাদ পেয়ে সাহাবীদের কেহ কেহ পুনরায় হাবশে চলে যান আবার কেহ কেহ নিজেদের আত্মীয়-স্বজনদের সহায়তায় মক্কায় ফিরে আসেন।

এটিই ছিল মুসলমানদের প্রথম হিযরত। এরপর ৮৩ জন পুরুষ ও ১৮ জন মহিলা বিভিন্ন পথে হাবশ দেশে হিযরত করেন। এটি ছিল হাবশে মুসলমানদের দ্বিতীয় হিযরতের ঘটনা। কাফেররা যখন দেখল যে মুসলমানরা হাবশ দেশে বেশ সুখে-শান্তিতে রয়েছে তখন তাদের হিংসা আরও বেড়ে গেল। সাহাবীদের এ শান্তিপূর্ণ জীবন-যাপন তাদের সহ্য হলনা। তারা অনেক মূল্যবান উপঢোকনসহ একদল দূত বাদশাহ্ নজ্জাশীর দরবারে পাঠিয়ে দিল। তারা সেখানে পৌঁছে তারা প্রথমে নাজুসীর বিশিষ্ট পাদ্রীদেরকে হাত করবার জন্যে অনেক দ্রব্যসামগ্রী দান করল। পাদ্রীরা তাদের উপর সন্তুষ্ট হয়ে কথা দিয়েছিল যে, তারা নাজাশীর কাছে কোরাইশ দূতদের পক্ষে সুপারিশ করবে। এরপর কুরাইশ দূতগণ অতি মূল্যবান দ্রব্যাদি নিয়ে বাদশাহের দরবারে হাযির হল। দরবারে প্রবেশ করে তারা প্রথমে বাদশাহকে সিজদা করে তারপর উপঢৌকনাদি তাঁর সামনে উপস্থাপন করে নিজেদের আগমনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করল। তারা

নিবেদন করল, হে রাজাধিরাজ! আমাদের গোত্রের কিছু লোক নিজেদের সনাতন ধর্মত্যাগ করে একটা নুতন ধর্ম গ্রহণ করেছে। এ ধর্ম সম্বন্ধে আমরাও কিছু জানিনা আমাদের বাপ-দাদারাও কিছু জানেন না। এরা ধর্মান্তরিত হয়ে আপনার দেশে পালিয়ে এসে নিশ্চিন্তে বসবাস করছে। তাদের ফিরিয়ে দেয়ার জন্য মক্কার নেতারা এবং এসর যুবকদের আত্মীয়-স্বজন আমাদেরকে আপনার দরবারে পাঠিয়েছেন। দয়া করে তাদেরকে আমাদের হাতে ফিরিয়ে দিন। তাদের কথা শুনে বাদশাহ বললেন, যারা আমার আশ্রয় গ্রহণ করেছে তাদের সম্বন্ধে পূর্ণরূপে অবগত না হয়ে তাদেরকে কারো হাতে সমর্পণ করা যাবে না। তাদের বক্তব্য শুনে যদি বুঝি যে, তোমাদের অভিযোগ সত্য তাহলে তাদেরকে নিশ্চয়ই তোমাদের হাতে সমর্পণ করব। বাদশাহর এ কথা শুনে তথাকার মুসলমানরা প্রথমে একটু চিন্তিত হয়ে পড়লেন।

কিন্তু আল্লাহ্ তায়ালা তাঁদের অন্তরে শক্তি ও সাহস সঞ্চার করে দিলেন। তাঁরা ঠিক করলেন যে, তারা সত্য কথাগুলোই নির্ভিককণ্ঠে বাদশাহর দরবারে পেশ করবেন। দরবারে উপস্থিত হয়ে সাহাবীগণ প্রথমে ইসলামী রীতি অনুযায়ী সকলকে সালাম জানালেন। এতে কোন এক রাজপরিষদ আপত্তি করে প্রশ্ন করলেন, তোমরা বাদশাহ্র সম্মানসূচক সিজদা করলে না কেন? তাঁরা উত্তর দিলেন, আল্লাহ্ ছাড়া আর কাউকেও সিজদা করার জন্যে আমাদের রাসূল আমাদেরকে হুকুম দেননি। এরপর নাজ্জাশী মুললমানদের বক্তব্য শুনতে চাইলেন। তখন হযরত যাফর (রাঃ) বলতে লাগলেন, আমরা অজ্ঞান ছিলাম। সত্যিকার জ্ঞান আমাদের কিছুই ছিল না। কে আল্লাহ্, কে তাঁর রসূল, আমরা কিছুই জানতাম না। আমরা পাথরের পূজা করতাম। মৃত জীব ভক্ষণ করতাম, আত্মীয় সম্পর্ক ছিন্ন করতাম। আমরা সবলেরা দুর্বলকে হত্যা করতাম এবং নানাবিধ অনাচার, ব্যভিচারে লিপ্ত ছিলাম। আমরা যখন নৈতিক অবনতির অতল গহ্বরে তলিয়ে গেলাম তখন আল্লাহ্ আমাদের কাছে তার রাসূল পাঠালেন। তাঁকে আমরা খুব ভাল করে চিনি। তাঁর বংশাবলী, তাঁর সততা, তাঁর চরিত্র ও আমানতদারী আমাদের কাছে সুপরিচিত। তিনি আমাদের এক অদ্বিতীয় আল্লাহ্র উপাসনা করতে আদেশ দেন এবং অসৎ কাজ হতে বিরত থাকতে আমাদেরকে বলেন। তিনি আমাদের সত্য কথা বলতে, আমানত রক্ষা করতে এবং সকলের সাথে সৎভাবে থাকতে আদেশ দিয়েছেন। পাড়া-পড়শীর সাথে মিলেমিশে থাকাই তাঁর হুকুম। তিনি আমাদের নামায কায়েম করতে, রোযা রাখতে এবং দান-খয়রাত করতে আদেশ দিয়েছেন। আমাদেরকে দুর্নীতি, ব্যভিচার, এতিমের

মাল হরণ, কারো উপর মিথ্যা দোষারূপ করা থেকে বিরত থাকতে হুকুম করেছেন। আমাদের রাসূল (সাঃ) আমাদেরকে পবিত্র কোরআন শিক্ষা দিয়ে আল্লাহ্র মধুর বাণী শুনিয়ে আমাদের মধ্যে নব জীবনের সঞ্চার করেছেন। আমরা তাঁকে আল্লাহ্র সত্য রাসূল হিসেবে বিশ্বাস করেছি এবং তাঁর সমস্ত বিধি নিষেধ মাথা পেতে মেনে নিয়েছি। এজন্যেই আমাদের গোত্রের লোকেরা আমাদের মহাশত্রুতে পরিণত হয়েছে এবং আমাদের উপর অত্যন্ত নির্মমভাবে নির্যাতন করছে। তাদের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে দেশ ছেড়ে আপনার দেশে আশ্রয় নিয়েছি। আমরা আমাদের রাসূলের আদেশক্রমে এখানে এসে হাযির হয়েছি। নাজ্জাশী বললেন, তোমাদের রাসূল (সাঃ) যে কোরআন নিয়ে এসেছেন তার খানিকটা আমাকে শোনাও, হযরত যাফর 'মরিয়ম' নামক সূরার প্রথম কয়েকটি আয়াত পাঠ করলেন। তা শুনে বাদশাহ্ কাঁদলেন এবং তার পাদ্রীরাও এত বেশী পরিমাণে কাঁদলেন যে তাদের দাঁড়ি বেয়ে অশ্রু ঝরতে শুরু করল।

তারপর বাদশাহ বললেন, আল্লাহ্র কসম, যে বাণী হযরত মূসা (আঃ) নিয়ে এসেছিলেন তা একই নূর হতে এসেছে। এ কথা বলেই তিনি কোরাইশ দূতগণকে সুস্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন যে, মুসলমান মুজাহিদগণকে তাদের হাতে সমর্পণ করা হবে না। বাদশাহর কথায় তারা অত্যন্ত চিন্তিত ও অপমানিত হল। তাদের নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে বলল, আগামীকাল এমন কৌশল অবলম্বন করব, যাতে বাদশাহ এ সকল পলাতক হতভাগাদের শিকড় পর্যন্ত কেটে দিতে বাধ্য হন। এ কথায় চিন্তিত হয়ে একজন বলে উঠল না! এমন কিছু করতে যেওনা। হাজার হোক তারা আমাদের আত্মীয়-স্বজন। মুসলমান হয়েছে বলেই তাদেরকে কোনরূপ চরম শাস্তি দেয়া উচিত হবে না। কিন্তু লোকটির কথা তারা মানল না। তার, অব্যর্থ কৌশলটি খাটাবে বলে দৃঢ়সংকল্প হল। পরদিন এ তারা বাদশাহর দরবারে হাযির হয়ে অভিযোগ করল যে, মুসলমানেরা হযরত ঈসা (আঃ) সম্বন্ধে অত্যন্ত ধৃষ্টতাপূর্ণ কথা বলে থাকে এবং তাকে আল্লাহ্র পুত্র বলে স্বীকার করে না। নাজ্জাশী মুসলমানদেরকে পুনরায় দরবারে ডেকে পাঠালেন। তাঁরা উপস্থিত হলে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা হযরত ঈসা (আঃ) সম্বন্ধে কি বলে থাক?

তাঁরা উত্তর দিলেন, আমরা ঠিক তাই বলে থাকি যা হযরত ঈসা (আঃ) সম্বন্ধে আমাদের রাসূলের নিকট নাযিল হয়েছে। হযরত ঈসা (আঃ) আল্লাহ্র বান্দা এবং তাঁরই রাসূল; তিনি রুহুল্লাহ; আল্লাহ্ তাঁকে কুমারী এবং পবিত্র

মরিয়মের গর্ভে সৃষ্টি করেছেন। বাদশাহ বললেন, হযরত ঈসা ও তাঁর নিজের সম্বন্ধে এর চেয়ে বেশী বলতেন না। তাঁর কথা শুনে পাদ্রীরা একটু আপত্তি করলেন। কিন্তু তিনি তাদের কথায় কর্ণপাত না করে মুসলমানদের লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা আমার এখানে সম্পূর্ণরূপে নিরাপদ। তোমরা এখানে সুখ-শান্তিতে বসবাস করতে থাক। যারা তোমাদের নির্যাতন করেছে তাদেরকে নিশ্চয়ই ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। এ ক্ষতিপূরণর কথা তিনি দরবারে ঘোষণা করে কোরাইশদের সমস্ত উপঢৌকন ফিরিয়ে দিলেন। -(খামীস)।

নাজ্জাশীর দয়া এবং ন্যায়পরায়ণতায় মুসলমানেরা হাবশে খুব আরাম-আয়েশে বসবাস করতে লাগলেন। এরপর কোরাইশ দূতগুণ অতি লজ্জিত ও অপমানিত হয়ে দেশে ফিরে যেতে বাধ্য হল। দূতগণের ব্যর্থতায় কোরাইশগণ ক্রোধে দ্বিগুণ জ্বলে উঠল। তারা একেবারে উম্মদ হয়ে মুসলমানদের উপর নির্মম অত্যাচার চালাতে লাগল। মুসলমানরা বাইরে যেতে পারে না। কাফেররা দেখলেই তাঁদের উপর নৃশংস মারপিট চালাত। কিন্তু এ অত্যাচার নির্যাতনের পরেও যখন মুসলমানদের সংখ্যা ধীরে ধীর বেড়ে চলল তখন কোরাইশরা সভা করে ঠিক করল যে তারা মুসলমানদেরকে বয়কট করে সমস্ত যোগাযোগ, সম্বন্ধ, আদান-প্রদান, লেন-দেন, কাজ-কারবার এমনকি কথাবার্তা পর্যন্ত বন্ধ করে দেবে। শুধু মুসলমানদের সাথেই নয় বরং বনি হাশেম ও বনি মোত্তালেব গোত্রের সমস্ত অমুসলমানদের সাথেও এ বয়কট করার জন্যে তারা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হল। এ সিদ্ধান্ত শুধু কথায়ই শেষ হল না। বরং নবুয়তের সাত বছরে মহরমের এগার তারিখে একে লিপিবদ্ধ করে কাবা গৃহে টানিয়ে রাখা হল। স্থির হল যে, যে পর্যন্ত মুহাম্মদকে হত্যা করার জন্যে তাদের হাওলা করানো না হবে, সে পর্যন্ত এ প্রতিজ্ঞা পত্র বলবত থাকবে। এ বয়কটের ফলে রাসূল (সাঃ) তাঁর পরিবার, পরিজন ও সাহাবীগণ দীর্ঘ তিনটি বছর দু'পর্বতের মধ্যবর্তী এক উপত্যকায় বর্ণনাতীত কষ্ট ভোগ করেছিলেন। এ সময়ে তাঁরা কারাগারের বন্দীর তুলনায় পতিত হয়েছিলেন। বাইরের কোন লোকের সাথে দেখা সাক্ষাত করা তখন তাঁদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। কেহই তাঁদের নিকট আসত না। তাঁরা কারও নিকট যেতেন না। নিজের ঘাঁটি ছেড়ে কেহ বাইরে গেলেই আর নিস্তার ছিল না। কাফিররা তাঁকে নির্মমভাবে প্রহার করত। কিছুদিন এভাবে অতিবাহিত হবার পর মুসলমানদের অবস্থা অতি শোচনীয় হয়ে উঠল। কারণ তাঁদের সাথে যে পরিমাণ খাদ্য-সামগ্রী মওজুদ ছিল তা কিছুদিনের মধ্যেই ফুরিয়ে গেল এবং এর ফলে তাঁরা নিদারুণ অন্নকষ্টে পতিত হলেন।

খাদ্যাভাবে উপবাস আরম্ভ হল, শিশু এবং স্ত্রীলোকেরা অনবরতঃ অনশনের ফলে বেহুশ হয়ে চীৎকার করতে লাগলেন। গাছের পাতা খেতে খেতে সকলের পায়খানা ছাগল-বকরীর বিষ্ঠার ন্যায় কঠিন হয়ে গেল। শিশুদের ক্রন্দনে বয়স্কদের হুশ জ্ঞান লোপ পাবার উপক্রম হল। এমনি অমানুষিকভাবে নির্যাতীত হলেও সাহাবীগণ সকল প্রকার ত্যাগ স্বীকার করে তারা স্বধর্মে অটল রইলেন। এ সকল সাহাবীদের প্রদর্শিত ধর্ম ও আদর্শের আমানতদার বলে আমরা নিজেদের দাবি করি। কিন্তু উভয়ের মাঝে পার্থক্য যে কত তা কোনদিন চিন্তা করে দেখি কি? মনে করি যে, সাহাবীগণের মত আমরাও ধর্মের যথেষ্ট উন্নতি করে যাচ্ছি। কিন্তু তাঁদের ত্যাগের সাথে আমাদের ত্যাগের তুলনা হয় কি?

মুহাজির ও আনসার বাহিনীর সম্মিলিত প্রথম যুদ্ধাভিযান

গযওয়ায়ে বদর ছিল ইসলামের সর্বপ্রথম যুদ্ধাভিযান যাতে মহাজির ও আনসারহণ সম্মিলিতভাবে অংশগ্রহণ করেন।

(১) ২রা হিজরীর রমযান মাসে এ যুদ্ধ সংগঠিত হয় এতে তিনজন বিশিষ্ট মুসলিম যোদ্ধা ছিলেন হযরত আলী (রাঃ) হযরত হামযা (রাঃ) এবং হযরত ওবাইদা (রাঃ) ইবনে হারেস ইবনে আবদুল মত্তালিব।

(২) এ যুদ্ধে শত্রুপক্ষের সর্বপ্রথম নিহত ব্যক্তি ছিল আসওয়াদ ইবনে আসাদ। মুসলমানদের পক্ষে সর্বপ্রথম শাহাদত বরণ করেন হযরত ওমর (রাঃ) ইবনে খাত্তাবের মওলা (চুক্তিবদ্ধ গোলাম) হযরত মাহযা (রাঃ)

(৩) এ যুদ্ধে জয়ের সুসংবাদ মদীনায় প্রথম নিয়ে এসেছিলেন হযরত যায়েদ (রাঃ) ইবনে হারেসা।

এর বিস্তারিত বিবরণ এই যে, ২য় হিজরীর রমযান মাসে রাসূল (সাঃ) ৩১৩ জন মুজাহেদীন মদীনা মুনাওয়ারা থেকে রওয়ানা হয়ে যাফরানে পৌঁছেন এবং বিভিন্ন সূত্রে মক্কার কোরায়েশ বাহিনীর খবরাখবর সংগ্রহ করার পর তিনি সাহাবায়ে কিরামের উদ্দেশ্যে বলেন-"এগিয়ে চল এবং আনন্দিত হও। আল্লাহ্ তা'আলা আমার সাথে দু'দলের মধ্যে একটির ওয়াদা করেছেন। আর বলতে গেলে আমি যেন কোরায়েশদের পরাজয়ের জায়গাটি নিজের চোখে দেখতে পাচ্ছি।" কোরায়েশদের একহাজার বাহিনী পরিপূর্ণ যুদ্ধসাজে সজ্জিত হয়ে আট দিনে বদরে এসে পৌঁছেছিল। তাদের বাণিজ্যকাফেলা মুসলামানদের উপস্থিতির কথা জানতে পেরে পথবদলে মক্কায় গিয়ে পৌঁছেছিল এবং তাদের আর্তচিৎকারে

এ কাফের বাহিনী মুসলমানদেরকে চিরতরে ভূপৃষ্ঠ থেকে মুছে দেয়ার প্রত্যয় নিয়ে বদরে এসে উপনীত হয়েছিল। উভয় বাহিনী সামনাসামনি হলে যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায়।

সুতরাং ২য় হিজরীর ১৭ই রমযান জুমাবার যুদ্ধ শুরু হয়। রাসূল (সাঃ) যুদ্ধের ময়দানে এক পাশে অবস্থিত নিজের তাবুতে বসে আল্লাহ্‌র দরবারে মুনাজাত করছেন। পূর্বের রাতেও তিনি বিগলিত কণ্ঠে দোআ করেছেন ঃ "হে আল্লাহ্‌ এরা কোরায়েশ। এরা নিজেদের দম্ভ ও অহঙ্কারের নেশায় মত্ত হয়ে তোমার বান্দাদেরকে তোমার আনুগত্য ও উপসনা থেকে বিরত রাখার উদ্দেশ্য এবং তোমার রসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার মানসে এগিয়ে এসেছে। সুতরাং তুমি সে সাহায্য পাঠাও যার ওয়াদা তুমি আমার সাথে করেছ। হে আল্লাহ্‌, তুমি এদেরকে ধ্বংসের মুখে পতিত কর। আজকের দিনে মুসলমানদের এ ক'টি প্রাণ যদি শেষ হয়ে যায়, তাহলে কিয়ামত পর্যন্ত তোমার ইবাদত হয়ত আর হবে না।" অতঃপর আরব রীতি মোতাবেক একক মোকাবেলার উদ্দেশ্য মক্কার মুশরিকেদের পক্ষে তিন বীর শায়বাহ, তার ভাই উতবাহ এবং তার পুত্র ওলীদ হাঁক ছাড়তে ছাড়তে যুদ্ধ ক্ষেত্রে এসে হাযির হয়ে মুসলমানদেকে তাদের মোকাবেলা করার আমন্ত্রন জানায়। রাসূল (সা) নিজের সর্বাধিক ঘনিষ্ঠ হযরত হামযা (রাঃ), হযরত আলী (রাঃ) ও হযরত ওবায়দা (রাঃ) ইবনে হারেসকে তাদের মোকাবেলার জন্যে পাঠিয়ে দেন।

সাথে সাথেই লোহার সাথে ইস্পাতের সংঘর্ষ বেধে যায় । কিন্তু কাফের বাহিনী দেখতে পায় , তাদের মহবীরত্রয় রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে গড়িয়ে পড়ছে। অপর দিকে হযরত ওবায়দা (রাঃ) কঠিনভাবে আহত হলে মুসলমানরা তাঁকে নিজেদের শিবিরে পৌছে দেন। মুসলমানদের পক্ষে সর্বপ্রথম শাহাদত বরণ করেন হযরত ওমর (রাঃ), ইবনে খাত্তাবের মুক্ত গোলাম মাহজা' (রাঃ)। তাঁর শাহাদাত সম্পর্কে দুটি বর্ণনা রয়েছে। ঐতিহাসিক ইবনে সা'দ বলেন, যুদ্ধ ক্ষেত্রে তিনি নিজেদের ব্যূহ থেকে বেরিয়ে গিয়ে শত্রুকে চ্যালেঞ্জ্য করলে এক মুশরিক বীর আমের ইবনে হাদরামী তাঁর মোকাবেরা করতে আসে এবং তিনি বীরের মত যুদ্ধ করতে করতে তারই হাতে শাহাদত বরণ করেন।

অন্য আরেক বর্ণনা মতে হযরত মাহজা' মুশরিকদের সাথে তুমুল যুদ্ধে লিপ্ত অবস্থা হঠাৎ করে শত্রুপক্ষের একটি তীর তাঁর দেহে বিদ্ধ হলে তিনি শাহাদত বরণ করেন। তিনিই ছিলেন বদর যুদ্ধে মুসলমানদের পক্ষে প্রথম

শহীদ। তিনি ছিলেন ইয়ামনের অধিবাস। একবার তাঁদের গায়ে ডাকাত পড়ে এবং তাঁকে ধরে নিয়ে বিক্রি করে দেয়। হযরত ওমর (রাঃ) তাঁকে কিনে মুক্ত করেন তাঁকে। তিনি প্রাথমিক পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবীদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। বদরের এ যুদ্ধ শুরু হয়েছিল ভোরবেলায়, কিন্তু দুপুর পর্যন্ত যুদ্ধের রূপ সম্পূর্ণভাবে বদলে গিয়েছিল। কোরায়েশ বাহিনী নিজেদের ৭০ জন নিহত সৈনিকের লাশ ফেলে রেখে মক্কার দিকে পালিয়ে যায়।

পক্ষান্তরে মুসলমানরা তখনো বিজয়ী বেশে যুদ্ধ ক্ষেত্রে অবস্থান করছিলেন। তাঁদের হাতে ছিল বিপুল পরিমাণ গণীমতসামগ্রী এবং ৭০ জন যুদ্ধবন্দী। মুসলিম বাহিনীর মধ্যে ছয়জন মুহাজির ও আটজন আনসার শাহাদত বরণ করেন। রাসূল (সাঃ) তাঁদের দাফন-কাফন সম্পন্ন করার পর নিহত কাফেরদেরকে একটি গর্তে পুতে দেন। এ বিজয় সম্পর্কে রাসূল (সাঃ) বলেন, "সমস্ত প্রশংসা ও শুকরিয়া আল্লাহ্‌ তা'আলার জন্য। তিনি তাঁর বিজয়ের অঙ্গীকার বাস্তবায়িত করেছেন, নিজের বান্দাদের সাহায্য করেছেন এবং বিপক্ষীয় সমস্ত বাহিনীকে সে একক সত্তাই পরাজিত করেছেন।" রাসূল (সাঃ) এ মহাবিজয়ের সুসংবাদ শোনানোর জন্য হযরত যায়েদ (রাঃ) ইবনে হারেসা ও হযরত আবদুল্লাহ্‌ (রাঃ) ইবনে রাওয়াহাকে মদীনায় পাঠান। ফলে হযরত যায়েদ (রাঃ) ইব্‌নে হারেসা ছিলেন প্রথম এ সুসংবাদবহনের গৌরবের অধিকারী। বদর যুদ্ধে যে কয়জন সাহাবী প্রথম একক পর্যায়ের যুদ্ধে মোকাবেলা করেন তাঁদের মধ্যে ওবায়দা (রাঃ) ইবনে হারেস ছিলেন রাসূল (সাঃ)-এর চাচা। তিনি রাসূল (সাঃ) চাইতে ১০ বছরের বড় ছিলেন। তিনি মুসলমানদের দারে আরকামে সমবেত হওয়ার পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং পরে দারে আরকামে সমবেতদের অন্তর্ভূক্ত হয়েছিলেন। শিয়াবে আবু তালেবের কঠিন দিনগুলোতেও তিনি রাসূল (সাঃ)এর সাথে ছিলেন। হিযরতের সময় তাঁর বয়স ছিল ৬০ বছর। তাই তাঁকে বলা হত শায়খুল মুহাজেরীন অর্থাৎ সর্বাধিক বয়স্ক মুহাজির। তাঁকে রাসূল (সাঃ) যথেষ্ট মূল্যায়ন করতেন। রাসূল (সাঃ) কাফেরদের গতি-বিধির প্রতি লক্ষ্য রাখার জন্য তাঁকে প্রথম হিজরীতে ৬০/৭০ জন অশ্বারোহী দলের নেতা নিযুক্ত করেন। এ অভিযানকেই বলা হয় সারিয়্যা ইবনে হারস বা সারিয়্যাহ রাবেগ। এ অভিযানেই হযরত সা'দ ইবনে আবী ওক্কাস (রাঃ) শত্রু বাহিনীর উপর ইসলামী ইতিহাসের সর্বপ্রথম তীর নিক্ষেপ করেন। বদর যুদ্ধে আহত হয়ে মদীনা প্রত্যাবর্তনের সাথে সাফরা নামক উপত্যকায় তিনি শেষ

নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন এবং সেখানেই সমাহিত হন। কথিত আছে, তাঁকে সমাহিত করার পর থেকে দীর্ঘকাল ধরে সাফরার আবহাওয়া কস্তুরির সুগন্ধ ছড়াতে থাকে। শাহাদাতকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর।

দ্বিতীয় বাইয়াতে আকাবায় প্রথম বাইয়াত গ্রহণকারী সাহাবা

আইয়ামে তশরীকের শেষ দিন। রাতের বেলায় রাসূল (সাঃ) হযরত আব্বাস (রাঃ) সমভিব্যবহারে আকাবায় আগমন করেন। এখানে মদীনার সমস্ত সত্যপন্থী মুশরিকদের কাছ থেকে একজন বললেন- আপনি আপনার নিজের ব্যাপারে আমাদের কাছ থেকে যে অঙ্গীকার নিতে চান, নিয়ে নিন। তখন রাসূল (সাঃ) বললেন–"আমি তোমাদের কাছ থেকে এ বিষয়ে বাইয়াত (অঙ্গীকার) নিচ্ছি যে, তোমরা এমনভাবে আমার সমর্থন ও রক্ষণাবেক্ষণ করতে থাকবে, যেমন করে স্বয়ং নিজের পরিবার-পরিজনকে করে থাক।" ইমাম আহমদ (রহঃ) ও ইমাম বাইহাকী (রহঃ) লিখেছেন- রাসূল (সাঃ)-এর বক্তব্য শুনে হযরত বাররা (রাঃ) ইবনে মা'রূর তাঁর পবিত্র হাত নিজের হাতে ধরে নিবেদন করলেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র কসম, যিনি আপনাকে সত্যসহকারে পাঠিয়েছেন, আমরা আমাদের প্রাণ সন্তান-সন্তুতির মতই আপনার হিফাযত করব। ইয়া রাসূলাল্লাহ্ আপনি আমাদের কাছ থেকে বাইআত নিয়ে নিন। আমা যুদ্ধ পরীক্ষিত লোক। আর এটা আমরা পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি।"

ওয়াকেদী (রহঃ) বর্ণিত এক রেওয়ায়াতে এ প্রসঙ্গে হযরত বাররা (রাঃ) ইবনে মা'রূরের ভাষ্য উদ্ধৃত করেছেন এভাবে–"আমরা প্রচুর সমরোপকরণ ও ক্ষমতা সংরক্ষণ করে রেখেছি। অথচ আমাদের এ অবস্থা তখন ছিল যখন আমরা মূর্তি উপাসক ছিলাম। সুতরাং যখন আমাদেরকে আল্লাহ্ হিদায়াত দান করেছেন, তখন আমাদের অবস্থা কেমন হতে পারে, তা সহজেই অনুমেয়। অন্যরা হিদায়তের মর্যাদা থেকে বঞ্চিত। আর আল্লাহ্ যখন মুহাম্মদ (সাঃ)-এর মাধ্যমে আমাদের সমর্থন করেছেন।" ইবনে সা'দের বর্ণনা মতে বাইআতে আকবা উপলক্ষ্যে হযরত বাররা (রাঃ) একথাও বলেছিলেন যে, "হে আব্বাস, আমরা আপনার বক্তব্য শুনেছি। (আপনি জানতে চেয়েছেন, আমাদের মাঝে সমগ্র আবের বিরোধীতার মোকাবেলা করার ক্ষমতা আছে কি-না?) আল্লাহ্‌র কসম, আমাদের অন্তরে যদি অন্য কোন কিছু গোপন থাকত, তাহলে আমরা তা সুস্পষ্ট বলে দিতাম। আমরা তো রাসূল (সাঃ)-এর সাথে সত্যিকারভাবে আনুগত্য করার জন্য জানের বাজী লাগিয়ে দিতে চাই।"

তাঁরপর মদীনার অন্যান্য সত্যপন্থীরা রাসূল (সাঃ)-এর বাইআত গ্রহণ করেন। ইতিহাসে এ বাইয়াতকে আকাবায়ে কবীরা কিংবা লাইলাতুল আকাবা নামে অভিহিত করা হয়। তিনি দ্বিতীয় বাইআতে আকাবায় নিযুক্ত খাযরাজের ৯জন নাকীবের একজন ছিলেন যাদেরকে বনু সালামাহর নাকীব নির্বাচিত করা হয়। এ বাইআতের পর রাসূল (সাঃ) হিযরতের প্রস্তুতি নিতে থাকেন। কিন্তু হযরত বাররা ইব্‌নে মা'রূর (রাঃ) তা দেখে যেতে পারেননি। রাসূল (সাঃ) হিযরতের একমাস পূর্বে রোগাক্রান্ত হয়ে তিনি পরলোকগমন করেন। তিনি রাসূল (সাঃ)-এর উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন সাহাবীদের মধ্যে গণ্য হন। তিনি যে উৎসাহ-উদ্দীপনা ও ঈমানী বলিষ্ঠতা দ্বিতীয় বাইয়াতে আকাবায় প্রদর্শন করেছিলেন তার দৃষ্টান্ত বিরল। তাঁকে মুত্তাকী বিজ্ঞ ও ফকীহ খেতাবেও ভূষিত করা হয়।

মুসলিম পিতামাতার কোলে প্রতিপালিত প্রথম নারী

যিনি প্রথম মুসলিম পিতা মাতার কোলে প্রতিপালিত হন তিনি হলেন উম্মুল মু'মেনীন হযরত আয়েশা বিনতে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)। জন্মের পর থেকেই তিনি নিজের পিতামাতাকে মুসলমান দেখতে পান। রাসূল (সাঃ)-এর সাথে তাঁর বিয়ে হয় ইসলামের আবির্ভাবের দশম সনের শাওয়াল মাসে। তখন তাঁর বয়স ছিল ৯ বছর। ১ম হিজরী সনের শাওয়াল মাসে মদীনায়ে মুনাওয়ারায়ে তাঁর রুখসাতী হয়।

তিনি ছিলেন এমন মহিলা–

(১) যিনি সমগ্র নারীসমাজে এমন ফযীলতের অধিকারিনী যেমন খাবারের মধ্যে সারীদ (উন্নত মানের গোশত মিশ্রিত একপ্রকার খাবার)।

(২) যাঁর লেহাফের ভেতরেও রাসূল (সাঃ)-এর প্রতি ওহী নাযিল হয়। অন্য কোন আযওয়াজে মুতাহহারাতের এ গৌরব অর্জিত হয়নি।

(৩) যাঁকে স্বয়ং জিবরাঈল (আঃ) সালাম জানান এবং উত্তরে তিনি বলেন- তাঁর প্রতিও আল্লাহ্‌র শান্তি ও রহমত নাযিল হোক।

(৪) যাঁর কল্যাণে নাযিল হয় তায়াম্মুমের আয়াত।

(৫) যাঁর চাইতে অধিক কুরআনের মর্ম, হালাল-হারামের বিধি-বিধান, আরব কাব্য-কবিতা ও বংশবিদ্যায় পারদর্শী আর কেউ ছিল না।

(৬) যাঁর কাছে সাহাবায়ে কিরাম জটিল ও কঠিন সমস্যার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতেন এবং যথাযথ সমাধান লাভ করতেন।

(৭) যিনি এক দিনে সত্তর হাজার দিরহাম আল্লাহ্‌র রাহে খয়রাত করে দেন, অথচ তাঁর নিজের দেহে শোভা পায় তালি দেয়া জামা।

(৮) যিনি আবদুল্লাহ্‌ রাহে সদকা করেন। অথচ সেদিন তিনি রোযা রাখেন এবং রাতের খাবার গ্রহণের জন্য কোন তরকারিও ঘরে থাকে না।

(৯) যাঁর মুক্তি সনদ কুরআনে অবতীর্ণ হয়।

(১০) দ্বীন সম্পর্কে যে গভীর জ্ঞান তিনি অর্জন করেন, উম্মতের উদ্দেশ্যে দ্বীনের প্রচার তিনি সম্পাদন করেন। ইলমে নবুওয়তের প্রচারে যে প্রয়াস চালান, উম্মতের সন্তানদের প্রতি জ্ঞানগত যে কল্যাণ সাধন করেন তা অন্য কোন উম্মুল মু'মেনিন করতে পারেননি।

(১১) তিনিই সর্বাধিক অর্থাৎ ২২১০ খানা হাদীস বর্ণনা করেন।

(১২) তাঁর ওড়না দিয়েই বদর যুদ্ধে মুসলিম মুজাহিদ বাহিনীর পতাকা তৈরী হয় যে প্রতীকের আওতায় ফেরেশতারাও ইসলামের খিদমতে আত্মনিয়োগ করেন এবং আল্লাহ্‌ তা'আলার পক্ষ থেকে প্রাথমিক বিজয় অবতীর্ণ হয়।

(১৩) যিনি বলতেনঃ "রাসূল (সাঃ) আমার ঘরে, আমার পালার দিনে আমার বুক গলার মাঝে ওফাতপ্রাপ্ত হন এবং শেষ পর্যায়ে আমার মুখের লালা রাসূল (সাঃ)এর লালার সাথে মিশে যায়। তা এভাবে যে, (আমার ভাই আবদুর রহমান) মিসওয়াক নিয়ে হাযির হয়। রাসূল (সাঃ) ছিলেন অত্যন্ত দুর্বল। (তা দেখে তিনি মিসওয়াক করার আগ্রহ প্রকাশ করেন।) আমি সে মিসওয়াক নিজের মুখে চিবিয়ে নরম করে দিলে তিনি তা দ্বারা মিস্‌ওয়াক করেন।

(১৪) যাঁর কক্ষে রাসূল (রাঃ) ইন্তিকাল করেন।

(১৫) যার কক্ষে রাসূল (সাঃ) রওযা র্নিমিত হয়।

উম্মতের সে কল্যাণ, বরকত ও মহামর্যাদার অধিকারিনী মাতার উপর বর্ষিত হোক লাখো সালাম। তিনি ৭৪ বছর বয়সে ৫৮ হিজরী সনের ১৭ই রমযান ইন্তিকাল করেন। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) তাঁর জানাযার নামায পড়ান এবং তাঁরই ওসিয়তক্রমে তাঁকে বাকী নামক কবরস্থানে সমাহিত করা হয়। তিনি বহু বিধবা, এতীম-অনাথ ও মিসকীনের লাল-পালন করতেন। কাজেই তাঁর ইন্তিকালে গোটা মদীনায় শোকের মামত নেমে আসে এবং জানাযায় বিরাট জন-সমাগম হয়।

হযরত খাদীজা (রাঃ)-এর পর ইসলাম গ্রহণকারিণী প্রথম মহিলা

রাসূল (সাঃ)-এর চাচী এবং হযরত আব্বাস (রাঃ)-এর স্ত্রী ছিলেন সিহাবাহ বিন্‌তে হারেস (রাঃ)। তিনি উম্মুল ফযল ডাক নামেই খ্যাত ছিলেন। মহিলাদের মধ্যে সর্বপ্রথম ঈমান আনার গৌবর যে উম্মুল মু'মেনীন হযরত খাদীজা (রাঃ)-ই অর্জন করেছিলেন তাতে কারো দ্বিমত নেই। তবে বিশ্বস্ত .... অনুযায়ী তাঁর পরে সর্বপ্রথমে ইসলামের দাওয়াত গ্রহণ করেন রাসূল (সাঃ)-এর বর্ণনা শ্রদ্ধেয় চাচা হযরত আব্বাস (রাঃ)-এর স্ত্রী হযরত উম্মুল ফযল। এদিক দিয়ে তিনি আস্‌ সাবেকূন আল আউয়ালূন। (প্রাথমিক মুসলমানদের অগ্রবর্তী) দের মধ্যে একান্ত বৈশিষ্ট্যের অধিকারিনী ছিলেন। তিনি তাঁর স্বামী হযরত আব্বাস (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণের পর মদীনা অভিমুখে হিযরত করেন। তাঁর এ হিযরত মক্কা বিজয়ের সামান্য কিছুদিন পূর্বে হয়েছিল। তিনি হেলাল গোত্রের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। তাঁর সহোদরা বোন হযরত মাইমুনা (রাঃ) বিন্‌তে হারেস যেহেতু রাসূল (সাঃ)-এর পত্নীত্বের গৌরব অর্জনে সমর্থ হয়েছিলেন, তাই তিনি সেদিক দিয়ে রাসূল (সাঃ)-এর আত্মীয়তা বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। তিনি অত্যন্ত পরহিযগার ও ইবাদতগুযার মহিলা ছিলেন।

কোন কোন বর্ণনা অনুযায়ী তিনি প্রতি সোম ও বৃহস্পতিবার নিয়মিত রোযা রাখতেন। রাসূল (সাঃ) প্রায়শঃ বলতেন, উম্মুল ফযল, মাইমুনা, সালমা্া ও আসমা হল চার মুমিন, বোন। একবার হযরত উম্মুল ফযল স্বপ্নে দেখলেন, রাসূল (সাঃ)-এর দেহের একটি অংশ তাঁর ঘরে রয়েছে। তিনি রাসূল (সাঃ)এর কাছে বর্ণনা করলে তিনি বললেন, "এর ব্যাখ্যা হল যে, আল্লাহ্‌ তায়ালা আমার আদরের দুলালী ফাতিমাকে সন্তান দান করবেন আর তুমি তাকে দুধ খাওয়াবে।" সুতরাং হযরত ফাতিমা (রাঃ)-এর ঘরে হযরত হুসাইন (রাঃ)-এর জন্ম হলে তিনি তাঁকে দুধ খাওয়ান এবং তাঁর রক্ষণাবেক্ষণ করেন।

বিদায় হজ্জের সময় রাসূল (সাঃ) সাথে তার হজ্ব পালনের সৌভাগ্য অর্জিত হয়। হযরত ওসমান (রাঃ)-এর খিলাফতকালে তিনি নিজের স্বামীর সামনেই ইন্তিকাল করেন। তাঁর জানাযার নামায পড়ান হযরত ওসমান (রাঃ)। তাঁর গর্ভে হযরত আব্বাস (রাঃ)-এর ছয় পুত্র ফযল, আবদুল্লাহ্‌ (রাঃ), মুঈন (রাঃ), কুলসুম (রাঃ), আবদুর রহমান (রাঃ) ও উবাইদুল্লাহ্‌ (রাঃ) এবং এক কন্যা উম্মে হাবীবাহ (রাঃ) এর জন্ম হয়। জীবনীকারগণ লিখেছেন যে তাঁর পুত্রগণ সবাই অত্যন্ত যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। বিশেষ করে হযরত আবদুল্লাহ্‌ (রাঃ) ইমামতের অংশ বলে অভিহিত হতেন এবং বিশিষ্ট্য মুফাস্‌সির ছিলেন। হযরত উম্মুল ফযল (রাঃ) থেকে বিশটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

ঈমান আনয়নকারিণী প্রথম মহিলা

সত্যের ব্যাপারে মতানৈক্যের কোন অবকাশ নেই যে রাসূল (সাঃ)-এর প্রতি সর্বপ্রথম ঈমান আনার গৌরব অর্জন করেছিলেন তাঁর জীবনসঙ্গিনী উম্মুল মুমেনীন হযরত খাদীজা (রাঃ)। কারণ, স্ত্রীই হয়ে থাকে একজন পুরুষের জীবনসঙ্গিনী। স্বামীর জন্য স্ত্রী অপেক্ষা অন্তরঙ্গ ও সহমর্মী আর কে-ই বা হতে পারে। তিনিই হয়ে থাকেন স্বামীর প্রকাশ্য ও গোপনীয়তার রক্ষায়িত্রী। বস্তুতঃ এখানেতো সমগ্র মক্কার মাঝে সর্বাধিক সাধ্বী মহিলা উম্মুল মুমেনীন আর রাসুল (সাঃ)-এর অন্তরঙ্গতার প্রশ্ন। আবার অন্তরঙ্গতাও এমন এক সময়ের, যখন তাঁর সরতাজ (মাথার মুকুট) ভরা যৌবনের দিগুলো অতিবাহিত করছিলেন। সুদীর্ঘ দাম্পত্য জীবনে স্ত্রী তাঁর জীবন সঙ্গীর অন্তরের সুগভীর প্রদেশের প্রতি বার বার লক্ষ্য করেছেন। তাঁর আশা-আকাঙ্খা পরখ করেছেন। কিন্তু তাঁকে দিনের আলোয় কিংবা রাতের আঁধার সর্বত্রই নিষ্কলুষ ও নিষ্ঠাবান পেয়েছেন। সে কারণেই (১৮ই রমযান, ১৭ ই আগষ্ট ৬১০ ঈসায়ী) থেকে ছ'মাস পূর্বে যখন তিনি নিজের স্বামীকে ব্যাকূল অবস্থায় দেখতে পেলেন, তখন তাঁর মুখ থেকে অজান্তেই বেরিয়ে গিয়েছিল, "আল্লাহ্ আপনাকে চিন্তাগ্রস্ত করবেন না।"

উম্মুল মুমেনীন হযরত খাদীজাতুল কুবরা (রাঃ)-এর মত সতী-সাধ্বী মহিলা তাঁর স্বামী রাসূল (সাঃ)-এর সত্যভাষী মুখ থেকে 'ইকরা' -এর ঘটনা শুনবেন আর কোন সংশয়ে পতিত হবেন, তা কেমন করে হতে পারে? এটা তেমনি হতে পারে যেমন মধ্য দিনের সূর্যকে দেখেও কেহ তার অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহ করে। তাই সত্যজ্ঞ মহিলা নবুয়ত রবির প্রথমে ছটা দেখামাত্রই স্বতঃস্ফূর্তভাবে কলেমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেলেন। ওহী নাযিলের ঘটনা শুনিয়ে রাসূল (সাঃ) তাওহীদের তবলীগের সূচনা করেন আর এতে 'বিশ্বাস করলাম' এবং সত্য বলে স্বীকার করলাম' বলার গৌরব সর্বপ্রথম সে মহিলায় অর্জন করলেন, যিনি পনের বয়সের বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে রাসূল (সাঃ) কেই পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা পবিত্র ও সত্যনিষ্ঠ পেয়েছিলেন।

হযরত খাদিজা (রাঃ)

উম্মুল মু'মেনীন হযরত খাদীজা (রাঃ) ছিলেন খোওয়াইলিদ ইব্নে আসাদ ইব্নে আবদুল ওযায ইব্নে কোসাই-এর দুলালী। কোসাই পর্যন্ত গিয়ে তাঁর বংশ পরম্পরা রাসূল (ষাঃ)এর বংশ পরম্পরার সাথে মিশে যায়। তাঁর মাতা ছিলেন ফাতিমা বিন্তে যায়েদা। তিনি ছিরেন আমের ইব্নে লুওয়াই এর বংশধর। তাঁর

পিতা ছিলেন একজন সম্মানিত ব্যবসায়ী। তাঁর প্রথম বিয়ে হয়েছিল আবু হালা ইব্নে যাররাহ তামীমার সাথে। এর ঔরসে তাঁর দুই পুত্র হালা হারেসের জন্ম হয়। আবু হালাহর মৃত্যুর পর তিনি আতীক ইব্নে আয়েদ মাখযুমীর সাথে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। এ পক্ষে তাঁর হিন্দা নামে এক কন্যার জন্ম হয়। আতীকের মৃত্যুর পর তিনি তৃতীয় বিয়ের ইচ্ছা পরিহার করেন এবং গোটা মনোযোগ ব্যবসা-বাণিজ্যে সম্প্রসারণে কেন্দ্রীভূত করেন।

তিনি রাসূল (সাঃ)-এর বিশ্বস্ততা ও সরলতার প্রভাবিত হয়ে নিজের ব্যবসা-বাণিজ্য তাঁরই হাতে সমর্পণ করেন। তাতে অল্প সময়েই মালামালের প্রাচুর্য এসে যায়। তিনি রাসূল (সাঃ)এর চরিত্রমাধুর্য ও আচার-আচারণে এতই মুগ্ধ হন যে, তিনি এক সময়তাঁকে নিজের জীবনসঙ্গী নির্বাচন করে নেন এবং এভাবে উম্মুল মুমেনীনের গৌরব অর্জন করতে সমর্থ হন। রাসূল (সাঃ) তাঁর নিবেদনক্রমে নিজের পিতৃগৃহ ছেড়ে তাঁর বাড়িতে এসে স্থায়ী ভাবে বসবাস করতে শুরু করেন। এ পূণ্যগৃহ অচিরেই সমগ্র পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা আদর্শ গৃহে পরিণত হয়ে যায়। রাসূল (সাঃ) যখন প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচার আরম্ভ করেন এবং কাফেররা তাঁকে কঠিন জটিলতায় ফেলে দেয়, নানারকম দুঃখ-কষ্ট দিতে থাকে, তখন উম্মুল মুমেনীন হযরত খাদীজা (রাঃ) জান মাল দিয়ে এক অভূতপূর্ব সাহায্য-সহায়তায় এগিয়ে আসেন।

স্বয়ং রাসূল (সাঃ) -এর ইরশাদ করেছেনঃ আমি কাফেরদের কোন কথায় যখন মর্মাহত হতাম, তখন তা খাদীজা কে বলতাম। সে এমনভাবে আমাকে সাহস জোগাত যাতে আমার অন্তর প্রশান্তিতে ভরে উঠত। এমন কোন চিন্তা আমার ছিল না যা খাদীজার কথায় সহজ ও হালকা হযে যেত না। শিয়াবে আবু তালেবে রাসূল (সাঃ) উপর যে কঠিন সময় অতিবাহিত হয়, তাতে উম্মুল মুমেনীন হযরত খাদীজা (রাঃ) ও সমান অংশীদার ছিলেন। নবুওয়াত লাভের ১০ম বছর হযরত খাদীজা ইন্তিকাল করেন। রাসূল (সাঃ) মক্কায় নিকটবর্তী 'হাজুন' নামক পাহাড়ের পাদদেশে তাঁকে দাফন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর। হযরত খাদীজা (রাঃ)-এর গর্ভে রাসুল (সাঃ)-এর নিম্ন বর্ণিত সন্তান-সন্তুতির জন্ম হয়েছিল।

পুত্র ঃ (১) কামেস (রাঃ)। দু' আড়াই বছর বয়সে তিনি ইন্তিকাল করেন। (২) আবদুল্লাহ্। তাঁকে তাহের ও তইয়্যেব নামেও ডাকা হত। শৈশবেই তাঁর ইন্তিকাল হয়।

কন্যা ঃ (১) হযরত যায়নব (রাঃ), (২) হযরত রুকাইয়া (রাঃ), (৩) হযরত ফাতেমা (রাঃ) ও (৪) হযরত উম্মে কুলসূম (রাঃ)।

হযরত খাদীজা (রাঃ)-এর ইন্তেকালের পর একবার তাঁর বোন হযরত হালাহ (রাঃ) রাসূল (সাঃ)এর সাথে দেখা করতে মদীনায় আসেন এবং অনুমতি প্রার্থনার রীতি অনুযায়ী ভেতরে আসার অনুমতি প্রার্থনা করেন। তাঁর কণ্ঠস্বরও অনেকটা হযরত খাদীজার কণ্ঠস্বরের মতই ছিল। সে শব্দ শুনতেই রাসূল (সাঃ)এর হযরত খাদিজার কথা মনে পড়ে গেল। তিনি বলে উঠলেনঃ "হালাহ হবে হয়ত।" হযরত আয়িশা (রাঃ) সেখানে উপস্থিত ছিলেন। রাসূল (সাঃ)-এর এ কথা শুনে তার মনে ঈর্ষার উদয় হয়। তিনি বললেন, "আপনি (এখনো) এক বৃদ্ধার কথা মনে করেন! তার এমনি প্রশংসা করেন! তিনি তো বয়োবৃদ্ধা ছিলেন। আল্লাহ্ যে আপনাকে তার চেয়ে উত্তম বদলা দিয়েছেন।" একথা শুনে রাসূল (সাঃ) রাগান্বিত হয়ে বললেন–(১) আল্লাহ্র কসম, আল্লাহ্ তায়ালা আমাকে তার চাইতে উত্তম বদলা দেননি।

(২) মানুষ যখন আমার উপর ঈমান আনতে অস্বীকার করেছিল, তখন তিনি আমার উপর ঈমান এনেছেন।

(৩) যখন মানুষ আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, তখন তিনি আমাকে সত্য বলেছেন।

(৪) মানুষ যখন আমাকে জীবিকা থেকে বঞ্চিত করে দিয়েছে, তখন তিনি অর্থ-সম্পদের মাধ্যমে আমার সাহায্য করেছেন।

(৫) যখন আল্লাহ্ তায়ালা আমাকে অন্য স্ত্রীর মাধ্যমে সন্তান দানে বঞ্চিত রাখেন, তখন তার মাধ্যমে সন্তান দান করেন।

হযরত আয়েশা বলেন, কথাগুলো রাসূল (সাঃ) এমনভাবে বলেছিলেন যাতে আমি ভয় পেয়ে যাই এবং সেদিন থেকে মনে মনে অঙ্গীকার করে নেই যে, ভবিষ্যতে আর ককনো রাসূল (সাঃ)-এর সামনে খাদীজাকে যেনতেন বলব না। তিনি বলেন, যদিও আমি হযরত খাদীজা (রাঃ)-কে কখনো দেখিনি কিন্তু তাঁর প্রতি আমার ঈর্ষা হত। কারণ রাসূল (সাঃ) বরাবরই তাঁর কথা আলোচনা করতেন। নিম্নে হযরত খাদীজা (রাঃ) এর কয়েকটি মহত্ব বর্ণনা করা হল–(১) তিনি রাসূল (সাঃ)-এর মহান ও পবিত্র চরিত্র মাধুর্যে প্রভাবিত হয়ে নিজে তাঁর সাথে বিয়ের আবেদন করেন। (২) বিয়ের পরে তিনি মনে-প্রাণে ধন-দৌলতের মাধ্যমে রাসূল (সাঃ)-এর খিদমত করেন। (৩) তিনি নৈরাশ্যের ভীড়ে রাসূল (সাঃ)-কে সান্ত্বনা যোগান। (৪) তিনি সমস্ত নারী-পুরুষের পূর্বে ইসলামের অন্তর্ভূক্ত হন। (৫) আল্লাহ্ তায়ালা স্বয়ং তাঁকে সালাম প্রেরণ করেন। (৬) জিবরাঈল (আঃ) তাঁকে সালাম জানান। (৭) রাসূল (সাঃ) তাঁকে সর্বদা স্মরণ করেন। (৮) হযরত মারিয়া কিবতিয়ার ঘরে সন্তান-সন্ততি তাঁরই ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। (৯) তাঁর জীবদ্দশায় রাসূল (সাঃ) আর কোন বিয়ে করেননি।

তৃতীয় অধ্যায়

রাসূল (সাঃ) ও সাহাবা (রাঃ)-দের আল্লাহ্ভীতি

ইহ্কাল ও পরকালের পরিত্রাণকারী রাসূল (সাঃ)-এর আল্লাহ্ভীতির অবস্থা ছিল নিম্নরূপ। অথচ পবিত্র কালামে পাকে ইরশাদ হচ্ছেঃ 'হে নবী, আপনার জীবদ্দশায় আল্লাহ্ তায়ালা কখনও তাদের (মুসলমানদের) উপর আযাব অবতীর্ণ করবেন না।' মহান আল্লাহ্র এত বড় ওয়াদা সত্ত্বেও রাসূলে আকরাম (সাঃ)-এর অবস্থা এমন ছিল যে, ঝড়-তুফানের আশংকা দেখলেই তিনি পূর্ববর্তী ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতি সমূহের কথা স্মরণ করে অস্থির হয়ে পড়তেন। আর আমাদের অবস্থা এ যে, দিবারাত্রি পাপাচারে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বিভিন্ন প্রকার আযাব স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করা সত্ত্বেও এর দ্বারা উৎকণ্ঠিত হয়ে তওবাহ্, ইস্তেগফার নামাযে লিপ্ত হওয়ার পরিবর্তে নানা প্রকার গর্হিত বিষয় নিয়ে আমোদ প্রমোদে লিপ্ত রয়েছি।

ঝড়-তুফানের সময় রাসূল (সাঃ)-এর মানসিক অবস্থা

হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, যখন আসমানে ঘন কাল মেঘের কোন আনাগোনা দেখা যেত, তখন রাসূল (সাঃ)-এর নূরানী চেহারা মোবারকে আতংকের ভাব পরিলক্ষিত হত এবং চেহারা বিবর্ণ আকার ধারণ করত। এমতাবস্থায় তিনি একবার ঘরে প্রবেশ করতেন আবার বাইরে আসতেন এবং এ বলে পানাহ্ চাইতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ خَيْرَهَا وَ خَيْرَ مَافِيْهَا وَخَيْرَ مَا اُرْسِلَتْ بِهٖ وَ
اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَ شَرِّ مَافِيْهَا وَشَرِّ مَا اُرْسِلَتْ بِهٖ ـ

অর্থ ঃ হে আমার রব! আমি তোমার কাছে এ বায়ূর মঙ্গল কামনা করছি এবং এর মধ্যে যা কিছু রয়েছে এবং যে জন্যে তা প্রেরিত হয়েছে সবেরও মঙ্গল কামনা করছি। আর এ বায়ুর অমঙ্গল হতে এবং এর মধ্যে যা কিছু রয়েছে এবং যে উদ্দেশ্যে তা প্রেরিত হয়েছে ওসবের অমঙ্গল হতে তোমার আশ্রয় কামনা করছি। বৃষ্টি যখন আরম্ভ হত তখন রাসূল (সাঃ)-এর চেহারা মোবারক আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠত। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি আরয করতাম ঃ ইয়া

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)! আকাশে মেঘ দেখলে বৃষ্টির পূর্ব লক্ষণ মনে করে লোকেরা আনন্দিত হয় আর আপনি তখন চিন্তিত হয়ে পড়েন কেন? এর উত্তরে রাসূল (সাঃ) বলতেনঃ হে আয়েশা-এর মধ্যেই যে আল্লাহ্র আযাব ও গযব লুকায়িত নেই তার নিশ্চয়তা আছে কি? মহান আল্লাহ্ বায়ূর দ্বারাই আ'দ জাতিকে আযাব দিয়েছিলেন অথচ তখন তারা বৃষ্টির আশায় মেঘ দেখে দেখে আনন্দিত হয়েছিল।

প্রকৃতপক্ষে এ মেঘের মধ্যেই নিহিত ছিল আসমানী আযাব যা আ'দ সম্প্রদায়ের উপর নিপতিত হয়েছিল। আল্লাহ্ তায়ালা কুরআন মাজীদে বর্ণনা করেছেন ঃ আ'দ জাতি যখন মেঘরাশিকে তাদের বস্তি অভিমুখে আগমন করতে দেখল তখন তারা বলল, এ মেঘখন্ড হতে আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হবে; কিন্তু আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, এটা বর্ষণকারী মেঘ নয় বরং এর মধ্যে নিহিত রয়েছে সে ভয়াবহ আযাব, যে বিষয়ে তাড়াহুড়া করতে (অর্থাৎ নবীকে বলতে, তুমি যদি সত্যবাদী হও, তবে তুমি আমাদের উপর কোন আযাব অবতীর্ণ কর)।

এটি (মেঘরাশি) একটি প্রচন্ড ঘূর্ণিঝড়, যার মধ্যে কঠিন আযাব বিদ্যমান রয়েছে, যা তার মনিবের আদেশে প্রতিটি বস্তুকে ধ্বংস করে দিবে। বস্তুতঃ তারা (আ'দ জাতি) এ ঝড়ের দরুন এমনভাবে বিচ্ছিন্ন হল যে, তাদের ঘর বাড়ির সামান্যতম চিহ্ন ব্যতীত আর কিছুই অবশিষ্ট রইল না। আমি নাফরমানদেরকে এভাবেই শাস্তি প্রদান করি। –(বয়ানুল কুরআন)

অন্ধকারের সময় হযরত আনাস (রাঃ)-এর আমল

হযরত আনাস (রাঃ)-এর জীবদ্দশায় একবার দিনের বেলায় ভীষণ অন্ধকার দেখা দিল। আমি খিযির বিন আবদুল্লাহ হযরত আনাস (রাঃ)-এর খিদমতে হাযির হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূল (সাঃ)-এর জামানায়ও কি কখনও এরূপ অন্ধকারাচ্ছন্ন হত? তিনি বললেন, রাসূল (সাঃ)-এর জামানায় বাতাস খানিকটা জোরে প্রবাহিত হলেই, কিয়ামত এসে গেল নাকি এ ভয়ে আমরা দৌড়ে মসজিদে হাযির হতাম। হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলেন, রাসূল (সাঃ)-এর অভ্যাস ছিল, আকাশে ঝড় উঠলেই তিনি অস্থির হয়ে মসজিদে আশ্রয় নিতেন।

সূর্যগ্রহণের সময় রাসূল (সাঃ)-এর আমল

রাসূল (সাঃ)-এর জামানায় একবার সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। সাহাবী (রাঃ)-গণ ভাবলেন, এ অবস্থায় রাসূল (সাঃ) কি করেন তা দেখার উদ্দেশ্যে সমস্ত সাহাবী (রাঃ)-গণ নিজ কাজ কর্ম ছেড়ে দিয়ে এমন কি যুবক ছেলে যারা মাঠে তীর-ধনুক নিয়ে অনুশীলন করছিল তারাও রাসূল আকরাম (সাঃ)-এর দরবারে একত্রিত হল। তখন রাসূল (সাঃ) দু'রাকাত কুসুফের নামায আদায় করেছিলেন। এ নামায এত সুদীর্ঘ ছিল যে, যে সব সাহাবী (রাঃ)-গণ তাঁর সাথে নামাযে দাঁড়িয়েছিলেন তখন তাঁদের অনেকেই বেহুঁশ হয়ে পড়েছিলেন। এ নামাযে রাসূলে আকরাম (সাঃ) কাঁদতে কাঁদতে এ দোয়া করছিলেন–"হে আমার রব! আপনি কি আমার সাথে ওয়াদা করেন নি যে, আমার বর্তমানে আপনি এদেরকে (মুসলমানদেরকে) আযাব দিবেন না আর যখন তারা ইস্তেগফার করতে থাকবে তখনও তাদের প্রতি কোন আযাব প্রেরণ করবেন না।" এরপর রাসূল (সাঃ)-সাহাবী (রাঃ)-দেরকে এ বলে নসীহত করলেন, "যখনই সূর্য অথবা চন্দ্র গ্রহণ হবে তখনই তোমরা আতংকিত হয়ে নামাযে দাঁড়িয়ে যাবে। আমি আখিরাতের যে ভয়াবহ দৃশ্য দেখতে পাচ্ছি যদি তোমরা তা দেখতে তাহলে কম হেসে বেশি বেশি কাঁদতে। যখনই তোমরা এ অবস্থায় পতিত হবে, তখনই নামায পড়ে, দোয়া করবে এবং সদ্‌কা করবে।

সারারাত রাসূল (সাঃ)-এর ক্রন্দন

একবার রাসূল (সাঃ) সারারাতভর কেঁদে কেঁদে ফযর পর্যন্ত অতিবাহিত করেন এবং তিনি ফযরের নামাযে শুধু এ আয়াতটি তিলাওয়াত করছিলেন–

إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ-

অর্থ ঃ "হে আমার রব আপনি যদি এদেরকে শাস্তি দেন তাহলে দিতে পারেন, যেহেতু এরা আপনারই বান্দা আর যদি আপনি এদেরকে ক্ষমা করে দেন তাহলে তাও করতে পারেন, কেননা আপনি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" –(সূরাহ মাইদা ঃ ১১৮

আয়াতের ব্যাখ্যা ঃ হে আল্লাহ্! তুমি যখন তাদের রব, তখন তুমি যদি তাদেরকে শাস্তি দাও, তাহলে তারা তো তোমারই বান্দাহ এবং তুমি তাদের মালিক, মালিক ইচ্ছা করলে ভৃত্যের ত্রুটির জন্য তাকে শাস্তি দিতে পারেন।

আর তুমি যদি তাদেরকে ক্ষমা করে দাও তাও তোমার ইচ্ছাধীন। কারণ তুমি সর্বশক্তিমান, একচ্ছত্র প্রভু!

আমার অবস্থা কিরূপ হবে

বর্ণিত আছে–একবার ইমাম আযম আবু হানিফা (রহঃ) সারারাত্রি–

وامتازو اليوم ايها المجرمون -

এ আয়াতটি পাঠ করতে থাকেন, আর ক্রন্দন করতে থাকেন। আয়াতের সারমর্ম কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তায়ালার হুকুম হবে– "হে পাপীষ্ঠরা, তোমরা (নিষ্পাপদের থেকে) পৃথক হয়ে যাও।" –(সূরা ইয়াসীন ঃ ৫৯) এ আয়াতের তাৎপর্য হল, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তায়ালা গুনাহগারদেরকে আদেশ দিবেন, 'তোমরা দুনিয়াতে একত্রে বসবাস করেছ; কিন্তু আজ পাপীরা পূণ্যবানদের কাছে থেকে আলাদা হয়ে যাও।' এ কথা স্মরণ করেই ইমাম আযম (রহঃ) সারারাত ক্রমাগত ক্রন্দন করেছিলেন। কারণ, কিয়ামতের দিন তাঁকে পুণ্যবান না পাপী হিসাবে বিবেচনা করা হবে, তা তাঁর জানা নেই এ ভয়ে। মানুষের আমলনামায় কি লেখা আছে, তা কেউ জানে না আর কোন কাজে আল্লাহ্ তায়ালা সন্তুষ্ট হন তাও নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। আল্লাহ্ তায়ালা যে আমলের দ্বারা সন্তুষ্ট সেটাই সৎকার্যরূপে আমলনামায় লিখা হয় আর যে আমলে তিনি নারাজ হন সেগুলোই বদ আমল রূপে লিপিবদ্ধ হয়। কাজেই কোন ব্যক্তিই নিজের আমল সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারে না, সে পাপী না পূণ্যবান। মানুষের চিরাচরিত স্বভাব হল সামান্য নেক কাজে তৃপ্তি অনুভব করে এবং পাপাচারীকে হেয় প্রতিপন্ন করে ঘৃণা করে অথচ পূণ্যের প্রতীক সত্ত্বেও হযরত ইমাম আযম (রহঃ)ও নিজের আমল সম্বন্ধে নিজেকে পাপী মনে করেই আল্লাহ্‌র ভয়ে সর্বদা ভীত সন্ত্রস্ত থাকতেন। আর আমরা সামান্যতম নেক কাজ করলেই আনন্দে আত্মহারা হয়ে সমাজে প্রচারের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ি। কতভাবে নিজের মহিমা প্রকাশ করি তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

অথচ ইমাম আযম (রহঃ) এর আমলের সাথে আমাদের আমলের পার্থক্য কি তা একবার ভেবে নেক কাজের মহিমা প্রচার থেকে বিরত থাকা উচিত। আর একথাও আমাদের সদাসর্বদা স্মরণ রাখা উচিত "মৃত্যু অলিখিতভাবে হঠাৎ একদিন এ সংসার হতে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে, একথা ভেবে যে ব্যক্তি ইহ্‌কালেই পরকালের পাথেয় সংগ্রহ করতে সদাসর্বদা তৎপর থাকে সে ব্যক্তিই বুদ্ধিমান।

পরকালের একমাত্র পাথেয় সৎ আমল, যে ব্যক্তি সংগ্রহ করবে সে নাযাত পাবে। পরকালের মুক্তির এটাই প্রথম ও প্রধান শর্ত।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর আল্লাহ্‌ভীতি

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের সমস্ত ওলামায়ে কিরামের মতানুসারে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) নবীদের পর মানব জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ মানব, তিনি নিঃসন্দেহে বেহেশ্‌তী বলে আল্লাহ্‌র নবী (সাঃ) ঘোষণা করেছেন। তিনি একদল বেহেশ্‌তীর সরদার হবেন। বেহেশ্‌তের প্রতিটি দরজা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-কে আহবান করবে আর উম্মতের মধ্যে তিনিই সর্ব প্রথম বেহেশ্‌তে প্রবেশ করবেন। তিনি অধিক মর্যাদাসম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও আক্ষেপ করে বলতেন, আমি যদি ঘাস হতাম, যা জানোয়ারে খেয়ে ফেলত। আবার কোন কোন সময় বলতেন, আমি যদি কোন মুমিনের গায়ের পশম হতাম। আবার কখনো কখনো বলতেন, যদি আমি কোন গাছ হতাম যা কেটে ফেলা হত। একদিন জঙ্গলে গিয়ে একটি জানোয়ারকে বসা অবস্থায় দেখে সুদীর্ঘ এক নিশ্বাস ফেলে বললেন, হে জানোয়ার, তুমি কত সুখ-শান্তিতে রয়েছ, খাও, ছায়ায় বিচরণ কর এবং পরকালে তোমার উপর হিসাব-নিকাশের কোন বোঝাই থাকবে না, হায় আফসোস! আমি যদি তোমার মত হতাম। নিজের জীবন সম্পর্কে তাঁর ধারণা এরূপ ব্যতিত আর কিছুই ছিল না। –(তারীখুল খুলাফা)

রাবীয়া আসলামী (রাঃ) বলেন, একবার হযরত আবু বকর (রাঃ) ও আমার মধ্যে কোন বিষয়ে মত-পার্থ ক্য দেখা দিলে কিছু তর্ক-বিতর্কে তিনি কটু কথা বললে আমি আন্তরিকভাবেই ব্যথিত হলাম। তিনি সাথে সাথেই তা উপলব্ধি করে আমাকে বললেন, তুমিও আমাকে অনুরূপ কথা বলে প্রতিশোধ নাও। আমি এরূপ প্রতিশোধ নিতে অস্বীকার করলে তিনি বললেন, আমি রাসূল (সাঃ)-এর দরবারে গিয়ে নালিশ করব। আমি তাতে অস্বীকৃতি জানালাম। তিনি চলে গেলেন। এমন সময় বনী আসলামের লোকজন এসে বলল, এ কেমন কথা; তিনিই অন্যায় করে আবার তিনিই রাসূল (সাঃ)-এর কাছে নালিশ করতে গেলেন। আমি বললাম, ইনি হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)। তিনি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হলে ধ্বংস অনিবার্য।

এরপর রাসূল (সাঃ)-এর খিদমতে আমি হাযির হয়ে পুরা ঘটনা বর্ণনা করলে তিনি (সাঃ)-শুনে বললেন, তুমি ঠিকই করেছ। কখনো প্রতিশোধমূলক উত্তর দেয়া উচিত নয়। তবে এভাবে বলে দাও, হে আবু বকর! আল্লাহ্ আপনাকে ক্ষমা করুন। সত্যিকার আল্লাহ্‌ভীতি একেই বলে। একটা কথার জন্য

এত চিন্তা? হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) -এর মত লোক হঠাৎ একটি মাত্র কটু কথা বলে একজনের মনে কষ্ট দিয়েছেন। কিন্তু এ কথার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য তাঁর কত চিন্তা, কত চেষ্টা। প্রথমে প্রতিশোধ নেয়ার জন্য অনুরোধ করলেন, প্রতিশোধ না নিলে তার বিরুদ্ধে রাসূল (সাাঃ)-এর দরবারে নালিশ করবেন এ ধরনের কথা বললেন অর্থাৎ যে করেই হোক নিজের ত্রুটির জন্য আল্লাহ্‌র বান্দা থেকে ক্ষমা লাভ করতে হবে, নতুবা হাশরের দিন এ হক্কুল ইবাদের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে জবাবদিহী করতে হবে। পাঠক চিন্তা করুন আল্লাহ্‌ ভীতি আর কাকে বলে। মানুষের মনে আমরা প্রতিনিয়ত কত শত উপায়ে কষ্ট দিয়ে থাকি; কিন্তু আল্লাহ্‌র ভয়ে তাদের ক্ষমা চেয়ে মুক্তি লাভ করার চিন্তা কোন দিন আমাদের মনে উদয় হয় কি?

আল্লাহ্‌র ভয়ে ভীত হযরত ওমর (রাঃ)

কোন কোন সময় হযরত ওমর (রাঃ) একটি তৃণখন্ড হাতে নিয়ে অনুরূপ হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করলেন। আবার কখনও বলতেন, আমার যদি জন্মই না হত। এরূপ আক্ষেপ সদা সর্বদাই করতেন। একদিন তিনি এক কাজে লিপ্ত থাকা অবস্থায় জনৈক ব্যক্তি এসে নালিশ করল যে, অমুক ব্যক্তি আমার উপর জুলুম করেছে, আমি আপনার কাছে এর সুবিচার চাই। হযরত ওমর (রাঃ) লোকটিকে বেত্রাঘাত করে বললেন, এ কাজের জন্য যখন বসি তখন আস না কে? এখন অন্য কাজে ব্যস্ত রয়েছি। আর এসেই বল যে, আমি অমুকের বিচার চাই। লোকটি চলে যাওয়ার পর হযরত ওমর (রাঃ) তৎক্ষণাৎ লোক পাঠিয়ে এ ব্যক্তিকে ডেকে এনে তার হাতে চাবুক দিয়ে বললেন, আমাকে এখনই বেত্রাঘাত করে প্রতিশোধ নিয়ে আমাকে রক্ষা কর। এটাই তোমার কাছে আমার আন্তরিক আবেদন। তখন লোকটি বলল, আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে আমি আপনাকে ক্ষমা করে দিলাম। সে মুহূর্তে হযরত ওমর (রাঃ) ঘরে গিয়ে দু'রাকাআত নফল নামায আদায় করে নিজেকে সম্বোধন করে আক্ষেপ করে বলতে লাগলেন, "হে ওমর! তুমি কতই নিকৃষ্ট ছিলে, আল্লাহ্‌ তোমাকে সম্মানিত করেছেন। তুমি পথভ্রষ্ট ছিলে। আল্লাহ্‌ তোমাকে হিদায়াত করেছেন। তুমি অপদস্ত ছিলে, আল্লাহ্‌ তোমাকে ইজ্জত প্রদান করে মানুষের প্রতিনিধি করেছেন। এখন তোমার কাছে এসে একজন ফরিয়াদী তার উপর জুলুমের বিচার প্রার্থী হল আর তুমি তাকে উল্টা বেত্রাঘাত করে তাড়িয়ে দিলে? কাল কিয়ামতে তুমি কি জওয়াব দিবে? অনেকক্ষণ পর্যন্ত তিনি এভাবে নিজেকে ধিক্কার দিতে থাকলেন।" হযরত আসলাম (রাঃ) ছিলেন হযরত ওমর (রাঃ)-এর গোলাম। তিনি বলেন, আমি

একদিন হযরত ওমর (রাঃ)-এর সাথে মদীনার অদূরে হাররা নামক স্থানে যাওয়ার সময় জনমানবহীন প্রান্তরে আগুন দেখা গেলে তিনি বললেন, হয়ত কোন কাফেলা হবে, রাত্রি হয়ে যাওয়ার দরুন শহরে প্রবেশ করতে না পেরে মাঠেই তাঁবু ফেলেছে। সেখানে গিয়ে আমরা দেখতে পেলাম, একটি মেয়েলোক বসে আছে। তার আশেপাশে কয়েকটি ছেলে মেয়ে চিৎকার করে কান্নাকাটি করছে। পাশেই একটি চুলায় আগুন জ্বলছে, তার উপর পানি ভর্তি একটি পাত্র রয়েছে।

এমতাবস্থায় হযরত ওমর (রাঃ) সালাম দিয়ে কাছে আসার অনুমতি চাইলে স্ত্রী লোকটির অনুমতি পেয়ে কাছে গিয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, বাচ্চাগুলো কাঁদছে কেন। মেয়েলোকটি বলল, ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হয়ে কাঁদছে। তিনি বললেন, পাত্রের মধ্যে কি রয়েছে? সে বলল, পানি ভর্তি করে চুলার উপর রেখেছি, যেন বাচ্চাগুলো খাবারের আশায় কিছুটা শান্ত্বনা পেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। এরপর মেয়েলোকটি বলল, আমার এবং আমীরুল মুমেনীন হযরত ওমরের ফয়সালা আল্লাহ্‌র দরবারে হবে। তিনি কেন আমাদের এরূপ দুরবস্থায় কোন খবর নিচ্ছেন না? এ কথা শুনে হযরত ওমর (রাঃ) কেঁদে বললেন, আল্লাহ্‌ তোমার উপর রহমত নাযিল করুন, ওমর তোমাদের এরূপ দুর্দশার অবস্থা কি করে জানবেন? মেয়েলোকটি বসল, তিনি আমাদের প্রতিনিধি, অথচ আমাদের কোন খোঁজ খবর রাখবেন না এটা কেমন কথা? হযরত আসলাম (রাঃ) বলেন, এ কথা শুনে তিনি আমাকে সাথে করে মদীনায় ফিরে এসে বায়তুল মাল থেকে কিছু আটা, চর্বি, কয়েকটি কাপড় এবং কিছু অর্থ নিয়ে একটি বস্তায় ভর্তি করে বললেন, বস্তা ভর্তি এ বোঝা আমার পিঠে তুলে দাও। তখন আমি আরয করলাম, হে আমিরুল মুমেনীন, এ হতে পারে না বরং এ বোঝা আমি বহন করে নিয়ে যাব। তখন তিনি বললেন না, এ বোঝাটা আমাকেই বহন করতে দাও। এভাবেই দু'তিন বার অনুরোধ করার পর তিনি বললেন, কিয়ামতের দিনও কি তুমিই আমার বোঝা উঠাবে? এ বোঝাটা আমাকেই বহন করতে হবে, কেননা এ ব্যাপারে কিয়ামতের দিন আমাকেই প্রশ্ন করা হবে।

অবশেষে আমি বাধ্য হয়েই বস্তাটি খলিফার পিঠে তুলে দিলাম। তিনি খুব দ্রুতগতিতে মেয়েলোকটির কাছে পৌঁছে গেলেন। আমিও সাথে ছিলাম। সেখানে পৌঁছেই তিনি পাত্রের মধ্যে আটা, খেজুর ও কিছুটা চর্বি ঢেলে চুলায় আগুন ধরিয়ে নিজেই পাক শুরু করে দিলেন। হযরত আসলাম (রাঃ) বলেন,

আমি দেখলাম, তাঁর ঘন দাড়ির ভিতর দিয়ে ধোঁয়া বের হচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই হারীরার মত এক প্রকার খাদ্য প্রস্তুত করে তিনি নিজ হাতে খাবার পরিবেশন করে শিশুদের খাওয়ালেন। পরিতৃপ্ত হয়ে শিশুরা খাবার খেয়ে আনন্দে মশগুল হয়ে গেল। তিনি অবশিষ্ট খাবার মেয়েলোকটির হাতে তুলে দিলে মেয়েলোকটি আনন্দিত হয়ে বলল, আল্লাহ্ তায়ালা তোমাকে এর উপযুক্ত পুরস্কার প্রদান করুন। তুমিই ছিলে খলিফার উপযুক্ত; ওমরের স্থলে তোমাকেই খলীফা করা উচিত ছিল। হযরত ওমর (রাঃ) তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, তুমি যখন ওমরের কাছে যাবে তখন সেখানে আমাকেও দেখতে পাবে। হযরত ওমর (রাঃ) ফযরের নামাযে অধিকাংশ সময় সূরা কাহফ ও সূরা ত্বা-হা প্রভৃতি সুদীর্ঘ সূরা পাঠ করে ক্রন্দন করতেন। কান্নার শব্দ অনেক দূর পর্যন্ত পৌঁছে যেত। একবার ফযরের নামাযে সূরা ইউসুফ পড়া অবস্থায়। যখন انما اشكو بثى وحزنى পর্যন্ত পৌঁছলেন তখন এত বেশি কাঁদলেন যে, শ্বাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। তাহাজ্জুদের নামাযে অনেক সময় ক্রন্দন করতে করতে পড়ে যেয়ে বেহুশ হয়ে যেতেন। কি অদ্ভুত আল্লাহ্র ভয়। যাঁর ভয়ে পৃথিবী কম্পিত হত, যাঁর নামে বড় বড় রাজা-বাদশারা পর্যন্ত ভয়ে কম্পিত থাকত, চৌদ্দ শত বছর পর আজও যাঁর খ্যাতি পৃথিবীর ইতিহাসে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে রয়েছে, সে পূণ্যবান মহাপুরুষ হযরত ওমর (রাঃ)-এর অন্তরও আল্লাহ্র ভয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেত। এ যুগে কোন বাদশাহ বা আমীর, প্রধানমন্ত্রী, প্রেসিডেন্ট, প্রজা-সাধারণের সাথে এরূপ ব্যবহার করে থাকে কি? শাসক আর প্রজার দূরত্ব যে কত আজ তার ব্যবধান বর্ণনা করা সত্যিই দুস্কর।

হযরত আবদুল্লাহ ইব্নে আব্বাস (রাঃ)-এর উপদেশ

হযরত ওহাব ইব্নে মুনাব্বেহ (রাঃ) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্নে আব্বাস (রাঃ)-এর দৃষ্টিশক্তি বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার পর তিনি আমাকে নিয়ে কা'বা শরীফ পৌঁছলেন। সেখানে কিছু লোকের ঝগড়া-বিবাদ শুনে তিনি আমাকে এ ঝগড়ার স্থানে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলে আমি তাই করলাম। সেখানে তিনি পৌঁছে সবাইকে সালাম করলেন, লোকেরা তাঁকে বসার আবেদন করলে, তিনি অস্বীকার করে বললেন, তোমরা কি জান না যে, যারা আল্লাহ্র খাস বান্দা, আল্লাহ্র ভয় তাদেরকে সব সময় চুপ করে রাখে। অথচ তাঁরা দুর্বলও নয় এবং বোকাও নন। বরং তারা ভাষা জ্ঞানে পন্ডিত, বাক্ শক্তিসম্পন্ন বুদ্ধিমান। কিন্তু

আল্লাহ্র শ্রেষ্ঠত্বের কথা ভেবে আজ তাদের বুদ্ধি নিস্তব্ধ, ভগ্নহৃদয় এবং কণ্ঠ নীরব। এ অবস্থা যখন তাদের উপর স্থায়ী হয়ে যায়, তখন এর উসিলায় তারা নেক কাজে দ্রুত অগ্রসর হয়ে থাকেন। আজ তোমরা এসব নেক বান্দা হতে কত দূরে সরে পড়েছ? হযরত ওহাব (রাঃ) বলেন এরপর থেকে আমি দু ব্যক্তিকেও একত্র হতে দেখিনি। হযরত ইব্নে আব্বাস (রাঃ) আল্লাহ্র ভয়ে এত বেশি ক্রন্দন করতেন যে, অত্যধিক পরিমাণে অশ্রু প্রবাহিত হওয়ার দরুন চেহারা মোবারকে দু'টি নালীর মত ঘা হয়ে গিয়েছিল। উপরের বর্ণনায় হযরত ইব্নে আব্বাস (রাঃ) নেক কাজসমূহ সম্পাদন করার একটা সহজ পন্থা বলে দিয়েছেন তাহল আল্লাহ্র শক্তি ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করবে এর দ্বারা প্রত্যেকটি নেক্ আমল করা সহজ হবে এবং সেগুলো অবশ্যই ইখলাসে পরিপূর্ণ হবে। দিবারাত্রি চবিবশ ঘন্টার মধ্যে সামান্য সময় যদি আমরা এ কাজের জন্য ব্যয় করি তাহলে তা কি খুব কঠিন বলে মনে হবে। সময় খুব দ্রুত চলে যাচ্ছে একথা আমরা কি কখনো চিন্তা করি।

তাঁবুক অভিযানকালে সামুদের বস্তি অতিক্রম

ইসলামের ইতিহাসে বিখ্যাত তাবুকের যুদ্ধ। এটাই ছিল রাসূল (সাঃ)-এর জীবনের সর্ব শেষ জিহাদ। রাসূল আকরাম (সাঃ) সংবাদ পেলেন যে, রোমের বাদশাহ হেরাক্লিয়াস বিরাট সৈন্যদল নিয়ে সিরিয়ার পথে আক্রমণের উদ্দেশ্যে মদীনার দিকে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। এ সংবাদ পেয়ে নবম হিজরী ৫ই রযব রাসূল (সাঃ) প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিশালী শত্রুর সাথে মোকাবিলা করার জন্য মদীনা হতে রওয়ানা হলেন। পুর্বাহ্নেই সে জন্যে রাসূল (সাঃ) সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা দিয়েছিলেন। "রোমের বাদশাহর সাথে যুদ্ধ করতে হলে তোমরা উত্তমরূপে প্রস্তুতি নাও।" তিনি নিজেও যুদ্ধের জন্য চাঁদা সংগ্রহ করতে শুরু করলেন। এ জিহাদেই হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) তাঁর সমুদয় সম্পদ আল্লাহ্র নামে উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁকে যখন রাসূল (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, "ঘরে কি রেখে এসেছ? উত্তরে তিনি বললেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সাঃ)-কে রেখে এসেছি।

হযরত ওমর (রাঃ) তাঁর সম্পদের অর্ধাংশ এ জিহাদের জন্য দান করেন এবং হযরত ওসমান (রাঃ) এক তৃতীয়াংশ সৈন্যের যাবতীয় ব্যয় ভার বহন করেন। এরূপে প্রত্যেক সাহাবী (রাঃ)-ই এ যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহের জন্য দান করে শরীক হয়েছিলেন। সে সময় মুসলমানগণ নিদারুন দারিদ্রতার মধ্যে জীবন-যাপন করছিলেন। সময়টা ছিল ভীষণ দুর্ভিক্ষের। তাই দশ দশ ব্যক্তি

পর্যায়ক্রমে এক একটি উটে আরোহণ করতেন। এ জিহাদকে এ জন্যই ইতিহাসে "জাইশুল উস্রাহ্ বা অভাব গ্রস্ত সৈন্যদল" নামে অভিহিত করা হয়েছে। এ জিহাদের সময়টা ছিল ত্যাগ, তিতিক্ষা ও সংকটাপন্নের কারণ। যুদ্ধক্ষেত্র ছিল সুদূর তাবুকে এবং সময় ছিল অত্যাধিক গরম কাল। তদুপরি তখন মদীনায় খেজুর পাকার ছিল মওসুম। আর তখন ছিল মদীনাবাসীদের খেজুর তূলার মওসুম আর এ খেজুরের উপরই নির্ভরশীল ছিল তাঁরা। এ সময়ে খেজুর ঘরে তুলতে না পারলে তা বিনষ্ট হওয়ার আশংকা ছিল। ফলে বছরের খোরাকী হারিয়ে মদীনাবাসী দারুন কষ্টে নিপতিত হওয়ার আশংকাও ছিল অধিক। মুসলমানদের জন্য এ সময়ে জিহাদে যাওয়া এক কঠিন পরীক্ষার সমতুল্য ছিল।

একদিকে আল্লাহ্র ভয় অপরদিকে রাসূল (সাঃ)-এর আদেশ এবং অপর দিকে সারা বছরের খোরাকী হারাবার আশংকা। এত সব বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও তাঁরা আল্লাহ্র ভয়ে প্রকম্পিত হয়ে আল্লাহ্র রাস্তায় বের হয়ে পড়েছিলেন। শিশু, স্ত্রীলোক, বৃদ্ধ ও মুনাফিক ব্যতীত সমস্ত মুসলমানই এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। যাঁরা অপরিহার্য কারণ বশতঃ এবং যানবাহনের জন্য উট সংগ্রহ করতে না পারার দরুন এ জিহাদের অংশগ্রহণ করতে পারেননি আপেক্ষে তাঁরা ক্রন্দনরত অবস্থায় রয়ে গিয়েছিলেন। রাসূল (সাঃ) সাহাবী (রাঃ)-দের নিয়ে তাবুকের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যখন সামূদ জাতির বস্তিতে পৌছলেন, তখন তিনি চাঁদর দিয়ে নিজের মুখ ঢেকে উট দ্রুত চালাতে লাগলেন এবং সাহাবী (রাঃ)-দেরকে বললেন, যালিমদের এ বস্তিটা ক্রন্দনরত অবস্থায় তাড়াতাড়ি অতিক্রম কর। এ বস্তিতে সামূদ জাতির উপর আল্লাহ্র যে আযাব এসেছিল আল্লাহ্ না করুন, সে আযাব যেন তোমাদের উপরও আপতিত না হয়, সেজন্য আল্লাহ্কে ভয় করতে থাক।

আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ) একটি অভিশপ্ত স্থান অতিক্রম করার সময় আল্লাহ্র গযবের ভয়ে নিজের চেহারা চাঁদর দিয়ে ঢেকে নিজ সাহাবী (রাঃ)-দেরকে আল্লাহ্র ভয়ে ক্রন্দন করতে করতে এ স্থানটি অতিক্রম করতে আদেশ করলেন। আমাদের উপর কোনরূপ বালা-মুসিবত বা অপদ-বিপদ, যেমন- ভূমিকম্প, বন্যা, ঝড় ইত্যাদি উপস্থিত হলে আমরা আনন্দ-স্ফূর্তি করার জন্য বন্যা কবলিত ও ভূমিকম্প বিধ্বস্ত স্থানসমূহ পরিদর্শন করতে যাই, আর কান্নাকাটি পরিবর্তে ভয় বা বিষাদের কোন কল্পনাও আমাদের মনে তখন উদয় হয়না।

তাঁবুকের যুদ্ধে হযরত কা'ব (রাঃ)-এর অনুপস্থিতি ও তওবা

তাবুক যুদ্ধ যখন শুরু হয়েছিল তখন সময়টা ছিল অত্যাধিক গরমের। তাবুকের যুদ্ধে অংশগ্রহণে অপারগ লোক ব্যতীত প্রায় ৮০ জনের বেশি আনসার মুনাফিক এবং প্রায় সমান সংখ্যক বেদুইন তাছাড়া মদীনার বাইরের বড় এক দলের লোকও এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি। তাই লোকেরা অন্য লোকদেরকেও এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ হতে বিরত রেখেছিল এবং এ বলে প্রচার করেছিল যে, এ প্রচন্ড গরমে এ যুদ্ধে বের হবে না," এরূপ প্রচারণাই প্রচার করে লোকদেরকে বাধা প্রদান করেছিল। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, "জাহান্নামের আগুন এর চেয়েও তীব্র থেকে তীব্রতর এবং গরম।" তাছাড়া আরও তিন জন খাঁটি মুসলমানও এ জিহাদে অংশগ্রহণ করেননি। তাঁরা কা'ব ইব্নে মালিক (রাঃ), হেলাল ইব্নে উমাইয়া (রাঃ) এবং মুরারাহ ইব্নে রাবী (রাঃ)। এ তিনজন সাহাবী (রাঃ) মোনাফেকী কিংবা কোন সঙ্গত কারণে নয় বরং আর্থিক স্বচ্ছলতাই এ জিহাদে শরীক না হওয়ার ছিল প্রধান কারণ। কা'ব (রাঃ)-এর নিজের বর্ণনা, আমি ভাবলাম বাগানে খেজুরের ফলন খুব ভাল হওয়ায় আমি যদি চলে যাই, তাহলে সব খেজুর বিনষ্ট হওয়ার আশাংকা দেখা দিবে। তাছাড়া আমি তো সব জিহাদে অংশগ্রহণ করেছি এ জিহাদে অংশগ্রহণ না করলে দোষের তেমন কিছুই হবে না, এরূপ চিন্তাই রয়ে গেলাম।

যখন যুদ্ধের পর তাঁর কাছে কৈফিয়ত চাওয়া হল তখন তিনি অত্যন্ত দুঃখিত ও লজ্জিত হয়ে গোটা বাগানটিই আল্লাহ্র পথে দান করলেন এ চিন্তা করে, কেননা এ বাগানটি যুদ্ধে শরীক হতে তাঁকে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিল। হযরত হেলাল ইব্নে উমাইয়া (রাঃ)-এর পরিবারে কিছু লোক কোথাও যাওয়াতে ভাবলেন, আমি সব জিহাদেই শরীক হয়েছি শুধুমাত্র এ একটি জিহাদেই শরীক না হলে তাতে আর কি হবে? এটা ভেবে তিনি রয়ে গেলেন।

যুদ্ধের পর যখন বোধোদয় হল তখন সমস্ত আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করার মনস্থ করলেন। কেননা এ পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়-স্বজনের কারণেই যুদ্ধে না যাওয়ার প্রধান মূল কারণ ছিল। হযরত কা'ব (রাঃ) তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণ হতে বিরত থাকার ঘটনা বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। তিনি নিজেই আপন ত্রুটির কথা বিস্তারিত বর্ণনা করে বলেন, তাবুকের যুদ্ধের পূর্বে আমি আর কোন দিন এত স্বচ্ছল ও সুখী ছিলাম না। এ যুদ্ধের সময় আমার যত ধন-সম্পদ ছিল আর কোন কালেও তত ছিল না। রাসূল (সাঃ)-এর একটি যুদ্ধ

সংক্রান্ত নির্দেশ ছিল যে, কোথায় এবং কোন্‌দিকে যুদ্ধ হবে তা তিনি কখনও সুস্পষ্ট প্রকাশ করতেন না। যে দিকে যুদ্ধ তার বিপরীত দিকের খোঁজ খবরও নিতেন, কারণ কোন্ দিকে অভিযান চলবে তা নিশ্চিত বলা যেত না। কিন্তু তাবুকের যুদ্ধে সুস্পষ্টভাবেই ঘোষণা করেছিলেন। কারণ সময়টা ছিল প্রচন্ড গরমকাল আর যুদ্ধক্ষেত্রটি ছিল বহু দূরে আর শত্রুপক্ষও ছিল প্রবল শক্তিশালী। কাজেই যাত্রার পূর্বেই নিজ বাহিনীকে সর্ব বিষয়ে সুচারুরূপে প্রস্তুতি নেয়ার আদেশ দিয়েছিলেন। ফলে, এত অধিক মুসলমান জিহাদে প্রস্তুত হয়েছিলেন যে, তাঁদের তালিকা করা কঠিন হয়ে পড়েছিল। লোক এত অধিক ছিল কেউ অনুপস্থিত থাকলে তা অনুমান করা সম্ভবপর ছিল না। হযরত কা'ব (রাঃ) বলেন, আমি অতি সকালেই যুদ্ধে যাওয়ার সামানপত্র ঠিক করার মনস্থ করলাম যে কোন মুহূর্তে যুদ্ধে চলে যাব।

এরিমধ্যে রাসূল (সাঃ) সাহাবী (রাঃ)-দেরকে নিয়ে তাঁবুক অভিযানের উদ্দেশ্যে রওয়না হয়ে গেলেন। কিন্তু আমার যাওয়া আর হল না। রাসূল (সাঃ) চলে যাওয়ার পর ভাবলাম, দু'এক দিনের মধ্যেই রওয়ানা হয়ে তাদের সাথী হব। কিন্তু চিন্তা-ভাবনা করতে করতে রাসূল (সাঃ) তাবুকের নিকটবর্তী হলেন, তথাপি আমার মনস্থির করা আর হল না। সব সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) চলে যাওয়ার পর মদীনার রাজপথে দেখলাম, আর কেউ সেখানে অবশিষ্ট নেই; শুধু দু'একটি মুনাফিক আর অক্ষম বৃদ্ধ ও শিশুরা ব্যতিত। রাসূল (সাঃ) তাঁবুকে পৌঁছে আমার কথা জিজ্ঞেস করলেন, কা'ব কোথায়? তাঁকে দেখছি না? একজন সাহাবী (রাঃ) বললেন, তার ধন সম্পদ তাঁকে আটকে রেখেছে। এ কথা শুনে হযরত মায়ায (রাঃ) বললেন, 'মিথ্যা কথা, আমি যতটুকু জানি, সে ভাল লোক অর্থাৎ মুনাফিক নয়। কিন্তু রাসুল (সাঃ) এ কথার উপর নীরব রইলেন।

যুদ্ধ শেষে মুসলমানগণ যখন বিজয় বেশে দলবলসহ ক্রমান্বয়ে মদীনার দিকে অগ্রসর হলেন, এ সংবাদে তখন আমার দুশ্চিন্তার অন্ত রইল না। ভাবলাম কি কৈফিয়ত দিব রাসূল (সাঃ)-এর কাছে? দিন যতই অতিবাহিত হল আমার অনুশোচনা ও অশান্তি ক্রমাগত বাড়তে লাগল। মনে নানা আপত্তির কথা উদয় হতে লাগল। ভাবলাম, কোন একটা মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে রাসূল (সাঃ)-এর থেকে ক্ষমা চেয়ে নিব। আবার ভাবলাম, আল্লাহ্‌র নবীর সাথে মিথ্যা বলব, তা কি করে সম্ভব? এ ব্যাপারে বাড়ির বয়োজ্যেষ্ঠদের সাথে পরামর্শ করা অবস্থাতেই রাসূল (সাঃ) তাঁর বাহিনীসহ মদীনায় ফিরে এলেন। তখন আর কি করব অস্তিরচিত্তেই সত্য বলার সিদ্ধান্ত নিলাম। রাসূল (সাঃ) অভ্যাসানুসারে তিনি

মদীনায় পৌঁছে প্রথমে মসজিদে প্রবেশ করেই দু'রাকাত তাহিয়াতুল মসজিদ নামায আদায় করে লোকদের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে মসজিদে বসে গেলেন। প্রথমে মুনাফিকরা এসে রাসূল (সাঃ)-এর কাছে মিথ্যা আপত্তি পেশ করে আল্লাহ্‌র কসম খেয়ে নিজেদের জিহাদে যোগ না দেয়ার কারণ বর্ণনা করতে লাগল। রাসূল (সাঃ) তাদের কথা শুনে বিষয়টি আল্লাহ্‌র উপর সোপর্দ করলেন।

এমন সময় আমি হাযির হয়ে রাসূল (সাঃ)-কে সালাম করলে তিনি অত্যন্ত অসন্তুষ্টির ভঙ্গিতে একটু মুসকি হেসে মুখ ফিরায়ে নিলেন। আমি তখন বললাম, আল্লাহ্‌র কসম আমি মুনাফিক নই, আমার ঈমানও বিনষ্ট হয়নি। তখন তিনি বললেন, "এখানে এস।" কাছে গিয়ে বসলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কোন্ জিনিস তোমাকে তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা হতে বিরত রেখেছে? আমি বললাম হে আল্লাহ্‌র রাসূল এ মুহূর্তে আমি যদি কোন দুনিয়াদার লোক হতাম; তাহলে যে কোন একটা মিথ্যা বলে আমার ক্রটির ক্ষমা চেয়ে নিতাম। কারণ, গুছিয়ে কথা বলার কৌশল আল্লাহ্ আমাকে দান করেছেন। কিন্তু আজ যদি আমি মিথ্যা কথা বলে আপনাকে সন্তুষ্ট করি, তাহলে নিশ্চয় আল্লাহ্ তায়ালা আমার প্রতি নারায হবেন। আর যদি আমি সত্য কথা বলি তাহলে আপনি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হবেন সন্দেহ নেই, কিন্তু অচিরেই আল্লাহ্ আপনার ক্রোধকেই ঠান্ডা করে দিবেন। সুতরাং সত্য কথাই বলি, আল্লাহ্‌র কসম আমার তাবুক যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করার কোন আপত্তি ছিল না, বরং বর্তমানে আমি যেরূপ স্বচ্ছল এর পূর্বে আমি কখনও এরূপ স্বচ্ছল ছিলাম না। আমার কথা শুনে রাসূল (সাঃ) বললেন, তাহলে তুমি সত্য বলছ! এরপর তিনি আমাকে বললেন, এখন যাও, আল্লাহ্ তায়ালাই তোমার ফয়সালা করবেন।

আমি সেখান থেকে ফিরে এলে আত্মীয়-স্বজনরা তিরস্কার করতে লাগল। তারা বলল, এর পূর্বে তুমি কখনও কোন ভুল করনি, এটাই তোমার প্রথম ভুল। তুমি যদি কোন একটা কারণ পেশ করে আল্লাহ্‌র দরবারে তোমার মাগফিরাতের জন্য রাসূল (সাঃ)-কে দোয়া করার আবেদন করতে, তাহলে রাসূল (সাঃ)-এর দোয়া তোমার মাগফিরাতের জন্যই যথেষ্ট ছিল। তখন আমি বললাম, আমার মত আরো কেহ আছে কি? তারা বলল, হ্যাঁ আরো দু'জন আছেন যাঁদের সাথেও রাসূল (সাঃ) এরূপই ব্যবহার করেছেন। তাঁদের মধ্যে হেলাল ইব্‌নে উমাইয়া (রাঃ) ও মুবারাহ ইব্‌নে রাবী। আমি দেখলাম, দু'জন ভাল লোক এবং উভয়ই বদরী সাহাবী। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সমস্ত সাহাবীকে নির্দেশ দিলেন যে, কেহ এদের

সাথে কথা বলতে পারবে না। এটা নিয়মের কথাই, যার সাথে সম্পর্ক থাকে, শাসন তাকেই করা হয়, শাস্তি তাকে দেয়া হয়। যার সাথে কোনরূপ সম্পর্ক নেই তাকে কেহ শাসন করে না, শাস্তিও দেয় না। রাসূল (সাঃ)-এর এ নির্দেশে সমস্ত সাহাবী আমাদের সাথে কথাবার্তা বন্ধ করে এবং আমাদের এড়িয়ে চলতে লাগলেন। এতে আমার মনে হল, বিশাল পৃথিবীটা যেন সংকীর্ণ হয়ে গেছে।

এমতাবস্থায় একটি কথা ভেবে খুবই অস্থির হলাম যে, এ অবস্থায় যদি আমার মৃত্যু হয়, তাহলে কেহ আমার জানাযা পড়বে না। আর আল্লাহ্ না করুন, যদি রাসূল (সাঃ)-এর ওফাত হয়ে যায়, তাহলে মৃত্যু পর্যন্ত কেহ কথাও বলবে না আর আমার জানাযাও কেহ পড়বে না। কারণ, রাসূল (সাঃ)-এর হুকুম অমান্য করার সাহস কে করবে? এভাবেই একমাস বিশ দিন অতিবাহিত হল আমার অপর দু'জন সাথী শুরু থেকেই ঘরের কোণে বসে গিয়েছিলেন। কিন্তু আমি তাঁদের তুলনায় শক্তিশালী ছিলাম। আমি আগের মতই বাইরে চলাফেরা করতাম। মসজিদে জামাতের সাথে নামায পড়তাম। কিন্তু কেহ আমার সাথে কোন কথা বলত না। আমি রাসূল (সাঃ) এর খিদমতে হাযির হয়ে তাঁকে সালাম করলে লক্ষ্য করতাম যে, সালামের উত্তরে রাসূল (সাঃ)-এর ঠোঁট মোবারক নড়ে কি-না। ফরয নামাযের পর সুন্নাত ও নফল নামাযগুলো রাসূল (সাঃ)-এর পাশে দাঁড়িয়ে আদায় করে আড় চোখে দেখতাম যে, তিনি (সাঃ) আমার দিকে তাকান কি-না। আমি নামায শুরু করলে তিনি আমার দিকে চাইতেন আর আমি তাঁর দিকে তাকালে তিনি দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতেন। এমনি করেই আমার দিন অতিবাহিত হতে লাগল। কিন্তু সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ)-গণ আমার সাথে কথা বন্ধ করার কারণে দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হল।

এ পরিস্থিতিতেই আমি একদিন হযরত আবু কাতাদাহ্ (রাঃ)-এর দেয়ালের উপর উঠে তাঁকে সালাম করলাম। তিনি ছিলেন আমার চাচাত ভাই এবং আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি আমার সালামের উত্তর দিলেন না। আমি তাঁকে আল্লাহ্র কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কি জান না যে, আমি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসি? তিনি এরও কোন উত্তর দিলেন না। সুতরাং আমি তাঁকে পুনরায় কসম দিয়ে উক্ত কথাই জিজ্ঞেস করলাম, কিন্তু এবারও তিনি নিরোত্তর রইলেন। আমি তৃতীয়বার জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, আল্লাহ্ ও রাসূলই ভাল জানেন। তাঁর কথা শুনে আমার দু'চোখ বেয়ে ক্রামাগত অশ্রু প্রবাহিত হতে লাগল আর আমি সেখান থেকে চলে এলাম। একদিন বাজারে যাওয়ার সময় দেখলাম এক খ্রীষ্টান কিব্তী সিরিয়া থেকে মদীনায় শস্য বিক্রি

করতে এসে লোকদের কাছে জিজ্ঞেস করছে, আপনারা কেহ কা'ব ইব্নে মালেকের ঠিকানা জানেন কি? লোকেরা আমার দিকে ইশারা করে বললে সে আমার কাছে এসে গাস্সান গোত্রের কাদের বাদশাহ্র একটি চিঠি আমার হাতে তুলে দিল। তাতে লেখা ছিল, জানতে পারলাম তোমার মনিব নাকি তোমার উপর যুলুম করছে। আল্লাহ্ তোমাকে অপমান ও ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করুন। তুমি আমার কাছে চলে এস, আমি তোমাকে সাহায্য করব। পত্রটি পড়ে আমি "ইন্না লিল্লাহ্" পড়তে লাগলাম। কারণ আমার এত বড় অবনতি ঘটছিল যে, শেষ পর্যন্ত কাফেররাও লোভ দেখিয়ে আমাকে ধর্মচ্যুত করতে চেষ্টা করেছিল। রাগে দুঃখে আমি পত্রটি একটি জলন্ত চুলায় নিক্ষেপ করে রাসূল (সাঃ)-এর দরবারে হাযির হয়ে আরয করলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি আমার প্রতি বিমুখ হয়েছেন বলে আমার এতটুকু অবনতি ঘটেছে যে, কাফেররাও আমাকে প্রলুব্ধ এবং পথভ্রষ্ট করার চেষ্টা করার আজ সাহস পাচ্ছে। রাসূল (সাঃ) আমার কথা শুনে কিছুই বললেন না। একান্ত বিমুখ ও মর্মাহত হয়ে আমি সেখান থেকে ফিরে এলাম। এ মুহূর্তে মনে হল গোটা জগতটাই যেন আমার কাছে অন্ধকার হয়ে গেল।

আমার মানষিক অবস্থা যখন এরূপ, তখন এক দিন রাসূল (সাঃ)-এর কাসেদ এসে আমাকে বললেন, আমাকে স্ত্রী থেকেও পৃথক থাকতে হবে। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, এর অর্থ কি? আমি কি তাঁকে তালাক দিয়ে দিব? কাসেদ বলল, 'না' শুধু স্ত্রী থেকে পৃথক থাকতে হবে এটাই নির্দেশ। আমি স্ত্রীকে বলে দিলাম, তুমি তোমার পিত্রালয়ে চলে যাও। যে পর্যন্ত আল্লাহ্ তায়ালা আমার ফয়সালা না করেন সে পর্যন্ত তোমাকে সেখানেই থাকতে হবে। আমার অপর দুজন সাথীর প্রতিও অনুরূপ আদেশ হয়েছিল। হযরত হেলাল (রাঃ)-এর স্ত্রী রাসূল (সাঃ)-এর খিদমতে হাযির হয়ে আরয করলেন যে, হে আল্লাহ্র রাসূল, আমার স্বামী অত্যন্ত বৃদ্ধ, কেহ তাঁর খিদমত না করলে তিনি মারা যাবেন। আপনার হুকুম হলে আর আপনি যদি অসন্তুষ্ট না হন, তাহলে আমি তাঁর কিছু কাজকর্ম করে দিতে পারি? রাসূল (সাঃ) বললেন, ক্ষতি নেই, কিন্তু সহবাস করা নিষিদ্ধ। তিনি বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! এসবের দিকে তাঁর কোন খেয়াল নেই। যেদিন থেকে এ অবস্থা শুরু হয়েছে সেদিন থেকে তিনি শুধু ক্রন্দনরত অবস্থায়ই সময় অতিবাহিত করছেন। হযরত কা'ব (রাঃ) বলেন, অনেকে আমাকে ইঙ্গিত করেছিলেন, হেলালের ন্যায় তুমিও স্ত্রীর খিদমত গ্রহণের অনুমতি চাও, হয়ত পেয়ে যাবে। আমি বললাম, তিনি বৃদ্ধ আর আমি যুবক।

এভাবে আরও দশ দিন কেটে গেল এবং আমার এ অভিশপ্ত অবস্থায় ৫০টি দিন অতিক্রান্ত হল। সেদিন আমি ফযরের নামায বাড়ির ছাদেই আদায় করেছি। মন অতি চঞ্চল; হৃদয় অতিশয় বিষাদিত। এমন সময় পাহাড়ের উপর থেকে কে যেন উচ্চস্বরে বলল, "কা'ব সুসংবাদ গ্রহণ কর।" এতটুকু শুনেই আমি সিজদায় পড়ে আনন্দের আতিশয্যে ক্রন্দন করতে লাগলাম। মনে হল, সমস্ত ভার-বোঝা যেন নেমে গেছে। এ মুহূর্তে যেন সমস্ত সংকীর্ণতা শেষ হয়ে পৃথিবীটা প্রশস্ত বোধ হতে লাগল। সেদিন ফযরের নামাযের পরই রাসূল (সাঃ) আমার ক্ষমা প্রাপ্তির কথা ঘোষণা করেছিলেন। তখন একজন সাহাবী (রাঃ) আনন্দে আত্মহারা হয়ে ছুটে এসে পাহাড়ের উপর উঠে আমাকে এ সুসংবাদ দিয়েছিলেন। এরপর অপর একজন সাহাবী (রাঃ) ঘোড়ার পিঠে ছুটে এসে আমাকে এ সংসংবাদ দিয়েছিলেন।

আমি তৎক্ষণাত আমার পরিধানে যে পোশাকটি ছিল তা সংবাদ বাহককে পুরস্কার স্বরূপ দিয়ে দিলাম। আল্লাহ্র কসম এ পোশাক ব্যতীত আমার কাছে অন্য কোন বস্ত্র ছিল না। ফলে; বাড়ির লোকদের কাছ থেকে একটি কাপড় ধার করে এনে লজ্জা নিবারণ করে অনতিবিলম্বে রাসূল (সাঃ)-এর খিদমতে হাযির হলাম। এভাবে আমার সঙ্গীদ্বয়কেও লোকেরা সুসংবাদ দিলেন। তাঁরাও সে দিনই ক্ষমাপ্রাপ্ত হলেন। আমি যখন রাসূল (সাঃ)-এর খিদমতে মসজিদে নববীতে উপস্থিত হলাম, তখন সমস্ত সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ)-গণ আমাকে মুবারকবাদ জানাতে লাগলেন। সবার আগে হযরত তালহা (রাঃ) ছুটে এসে আমাকে মুবারকবাদ জানালেন এবং আমার সাথে মুসাফাহা করলেন যা আমার চির স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এরপর আমি রাসূল (সাঃ)-এর কাছে গিয়ে সালাম করলাম। আমাকে দেখে তাঁর চেহারা মোবারক উজ্জ্বল হয়ে উঠল। আনন্দের সময় তাঁর মুখমন্ডল এরূপ পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় উজ্জ্বল হয়ে উঠত। আমি আরয করলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার তওবার পরিপূর্ণতা হল, আমার যাবতীয় সম্পদ আল্লাহ্র রাস্তায় সদ্কা করে দিলাম। কেননা, এগুলোই আমার উপর এ কঠিন বিপদ ও লাঞ্ছনার কারণ ছিল। তিনি (সাঃ) বললেন, এরূপ করলে তোমার কষ্ট হবে, কাজেই কিছু সম্পদ তোমার কাছে রেখে দাও, বাকীটা দান কর। আমি বললাম, যদি আপনি ভাল মনে করেন, তাহলে খয়বরের যুদ্ধে প্রাপ্ত গনীমতের মালটুকু রেখে দেই। হযরত কা'ব (রাঃ) বলেন, সত্য কথা বলাটাই সেদিন আমাকে নাযাত দিয়েছে। এ ছিল সাহাবায়ে কিরামের (রাঃ)-গণের আল্লাহ্র ভয়ের দৃষ্টান্ত। তাঁরা সর্বদাই জিহাদে যোগ দিয়েছেন, মাত্র একবার

শরীক না হওয়ার দরুন কি কঠোর শাস্তিটা না হয়েছিল, আর তাঁরা কত সহিষ্ণুতার সাথে তা মাথা পেতে নিয়েছিলেন। নিজের ত্রুটির জন্য সুদীর্ঘ পঞ্চাশটি দিন অবিরত কেঁদেছেন। যে সম্পদ জিহাদে যোগদানে বাধা সৃষ্টি করেছিল সেগুলো আল্লাহ্র নামে দান করে দিলেন। বিধর্মীর লোভ প্রদর্শনে হযরত কা'ব (রাঃ) আরও কত বেশি লজ্জিত হয়ে পড়লেন। তিনি মনে করলেন, তাঁর ঈমান কত দুর্বল হয়েছে যে, কাফেররা পর্যন্ত তাঁকে প্রলোভন দেখাতে সাহস পাচ্ছে। তাই তাঁর অনুশোচনার মাত্রায় বেড়ে গেল। তিনি তাঁর এ অবনতির কথা রাসূল (সাঃ)-এর কাছে ব্যক্ত করতে কোনরূপ দ্বিধাবোধ করলেন না।

আমাদের সামনে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আদেশ নিষেধ রয়েছে। অন্যান্য সব বাদ দিয়ে শুধু নামাযের কথাই ধরা যাক; আমাদের কয়জন এ হুকুমটি যথাযথভাবে পালন করেছি? অথচ এ নামাযই হল আল্লাহ্ তায়ালার সর্বশ্রেষ্ঠ আদেশ। যা পালন করলে মুমিন হওয়ার পরিচয় পাওয়া যায়, পালন না করলে কাফেরের পর্যায়ভুক্ত হতে হয়। তারপর যাকাত ও হজ্বের কথা তো অনেক দূরে, কেননা সেগুলো আদায় করতে সম্পদও ব্যয় করতে হয়।

কবরের ফরিয়াদ

হযরত রাসূল (সাঃ) একদিন মসজিদে নামায পড়তে এসে দেখতে পেলেন, কয়েকজন সাহাবা (রাঃ) অট্টহাসিতে মশগুল রয়েছেন এবং তাঁদের হাসির নমুনা এরূপই ছিল যে তাঁদের দাঁত পর্যন্ত দেখা যাচ্ছিল। রাসূল (সাঃ) এঁদের উদ্দেশ্যে বললেন, যদি তোমরা মৃত্যুকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করতে, তাহলে আমি কখনও এ ঘৃণ্য অবস্থায় তোমাদেরকে দেখতাম না। সুতরাং তোমরা মৃত্যুকে অধিক পরিমাণে স্মরণ কর। এমন কোন দিন অতিবাহিত হয় না, যেদিন কবর এ বলে ফরিয়াদ না করে যে, আমি মাটির ঘর, নির্জন ঘর, অপরিচিত ঘর, পোকা মাকড়ের ঘর। যখন নেককার কোন বান্দাকে কবরে রাখা হয় তখন কবর তাকে এ বলে সম্বোধন করতে থাকে, তোমাকে খোশ আমমেদ বা স্বাগতম, যত লোক পৃথিবীতে বিচরণ করত, তারি মধ্যে তুমিই আমার কাছে অধিক প্রিয়। তুমি যখন আজ আমার কাছে এসেছ, নিশ্চয় আমার সদ্ব্যবহার পাবে। অতঃপর উক্ত মৃত ব্যক্তির দৃষ্টি পর্যন্ত কবর প্রশস্ত হয়ে জান্নাতের একটি দরজা এ কবরের দিকে খুলে দেয়া হলে জান্নাতি সুগন্ধি কবরের ভিতরে প্রবেশ করতে থাকে। কোন পাপীকে যখন কবরস্থ করা হয়, তখন কবর তাকে বলতে থাকে, হে পাপীষ্ট! তোর কবরে আগমন বড়ই অশুভ! দুনিয়ার সমস্ত লোকদের

মধ্যে তুই আমার কাছে ছিলে সর্বাপেক্ষা ঘৃণার পাত্র। আজ তোকে যখন আমার কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে, তখন তুই আমার ব্যবহার এবং আচার-আচরণ কিরূপ তা দেখতে পাবি। অতঃপর কবর দু'দিক থেকে এমনভাবে চাপ দেবে যে, পাপীষ্ঠের পাঁজরের হাড়গুলো একটি অপর দিকে ঢুকে যাবে আর ৭০টি বিষধর অজগর আযাবের জন্য নিযুক্ত করা হবে। সেগুলো এত ভয়ংকর ও বিষাক্ত যে, এ সাপ যদি পৃথিবীতে একটি নিশ্বাসও ফেলে, তাহলে বিষের ক্রিয়ায় যমিনে কোন তৃণলতা জন্মাবে না। অনবরত সাপগুলো দংশন করতে থাকবে। কবরবাসীর বর্ণনা প্রসঙ্গে রাসূল (সাঃ)- বলেন, কবর হয়ত জান্নাতের একটা টুকরা, নতুবা জাহান্নামের একটা গর্ত। (মিশকাত)

এ জন্যই রাসূল (সাঃ) অধিকাংশ সময় গভীর চিন্তায় নিমগ্ন থাকতেন। মৃত্যুকে স্মরণ করলে অন্তরে আল্লাহ্‌র ভয়-ভীতির সঞ্চার হয়। এ কারণেই রাসূল (সাঃ) মৃত্যুকে অধিক পরিমাপে স্মরণ করতে আমাদেরকে অসিয়ত করেছেন।

হযরত হানযালা (রাঃ)-অন্তরে মোনাফেকীর ভয়

হযরত হানযালা (রাঃ) হতে বর্ণিত, একবার আমরা মসজিদে নববীতে উপস্থিত ছিলাম। রাসূল (সাঃ) আমাদের উদ্দেশ্যে নানান বিষয়ে নসীহত করছিলেন, তাতে আমাদের মন পরিবর্তনে অশ্রু বইতে লাগল। মজলিস শেষে আমি যখন বাড়ি ফিরে বিবি-বাচ্চারা কাছে এসে দুনিয়ার কথাবার্তা বলতে লাগলাম তাদের সাথে হাসি-ঠাট্টা শুরু করলাম, তাতে আমার অন্তরের পূর্বাবস্থা সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়ে গেল। হঠাৎ আমার মনে হল, আমি একটু আগে কেমন ছিলাম আর এখন কেমন হয়ে গেলাম। তখন আমার অন্তর বলে উঠল, হানযালা! তুমি তো মুনাফিক হয়েছ। কারণ রাসূল (সাঃ)-এর মুহব্বতে কিছু আগে থাকা কালে তোমার অবস্থা ছিল এক রকম, আর বাড়ি আসার পর তোমার অবস্থা হয়েছে সম্পূর্ণ বিপরীত। আমার এ অবস্থার পরিবর্তনে আফসোস ও আক্ষেপ করতে করতে ঘর থেকে বের হয়ে পথে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) আসতে দেখে আমি তাঁকে বললাম, হানযালা তো মুনাফিক হয়েছে। এ কথা শুনে তিনি আশ্চর্য হয়ে বললেন, "সোবহান্নাল্লাহ" তুমি কি বলছ? আমি তাঁকে তখন সব ঘটনা খুলে বললাম যে, যখন আমরা নবীজীর খিদমতে থাকি, সেখানে ভাসমান অবস্থায় যখন জান্নাত-জাহান্নামের কথা শুনি, তখন এগুলো যেন আমরা আমাদের চোখের সামনে দেখতে পাই। কিন্তু যখন আমরা ঘরে ফিরে আসি এবং পরিবার পরিজনের সাথে মিলিত হই তখনও আর এসব মনে

থাকে না। স্ত্রী-পুত্র, পরিবার-পরিজন ও সম্পদের নেশায় সব কিছু ভুলেই যাই। এ কথা শুনে হযরত আবু বকর (রাঃ) বললেন, এরূপ অবস্থা তো আমারও হয়।

অতঃপর আমরা উভয়েই রাসূল (সাঃ)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ)। হান্‌যালা মুনাফিক হয়ে গেছে। তিনি (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন ব্যাপার কি? তখন হযরত হানযালা (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ)! আমরা যখন আপনার খিদমতে উপস্থিত থাকি, আপনার মুখে জান্নাত-জাহান্নামের কথা শুনি, তখন আমাদের অবস্থা এমন হয় যে, আমরা জান্নাত-জাহান্নাম যেন আমাদের চোখের সামনে ভাসমান অবস্থায় দেখতে পাই। কিন্তু যখন আপনার মজলিস থেকে বাড়ি ফিরে সাংসারিক বিভিন্ন কাজে নিমগ্ন হই, তখন আমাদের এ অবস্থা আর এরূপ থাকে না, সব কিছুই ভুলে যাই। এ কথা শুনে রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করলেন, যাঁর হাতে আমার জীবন, আমি ঐ আল্লাহ্‌র কসম খেয়ে বলছি, সব সময় যদি তোমাদের ঐ অবস্থা বিদ্যমান থাকত যেরূপ আমার সামনে হয়, তাহলে ফেরেস্তারা তোমাদের বিছানায় এবং তোমাদের চলার পথে তোমাদের সাথে মুসাফাহা করত। হে হানযালা! জেনে রাখ, মানুষের এরূপ অবস্থা কখনও কখনও হয়ে থাকে। মানুষের সাথে মানুষের প্রয়োজনসমূহ লেগেই রয়েছে, যেগুলো পুরণ করতে মানুষ বাধ্য। যেমন, খাওয়া-পরা, সন্তানাদির খোঁজ-খবর নেয়া ইত্যাদি। তাই উপরোক্ত অবস্থা মানুষের কখনও কখনও হাসিল হতে পারে। সর্বদাই এরূপ অবস্থা বিদ্যমান থাকা অবশ্যই ক্ষতিকর। ফেরেশ্‌তারা এসব থেকে মুক্ত; কাজেই ফেরেশ্‌তাদের ন্যায় অবস্থা সব সময় মানুষের হতে পারে না। তবে চিন্তার বিষয় হল এ যে, সাহাবায়ে কিরামের দ্বীন দুনিয়া সম্পর্কে ধারণা কেমন ছিল তা হযরত হানযালা (রাঃ)-এর চিন্তা চেতনা সম্পর্কে ধারণা করলেই উপলব্ধী করা যাবে।

আল্লাহ্‌ভীতির বিভিন্ন দৃষ্টান্ত

কুরআন, হাদীস ও বুজুর্গানে দ্বীনের ঘটনাবলীতে আল্লাহ্‌ভীতির কথা এত বেশি আলোচিত হয়েছে যে; সেগুলো গণনা করা সম্ভব নয়। তবে সংক্ষেপে এতটুকু বলা যায় যে, আল্লাহ্ ভীতির এবং দ্বীনের প্রতিটি বিষয়ে পূর্ণতা আনয়ন করে মানব জীবনকে সুষ্ঠ সুন্দর করে তোলাই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেন, আল্লাহ্‌র ভয় সমস্ত জ্ঞান ও হিকমতের মূল। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে ওমর (রাঃ) আল্লাহ্‌র ভয়ে এত বেশি ক্রন্দন করতেন যে, অবশেষে তাঁর দু'টি চোখই বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল। একদিন এক ব্যক্তি তাঁকে

ক্রন্দন করতে দেখে আশ্চর্য বোধ করলেন। তিনি তাঁকে বললেন, তুমি আমার কান্নায় আশ্চর্য বোধ করছ? অথচ আল্লাহ্‌র ভয়ে সূর্য, চন্দ্রও কাঁদে। একবার রাসূল (সাঃ) এক যুবক সাহাবী (রাঃ)-এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, যুবকটি তখন কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করছিলেন– যুবক যখন فاذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان এ আয়াতে পৌঁছল, তখন ভয়ে তার শরীরের লোমগুলো দাঁড়িয়ে গেল, কাঁদতে কাঁদতে তাঁর কণ্ঠস্বর বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হল। তিনি বলছিলেন, হায়! আমার দুর্ভাগ্য যেদিন আকাশ ফেটে যাবে, সে ক্বিয়ামতের দিন আমার কি দশা হবে, হায়! রাসূল (সাঃ) শুনে তাঁকে বললেন, তোমার কান্নায় ফেরশতারাও অংশগ্রহণ করছে এবং কাঁদছে। একজন আনসারী সাহাবী (রাঃ) তাহাজ্জুদের নামাযে খুব কেঁদে বলেছিলেন, জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহ্‌ তোমার কাছে প্রার্থনা করছি। তাঁর কথা শুনে রাসূল (সাঃ) বললেন, "তুমি আজ ফেরেশ্‌তাদেরকে কাঁদিয়ে ফেলছ। আবদুল্লাহ ইব্‌নে রাওয়াহা (রাঃ) একদিন খুব কান্নাকাটি করেছিলেন। তাঁর কান্না দেখে তাঁর স্ত্রীও কাঁদতে লাগলেন। তিনি স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কাঁদছ কেন?" স্ত্রী বললেন, যে কারণে আপনি কাঁদছেন। তিনি বললেন, আমি এ জন্য কাঁদছি যে, জাহান্নামের উপর দিয়ে তো আমাদের যেতেই হবে। জানি না তখন সে পথ অতিক্রম করতে পারব কিনা। যুরারাহ ইব্‌নে আওফা (রাঃ) একটি মসজিদে নামায পড়ছিলেন। ক্বিরাতের মধ্যে فاذا نقر فى الناقور (যে দিন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে) পর্যন্ত পৌঁছে, আয়াতটি পাঠ করার সাথে সাথে বেহুস হয়ে ইন্তিকাল করলেন। হযরত খোলায়েদ নামক একজন সাহাবী (রাঃ) একদিন নামায পড়ছিলেন। ক্বিরাতের মধ্যে যখন كل نفس ذائقة الموت (প্রত্যেক প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে) এ আয়াত পর্যন্ত পৌঁছলেন, তখন আয়াতটি তিনি বারবার পড়তে লাগলেন। খানিকক্ষণ পর ঘরের এক কোণ থেকে আওয়াজ এল তুমি এটা আর কত বার পড়বে? তোমার বারবার পড়ার দরুণ এ যাবত চারজন জ্বীন মরে গেছে। জনৈক সাহাবী (রাঃ) সম্পর্কে বর্ণিত রয়েছে যে, তিনি নামাযের মধ্যে যখন وردوا الى الله مولهم الحق এ আয়াতে পৌঁছালেন, তখন তিনি এক চিৎকার মেরে মাটিতে পড়ে ছটফট করতে করতে মারা গেলেন। বিখ্যাত বুযুর্গ হযরত ফোযায়েল (রহঃ) বলেন, আল্লাহ্‌র ভয় যাবতীয় নেক কর্মের দিকে নির্দেশ করে। হযরত শিবলী (রহঃ)-এর কথা

কে না জানে তিনি বলেন, আমি যখনই আল্লাহ্‌কে ভয় করেছি, তখনই আমার ইলম ও হিকমতের এমন দ্বার খুলে গিয়েছে, যা ইতিপূর্বে কখনও খোলেনি। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন, আমি বান্দার উপর দু'টি ভয় একত্রে দেই না এবং একই সময়ে দু'টি বিষয়ে নিশ্চিন্ত করি না। বান্দা যদি দুনিয়াতে আমার বিষয়ে উদাসীন থাকে, তাহলে আখিরাতে আমি তাকে ভয়ের সম্মুখীন করব। আর যদি দুনিয়াতে আমাকে ভয় করতে থাকে, তাহলে আখিরাতে তাকে নিশ্চিন্ত রাখব। রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে ভয় করে, প্রত্যেক বস্তু তাকে ভয় করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌ ব্যতীত অনকে ভয় করে, প্রত্যেক বস্তু তাকে ভয় প্রদর্শন করে। ইয়াহইয়া ইব্‌নে মোয়ায (রাঃ) বলেন, হতভাগা মানুষ যদি জাহান্নামকে এতটুকু ভয় করত যতটুকু দারিদ্রকে ভয় করে, তাহলে সোজা জান্নাতে প্রবেশ করত।

আবু সুলাইমান দারানী (রহঃ) বলেন, যার অন্তর থেকে আল্লাহর ভয় বের হয়ে যায়, সে ধ্বংস হয়ে যায়। রাসূল (সাঃ) বলেন, আল্লাহ্‌র ভয়ে যে চোখ থেকে মাছির মাথা পরিমাণ অশ্রু নির্গত হয় সে চোখের জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম। তিনি (সাঃ) আরও বলেন, 'যে মুসলমানের অন্তর আল্লাহ্‌র ভয়ে কেঁপে উঠে, তার গুনাহসমূহ বৃক্ষের পাতার ন্যায় ঝরে পড়ে যায়।' আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ) আরও বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র ভয়ে কাঁদে তার জাহান্নামে যাওয়া ঐরূপ অসম্ভব যেমন স্তনের মধ্যে দিয়ে দুধ ফিরে যাওয়া অসম্ভব।' হযরত উক্‌বা ইব্‌নে আমের (রাঃ) একদিন রাসূল (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, "নাযাতের উপায় কি?" উত্তরে তিনি (সাঃ) ইরশাদ করলেন, 'আপন জিহ্বাকে সংযত রাখ, ঘরে বসে থাক এবং নিজের গুনাহের জন্য অনবরত ক্রন্দন করতে থাক।' হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) একদিন রাসূল (সাঃ)-এর কাছে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার উম্মতের মধ্যে এমন লোকও আছে কি, যে বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে?' তিনি (সাঃ) উত্তর দিলেন, হ্যাঁ আছে। 'যে ব্যক্তি নিজের গুনাহর ভয়ে সর্বদাই কাঁদে।' রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেন, 'দু'টি ফোঁটা আল্লাহ্‌র কাছে খুবই প্রিয়। একটি, অশ্রু যা আল্লাহ্‌র ভয়ে নির্গত হয় আর অপরটি ঐ রক্তের ফোঁটা যা জিহাদে আল্লাহ্‌র রাস্তায় প্রবাহিত হয়।' রাসূল (সাঃ) আরও ইরশাদ করেন, "কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌ তা'আলা সাত শ্রেণীর লোককে আপন ছায়া দান করবেন, তন্মধ্যে এক শ্রেণী হল, যাঁরা নির্জনে বসে আল্লাহ্‌র ভয়ে কাঁদে। যদ্দরুণ তাদের দু'চোখ বয়ে অশ্রু প্রবাহিত হয়ে যায়।" হযরত আবু বকর (রাঃ) বলেন, 'যার কান্না আসে, সে কাঁদবে আর যার কান্না না আসে, সে কান্নার ভান করবে।' হযরত মুহাম্মদ ইব্‌নে মুনকাদির (রাঃ) যখন ক্রন্দন করতেন তখন

চোখের পানি দ্বারা তাঁর মুখ ও দাড়ি ভিজে যেত। এমতাবস্থায় তিনি বলতেন, আমি রাসূল (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি, যে স্থানে অশ্রু প্রবাহিত হয়, জাহান্নামের আগুন উক্ত স্থানকে স্পর্শ করবে না। হযরত সাবেত কেনানী (রহঃ)-এর চোখে ব্যথা হল, চিকিৎসক তাঁকে বললেন, একটি বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করলে চক্ষু ভাল হতে পারে। বিষয়টি হল, "তুমি কাঁদবে না। তিনি বললেন, যে চোখ কাঁদে না, তার মধ্যে কোন কল্যাণ নেই।" হযরত ইয়াজিদ ইব্নে মাইসারা (রহঃ) বলেন, সাতটি কারণে মানুষের কান্না আসে। খুশীতে, ব্যথায়, ক্ষিপ্ততায়, হতবুদ্ধিতায়, দেখাদেখি, নেশায় ও আল্লাহ্র ভয়ে। আল্লাহ্র ভয়ে নির্গত এক ফোঁটা অশ্রু, আগুনের কুন্ডলীকে নিভিয়ে দিতে পারে।

হযরত কা'ব আহবার (রাঃ) বলেন, "যাঁর হাতে আমার জীবন আমি সে আল্লাহ্র কসম খেয়ে বলছি, আমি যদি আল্লাহ্র ভয়ে কাঁদি আর অশ্রু আমার গাল বয়ে প্রবাহিত হয়, তা আমার কাছে পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ আল্লাহ্র রাস্তায় সদকা করার চেয়েও অধিক প্রিয়।" রাসূল (সাঃ)-এর বহু হাদীস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, নিজের গুনাহর কথা ভেবে আল্লাহ্র ভয়ে ক্রন্দন করা অত্যন্ত নেকীর কাজ। তাই, নির্জনে বসে চোখের পানি ফেলাই অত্যন্ত কল্যাণকর এবং ফলপ্রসূ। নিজের গুনাহর ভয়ের সাথে সাথে আল্লাহ্র রহমত ও অনুগ্রহের আশা করাও আবশ্যক। নিঃসন্দেহে, আল্লাহ্র রহমত প্রতিটি বস্তুর জন্য ব্যাপক। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, হাশরের দিন আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে যদি ঘোষণা করা হয় যে, একজন লোক ব্যতীত সমস্ত হাশরবাসী জাহান্নামে যাবে, তাহলে আল্লাহ্র রহমতের প্রতি লক্ষ্য করে আমি আশাবাদী যে, সে লোকটি আমিই হব। আর যদি ঘোষণা করা হয় যে, একজন লোক ব্যতীত সমস্ত হাশরবাসী জান্নাতে যাবে, তাহলে আমার আমলের বিবেচনায় আমার ভয় হচ্ছে যে, সে লোকটি আমিই হব। কাজেই আল্লাহ্র ভয় ও আল্লাহ্র রহমত দু'টি বস্তুকে আলাদা আলাদা ভাবে বিবেচনা করা উচিত। বিশেষভাবে মৃত্যুর সময় আল্লাহ্র রহমতের আশা করাটাই অধিক বাঞ্ছনীয়। রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেন, "তোমাদের মধ্যে কেহ যেন আল্লাহ্র রহমতের আশা না নিয়ে মৃত্যুবরণ না করে।" হযরত আহমদ ইব্নে হাম্বল (রহঃ)-এর যখন মৃত্যুর সময় সন্নিকট হল, তখন তিনি নিজের ছেলেকে ডেকে বললেন, যেসব হাদীসে আল্লাহ্র রহমতের কথা বর্ণিত হয়েছে সেগুলো আমাকে শুনাও। যাতে আমার প্রতি আল্লাহ্র রহমতের আশা বৃদ্ধি পায়।

চতুর্থ অধ্যায়

সাহাবায়ে কিরামের পরহেযগারী ও দারিদ্র

দারিদ্রতা স্বয়ং রাসূল (সাঃ)-এর পছন্দনীয় বিষয় ছিল। তাই তিনি দরিদ্র জীবন যাপন অবলম্বন করেছিলেন। রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেন, দারিদ্রতা মুমিনের তোহফা। তিনি (সাঃ) আরও ইরশাদ করেন, দারিদ্র আমার গৌরবের বস্তু।

পাহাড়কে স্বর্ণে পরিণত করার প্রস্তাব অগ্রাহ্য

রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেন, আল্লাহ্ আমার জন্য মক্কার পাহাড়গুলোকে স্বর্ণে পরিণত করে দেয়ার প্রস্তাব দিলেন। আমি বললাম, হে আমার রব! আমি এটাই পছন্দ করি যে, একদিন পেট ভরে খাব আর একদিন উপবাস থাকব। ক্ষুধার্ত থেকে তোমার কাছে কান্নাকাটি করে তোমাকে স্মরণ করব। আর যখন পেট ভরে খাব, তখন তোমার শুকরিয়া আদায় করে তোমার প্রশংসা করব। (তিরমিযী) আমরা যাঁর উম্মত বলে দাবী করি, যিনি শ্রেষ্ঠ নবী, দু'জাহানের পরিত্রাণকারী, তিনি দারিদ্রের মধ্যে জীবন-যাপন করাই ভালবাসতেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁর প্রতিটি আমল আমাদের জন্য একান্তভাবেই অনুকরণ ও অনুসরণযোগ্য।

রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর শপথ

পারিবারিক ব্যাপারে একবার রাসূল (সাঃ) স্ত্রীগণের আচার-আচরণে বিরক্ত হয়ে কসম করলেন যে, তিনি একমাস তাঁদের কাছে যাবেন না। এরপর থেকে একটি পৃথক ঘরে থাকতে লাগলেন। আর তাতে প্রচারিত হল যে, রাসূল (সাঃ) তাঁর সমস্ত বিবিকে তালাক দিয়েছেন। সংবাদ পেয়ে হযরত ওমর (রাঃ) দৌড়ে মসজিদে উপস্থিত হয়ে দেখলেন সাহাবা (রাঃ)-গণ এখানে সেখানে বসে ক্রন্দন করছেন। আর বিবিগণও নিজ নিজ ঘরে বসে কাঁদছেন। হযরত ওমর (রাঃ) স্বীয় কন্যা হযরত হাফসাহ (রাঃ)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন, এখন কাঁদছ কেন? আগেই তো বলেছিলাম যে, এমন কথা বা আচার-আচরণ কখনো করবেনা, যে আচার-আচরণে রাসূল (সাঃ) অসন্তুষ্ট হন। অতঃপর তিনি মসজিদে গেলেন। সেখানে দেখলেন একদল সাহাবী মিম্বরের পাশে বসে কাঁদছিলেন। তিনি কিছুক্ষণ সেখানে বসে রইলেন। কিন্তু অধিক অস্থিরতার

কারণে দীর্ঘ সময় বসে থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব হল না। সেখান থেকে উঠে তিনি রাসূল (সাঃ) যেখানে অবস্থান করছিলেন, তাঁর কাছে চলে গেলেন। সে ঘরের দরজায় রাবাহ নামক একজন সাহাবী (রাঃ) পাহরাদার হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি ঘরের দরজার সিঁড়ির উপর পা ঝুলিয়ে বসেছিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) রাসূল (সাঃ)-এর সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে হযরত রাবহ (রাঃ)-এর মাধ্যমে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। হযরত রাবাহ (রাঃ) রাসূল (সাঃ)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে হযরত ওমর (রাঃ) এর আগমনের কথা জানালে তিনি (সাঃ) চুপ থাকলেন, কোন কথাই বললেন না। হযরত রাবাহ (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ)-কে বললেন, আমি আপনার কথা রাসূল (সাঃ)-কে বলেছি- কিন্তু তিনি কোন কথাই বলেননি।

হযরত ওমর (রাঃ) সেখান থেকে ফিরে এসে মিম্বরের কাছে বসে রইলেন। কিন্তু বেশীক্ষণ বসে থাকতে পারলেন না। অস্থির হয়ে পুনরায় হাযির হয়ে হযরত রাবাহ (রাঃ)-এর মাধ্যমে ভিতরে প্রবেশের আব্‌রো অনুমতি চাইলেন। কিন্তু কোন জওয়াব নেই। রাসূল (সাঃ) এবারও চুপ থাকলেন। এদিকে হযরত ওমর (রাঃ)-এর অস্থিরতাও চরম পর্যায়ে গিয়ে উপনীত হল। তৃতীয় বার চেষ্টা করেও কোন ফল না পেয়ে তিনি যখন নিরাশ হয়ে ফিরে যাচ্ছিলেন, তখন হযরত রাবাহ (রাঃ) তাঁকে পিছন থেকে ডেকে বললেন, আপনাকে ভিতরে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে।

হযরত ওমর (রাঃ) ভিতরে গিয়ে দেখলেন, রাসূল (সাঃ) একটি খেজুর পাতার মাদুরের উপর শুয়ে রয়েছেন। মাদুরের উপর কোনরূপ বিছানা না থাকায় পবিত্র দেহের উপর মাদুরের দাগ পড়ে গিয়েছে। তাঁর মাথার নিচে ছিল খেজুরের ছালের চামড়ার বালিশ। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, আমি সালাম করে প্রথমেই এ কথা জিজ্ঞেস করলাম যে, ইয়া রাসুলুল্লাহ! আপনি কি আপনার বিবিদের তালাক দিয়েছেন? তিনি (সাঃ) উত্তর দিলেন, "না"। আমি রাসূল (সাঃ)-কে সন্তুষ্ট করার জন্য আরয করলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! কোরাইশ বংশের লোকদের, নারীদের উপর আমাদের প্রাধান্য ছিল। কিন্তু মদীনায় এসে দেখলাম, এখানের নারীরা পুরুষের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে আছে। এ পরিবেশে এদের সাথে মেলামেশা করে কোরাইশী নারীরাও প্রভাবান্বিত হয়ে পড়েছে। এরপর আমি আরও দু' একটি কথা বললাম, যার দ্বারা পবিত্র চেহারা মোবারকে মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠল। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, আমি ঘরের চারদিক লক্ষ্য করে দেখলাম এক কোণে তিনটা কাঁচা চামড়া পড়ে আছে, আর

এক কোণে এক মুষ্টি যব পড়ে রয়েছে। এছাড়া আর কোথাও কিছু নেই। এ ছিল ঘরের সমুদয় সম্পদ। তা দেখে আমি কেঁদে ফেললে রাসূল (সাঃ) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কাঁদছ কেন? আমি আরয করলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! কেন কাঁদব না? আপনার পবিত্র দেহ মোবরকে মাদুরের দাগ পড়ে আছে, আর আপনার যাবতীয় সম্পদ তো আমার সামনেই বিদ্যমান।

অতঃপর আমি আরয করলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! দোয়া করুন, আল্লাহ্ তাআলা আপনার উম্মতকেও যেন আর্থিক স্বচ্ছলতা প্রদান করেন। রোম ও পারস্যের বাদশাহরা কত জাঁকজমক, কত বিলাসিতা, কত প্রাচুর্যের মধ্যে জীবন-যাপন করছে। অথচ তারা বেদ্বীন, আল্লাহ্‌র কোন ইবাদত করে না। পক্ষান্তরে আপনি আল্লাহ্‌র রাসূল এবং তাঁর বিশেষ প্রিয় বান্দা। তা সত্ত্বেও এ দুর্দশা। তিনি (সাঃ) বালিশে মাথা রেখে শোয়া অবস্থায় ছিলেন, হযরত ওমর (রাঃ) এর কথা শুনে উঠে বললেন, ওমর তুমি কি এখনও সন্দেহের মধ্যে রয়েছ? শোন, সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, আরাম-আয়েশ শুধুমাত্র দুনিয়াদারদের জন্য দেয়া হয়েছে আর আমাদের জন্য আখিরাতে। হযরত ওমর (রাঃ) আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার তওবা কবুলের জন্য আল্লাহ্ তাআলার কাছে দোয়া করুন। বাস্তবিকই আমি ভুলের মধ্যে নিপতিত রয়েছি। এ হল দু'জাহানের পরিত্রাণকারী, আল্লাহ্‌র অতি প্রিয় রাসূলের জীবন যাপনের নমুনা। যিনি কোন বিছানা ছাড়াই খালি মাদুরে আরাম করলেন, গায়ে মাদুরের দাগ পড়ে গেল, ঘরের মাল ও আসবাব-পত্রের অবস্থাও ইতিপূর্বে আমরা জানতে পারলাম। এ পরিস্থিতিতে অবস্থার উন্নতির জন্য হযরত ওমর (রাঃ) দোয়ার আবেদন করলে, তাঁকে কঠোর সতর্কবাণী শোনানো হল। হযরত আয়েশা রাযিআল্লাহু আনহাকে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, আপনার ঘরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিছানা কিরূপ ছিল ? তিনি উত্তর দিলেন, একটি চামড়ার তোষক ছিল, যার মধ্যে খেজুরের ছাল ভর্তি করে প্রস্তুত করা হয়েছিল। হযরত হাফসা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে এক ব্যক্তি প্রশ্ন করেছিল যে, আপনার ঘরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিছানা কিরূপ ছিল? উত্তরে তিনি বলেন, একটি চট দু ভাঁজ করে বিছানো হত। একদিন আমার খেয়াল হল যে, চটখানি যদি চার ভাঁজ করে বিছানো হয় তাহলে একটু নরম হবে। আমি তাই করলাম। ভোরে ঘুম থেকে জেগে তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আজ আমার নিচে কি বিছানো হয়েছিল? আমি আরয করলাম, নতুন কিছু নয়, ঐ পুরাতন চটখানি আমি চার ভাঁজ করে বিছিয়ে দিয়েছি। তিনি বললেন, বিছানাটি পূর্বে যেভাবে

ছিল, সেভাবেই বিছিয়ে দাও। এরূপ নরম বিছানা রাতে জাগ্রত হতে বাধা সৃষ্টি করে। এখন আমরা আমাদের নরম নরম বিছানার প্রতি একটু লক্ষ্য করি। তাহলে বুঝে আসবে আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্য কতটুকু প্রাচুর্য দান করেছেন। এতদসত্ত্বেও আল্লাহ্ তাআলার নিয়ামতের শোকরিয়া আদায় করার পরিবর্তে সর্বদা অভাব অভিযোগের কথাই আমাদের মুখে আহরহ আলোচনা হচ্ছে।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর ক্ষুধার দৃষ্টান্ত

একবার হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন আমার সেদিনগুলোর কথাও এখনো মনে আছে, যখন আমি ক্ষুধার তাড়নায় বেহুশ হয়ে রাসূল (সাঃ)-এর মিম্বার ও হুজরার মাঝখানে পড়ে থাকতাম। আর লোকেরা উম্মাদ মনে করে আমার ঘাড়ে পা দ্বারা মর্দন করে দিত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমি উম্মাদ ছিলাম না বরং তীব্র ক্ষুধার জ্বালায় বেহুশ হয়ে পড়ে থাকতাম। না খেয়ে ক্ষুধার্ত অবস্থায় কয়েকদিন অতিবাহিত হয়ে যেত। রাসূল (সাঃ) ওফাতের পর আল্লাহ্ তাআলা যখন মুসলমানদের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন করলেন, তখন হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর আর্থিক অবস্থাও স্বচ্ছল হয়েছিল। তিনি অত্যন্ত পরহেজগার ছিলেন। তাঁর কাছে একটি থলে ছিল যার মধ্যে খেজুরের বিচি ভর্তি ছিল। এ খেজুরের বিচি দিয়েই তিনি তাসবীহ্ পাঠ করতেন। যখন থলেটি খালি হয়ে যেত তখন তাঁর দাসী থলেটি পুনরায় ভরে দিত। তিনি সারারাত ইবাদতে মশগুল থাকার জন্য রাতকে তিন ভাগে বিভক্ত করে নিয়েছিলেন, এ নিয়মে তিনি নিজে, স্ত্রী ও খাদেম এ তিন জনে মিলে রাতের এক এক ভাগে ইবাদতে মশগুল থাকতেন। এভাবেই সারারাত তাঁর বাড়িতে ইবাদত-বন্দেগী চলত।

বায়তুল মাল থেকে হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর ভাতা

কাপড়ের ব্যবসা করে হযরত আবু বকর (রাঃ) জীবিকা নির্বাহ করতেন। খলীফাতুল মুসলিমীন নিযুক্ত হওয়ার পরও পূর্বের ন্যায় তিনি কয়েকটি চাদর হাতে নিয়ে বাজারে যাওয়ার পথে হযরত ওমর (রাঃ)-এর সাথে সাক্ষাত হলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় যাচ্ছেন? উত্তরে হযরত আবু বকর (রাঃ) বললেন, বাজারে যাচ্ছি। হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, ব্যবসায় নিমগ্ন থাকলে খিলাফতের কাজ চলবে কি করে? তিনি বললেন, ব্যবসা না করলে স্ত্রী-সন্তানাদি চলবে কি করে? হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, চলুন, আবু ওবায়দার কাছে যাই। তাঁকে রাসূল (সাঃ) বায়তুল মালের খাজাঞ্চী নিযুক্ত করে গেছেন। তিনি আপনার

জন্য একটা ভাতা নির্দিষ্ট করে দিবেন। এরপর, উভয়ে হযরত আবু ওবায়দা (রাঃ)-এর কাছে গেলেন। তিনি একজন সাধারণের জন্য যে পরিমাণ ভাতা নির্ধারণ করেছিলেন সে পরিমাণ ভাতা খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর জন্যও নির্দিষ্ট করে দিলেন বেশিও নয়, কমও নয়।

একবার হযরত আবু বকর (রাঃ) এর স্ত্রী বললেন, মিষ্টান্ন জাতীয় কোন বস্তু খেতে খুব মন চাচ্ছে। তিনি স্ত্রীকে বললেন, মিষ্টি ক্রয় করার মত অর্থ আমার হাতে নেই, কি দিয়ে মিষ্টি ক্রয় করব? বিবি বললেন, আমি প্রতিদিনের খরচ থেকে কিছু অর্থ রেখে দিব এবং তা দিয়ে মিষ্টি খরিদ করব। তিনি অনুমতি দিলেন। কয়েক দিন পর কিছু অর্থ জমা হল। হযরত আবু বকর (রাঃ) বললেন, অভিজ্ঞতায় জানা গেল যে, এ পরিমাণ অর্থ আমি বায়তুল মাল থেকে অতিরিক্ত নিয়ে থাকি। তারপর তিনি সঞ্চিত অর্থগুলো বায়তুলমালে পুনরায় জমা করে দিয়ে ভবিষ্যতে এ পরিমাণ ভাতা কম করে দিলেন এবং খাজাঞ্চিকে ডেকে পাঠালেন এবং নির্দেশ দিলেন যে, প্রতি মাসে এ পরিমাণ টাকা যেন কম দেয়া হয়।

এ হল খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর জীবিকা নির্বাহের অবস্থা, যিনি রাসূল (সাঃ)-এর পর মুসলিম রাষ্ট্রের প্রথম রাষ্ট্রনায়ক ছিলেন। বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে, হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) বলেন, হযরত আবু বকর (রাঃ) খলীফা হওয়ার পর তিনি ঘোষণা করলেন যে, আমি একজন ব্যবসায়ী এবং ব্যবসা আমার জীবিকা নির্বাহের জন্য যথেষ্ট। কিন্তু খলীফা হওয়ার দরুন আমাকে রাষ্ট্রীয় কাজে লিপ্ত থাকতে হচ্ছে। তাই ব্যবসা পরিত্যাগ করে বায়তুল মাল থেকে ভাতা নিচ্ছি। মৃত্যুর সময় হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে বললেন, আমার প্রয়োজনার্থে বায়তুলমালে যা কিছু আছে, আমার পরে এসব জিনিস পরবর্তী খলীফার কাছে জমা করে দিবে। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, মৃত্যুর পর হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর কাছে কোন সম্পদ ছিল না, মাত্র একটি দুগ্ধবতী উষ্ট্রী, কটি পিয়ালা এবং একজন খাদেম ছিল। অন্য রেওয়ায়েতে আছে, একটা ওড়না ও একটা বিছানাও ছিল। এসব জিনিস যখন হযরত ওমর (রাঃ)-এর কাছে পাঠানো হল, তখন তিনি বললেন, আল্লাহ্ তাআলা হযতর আবু বকর (রাঃ)-এর প্রতি রহমত করুন। তিনি পরবর্তী খলীফাদের এ পদ্ধতি অনুসরণের জন্য একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন।

বায়তুল মাল থেকে হযরত ওমর (রঃ)-এর ভাতা

হযরত ওমর (রাঃ) ব্যবসায়ী ছিলেন বিধায় ব্যবসার মাধ্যমেই জীবিকা নির্বাহ করতেন। যখন খলীফা নিযুক্ত হলেন, তখন তাঁর জন্যও বায়তুলমাল থেকে ভাতা নির্ধারণ করা হল। একদিন তিনি মদীনাবাসীকে ডেকে বললেন, আমি ব্যবসায়ী ছিলাম এখন তোমরা আমাকে খিলাফতের কাজে নিযুক্ত করেছ। কাজেই এখন থেকে আমার জীবিকা নির্বাহের উপায় কি? লোকেরা বিভিন্ন ধরনের ভাতার কথা আলোচনা করলেন। হযরত আলী (রাঃ) চুপ করে বসেছিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার অভিমত কি? তিনি বললেন, মধ্যম ধরনের ভাতা যা তোমার ও তোমার পরিবারের জন্য যথেষ্ট হয়। হযরত ওমর (রাঃ) তাঁর প্রস্তাব খুব যুক্তিসঙ্গত বলে মনে করলেন আর মধ্যম ধরনের ভাতাই তাঁর জন্য সুনির্দিষ্ট করা হল।

কিছুদিন পর হযরত আলী (রাঃ), হযরত ওসমান (রাঃ), হযরত তালহা (রাঃ), হযরত যুবায়ের (রাঃ) প্রমুখ সাহাবী (রাঃ)-গণ এক বৈঠকে মিলিত হয়ে হযরত ওমর (রাঃ)-এর ভাতা আরও বৃদ্ধি করার ব্যাপারে প্রস্তাব করলেন। কিন্তু কেহই সাহস করে বলতে পারলেন না। অবশেষে তাঁরা উম্মুল মুমিনীন হযরত হাফসা (রাঃ)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে তাঁর পিতার ভাতা বৃদ্ধির ব্যাপারে তাঁর সাথে কথা বলতে অনুরোধ করে বলেছিলেন যে, হযরত ওমর (রাঃ)-এর কাছে যেন তাঁদের নাম প্রকাশ করা না হয়। হযরত হাফসা (রাঃ) যখন হযরত ওমর (রাঃ)-এর কাছে ভাতা বৃদ্ধির প্রস্তাব পেশ করলেন, তখন তাঁর চোখে-মুখে ক্রোধের চিহ্ন ফুটে উঠল। তিনি এ প্রস্তাব কে করেছে নাম জিজ্ঞেস করলেন। হযরত হাফসা (রাঃ) বললেন, প্রথমে আপনার অভিমত জানতে দিন। হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, আমি যদি লোকটির নাম জানতে পারতাম, তাহলে এমন শাস্তি দিতাম যে, তার চেহারা বিগড়ে যেত। তারপর বললেন, হাফসা! তুমিই বল, তোমার ঘরে রাসূল (সাঃ)-এর উৎকৃষ্টতম পোশাক কি ছিল ? তিনি উত্তর কররেন, দু'টি কাপড় ছিল। যা তিনি জুমার দিন এবং কোন বিদেশী প্রতিনিধি দল আসলে তাদের সাথে সাক্ষাতের সময় পরিধান করতেন। তারপর হযরত ওমর (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, রাসূল (সাঃ) তোমার ঘরে সবচাইতে উত্তম খাদ্য কি খেয়েছেন ? হযরত হাফসা (রাঃ) বললেন, আমরা যবের রুটি খেতাম। আমি গরম রুটির উপর একটু ঘি ঢেলে দিতাম আর তিনি (সাঃ) তাই আনন্দের সাথে খেতেন এবং অন্যকেও খাওয়াতেন। অতঃপর হযরত ওমর (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, তোমার ঘরে রাসূল (সাঃ)-এর সর্বোত্তম বিছানা কিরূপ ছিল? উত্তর

দিলেন, একটা মোটা কাপড়, গরমের সময় আমি তা দু'ভাঁজ করে বিছিয়ে দিতাম আর শীতের সময় এর অর্ধেক বিছিয়ে দিতাম এবং বাকি অর্ধেক তিনি গায়ে দিতেন।

এ কথা শুনে হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, হাফসা ! তুমি এসব লোকদের জানিয়ে দাও, রাসূল (সাঃ) আখিরাতের সুখের আশায় দুনিয়াতে অল্পতেই পরিতুষ্ট হয়ে জীবন যাপন করেছেন আর আমি তাঁরই অনুসরণ করব। আমি রাসূল (সাঃ) ও হযরত আবু বকর (রাঃ) এ দুজন সাথীর মতই জীবন-যাপন করব। আমি আর আমার দুজন সাথী অর্থাৎ রাসূল (সাঃ) ও আবু বকরের উদাহরণ ঐ তিন ব্যক্তির ন্যায় যাঁরা একই পথের পথিক। তন্মোধ্যে প্রথম ব্যক্তি একটি মাত্র পাথেয় নিয়ে চলেছেন আর গন্তব্যস্থলে পৌঁছে গেছেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রথম ব্যক্তির অনুসরণ করেছেন এবং তাঁর নির্দেশিত পথে চলেছেন। সেও প্রথম ব্যক্তির কাছে গিয়ে মিলিত হয়েছেন। অতঃপর তৃতীয় ব্যক্তি পথ চলতে শুরু করেছে। এখন সে যদি পূর্বের দু ব্যক্তির অনুসরণ করে, তাহলে সেও গন্তব্যস্থানে পৌঁছতে পারবে এবং তাঁদের সাথে মিলিত হতে পারবে নতুবা কখনও তাঁদের সাক্ষাত লাভ করতে পারবে না। এটা ঐ ব্যক্তির অবস্থা, দুনিয়ার বড় বড় বাদশাহগণও যার ভয়ে প্রকম্পিত হত তিনি কত সাধারণভাবে জীবন কাটিয়ে দিলেন। একবার আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর (রাঃ) খোতবা দিচ্ছিলেন, তাঁর পরিহিত কাপড়ে বারটি তালি ছিল, তন্মোধ্যে একটি ছিল চামড়ার তালি। একবার তিনি জুমার নামায পড়ানোর জন্য ঘর থেকে বের হতে বিলম্ব হল। মসজিদে পৌঁছে তিনি বললেন, আমার এ কাপড় ব্যতীত অন্য কোন কাপড় নেই, কাপড়খানি ধোয়ার পর শুকাতে একটু দেরী হয়ে গেছে। একদিন হযরত ওমর (রাঃ) আহার করছিলেন। এমন সময় ক্রীতদাস এসে সংবাদ দিল যে, উত্‌বা ইব্‌নে আবি ফারকাদ আপনার সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে এসেছেন।

তিনি ওত্‌বাকে ভিতরে প্রবেশের অনুমতি দিয়ে খানায় শরীক হওয়ার জন্য বললেন। হযরত ওত্‌বা (রাঃ) খানা খেতে বসলেন। খাদ্য এত মোটা ছিল যে, তা খাওয়া যাচ্ছিল না। তখন তিনি বললেন, আটা চালনী দিয়ে ছেঁকেও তো রুটি তৈরী করা যেত। হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, সব মুসলমানেরই কি ময়দার রুটি খাওয়ার সঙ্গতি আছে? তিনি বললেন, সব মুসলমান তো খেতে পারবে না। হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, আফসোস ! তুমি চাও যে, আমি

আমার সমস্ত স্বাদের বস্তু দুনিয়াতেই খেয়ে শেষ করে ফেলি। এ ধরনের বহু দৃষ্টান্ত রাসূল (সাঃ)-এর সাহাবী (রাঃ)-দের রয়েছে। এ যুগে তাঁদের পূর্ণ অনুসরণ সম্ভবও নয় আর প্রত্যেক ব্যক্তিকে এরূপ চেষ্টা করাও অনুচিত। কারণ, আমরা দুর্বল। এত অসাধারণ কষ্ট স্বীকার করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এ জন্যই বর্তমান যুগের হক্কানী পীর মাশায়েখগণ আত্মশুদ্ধির জন্য এত কঠোর সাধনার অনুমতি দেন না, যার দরুন দুর্বলতা সৃষ্টি হতে পারে। কেননা, আমরা তো আগে থেকেই দুর্বল। এসব সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ)-কে আল্লাহ্ তাআলা শক্তিও দান করেছিলেন। তবে হ্যাঁ! তাঁদের অনুসরণের আকাংখা করা এবং যথাসম্ভব চেষ্টা করা অবশ্য কর্তব্য যাতে বিলাসিতার মাত্রা কিছুটা কমে আসে, দুঃখ-কষ্টের সময় সব্‌র করা সহজ হয় এবং বিত্তশালী ও অর্থহীনের মধ্যে কিছুটা সমতা ফিরে আসে। প্রত্যেক ব্যক্তি তার থেকে ধনাঢ্য ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টি রাখে যে, কিভাবে তার মত হওয়া যায়। সর্বদা একটি আক্ষেপ থাকে যে, হায় ! আমি কি হলাম, আমার থেকে তো অমুক ব্যক্তি অনেক বেশি অর্থ-সম্পদের অধিকারী।

হযরত বেলাল (রাঃ) কর্তৃক জনৈক মুশরিক থেকে ঋণ গ্রহণ

এক ব্যক্তি হযরত বেলাল (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, রাসূল (সাঃ)-এর সাংসারিক অবস্থা কিরূপ ছিল? তিনি বলেন, রাসূল (সাঃ)-এর কাছে কোন অর্থ-সম্পদ জমা থাকত না। খরচ নির্বাহের দায়িত্ব আমার উপর ছিল ন্যাস্ত। রাসূল (সাঃ)-এর কাছে কোন মুসলমান ক্ষুধার্ত অবস্থায় আসলে, আমি তার আহারের ব্যবস্থা করতাম। বস্ত্রহীন আসলে আমি তার কাপড়ের ব্যবস্থা করে দিতাম। নিয়মিত এ অবস্থা চলতে থাকত। একদিন এক মুশরিকের সাথে আমার সাক্ষাত হল, সে বলল আমি ধনী এবং বেশ স্বচ্ছল। তুমি অন্য কারও কাছ থেকে করজ না করে, যখন যা প্রয়োজন হয়, আমার কাছ থেকে নিয়ে নিও। আমি বললাম, এর চেয়ে উত্তম আর কি হতে পারে ? তারপর আমি এ ব্যক্তি থেকে করজ নেয়া শুরু করলাম। রাসূল (সাঃ)-এর নির্দেশ পেলেই তার কাছ থেকে ধার নিয়ে মেহমানদের খিদমত করতাম অথবা রাসূল (সাঃ)-এর হুকুম অনুযায়ী ব্যয় করতাম। একবার আমি অযূ করে আযান দেয়ার জন্য মাত্র দাঁড়িয়েছি, এমন সময় এ মুশরিক একদল লোক সাথে নিয়ে এসে আমাকে বলল, হে হাবশী! আমি তার দিকে তাকাতেই সে আমাকে অকথ্য ভাষায়

গালিগালাজ শুরু করে বলল, মাস শেষ হতে আর কত দিন বাকী? আমি বললাম আরও চার দিন বাকী আছে। সে বলল, মাসের শেষে আমার সমুদয় অর্থ পরিশোধ করা না হলে, আমি তোকে আমার টাকার বিনিময়ে গোলাম বানিয়ে নেব এবং পূর্বের ন্যায় ছাগল চরিয়ে বেড়াবে। অতঃপর সে চলে গেল। কথাগুলো শুনে সারাটা দিন যে আমার কিভাবে কেটেছে তা কেবল আল্লাহ্ তাআলা জানেন। ইশার নামাযের পর আমি নির্জনে রাসূল (সাঃ)-এর খিদমতে হাযির হয়ে সমস্ত ঘটনা বলে এবং আরয করলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল, এ মুহূর্তে ঋণ পরিশোধ করার কোন ব্যবস্থা আপনার কাছেও নেই, আমার পক্ষেও এত দ্রুত কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। কিন্তু সে আমাকে অপমান না করে ছাড়বে না। তাই, যদি আপনি অনুমতি দেন, তাহলে ঋণ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত আমি অন্যত্র আত্মগোপন করে থাকব। ঋণ পরিশোধ করার মত অর্থ আপনার হাতে আসলেই আমি চলে আসব।

এ কথা বলে আমি ঘরে ফিরে সফরের প্রস্তুতি নিয়ে ভোর হওয়ার অপেক্ষা করতে থাকি। ভোর হতে না হতেই এক ব্যক্তি ছুটে এসে আমাকে বলল, তুমি এখনই রাসূল (সাঃ)-এর খিদমতে হাযির হও। আমি রাসূল (সাঃ)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে দেখলাম, মাল-রসদে ভর্তি চারটি উষ্ট্রী বসে রয়েছে। আমাকে দেখে রাসূল (সাঃ) হাসি মুখে বললেন, বেলাল! সুসংবাদ নাও! আল্লাহ্ তাআলা তোমার ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। এ নাও চারটি উষ্ট্রী। এদের পিঠে যে সমস্ত মাল আছে, সবই তোমার হাওলা করলাম। ফেদাকের সর্দার এগুলো আমার জন্য হাদিয়া স্বরূপ পাঠিয়েছেন। যাও তোমার সমস্ত ঋণ পরিশোধ করে আস। আমি আল্লাহ্‌র শোকরিয়া আদায় করলাম এবং পরম আনন্দের সাথে সমুদয় ঋণ পরিশোধ করে আসলাম। রাসূল (সাঃ) মসজিদেই আমার অপেক্ষা করছিলেন।

আমি ফিরে এসে বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল, আল্লাহ্ আপনাকে সমস্ত ঋণ থেকে মুক্ত করেছেন। এখন আর কোন ঋণ বাকী নেই। তিনি (সাঃ) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, মালপত্র থেকে কোন কিছু অবশিষ্ট আছে কি? আমি আরয করলাম, হ্যাঁ কিছু অবশিষ্ট রয়েছে। তিনি আদেশ করলেন যে, এগুলোও বন্টন করে দাও। যেন আমি শান্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারি। রাসূল (সাঃ) বললেন, যতক্ষণ পর্যন্ত এগুলো নিঃশেষ না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি বাড়ি যাব না। দিনের শেষে ইশার নামাযের পর রাসূল (সাঃ) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন,

অবশিষ্ট মালগুলো কি শেষ হয়েছে? না কি এখনও বাকী আছে? আমি আরয করলাম, এখনও কিছু বাকী রয়ে গেছে। প্রয়োজন আছে এমন কোন দরিদ্র লোক আসেনি। তিনি বললেন, আমি আজ ঘরে না গিয়ে মসজিদেই থাকব। সুতরাং তিনি মসজিদেই আহার করলেন। দ্বিতীয় দিন ইশার নামাযের পর রাসূল (সাঃ) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, কি বেলাল? কিছু বাকী আছে? আমি আরয করলাম, আল্লাহ্ তাআলা আপনাকে শান্তি দিয়েছেন। রাসূল (সাঃ) আনন্দিত হয়ে আল্লাহ্‌র শোকরিয়া আদায় করলেন। রাসূল (সাঃ)-এর ভয় হয়েছিল, আল্লাহ্ না করুন ! হাতে কিছু মাল থাকা অবস্থায় মৃত্যু এসে যায় না কি। অতঃপর তিনি (সাঃ) আনন্দের সাথে ঘরে ফিরলেন । যাঁরা আল্লাহ্‌কে ভয় করেন, তাঁরা মৃত্যুর পর কোন সম্পদ রেখে যেতে চান না। রাসূল (সাঃ)-এর তো কোন কথাই নেই। তিনি ছিলেন নবীদের সরদার। তিনি কি করে ধন-সম্পদ রেখে যাবেন? তিনি দুনিয়া থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়ে যেতে চেয়েছিলেন। কাজেই ধন-দৌলত কখনও নিজের অধিকারে রাখতেন না, কারণ যে কোন মুহূর্তে মৃত্যু আসতে পারে।

দু'ব্যক্তি সর্ম্পকে রাসূল (সাঃ)-এর অভিমত

রাসূল (সাঃ)-এর কতিপয় সাহাবী (রাঃ)-সহ উপবিষ্ট থাকা অবস্থায় একটি লোক তাঁদের সম্মুখ দিয়ে চলে যাওয়ার সময় রাসূল (সাঃ) সাহাবাদের জিজ্ঞেস করলেন! এ চলে যাওয়া লোকটি সম্বন্ধে তোমাদের ধারণা কি? সাহাবী (রাঃ)-গণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইনি অত্যন্ত শরীফ এবং সর্ব বিষয়ে উপযুক্ত। কোথাও তাঁর বিবাহের প্রস্তাব করলে তা সাদরে গৃহীত হবে আর কারো জন্য সুপারিশ করলে নিশ্চয় রক্ষা করা হবে। এ কথা শুনে রাসূল (সাঃ) নিঃচুপ রইলেন।

এরপর অন্য এক ব্যক্তি এ পথ দিয়ে চলে যাওয়ার সময় তিনি (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, এ লোকটি সম্পর্কে তোমাদের অভিমত কি? জবাবে সাহাবা (রাঃ)-গণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি একজন সাধারণ মুসলমান এবং নিঃস্ব গরীব। তাঁর জন্য কোথাও বিবাহের প্রস্তাব করলে সাদরে গ্রাহ্য হবে না। তাঁর জন্য কোথাও সুপারিশ করলে, তা কার্যকর হবে না। সাহাবা (রাঃ)-গণের কথাবার্তা শোনার পর রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করলেন, প্রথমোক্ত ব্যক্তির মত লোক দ্বারা পৃথিবী পরিপূর্ণ হলেও দ্বিতীয় ব্যক্তির সমতুল্য হতে পরবে না। এ কথার তাৎপর্য হল, পার্থিব মানসম্মানের কোন মূল্যই আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। যেমন কোন কোন মানুষের কাছে একজন নিষ্ঠাবান গরীব মুসলমানের

কোন মূল্য নেই । অথচ সে আল্লাহ্‌র কাছে তাকওয়ার ক্ষেত্রে অনেক মর্যাদার অধিকারী। হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, 'যে দিন আল্লাহ্‌র নাম নেয়ার মত একটি লোকও পৃথিবীতে থাকবে না, সেদিনই কিয়ামত সংঘটিত হবে।' আল্লাহ্‌র নামের বরকতেই পৃথিবীর অস্তিত্ব এখনো টিকে রয়েছে।

দরিদ্রতাই রাসূল (সাঃ) প্রেমিকদের বৈশিষ্ট্য

এক সাহাবী (রাঃ) রাসূল (সাঃ)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ) আমি আপনাকে ভালবাসি। তিনি (সাঃ) উত্তরে বললেন, তুমি যা বলছ, তা চিন্তা-ভাবনা করে বল। সে সাহাবী (রাঃ) পুনঃ বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ)! আমি আপনাকে ভালবাসি। তিনি (সাঃ) পুনরায় একই কথা বললেন। এভাবে তিনবার প্রশ্নোত্তর হলে রাসূল (সাঃ) বললেন, তুমি যদি নিজ দাবীতে সত্য হও, তাহলে দারিদ্র অবলম্বনের জন্য প্রস্তুতি নাও। কেননা যাঁরা আমাকে ভালবাসে, তাঁদের দিকে দরিদ্রতা এত দ্রুত ধাবিত হয়, যেমন পানির স্রোত যেভাবে দ্রুত নিচের দিকে ধাবিত হয়। এ কারণেই সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ)-গণ ও নবী প্রেমিক ওলামা-মাশায়েখগণ অধিকাংশ সময় দারুন অভাব-অনটনের মধ্যে দিনাতিপাত করে থাকেন।

আম্বর অভিযানে রসদের অনটন

অষ্টম হিজরীতে রাসূল (সাঃ)-এর নির্দেশে তিনশত সৈন্যের একটি বাহিনীসহ হযরত আবু ওবায়দা (রাঃ)-এর নেতৃত্বে সমুদ্রোপকূল অভিমুখে রওয়ানা করেন। এ অভিযানে তাঁদের রসদস্বরূপ দেয়া হয়েছিল কিছু খেজুর। সেখানে পনের দিন অবস্থান করার পর তাঁদের সমুদয় রসদ নিঃশেষ হয়ে গেল। দানবীর সাহাবী হযরত কায়েস (রাঃ) মদীনায় ফিরে মূল্য পরিশোধ করার শর্তে সাহাবাদের কাছ থেকে উট ক্রয় করে জবাই করতে আরম্ভ করলেন। প্রতি দিন তিনটি করে উট জবাই হতে লাগল। তৃতীয় দিন সেনাপতি হযরত আবু ওবায়দা (রাঃ) এ ভেবে উট জবাই করা বন্ধ করার নির্দেশ দিলেন যে, এভাবে উট জবাই হতে থাকলে শেষ পর্যন্ত তাঁদের মদীনায় ফিরে যাওয়া মহা সমস্যা দেখা দিবে। অবশেষে তিনি যাঁর কাছে যা কিছু খেজুর অবশিষ্ট ছিল সবই একত্রিত করে একটি থলিতে ভর্তি করে

প্রত্যেককে দৈনিক মাত্র একটি করে খেজুর দিতে লাগলেন। যুদ্ধের ময়দানে যেখানে শক্তি ও বলের প্রয়োজন সেখানে দৈনিক একটি মাত্র খেজুরের উপর নির্ভর করে যুদ্ধাভিযান চালান কত বড় মনোবলের পরিচায়ক। যদি তাঁদের এরূপ মনোবল না হত এরূপ করা সম্ভব হত না। পরবর্তীকালে হযরত যাবের (রাঃ) যখন এ ঘটনা তাঁর সহচরদের শুনাচ্ছিলেন তখন একজন তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, একটিমাত্র খেজুর দ্বারা কি করে দিন কাটাতেন এবং যুদ্ধ পরিচালনা করতেন? হযরত যাবের (রাঃ) বললেন, এর মর্ম তখনই উপলব্ধি হয়েছিল যখন একটি খেজুরও আর অবশিষ্ট ছিল না। তখন আমরা গাছের শুক্না পাতা পানিতে ভিজিয়ে খেতে লাগলাম। অবশেষে আল্লাহ্ তায়ালা সাহাবী (রাঃ)-দের এ মহাসংকট দূর করলেন এবং বিরাটকায় আম্বর নামক একটি মাছের মাধ্যমে। মাছটা এতবড় ছিল যে, তিনশত সৈন্যের কাফেলা ক্রমাগত আঠার দিন খেয়েও তা শেষ করতে পারেনি। অবশেষে মাছটির কিছু অংশ মদীনায়ও আনা হয়েছিল।

রাসূল (সাঃ)-বিস্তারিত ঘটনা শুনে বলেছিলেন, এ রিযিক আল্লাহ্র তরফ হতে তোমাদের জন্য বিশেষ দান স্বরূপ। দুঃখ-কষ্ট, অভাব-অনটন এ দুনিয়ার একটি স্বাভাবিক ব্যাপার, তবে আল্লাহ্র বিশেষ বান্দাদের কাছে এগুলো অধিকমাত্রায় এসে থাকে। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, নবী-রাসূলগণ সবচেয়ে বেশি কষ্ট ভোগ করে থাকেন। তারপর যাঁরা সর্বোত্তম লোক তারাও দুঃখ-কষ্ট ও অভাব-অনটনে পতিত হয়ে থাকেন। এভাবেই দ্বীনদারীর পর্যায় হিসাবে মানুষের পরীক্ষা হয়ে থাকে।

কিন্তু আল্লাহ্র খাস বান্দাদের কাছে যে দুঃখ-কষ্ট আসে, তারপর তাঁদের সুখও অনিবার্য। আমাদের চিন্তা করা উচিত আমাদের অগ্রগামীরা কিরূপ জীবন যাপন করেছেন। দ্বীনের জন্য তাঁরা কতখানি ত্যাগ স্বীকার করেছেন। যে ধর্মকে আজ আমরা হেলায় হারাতে বসেছি সে ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য আজ আমাদের পূর্বপুরুষগণ কতই না কষ্ট ভোগ করেছেন। দিনের পর দিন উপবাস করেছেন, গাছের পাতা খেয়েছেন, পেটে পাথর বেঁধেছেন, বুকের তাজা রক্ত দিয়েছেন। আজ আমরা সে ধর্মকে রক্ষাও করতে পারছিনা। আমরা আজ তাঁদের মত ও পথ থেকে কত দূরে?

পঞ্চম অধ্যায়

সাহাবী (রাঃ)-দের পরহেযগারী

আমাদের সাহাবায়ে কিরামের প্রতিটি কাজ এবং প্রতিটি অভ্যাস অনুসরণ ও আমল করার উপযোগী। কারণ, আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর প্রিয় রাসূল (সাঃ)-এর সাহচর্যের জন্য একমাত্র তাঁদের জামাতকেই নির্বাচিত করেছেন। সাহাবীদের সম্পর্কে রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেন, 'আমি শ্রেষ্ঠতম মানুষের যুগে প্রেরিত হয়েছি।' অতএব, শ্রেষ্ঠতম যুগের শ্রেষ্ঠতম লোকদেরকেই রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাহচর্যের জন্য বাছাই করা হয়েছিল।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরহেযগারী

একদিন রাসূল (সাঃ) একটি জানাযা থেকে ফিরার পথে একটি মেয়েলোকের দাওয়াত গ্রহণ করলেন। রাসূল (সাঃ) সাহাবীদের নিয়ে যখন আহার করতে বসলেন তখন তিনি একখন্ড গোশ্ত চিবাচ্ছিলেন অথচ তা গিলতে পারছেন না। রাসূল (সাঃ) বললেন, আমার মনে হয় গোশ্তটির কোথাও কিছু গলদ রয়েছে। মেয়েলোকটি বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি বকরী আনার জন্য বাজারে লোক পাঠিয়েছিলাম কিন্তু বকরী না পাওয়াতে আমার প্রতিবেশীর একটি বকরী ক্রয় করেছি। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ মালিক বাড়ি না থাকায় তার স্ত্রী বকরীটি পাঠিয়েছে। তখন রাসূল (সাঃ) বললেন, এর গোশ্ত কয়েদীদেরকে খাইয়ে দাও। সন্দেহজনক কোন জিনিস এরূপ হয়ে যাওয়া নিতান্তই স্বাভাবিক। তাঁর নিষ্ঠাবান অনুসারীদের ব্যাপারেও এরূপ ঘটনা বিরল নয়।

সন্দেহযুক্ত খেজুর

একদিন রাসূল (সাঃ) সারাটি রাত বিনিদ্র অবস্থায় ছটফট করছিলেন। বিবিদের মধ্য হতে একজন তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, আজ আপনার ঘুম হচ্ছে না কারণ কি? তিনি (সাঃ) বললেন, একটি খেজুর পড়েছিল, নষ্ট হয়ে যাবে ভেবে আমি তা উঠিয়ে খেয়ে ফেলেছি, কিন্তু পরক্ষণই মনে হল; তা যদি সদ্কার মাল হয়ে থাকে? এ চিন্তায় আমার ঘুম আসছে না। সদ্কার মাল সন্দেহে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সারাটি রাত ছটফট করে কাটিয়ে দিলেন। পক্ষান্তরে আমাদের অবস্থা এ যে, সুদ, ঘুষ, চুরি, ডাকাতি যত ইসলাম বহির্ভূত কাজ সব কিছু করেও আমরা আনন্দচিত্তে খাওয়া দাওয়া করছি, রাতভর আরামে নিদ্রা যাচ্ছি, আবার নবীজীর উম্মত বলেও দাবী করছি।

হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর পরহেযগারী

মুসলিম জাহানে প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর একজন গোলাম ছিল। সে আপন মুক্তির জন্য আয়ের একটি নির্ধারিত অংশ হযরত আবু বকর (রাঃ) কে প্রদান করত। একদিন এ ক্রীতদাস কিছু খাদ্য হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর সম্মুখে আনয়ন করলে তিনি এক লোকমা খেলেন। ক্রীতদাস বলল, আমীরুল মু'মেনীন! আমি এ খাদ্য কোথা থেকে এনেছি তা জিজ্ঞেস করলেন না? তিনি বললেন, ক্ষুধার তীব্রতায় আমি সে কথা জিজ্ঞেস করতে ভুলেই গিয়েছি, এখন বল, এ খাদ্য তুমি কোথা থেকে এনেছ? সে বলল, অন্ধকার যুগে আমি কাফের থাকা অবস্থায় এক গোত্রের লোকদের কিছু তদবীর করেছিলাম। তারা আমাকে কিছু দেয়ার ওয়াদা করেছিল। আজ তাদের সেখানে বিবাহের উৎসব ছিল, আমি সেখানে গেলে ঐ মজুরী বাবত এ খাদ্য দিয়েছে। এ কথা শুনে হযরত আবু বকর (রাঃ) বললেন, তুমি আমাকে ধ্বংস করে দিয়েছ। এ বলে তিনি গলার ভিতর হাত ঢুকিয়ে বমি করার চেষ্টা করতে থাকেন। কিন্তু বমি হল না, তীব্র ক্ষুধা অবস্থায় খাওয়া একটি মাত্র লোকমা সহজে কি বের হয়? তাঁর কষ্ট দেখে এক ব্যক্তি বললেন, আল্লাহ্ আপনার উপর রহমত করুন! একটিমাত্র লোকমার জন্য এত কষ্ট? তিনি উত্তর দিলেন, এ লোকমা বের করতে আমার জীবনও যদি বিপন্ন হয় তবুও তা বের করব। কেননা, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখে শুনেছি, যে শরীর হারাম খাদ্য দ্বারা পরিপুষ্ট হয়, তা জাহান্নামের আগুনের উপযোগী। আমার শরীরের কোন অংশ হারাম খাদ্য দ্বারা গঠিত না হোক, তা আমি চাইনা, শুধু এ জন্যেই প্রাণান্তকর চেষ্টা করছি। একবার তাঁর এক ক্রীতদাস অন্ধকার যুগে জ্যোতির্বিদ্যার মাধ্যমে গায়েবের কোন কথা বললে ঘটনাক্রমে তা বাস্তবে পরিণত হয়েছিল। তারা ক্রীতদাসকে বিনিময়ে খাদ্য দিয়েছিল। সে খাদ্য থেকে হযরত আবু বকর (রাঃ) কে কিছু দিলে তিনি তা খেয়েছিলেন, কিন্তু পরে সমস্ত খাদ্য বমি করে ফেলেছিলেন। ক্রীতদাসের মাল হারাম নয়। কিন্তু শুধু সন্দেহের কারণে তিনি তা গ্রহণ করেননি। –(বুখারী)

হযরত ওমর (রাঃ)-এর দুধ পান

একবার দুধ পান করে হযরত ওমর (রাঃ) এক অস্বাভাবিক স্বাদ অনুভব করেন। যিনি দুধ দিয়েছিলেন, তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এ দুধ কোথায় পেলে? লোকটি বলল, আমি জঙ্গলে গিয়েছিলাম, সেখানে লোকেরা উটের দুধ দোহন করলেন। তারা আমাকেও ঐ দুধ থেকে কিছু অংশ দিয়েছিল। আমি সে দুধই আপনাকে দিয়েছি। শুনামাত্রই তিনি গলার ভিতর হাত ঢুকিয়ে বমি করে

ফেললেন। আল্লাহ্ভীরু লোকেরা সামান্যতম সন্দেহজনক বস্তুও গ্রহণ করতেন না, যেন তা দ্বারা শরীরের কোন অংশ প্রতিপালিত হয়ে না যায়। অথচ আজ আমরা অপবিত্র বস্তুও গ্রহণ করতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধাবোধ করিনা।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর বাগিচা দান

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) মৃত্যুকালে উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে ডেকে বললেন, আমার ইচ্ছা ছিল না যে, বায়তুল মাল থেকে কিছু গ্রহণ করি। কিন্তু ওমর (রাঃ) আমার কষ্ট হবে মনে করে আমাকে তা গ্রহণ করতে বাধ্য করে বললেন যে, ব্যবসা জারী রাখলে খিলাফতের কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি হতে পারে। তাই আমি তা কবুল করি। এখন শোন, আমার অসিয়ত এ যে, বায়তুল মাল থেকে গৃহীত ভাতার পরিবর্তে আমার অমুক বাগানটি দান করলাম। তাঁর ইন্তিকালের পর হযরত আয়েশা (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ)-এর কাছে অসিয়ত মোতাবেক বাগানটি দান করে দেন। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, তোমার পিতার উপর আল্লাহ্ রহমত করুন। তিনি চাইলে, তাঁর বিরুদ্ধে কারো মুখ খোলার কোন সুযোগ না থাকে। চিন্তার বিষয় যে, তাঁর ভাতার পরিমাণই বা কি ছিল? আর তাও তিনি গ্রহণ করেছিলেন জনগণের তাগিদে, সুষ্ঠুভাবে খিলাফতের কাজ পরিচালনার স্বার্থে। তদুপরি বিবি যে সামান্য অর্থ মিষ্টি খাওয়ার জন্য রেখেছিলেন, তাও মিষ্টি না খেয়ে তা পুনরায় বায়তুল মালে জমা করে দিলেন। তারপরও মনে সন্দেহ। অবশেষে প্রতিদানস্বরূপ নিজের বাগানটাই দান করে গেলেন। এরূপ দৃষ্টান্ত কি আর কোথাও পাওয়া যাবে।

একজন মুহাদ্দিসের পরহেযগারী

একজন সুপ্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ছিলেন আলী ইব্নে মা'বাদ (রহঃ)। তাঁর জীবনের একটি ঘটনায় বলেন, আমি একটি ভাড়াটিয়া বাড়িতে অবস্থান করতাম। কালি শুকানোর জন্য আমার সামান্য মাটির প্রয়োজন হলে ঘরের দেয়াল থেকে সামান্য মাটি নিয়ে কালি শুকিয়ে ফেলি। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হল, এটাতো ভাড়াটিয়া বাড়ি। এর দেয়ালের মাটি ব্যবহার করার আমার তো কোন অধিকার নেই। কিন্তু সাথে সাথে এ কথাও মনে হল যে, এ সামান্য মাটি নিলে কি আর দোষ হবে? এটা নিতান্তই তুচ্ছ বস্তু। এ কথা ভেবে দেয়াল থেকে সামান্য মাটি নিয়ে শুকানোর কাজটা সেরে ফেলি। রাতে স্বপ্নে দেখলাম, এক ব্যক্তি সামনে দাঁড়িয়ে বলছেন, কাল কিয়ামতে তুমি বুঝতে পরবে এ তুচ্ছ মাটি কি বস্তু। সত্যিকারভাবে যাঁরা পরহেযগার তাঁরা এ তুচ্ছ বস্তু সম্বন্ধেও সতর্কতা অবলম্বন করেন। পরহেযগারী ও আল্লাহ্ ভীতিতে যিনি আল্লাহকে যত বেশি ভয় করেন, তিনিই তত বেশি পরহেযগার হয়ে থাকেন।

কবর সম্বন্ধে উপদেশ

হযরত কোমায়েল (রাঃ) এক বর্ণনায় বলেন, আমি একবার হযরত আলী (রাঃ)-এর সাথে কোথাও যাচ্ছিলাম। তিনি হযরত আলী (রাঃ) ময়দানের মধ্যে একটি কবরস্থানে সম্বোধন করে বলতে লাগলেন, হে কবরবাসীরা, তোমাদের কি খবর? তোমরা কি অবস্থায় এখানে দিনাতিপাত করছ? অতঃপর তিনি আমার দিকে মুখ করে বললেন, হে কোমায়েল! যদি এ কবরবাসীরা কিছু বলতে পারত, তাহলে এ কথাই বলত যে, সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ হল তাক্ওয়া ও পরহেযগারী। এ কথা বলেই তিনি কেঁদে বললেন, হে কোমায়েল! কবর হল আমলের সিন্দুক এবং মৃত্যুর সময় সব কিছু পরিষ্কার বুঝে আসে। অর্থাৎ মানুষ ভাল-মন্দ যা কিছুই করে তা কবরের মধ্যে সংরক্ষিত থাকে। হাদীসে বর্ণিত আছে, নেক আমল সুদর্শন নেক লোকের বেশে মৃত ব্যক্তির সান্ত্বনার জন্য তার কাছে আগমন করে। আর বদ আমল বীভৎস বদলোকের বেশে মৃত ব্যক্তির কাছে আসে, যা তার জন্য অধিকতর কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। একটি হাদীসে বর্ণিত রয়েছে, প্রত্যেক মৃত ব্যক্তির সাথে কবর পর্যন্ত তিনটি বস্তু যায়। (১) তার ধন-সম্পদ (২) তার আত্মীয় স্বজন, (৩) তার আমল। এরি মধ্যে ধন-সম্পদ ও আত্মীয় স্বজন দাফনের পর ফিরে আসে আর আমল তার সাথে থেকে যায়।

রাসূল (সাঃ) একদিন এ বিষয়টি দৃষ্টান্ত স্বরূপ এভাবে বলেছিলেন যে, মনে কর এক ব্যক্তির তিনটি ভাই আছে, মৃত্যুকালে সে একজনকে ডেকে বলল, ভাই! তুমি জান আমার উপর কিরূপ বিপদ আপতিত হয়েছে? এ মুহূর্তে তুমি আমার কি সাহায্য করতে পার? সে বলল, আমি তোমার চিকিৎসা করব, তোমার খিদমত করব, তোমার মৃত্যু হলে তোমাকে গোসল দিয়ে কাফন দাফনের ব্যবস্থা করব। অতঃপর তোমার মহিমা প্রচার করতে থাকব। রাসূল (সাঃ) বলেন, এ ভাইটি হল তার পরিবার-পরিজন ও আত্মীয় স্বজন। অতঃপর সে দ্বিতীয় ভাইকে ডেকে জিজ্ঞেস করল, এ অবস্থায় তুমি আমার কি সাহায্য করতে পার? সে বলল, তোমার এবং আমার সম্পর্ক হল দুনিয়ার হায়াত পর্যন্ত। তোমার মৃত্যুর পর আমি অন্যত্র চলে যাব। রাসূল (সাঃ) বলেন, এ ভাই হল মৃত ব্যক্তির ধন-সম্পদ।

অতঃপর সে তার তৃতীয় ভাইকে ডেকে অনুরূপ প্রশ্ন করল। তখন সে বলল, দুনিয়াতেও আমি তোমার সাথে রয়েছি, কবরেও তোমার সাথেই থাকব

এবং ঐ নির্জন ঘরে তোমার বন্ধু হব। হিসাব-নিকাশের সময় নেকীর পাল্লায় বসে তা ভারী করে দিব। রাসূল (সাঃ) বলেন, এ ভাই হল তার নেক আমল। অতঃপর তিনি সাহাবী (সাঃ)-দের উদ্দেশ্য করে বললেন, এখন তোমরাই বল, এ লোকের কোন ভাইটি সত্যিকারভাবে কাজে এল? প্রথম দু' ভাই তো তার কোন কাজে এল না।

হারাম ভক্ষণে দোয়া কবুল হয়না

রাসূল (সাঃ) বলেন, আল্লাহ্ তায়ালা নিজে পবিত্র এবং শুধু পবিত্র মালই তিনি গ্রহণ করেন। তিনি রাসূল (সাঃ)-কে যে আদেশ দিয়েছেন, সমস্ত মুসলমানকেও তিনি সে আদেশই দিয়েছেন। যেমন-কুরআন মজীদে ঘোষিত হয়েছে-يٰٓاَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبٰتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا اِنِّىْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ـ

অর্থ ঃ হে রাসূলগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু খাও এবং নেক আমল করতে থাক। আমি তোমাদের আমল সম্পর্কে অবগত রয়েছি। অন্যত্র মুমিনদেরকে লক্ষ্য করে বলেন-

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ ـ

অর্থ ঃ হে ঈমানদারগণ! আমার দেয়া পবিত্র হালাল রিযিকসমূহ ভক্ষণ কর। অতঃপর রাসূল (সাঃ) এক ব্যক্তির নাম উল্লেখ করে বললেন যে, সে লম্বা লম্বা সফর করত, যে কারণে তার মাথার চুল এলোমেলো থাকত, তার পোশাক ময়লাযুক্ত থাকত। এরূপ পেরেশান অবস্থায় সে ব্যক্তির দু হাত আকাশের দিকে তুলে বলে, ইয়া আল্লাহ্, ইয়া আল্লাহ্! কিন্তু তার খাওয়া-পরা পোশাক-পরিচ্ছদ সব কিছুই হারাম মালের। এমতাবস্থায় তার দোয়া কি করে কবুল হতে পারে? আমাদের সর্বদাই অভিযোগ যে, আমাদের দোয়া কবুল হয় না। কেন যে দোয়া কবুল হয় না তা এ হাদীস দ্বারাই উপলব্ধি করা যায়। আল্লাহ তায়ালা ইচ্ছা করলে ফাসিক গুনাহ্গারের কেন, অনেক সময় কাফেরের দোয়াও কবুল করেন। তবে মুত্তাকী পরহেযগারদের দোয়াই প্রকৃত দোয়া। সেজন্যই সবাই পরহেযগারদের দ্বারাই দোয়া কবুল করানোর আশা করেন। যারা নিজের দোয়া কবুল হওয়ার আশা রাখেন তাদের অবশ্যই হারাম মাল বর্জন করা উচিত।

দোয়া করার পদ্ধতি

হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন- দোয়া করার প্রকৃত নিয়ম হল তোমরা নিজেদের হস্তযুগলকে কাঁধ বরাবর অথবা তার নিকটতম পরিমাণ উত্তোলন করবে। আর ইস্তিগফার করলে একটি আংগুলী দ্বারা ইংগিত করবে। প্রকৃত দোয়া করার পদ্ধতি হল, তোমার হস্তযুগলকে একই সাথে সম্প্রসারিত করবে। অন্য এক বর্ণনায় দোয়ার এ পদ্ধতি আলোচিত হয়েছে যে, উভয় হস্তকে উত্তোলন করতে হবে এবং হস্তের তালুকে নিজের মুখমন্ডলের দিকে রাখতে হবে। -(আবু দাউদ ও মিশকাত)। দোয়ায় হস্ত উত্তোলন করে কাকতি মিনতি সহ দোয়া করলে দোয়া কবুল হবে বলে আশা করা যায়। যেমন সাহাবী হযরত সালমান (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ) বলেছেন, আল্লাহ্ অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়ালু। কোন বান্দা হস্ত উত্তোলন করে তাঁর কাছে কিছু প্রার্থনা করলে তখন তিনি বান্দাকে খালি-হাতে ফিরিয়ে দিতে লজ্জাবোধ করেন। -(আবু দাউদ, তিরমিযী, বায়হাকী, মিশকাত)। রাসূল (সাঃ) আল্লাহ্‌র কাছে কোন দোয়া করলে তিনি হস্ত উত্তোলন করে দোয়া করতেন আর এটাই ছিল তাঁর সাধারণ অভ্যাস। হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে, "রাসূল (সাঃ)-এর এ অভ্যাস ছিল যে তিনি দোয়াকালীন করতালু নিজের মুখমন্ডলের দিকে করতেন। -(জামেউ সাগীর-সুযূতী)

দ্রষ্টব্য ঃ "দোয়া কবুলের প্রধান শর্ত হল হালাল রোজগার।"

হযরত ওমর (রাঃ)-এর সতর্কতা

বাহ্‌রাইন থেকে একবার হযরত ওমর (রাঃ)-এর কাছে কিছু মেশ্‌ক আসলে তিনি বললেন, কেহ এগুলো ওজন করে মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করে দাও। তাঁর স্ত্রী হযরত আতেকা (রাঃ) আরয কররেন, আমিই এগুলো মেপে দিব। কিছুক্ষণ পর তিনি আবার বললেন, কেহ এগুলো বন্টন করে দাও। স্ত্রী আবার বললেন, আমি এগুলো বন্টন করে দিতে পারি। তিনি চুপ থাকলেন। তৃতীয়বার আবার যখন এরূপ বলাবলি হল, তখন তিনি বললেন, আমার মন চায় না যে, তুমি এগুলো নিজের হাতে পাল্লায় রাখবে এবং পরে এ হাত শরীরে মালিশ করে দিবে। এভাবে হয়ত কিছুটা মেশ্‌ক আমার অংশে বেশি এসে যাবে। কিন্তু হযরত ওমর (রাঃ)-এর কি আশ্চর্যজনক সতর্কতা। যে কেহ মেশ্‌ক

ওজন করবে, তার হাতে নিশ্চয় কিছুটা লাগবে। স্ত্রীর ওজন করাটা পর্যন্ত সহ্য করলেন না, একমাত্র আখিরাতের ভয়ে। হযরত ওমর ইব্‌নে আবদুল আযীয (রহঃ) একবার তাঁর খিলাফতের আমলে এরূপ মেশ্‌ক ওজন করার সময় নিজের নাক বন্ধ করে নিয়ে বললেন, সুগন্ধি গ্রহণই তো মেশ্‌কের একমাত্র উদ্দেশ্য। আমাদের পূর্ববর্তীদের এটাই ছিল সতর্কতার নিদর্শন। চিন্তা-চেতনায় তাঁরা কত সতর্কতা অবলম্বন করতেন উল্লেখিত ঘটনাই উপলব্ধি করা যায়।

গভর্নরকে বরখাস্ত

কোন এক ব্যক্তিকে হযরত ওমর ইব্‌নে আবদুল আযীয (রহঃ) গভর্নর নিযুক্ত করলে এতে এক ব্যক্তি আপত্তি করে বলল, হাজ্জাজ ইব্‌নে ইউসুফও এ ব্যক্তিকে গভর্নর নিযুক্ত করেছিল। হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয এ কথায় শুনে তাকে বরখাস্ত করে দিলেন। লোকটি বলল, আমি হাজ্জাজের শাসনামলে সামান্য কয়দিন গভর্নর ছিলাম। তিনি উত্তর দিলেন, তুমি তার সাথে একদিন অথবা তার চেয়ে কম সময় থাকাও তোমার মন্দ হওয়ার জন্যই যথেষ্ট। সংশ্রবের একটা প্রভাব মানুষের মধ্যে নিশ্চয় পড়ে যায়। প্রবাদ আছে-সৎসঙ্গে জান্নাতবাস, অসৎসঙ্গে সর্বনাশ। কাজেই খারাপ লোকের সংশ্রব ত্যাগ করা উচিত। মনস্তত্ত্ববিদরা বলেন, খাবার লোকের উপকার ও গ্রহণ করতে নেই, কেননা এটাও এক সময় ক্ষতি ভয়ানক কারণ হয়ে দাঁড়ায়। পরিস্থিতি এবং পরিবেশশে শুধু মানুষ কেন? জীব-জানোয়ারের স্বভাবও মানুষের মধ্যে এসে যায়।

রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেন, উট ও ঘোড়ার মালিকদের মধ্যে অহংকার আর বকরীর মালিকদের মধ্যে বিনয় দেখা যায়। রাসূল (সাঃ) আরও বলেন, নেক লোকের সাহচার্যের দৃষ্টান্ত এ লোকের মত যে মেশ্‌ক বিক্রেতার কাছে বসলে, যদি সে মেশ্‌ক নাও কিনে তবুও তার সুগন্ধে মস্তিষ্ক শীতল হয়। পক্ষান্তরে রাসূল (সাঃ) অসৎলোকের সংশ্রবকে কামারের চুলার সাথে তুলনা করেছেন। অর্থাৎ আগুনের স্ফুলিঙ্গ গায়ে না আসলেও তার উত্তাপ ও ধোঁয়া থেকে নিশ্চয় নিস্তার পাবে না।

ষষ্ঠ অধ্যায়

নামাযে অনুরাগ ও বিনয়

নামায হল মু'মিনের সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত। কিয়ামতের দিন ঈমানের পর সর্বপ্রথম নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেন, কুফর এবং ইসলামের মাঝখানে নামাযই হল একমাত্র অন্তরায়। সুতরাং যে ব্যক্তি নামায পড়ে না, সে কাফেরের সমতুল্য। নামায সম্পর্কে কোরআনে ঘোষিত হয়েছে- "যারা নামায পড়ে, যাকাত দেয় ও পরলোকে নিশ্চিত বিশ্বাসী তারাই তাঁদের প্রতিপালক কর্তৃক নির্দেশিত পথে রয়েছে এবং তারাই সফলকাম। (৩১ঃ ৪-৫)। নামায সম্পর্কে হাদীসে আরও বলা হয়েছে- নামায ধর্মের খুঁটি, যে ব্যক্তি দৃঢ় রাখে এবং যে তা ত্যাগ করে সে ধর্মকে ধ্বংস করে। -(সগীর)

নফল নামায আদায়কারীদের মর্যাদা

মহান আল্লাহ্ বলেন, যে ব্যক্তি আমার কোন ওলীর সাথে শত্রুতা করে, আমার পক্ষ থেকে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হল। কোন বান্দা ফরয ব্যতীত অন্য কোন বস্তুর সাহায্যে আমার নৈকট্য লাভ করতে পারে না। তবে নফলের সাহায্যে বান্দা আমার এত অধিক নৈকট্য লাভ করে যে, আমি তাকে আমার মাহবুবরূপে গ্রহণ করি। তখন আমি তার কর্ণ হয়ে যাই, যদ্দ্বারা সে শ্রবণ করে, আমি তার চক্ষু হয়ে যাই যদ্দ্বারা সে দেখে, আমি তার হাতে হয়ে যাই যদ্দ্বারা সে ধরে, আমি তার পা হয়ে, যাই যদ্দ্বারা সে চলে, সে আমার কাছে কিছু চাইলে, আমি তা দান করি, আর কোন কিছু থেকে আশ্রয় চাইলে, আমি তার হিফাযত করি। আল্লাহ তায়ালার চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি হয়ে যাওয়ার অর্থ এটা যে, তখন তার দেখা-শুনা, চলা-ফেরা সবকিছু একমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টিতে হয়ে যায়। তখন আল্লাহ্র সন্তুষ্টির বাইরে আর কোন কাজই সে করতে পারে না। কত বড় সৌভাগ্যবান এ সব লোক, যারা ফরয আদায় করার পর অতি মাত্রায় নফল আদায় করেন। আমাদের সকলকে আল্লাহ্ তায়ালা স্বীয় মেহেরবানীতে আমাদের সকলকে এ মহা মূল্যবান সম্পদ দান করুন। আমীন॥

রাসূল (সাঃ)-এর সারারাত নামায ও কিরআত

হযরত আয়েশা (রাঃ) কে এক ব্যক্তি বললেন, রাসূল (সাঃ)-এর এমন কোন আশ্চর্যজনক ঘটনা আমাকে বলুন যাআপনি স্বচক্ষে দেখেছেন। তিনি বললেন, রাসূল (সাঃ)-এর কোন ঘটনা আশ্চর্যজনক নয়। এক রাতে তিনি আমার ঘরে আগমন করে আমার পাশে শুয়ে অল্পক্ষণ পরেই বললেন, আমি ইবাদত করব। এ বলে তিনি নামাযে দাঁড়িয়ে কাঁদতে কাঁদতে চোখের পানিতে তাঁর বুক ভেসে যায়। তারপর রুকু করলেন, সেখানেও এভাবেই কাঁদলেন, অতঃপর সিজদা করলেন, সেখানেও এভাবে কাঁদলেন। তারপর সিজদা থেকে উঠেও অনুরূপভাবে কাঁদলেন, এভাবে ভোর পর্যন্ত নামাযের মধ্যে কেঁদে কাটিয়ে দিলেন। এমন কি হযরত বেলাল (রাঃ) এসে ফযরের নামাযের জন্য ডাক দিলে আমি আরয করলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ)! আপনার অগ্রপশ্চাতের যাবতীয় গুনাহ্ মাফ হওয়া সত্ত্বেও আপনি এত বেশি কাঁদছেন কেন? তিনি (সাঃ) উত্তর দিলেন, আমি কি তার কৃতজ্ঞ বান্দা হব না? রাসূল (সাঃ) যখন তাহাজ্জুদ নামায পড়তেন তখন তার কিয়াম করা অর্থাৎ সূরা তিলাওয়াতে দাড়িয়ে থাকা যে কত সুদীর্ঘ হত তা সাধারণ মানুষের ধারণায়ও আসা অসম্ভব।

রাসূল (সাঃ)-এর ইবাদত

রাসূল (সাঃ) ইবাদত বন্দেগীতে তিনি ছিলেন মধ্যপন্থী। নফল রোযা রাখতেন আবার মাঝে ছেড়ে দিতেন, রাত জেগে নামায পড়তেন এবং নিদ্রাও যেতেন। সবকিছুতেই তিনি মধ্যম পন্থা অবলম্বন করতেন। কালাম মজীদে রাসূল (সাঃ)-এর উম্মতকে তাই মধ্যপন্থী বলা হয়েছে।

রাসূল (সাঃ)-এর কিরআত

এক হাদীসে রাসূল (সাঃ) বলেনঃ আল্লাহ্র কাঠে সে নামায অধিক প্রিয় যে নামাযে কিয়ামে দাড়িয়ে থাকা সুদীর্ঘ হয়। তিনি এত দীর্ঘক্ষণ নামাযে দাড়িয়ে থাকতেন যে, তাঁর পা ফুলে যেত, ফেটে যেত। কখনও কখনও প্রায় সারা রাতই দাঁড়িয়ে কেটে যেত। হযরত হোযাইফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত , তিনি বলেনঃ আমি এক রাতে রাসূল (সাঃ)-এর সাথে তাহাজ্জুদ পড়েছিলাম। তিনি সূরাহ বাকারাহ পড়তে শুরু করলেন। আমি মনে মনে বললাম, হয়তঃ তিনি একশ আয়াতে রুকু করবেন। তারপর তিনি এগিয়ে চললেন, আমি মনে মনে বললাম হয়তঃ তিনি এ সূরাহটি শেষ করে রুকু করবেন। কিন্তু এরপর তিনি সূরাহ নিসা শুরু করলেন এবং তা পড়ে ফেললেন। এরপর সূরাহ আল ইমরান শুরু করলেন এবং তাও শেষ করে ফেললেন। তিনি তারতীল সহকারে অর্থাৎ ধীরে সুস্থে থেমে থেমে কিরআত করছিলেন। যখন তিনি কোন তাসবীহের আয়াতে পৌছতেন তখন তাসবীহ করতেন এবং কোন প্রার্থনায় স্থানে পৌছলে আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করতেন আর আশ্রয় প্রার্থনা আয়াতে পৌছলে আল্লাহ্র

কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। তারপর তিনি রুকু করতেন, তিনি বলতে থাকলেন "সুবাহানা রাব্বিয়াল আযিম" পবিত্রতা বর্ণনা করছি আমি আমার মহান আল্লাহ্‌র। তাঁর রুকুও ছিল তাঁর কিয়ামের সমান। তারপর তিনি রুকু থেকে মাথা উঠাতে উঠাতে বললেনঃ সামিআল্লাহ্‌ লিমান হামিদাহ-রাব্বানা লাকাল হামদ অর্থাৎ আল্লাহ্‌ শুনছেন, তাঁর প্রশংসা বাণী যে আল্লাহ্‌র প্রসংশা করছে। এ সময় তিনি দীর্ঘ কিয়াম করলেন, প্রায় যত সময় রুকু করেছিলেন, তত সময় পর্যন্ত। তারপর তিনি সিজদাহ করলেন এবং এতে বললেনঃ সুবাহানা রাব্বিয়্যাল আলা অর্থাৎ পবিত্রতা বর্ণনা করছি আমি আমার উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন রবের। তার সিজদাও ছিল প্রায় কিয়ামের সমান।-(মুসলিম)। জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত-রাসূল (সাঃ) কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, কোন নামায উত্তম? তিনি জবাব দিলেন, যে নামাযে কিয়াম দীর্ঘায়িত হয়।-(মুসলিম)

রাসূল (সাঃ)-এর চার রাকাত নামাযে ছয় পারা পাঠ

হযরত আউফ (রাঃ) বলেন, আমি একবার রাসূল (সাঃ)-এর সহযাত্রী ছিলাম। রাসূল (সাঃ) মিসওয়াক করে ওযু করে নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন। আমি তাঁর সাথে নামাযে শরীক হলাম। তিনি প্রথম রাকাতে সূরা বাক্বারাহ তিলাওয়াত করলেন, তিনি প্রতি রহমতের আয়াতে দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত রহমতের দোয়া করলেন। আবার প্রতিটি আয়াতে দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করলেন। সূরা বাক্বারাহ্‌ শেষ করে রুকু করলেন। রুকু সূরা পড়ার সমপরিমাণ সময় পর্যন্ত লম্বা করলেন। রুকুর মধ্যে তিনি- سبحان ذى الجبروت والملكوت والجبروت - এ দোয়া পড়ছিলেন। অতঃপর রুকুর সমপরিমাণ সময় সিজদায় কাটালেন। তারপর দ্বিতীয় রাকাতে সূরা বাকারার ন্যায় সূরা আলে ইমরান পড়লেন। প্রতি রাকাতে এক একটি সূরা পড়ে চার রাকাতে মোট সোয়া ছয় পারা তিলাওয়াত করলেন। চিন্তা করার বিষয় যে, নামাযটি কত সুদীর্ঘ ছিল? হযরত হোযায়ফা (রাঃ) একবার এভাবে রাসূল (সাঃ) সাথে চার রাকাত দীর্ঘ নামায পড়েছিলেন। যার মধ্যে রাসূল (সাঃ) সূরা বাকারাহ থেকে সূরা মায়েদাহ পর্যন্ত মোট সোয়া ছয় পারা তিলাওয়াত করেছিলেন, তাজবীদও তারতীলের সাথে সোয়া ছয়পারা পড়া এবং প্রত্যেক রাকাতের আয়াতে দীর্ঘক্ষণ আশ্রয় চাওয়া, তদুপরি এ পরিমাণ দীর্ঘ রুকু, সিজদা করা কি সহজ ব্যাপার? কোন কোন সময় রাসূল (সাঃ) প্রথম রাকাতেই প্রথম তিন সূরা অর্থাৎ প্রায় পাঁচ পারা

পড়ে ফেলতেন। এত সুদীর্ঘ নামায এজন্যই সম্ভব ছিল যে, রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেন, আমার চোখের তৃপ্তি হল নামাযের মধ্যে। আল্লাহ্‌ তায়ালা আমাদেরকেও প্রিয় রাসূল (সাঃ)-এর অনুসরণ করার তওফীক দান করুন। আমীন॥

সুদীর্ঘ নামায

বিখ্যাত তাবেয়ী হযরত মুজাহিদ (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) ও হযরত ইব্‌নে যুবায়ের (রাঃ) নামাযে দাঁড়ালে মনে হত যেন একটি কাঠখন্ড মাটিতে পুঁতে রাখা হয়েছে। অর্থাৎ একটুও নড়াচড়া করতেন না। মুহাদ্দিসীনগণ বর্ণনা করেন, হযরত ইব্‌নে যোবায়ের (রাঃ) হযরত আবু বকর (রাঃ) থেকে নামায শিখলেন, হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে থেকে নামায শিক্ষা করেছেন। এক ব্যক্তি বর্ণনা করেন যে, হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌নে যোবায়ের (রাঃ) এত লম্বা সিজদা করতেন যে, পাখি এসে তাঁর কোমরের উপর বসে যেত। কোন কোন সময় এত লম্বা রুকু করতেন যে, সারা রাত রুকুতেই কাটিয়ে দিতেন। আবার কোন কোন সময় একই সিজদায় সারা রাত কেটে যেত।

এক যুদ্ধের সময় হযরত ইব্‌নে যুবযের (রাঃ) এক মসজিদে নামায পড়ছিলেন। একটি গোলা এসে মসজিদের দেয়ালে বেঁধে যায়। তাতে দেয়ালের একটি টুকরা ভেঙ্গে হযরত ইব্‌নে যুবায়েরের দাড়ি ও গলার মাঝখান দিয়ে অতিক্রম করে। এতে তিনি বিচলিতও হলেন না এবং রুকু সিজদাও সংক্ষেপ করলেন না। একবার তিনি ঘরে নামায পড়ছিলেন। তাঁর শিশু পুত্র হাশেম তাঁর পাশেই ঘুমাচ্ছিল। ঘরের ছাদ থেকে একটি সাপ্প পড়ে গিয়ে শিশুটিকে জড়িয়ে ধরে, তাতে শিশুটি চিৎকার শুরু করে। বাড়ির লোকজন দৌড়ে এসে শিশুটিকে উদ্ধার করে। সাপটি মারতে যেয়ে প্রচুর হৈ-চৈ ও শোরগোল হয়। কিন্তু ইব্‌নে যুবায়ের অত্যন্ত শান্ত ও মনযোগ সহকারে নামাযেই লিপ্ত রইলেন। নামায শেষে জিজ্ঞেস করলেন, কেমন যেন একটু হৈ-চৈ হল, কি ব্যাপার? স্ত্রী বললেন, আল্লাহ্‌ আপনার উপর রহমত করুন। ছেলেটি তো মারাই যেত। আপনার তো কোন খবরই নেই। তিনি বললেন, তোমার ধ্বংস হোক! নামাযের মধ্যে অন্য কোন কিছুর খেয়াল করলে কি নামায পরিপূর্ণ হয়?

হযরত ওমর (রাঃ) যখন আততায়ীর আঘাতে আহত হয়ে অন্তিম শয্যায় শায়িত, জখম হতে রক্ত নির্গত হত এবং বেশির ভাগ সময় অচেতন অবস্থায় থাকতেন। যখন তাঁকে নামাযের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হত এরূপ অবস্থায়ও তিনি নামায আদায় করতেন এবং বলতেন, ইসলামে এ ব্যক্তির কোন অংশ

নেই, যে নামায পরিত্যাগ করে। হযরত ওসমান (রাঃ) সারা রাত জেগে নামাযে মাশগুল থাকতেন এবং এক রাকাতের মধ্যে কুরআন মজীদ খতম করতেন।

নামাযের সময় হলেই হযরত আলী (রাঃ)-এর অভ্যাস এরূপ ছিল যে, তাঁর শরীরে কম্পন শুরু হয়ে চেহারা হলুদ বর্ণ হয়ে যেত। খাল্‌ফ্‌ ইব্‌নে আইউব (রাঃ) কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, নামাযের মধ্যে মাছি আপনাকে বিরক্ত করে কি? তিনি বললেন, ফাসেকরা বেত্রাঘাতের শাস্তি ভোগ করে, কিন্তু একটুও নড়ে না এবং গর্ব ভরে বলে বেড়ায়, আমার ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা দেখলে? এত বেত খেলাম কিন্তু একটুও নড়িনি। এটা কি করে সম্ভব যে আমি আমার রবের সামনে দাঁড়াব আর সামান্য মাছির কামড়ে নড়াচড়া করব? হযরত মুসলিম ইবনে ইয়াসার (রহঃ) যখন নামাযে দাঁড়াতেন তখন ঘরের লোকজনদেরকে উদ্দেশ্য করে বলতেন, তোমরা কথাবার্তা বলতে থাক, তোমাদের কথাবার্তা আমার নামাযে কোন ক্ষতি হবেনা।

তিনি একবার বসরার জামে মসজিদে নামায পড়াকালে মসজিদের একটি অংশ ধ্বসে পড়ল। অনেক লোক জমা হয়ে অনেক হৈ-চৈ হল অথচ তিনি এসব কিছুই অবগত ছিলেন না।

হযরত হাতেম আ'সাম (রহঃ) কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, আপনি নামায কিরূপে আদায় করেন? তিনি বললেন, যখন নামাযের সময় হয় তখন অযু করার পর নামাযের মুসল্লায় কিছুক্ষণ বসে থাকি। সমস্ত শরীর যখন সম্পূর্ণরূপে শান্ত হয়, তখন নামাযের জন্য দাঁড়াই। এভাবে, কাবা শরীফ যেন আমার চোখের সামনে, পুলসিরাত যেন আমার পায়ের নীচে, জান্নাত আমার ডান দিকে, জাহান্নাম আমার বাম দিকে, মালাকুল মওত যেন আমার ঘাড়ের উপর দাঁড়ায়, আর মনে করি এটাই যেন আমার জীবনের শেষ নামায। অতঃপর অত্যন্ত বিনয় ও একাগ্রতার সাথে ধীরে সুস্থে নামায আদায় করি। তারপর আশা নিরালার মাঝখানে অবস্থান করি। এত কিছুর পরেও আমার নামায কবুল হল কি-না? নিশ্চিন্ত হতে পারিনা?

এক আনসার ও এক মুহাজিরের চৌকিদারী

এক যুদ্ধে রাসূল (সাঃ) ফিরার পথে রাস্তায় এক জায়গায় রাত্রি যাপন করলেন। তিনি সাহাবী (রাঃ)-দের বললেন, আজ রাতে পাহারায় কে থাকবে? একজন আনসার হযরত আম্মার ইব্‌নে ইয়াসির (রাঃ) এবং একজন মুহাজির হযরত আব্বাস ইব্‌নে বিশ্‌র (রাঃ) বললেন, আমরা থাকব। রাসূল (সাঃ) একটি পাহাড়ের দিকে ইশারা করে বললেন, এ দিক থেকে শত্রুর হামলার আশংকা

রয়েছে। তোমরা ওখানে গিয়ে পাহারায় নিযুক্ত থাক। তাঁরা উভয়েই সেখানে চলে গিয়ে আনসার মুহাজিরকে বললেন যে, চল রাতটিকে দু' ভাগ করে আমরা পর্যায়ক্রমে পাহারা দেই। একাংশে তুমি ঘুমাবে, আমি জেগে থাকব। আর একাংশে আমি ঘুমাব, তুমি জেগে থাকবে। অন্যথায় হয়ত দুজনই ঘুমিয়ে পড়তে পারি। তাতে পাহারার কাজ ব্যাহত হবে। জাগ্রত ব্যক্তি যদি শত্রুর আশংকা দেখলে সে তার ঘুমন্ত সাথীকে জাগাবে। রাতের প্রথম অংশে আনসারীর জাগার পালা নির্ধারিত হল। তাই মুহাজির শুয়ে পড়লেন। আনসারী বসে না থেকে নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন। এমতাবস্থায় এক দুশমন এসে আনসারীকে নামাযে দেখে তীর ছুঁড়লে তিনি তীর বিদ্ধ হলেন, কিন্তু একটুও নড়লেন না। সে আর একটি তীর মারল। এ তীরও তাঁর গায়ে বিদ্ধ হল। এবারও তিনি নড়লেন না। শত্রু তৃতীয় তীর নিক্ষেপ করল। তিনি তীর বিদ্ধ হতে থাকেন আর নিজ হাতে টেনে ফেলতে থাকেন। অতঃপর তিনি শান্তভাবে রুকু, সিজদা করে নামায শেষ করে সাথীকে ডাকলেন। দুশমন একজনের স্থানে দুজনকে দেখে ভাবল, না জানি এখানে আরও কত লোক রয়েছে দাতা ভেবে প্রাণ ভয়ে সে পালাল?

মুহাজির ঘুম থেকে জেগে দেখলেন সাথীর শরীর থেকে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে। তিনি বললেন, "সুবহানাল্লাহ"। তুমি প্রথমেই আমাকে কেন জাগালে না? আনসারী বললেন, আমি নামাযের মধ্যে সূরা কাহফ পড়ছিলাম। সূরাটা শেষ না করে রুকু করতে আমার মন চাইল না। কিন্তু আমার ভয় হল, যদি তীর খেয়ে খেয়ে আমি মারা যাই, তাহলে রাসূল (সাঃ) যে পাহারার দায়িত্ব দিয়েছেন তা সম্পন্ন হবে না। এ ভয় যদি না হত তাহলে আমি মারা গেলেও সূরাটা শেষ না করে রুকু করতাম না। এ ছিল সাহাবায়ে কিরামের নামাযের নমুনা। তীরের আঘাতের পর আঘাত সহ্য করে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে, কিন্তু নামাযের মধ্যে সামান্যতম পরিবর্তন আনায়ন করেননি। আর আমাদের নামাযের অবস্থা হল, সামান্য মশা-মাছির কামড়েই মনযোগ বিনষ্ট হয়ে যায়। নামাযে বসে কত চিন্তা-ভাবনা করি। তখন নামায পড়ছি কিনা তার কোন খেয়ালই থাকে না।

নামাযের মধ্যে খেয়াল নষ্ট হওয়ার দরুন হযরত আবু তালহা (রাঃ)-এর বাগান ওয়াকফ করা। একদিন নিজ বাগানে হযরত আবু তালহা (রাঃ) নামায পড়ছিলেন। এমতাবস্থায় একটি পাখি এদিক সেদিক উড়তে লাগল। বাগান খুব ঘন থাকার কারণে সেটা বের হতে পারছিল না। নামাযের মধ্যেই তাঁর দৃষ্টি

পাখির দিকে গেল। এমন কি তিনি কত রাকাত নামায পড়েছেন, তাও ভুলে গেলেন। এতে তিনি ভীষণ মনক্ষুন্ন হয়ে সে বাগানটাই আল্লাহ্‌র রাস্তায় দান করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে রাসূল (সাঃ)-এর খিদমতে হাযির হয়ে সব ঘটনা বলে আরয করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ), আপনার ইচ্ছা অনুযায়ী বাগানটি খরচ করুন।

হযরত ওসমান (রাঃ)-এর খিলাফতের সময় একজন আনসারী নিজের বাগানে নামায পড়ছিলেন। বাগানে পাকা খেজুরের কাঁদিগুলো ফলের ভারে নুয়ে পড়েছিল। নামাযের মধ্যেই তাঁর দৃষ্টি কাঁদিগুলোর উপর পড়ে এবং এগুলো দেখে আনন্দে আত্মহারা হয়ে কত রাকাত নামায পড়েছেন তা ভুলে যান। বাগানের কারণে নামাযের মধ্যে বিঘ্ন ঘটায় তিনি মনে দারুন কষ্ট পেলেন। তাই হযরত ওসমান (রাঃ)-এর কাছে হাযির হয়ে আরয করলেন, আমি এ বাগান আল্লাহর রাস্তায় দান করলাম। আপনি আপনার ইচ্ছামত খরচ করুন। হযরত ওসমান (রাঃ) উক্ত বাগানটি পঞ্চাশ হাজার দেরহাম বিক্রি করে তা ধর্মীয় উন্নয়ন কাজে ব্যয় করে দিলেন।

নামাযের খাতিরে ইব্‌নে আব্বাসের চক্ষু চিকিৎসা ত্যাগ

যখন চক্ষু রোগে আক্রান্ত হলেন হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে আব্বাস (রাঃ), তখন একজন চিকিৎসক তাঁর খিদমতে বললেন, আমি আপনার চোখের চিকিৎসা করতে পারি এ শর্তে যে, আপনি পাঁচ দিন জমীনে সিজদা না করে কোন উঁচু জায়গায় করবেন। একথা শুনে তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র কসম, তা কখনও হতে পারে না। আমি স্বয়ং রাসূল (সাঃ)-এর কাছে শুনেছি, যে ব্যক্তি জেনে শুনে এক ওয়াক্ত নামায ছেড়ে দেয়, সে কিয়ামতের দিন এমনভাবে আসবে যে, আল্লাহ্ তায়ালা তার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকবেন।

কারণ বশতঃ এরূপে নামায আদায় করা যদিও জায়েয তবুও সাহাবীদের নামাযের প্রতি যে গুরুত্ব ছিল এবং রাসূল (সাঃ) এর হুকুমের প্রতি তাঁদের যে আস্থা আসক্তি ছিল তারই ফলশ্রুতিতে ইব্‌নে আব্বাস (রাঃ) চক্ষু চিকিৎসা করালেন না। নামাযের জন্য তাঁরা সমস্ত দুনিয়া কুরবান করতে পারতেন। নামাযের বিন্দুমাত্র অঙ্গহানি করে পার্থিব অতি মূল্যবান বস্তুকেও তাঁরা রক্ষা করতে রাজি হতেন না। আজ আমরা নির্লজ্জের মত জীবন উৎসর্গকারী সাহাবী

(রাঃ)-দের শানে যা ইচ্ছা তাই বলে ফেলি। কিন্তু হাশরের দিন যখন তাঁদেরকে অনন্ত অসীম সুখে দেখব, তখন বুঝে আসবে তাঁরা কি ছিলেন আর আমরা কি আছি?

নামাযের সময় সাহাবীদের ব্যবসা

আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে ওমর (রাঃ) একদিন বাজারে বসা অবস্থায় জামাতের সময় হলে তিনি দেখলেন, প্রত্যেকেই নিজ দোকান বন্ধ করে মসজিদে চলে গেছেন। তখন তিনি বললেন, এসব লোকের সম্পর্কেই কুরআনের এ আয়াতটি নাযিল হয়েছে।

رِجَالٌ لَا تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ـ

অর্থ ঃ "মসজিদে এমন সব লোক সকাল সন্ধ্যায় আল্লাহ্‌র পবিত্রতা বর্ণনা করে; যাদেরকে ব্যবসা ও বেচা-কেনা আল্লাহ্‌র যিকর ও নামায থেকে বিরত রাখতে পারে না।"

এ সমস্ত নিষ্ঠাবান লোকদের সম্পর্কে হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রাঃ) বলেন, তারা নিজেদের ব্যবসা বাণিজ্যে ও কাজ-কর্মে নিয়োজিত থাকতেন কিন্তু আযান এর সাথে সাথেই মসজিদে প্রবেশ করতেন। আল্লাহ্‌র কসম! তাঁরা ব্যবসায়ী ছিলেন, কিন্তু ব্যবসা-বাণিজ্য তাঁদেরকে কখনও আল্লাহ্‌র পথ থেকে বিরত রাখতে পারত না। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে মাসউদ (রাঃ) বাজারে বসে ছিলেন। এমন সময় আযান হলে তিনি দেখলেন। লোকেরা মালপত্র রেখেই মসজিদে যাচ্ছেন দেখে তখন তিনি বললেন, এসব লোকদের সম্বন্ধেই কুরআনে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে– رجال لا تلهيهم الخ

রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেন, কিয়ামতের দিন সমস্ত মানুষকে একত্রিত করে আল্লাহ্ তায়ালা বলবেন, যারা সুখে-দুঃখে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করত তারা কোথায়? তখন খুব সামান্য সংখ্যক লোক উঠে দাঁড়াবে এবং বিনা হিসাব-নিকাশে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আল্লাহ্ পুনরায় বলবেন, এসব লোক কোথায়? যারা রাত্রে বেলায় আরামের বিছানা ত্যাগ করে নিজের রবকে স্মরণ করত। এবারও একটি ক্ষুদ্র দল উঠে বিনা হিসাব-নিকাশে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তারপর ঘোষণা করা হবে; এ সব লোক কোথায়, যাদেরকে ব্যবসা বাণিজ্য আল্লাহ্‌র

যিক্‌র ও নামায থেকে বিরত রাখতে পারত না। তখন সংক্ষিপ্ত একটি দল উঠে এবং বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। অতঃপর সমস্ত হাশরবাসীর হিসাব-নিকাশ শুরু হবে।

মর্মান্তিক শাহাদত

ওহুদের যুদ্ধে যেসব কাফেরবৃন্দ নিহত হয়েছিল প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য তাদের আত্মীয়-স্বজনরা ব্যাকুল হয়ে উঠল। ওহুদের যুদ্ধে সুলাফা নামক এক কাফের রমনীর দু' পুত্র হযরত আসেমের হাতে নিহত হয়। সুতরাং সুলাফা মানত করেছিল যে, আসেমের মাথা আমার হাতে আসলে আমি তার মাথার খুলি দ্বারা শরাব পান করব। অতএব, সে আরও ঘোষণা করে দিল, যে ব্যক্তি আসেমের মাথা এনে দিবে, একশত উট তাকে পুরস্কার দেয়া হবে। এ ঘোষণায় আকৃষ্ট হয়ে সুফিয়ান ইব্‌নে খালিদ নামক এক কাফের হযরত আসেম (রাঃ)-কে হত্যা করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করল। মদীনায় সে আজল ও কা-রা গোত্রের কিছু লোককে পাঠাল। এরা মদীনায় পৌঁছে রাসূল (সাঃ)-এর সাথে সাক্ষাত করে নিজেদের মুসলমান বলে দাবী করে এবং তালীম ও তাবলীগের জন্য কিছু সংখ্যক লোককে তাদের এলাকায় পাঠানোর জন্য রাসূল (সাঃ)-এর কাছে অনুরোধ করল। বিশেষ করে হযরত আসেম (রাঃ)-কেও তাদের সাথে পাঠানোর আবেদন করল। কারণ, আসেমের বয়ান তাদেরকে খুবই আকৃষ্ট করবে বলে প্রকাশ করল।

সুতরাং রাসূল (সাঃ) দশজন সাহাবীর একটি দল (অন্য বর্ণনা অনুসারে ছয় জন) তাদের সাথে পাঠিয়ে দিলেন। হযরত আসেম (রাঃ) কেও সেখানে পাঠালেন। পথিমধ্যে এ মুসলমান পরিচয় দানকারী মুনাফিকরা সাহাবীদের সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা করে। সাহাবীদের সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করে। সেখানে পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী একশত প্রসিদ্ধ তীরন্দাজসহ চৌদ্দশত সৈন্যের এক বিরাট বাহিনী সাহাবীদের উপর আক্রমণ করে। কোন কোন বর্ণনায় উল্লেখ রয়েছে যে, রাসূল (সাঃ) মক্কাবাসীদের খবরা খবর জানার জন্য সাহাবী (রাঃ)-দের এ দলটি পাঠিয়েছিলেন। রাস্তায় লেহ্ইয়াল গোত্রের দু' শত লোকের সাথে তাদের মোকাবিলা হয়েছিল। দশ অথবা ছ'জন সাহাবীর এ ক্ষুদ্র দলটি শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হয়ে নিকটবর্তী ফিদ্ ফিদ্ নামক পাহাড়ের চূড়ায় আশ্রয় গ্রহণ করেন।

কাফেররা বলল, আমরা তোমাদের রক্তে আমাদের ভূমিকে রঞ্জিত করতে চাই না। বরং তোমাদের বিনিময়ে মক্কাবাসীদের কাছ থেকে কিছু মাল পেতে চাই, কাজেই তোমরা আমাদের সাথে আস। আমরা তোমাদের হত্যা করব না। তখন তাঁরা বললেন, আমরা কাফেরদের আশ্রয় চাইনা এ বলে তীরের সাহায্যে মোকাবিলা শুরু করলেন। তীর শেষ হলে বর্শা দ্বারা মোকাবিলা হল।

হযরত আসেম (রাঃ) সাথীদেরকে উৎসাহ দিয়ে বললেন, বন্ধুগণ! তোমাদের সাথে প্রতারণা করা হয়েছে। তোমরা ভয় পেয়ো না, শাহাদাতকে গণীমত মনে করে বীর-বিক্রমে যুদ্ধ কর। আল্লাহ্ তোমাদের সহায় আছেন এবং জান্নাতের হুরগণ' তোমাদের অপেক্ষায় আছেন। এ বলে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। প্রথমে তিনি বর্শা দ্বারা মোকাবিলা করলেন। যখন বর্শা ভেঙ্গে গেল তখন তলোয়ার দ্বারা শত্রুদের নিপাত করতে লাগলেন। কিন্তু শত্রু সংখ্যা অত্যধিক হওয়ায় অবশেষে তিনি শাহাদাত বরণ করলেন। মৃত্যুর সময় তিনি দোয়া করলেন, হে আল্লাহ্! তোমার রাসূলের কাছে আমাদের এ দুর্ঘটনার সংবাদ পৌছিয়ে দাও। তাঁর দোয়া কবুল হল এবং আল্লাহ্ তায়ালা তৎক্ষণাৎ এ সংবাদ রাসূল (সাঃ)-কে পৌছিয়ে দিলেন। হযরত আসেম (রাঃ) জানতে পেরেছিলেন যে, সুলাফা তার মাথার খুলি দ্বারা শরাব পান করার মানত করেছে। তাই দোয়া করলেন, হে আল্লাহ্! আমার শির তোমার রাস্তায় কাটা যাচ্ছে। কাজেই তুমি তা রক্ষা কর। তাঁর এ দোয়াও কবুল হয়েছে।

তাঁর শাহাদাতের পর কাফেররা যখন তাঁর শির কাটার জন্য প্রস্তুত হল তখন আল্লাহ্ এক ঝাঁক মৌমাছি পাঠিয়ে দিলেন। অন্য বর্ণনায় এক ঝাঁক ভীমরুলের কথা এসেছে। সেগুলো তাঁর লাশকে ঘিরে ফেলল। এ দেখে কাফেররা মনে করল, রাত্রিবেলায় এগুলো চলে গেলে তারা হযরত আসেমের শির কেটে নিবে। কিন্তু আল্লাহ্র কুদরতে রাতে ভীষণ বৃষ্টি হল এবং পানির স্রোতে তাঁর লাশ যে কোথায় ভেসে গেল তা আর কেহ বলতে পারল না।

এভাবেই শত্রুর সাথে মোকাবিলা করতে করতে তিনজন বাদে সবাই শহীদ হলেন। যাঁরা জীবিত ছিলেন তাঁরা হলেন, হযরত খোবায়ের (রাঃ) হযরত যায়েদ ইব্‌নে দাসনা (রাঃ) এবং হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে তারেক (রাঃ)। শত্রুরা তাঁদেরকে অভয় দিল যে, তোমরা পাহাড় থেকে নীচে নেমে আস, আমরা তোমাদের কোন ক্ষতি করব না।

তাদের কথা বিশ্বাস করে তিন জনই যখন নিচে নেমে আসলেন তখন ধনুকের তার দিয়ে তাঁদেরকে হাত বাঁধা শুরু করল। আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে তারেক (রাঃ) কাফেরদের বললেন, এটা তোমাদের প্রথম ধোঁকা। আমি কখনও তোমাদের সাথে যাব না। আমি আমার শাহাদতপ্রাপ্ত ভাইয়ের পথই অনুসরণ করব।

কাফেররা তাঁকে টানা-হেঁচড়া করল, কিন্তু তিনি কিছুতেই আপন জায়গা ছাড়লেন না। অবশেষে কাফেররা তাঁকে শহীদ করে দিল। বাকী রইলেন দু'জন। এ দু'জনকে তারা মক্কাবাসীদের হাতে বিক্রি করল। পিতা হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য সাফ্‌ওয়ান ইব্‌নে উমাইয়া হযরত যায়েদ ইব্‌নে দাস্‌নাকে পঞ্চাশটি উটের বিনিময়ে ক্রয় করে নিল। আর হুজারের ইব্‌নে আবি এহাব তার পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য হযরত খোবায়েব (রাঃ) কে এক শত উটের বিনিময়ে ক্রয় করল। বুখারী শরীফের একটি হাদীসে বর্ণিত আছে যে, হারেস ইব্‌নে আমেরের বংশধর হযরত খোবায়েব (রাঃ) হারেস ইব্‌নে আমেরকে হত্যা করেছিলেন।

হযরত যায়েদ (রাঃ)-কে হত্যা করার জন্য সফ্‌ওয়ান সাথে সাথেই একটি ক্রীতদাসের মাধ্যমে হারাম শরীফের বাইরে পাঠিয়ে দিল। এ হত্যাকান্ড দেখার জন্য বহু লোক সেখানে সমবেত হয়েছিল। তন্মধ্যে আবু সুফিয়ানও ছিল। সে হযরত যায়েদ (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল, যায়েদ। আল্লাহ্‌র কসম তুমি সত্য করে বল? তুমি কি এটা পছন্দ করবে যে, তোমার পরিবর্তে আমরা মুহাম্মদকে হত্যা করি, আর তুমি পরিবার পরিজন নিয়ে সুখে শান্তিতে থাক? হযরত যায়েদ (রাঃ) উত্তর দিলেন, আল্লাহ্‌র কসম, হত্যা তো দূরের কথা, আমি এতটুকু সহ্য করব না যে, রাসূল (সাঃ) যেখানে আছেন সেখানেই তাঁর পায়ে একটা কাঁটা বিদ্ধ হোক আর আমি সুখে-শান্তিতে থাকি।

একথা শুনে আবু সুফিয়ান বলল, "মুহাম্মদের অনুসারীরা তাঁকে যেরূপ ভালবাসে, এমন ভালবাসার নজির আমি কোথাও দেখিনি। এরপর হযরত যায়েদ (রাঃ)-কে শহীদ করে দেয়া হল। হযরত খোবায়ের (রাঃ) কিছু দিন বন্দী অবস্থায় রইলেন। হুজায়েরে যিনি পরে মুসলমান হয়েছিলেন, তিনি বলেন, হযরত যুবায়েব (রাঃ) আমাদের কয়েকখানায় বন্দী ছিলেন। একদিন আমি

দেখলাম তিনি একটা আঙ্গুরের গুচ্ছ খাচ্ছেন। সে সময় মক্কায় কোথাও কোন আঙ্গুর ছিল না। তাঁর মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলে তিনি লোম পরিষ্কার করার জন্য একটি ক্ষুর চেয়ে নিলেন। হঠাৎ একটি শিশু তাঁর কাছে চলে গেল। হযরত খোবায়েব (রাঃ)-এর হাতে ক্ষুর আর তাঁর কাছেই শিশুটি দেখে সবাই চিন্তিত হয়ে গেল। এ অবস্থা দেখে তিনি বললেন, তোমরা কি ভাবছ আমি এ শিশুকে হত্যা করব। আমি এমন কাজ করব না।

এরপর হযরত খোবায়েব (রাঃ) কে শহরের বাইরে নিয়ে শূলীতে চড়ানোর পূর্বে তাঁর কোন অন্তিম ইচ্ছা আছে কি-না জিজ্ঞেস করা হল। তিনি বললেন, এটা আমার দুনিয়া থেকে বিদায়ের এবং আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাতের সময়। আমাকে দু'রাকাত নামায আদায় করার সময় দেয়া হোক। নামায শেষে তিনি বললেন, তোমরা যদি মনে না করতে যে, আমি মত্যুর ভয়ে নামাযের মধ্যে দেরি করছি। তাহলে আরও দু'রাকাত পড়তাম। শূলীতে তুলার পর তিনি বললেন, হে আল্লাহ! এমন কি কেহ নেই যে তোমার রাসূল (সাঃ) কে আমার শেষ সালাম পৌঁছিয়ে দিবে। তৎক্ষণাৎ অহীর মাধ্যমে রাসূল (সাঃ) খোবায়েব (রাঃ)-এর সালাম পেয়ে রাসূল (সাঃ) বললেন, ওয়া আলাইকুমুস্ সালাম ইয়া খোবায়েব। রাসূল (সাঃ) সাহাবীদের বললেন, কাফেররা খোবায়েবকে শহীদ করে ফেলেছে। হযরত খোবায়েব (রাঃ)-কে যখন শূলীতে চড়ানো হল, তখন কাফেররা চারদিক থেকে তীর নিক্ষেপ করতে লাগল।

এ সময় একজন তাঁকে আল্লাহ্‌র কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করল, তুমি কি এটা পছন্দ করবে যে, তোমার পরিবর্তে মুহাম্মদকে হত্যা করি আর তুমি মুক্তি পেয়ে যাও। তিনি বললেন, আমার জীবনের বিনিময়ে হলেও আমি এটা পছন্দ করব না যে, রাসূল (সাঃ)-এর পায়ে একটা কাঁটা বিদ্ধ হোক। এ সমস্ত কাহিনীর প্রতিটি শব্দই জ্ঞানপূর্ণ ও শিক্ষাপ্রদ। তবে এ কাহিনীতে দু'টি বিষয় বিশেষ ভাবে প্রনিধান যোগ্য।

নবী করীম (সাঃ)-এর প্রতি সাহাবীদের ভালবাসা

রাসূল (সাঃ)-কে বিন্দুমাত্র কষ্ট থেকে নিরাপদ রাখতে সাহাবীদের জীবন উৎসর্গ করার আকাংখা। হযরত খোবায়েব (রাঃ)-এর মুখ দ্বারা উচ্চারণ

করানোটাই কাফেরদের উদ্দেশ্য ছিল। নতুবা. রাসূল (সাঃ)-কে কষ্ট দেয়ার ক্ষমতা তখন কাফেরদেরও ছিল না। তদুপরি অন্তিমকালে মানুষ স্বাভাবিকভাবে স্ত্রী-পুত্র-পরিজনকে স্মরণ করে তাদের কাছে সালাম পাঠায়। কিন্তু খোবায়েব (রাঃ) সালাম পৌছালেন রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে, স্মরণ করলেন রাসূল (সাঃ)-কে। আর এসব সাহাবায়ে কিরামের জীবনের শেষ আকাঙ্খা ছিল দু' রাকাত নামায।

জান্নাতে রাসূল (সাঃ)-এর সাথী

হযরত রাবীয়া (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (সাঃ)-এর খিদমতে রাত্রিযাপন করতাম। তাহাজ্জুদের সময় পানি, মিসওয়াক ইত্যাদি পেশ করতাম। একদিন আমার খিদমতে সন্তুষ্ট হয়ে রাসূল (সাঃ) বললেন, চাও, যা চাওয়ার আছে। আমি আরয করলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! (সাঃ) আমি বেহেশ্তে আপনার সাথী হতে চাই। রাসূল (সাঃ) বললেন, বস্ এতটুকুই? আর কিছু না? অতঃপর তিনি বললেন, আচ্ছা ঠিক আছে, তবে বেশি বেশি সিজদার মাধ্যমে আমাকে সাহায্য করবে। এ হাদীসের মধ্যে একটি সর্তকবাণী রয়েছে যে, শুধুমাত্র দোয়ার উপর নির্ভর করলে চলবে না। যেমন অনেকের ধারণা যে, অমুক বুজুর্গের দোয়ায় আমি পার পেয়ে যাব। এরূপ ধারণা ভুল। আমরা দুনিয়াবী কাজের জন্য দোয়ার অপেক্ষায় থাকি না, হাজারভাবে চেষ্টা করি, তদবীর করে থাকি। কিন্তু ধর্মীয় বিষয়গুলোর ব্যাপারে তদবীর ও দোয়ার আশ্রয় নেই। চেষ্টা-তদবীর জরুরী মনে করি না। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আল্লাহওয়ালাদের দোয়া অত্যন্ত কার্যকরী, কিন্তু রাসূল (সাঃ) স্বয়ং উক্ত সাহাবীকে শুধু দোয়ার উপর নির্ভরশীল না হয়ে বেশি বেশি সিজদার মাধ্যমে সাহায্য করতে বললেন।

সপ্তম অধ্যায়

সাহাবীদের দয়া ও পরোপকার

ইসলামে ইসার হল নিজ প্রয়োজনের তুলনায় অন্যের প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দেয়ার যে বিধান রয়েছে তার নাম। ইসারের বহু নিদর্শন সাহাবী (রাঃ)-দের জীবনে পাওয়া যায়। তাঁদের সুমহান আদর্শ এতই উচ্চমানের যে তার অনুমান করা সাধারণ মানুষের পক্ষে অসম্ভব। এর কিছুটাও যদি আমরা অনুসরণ করি তা আমাদের সৌভাগ্য। সাহাবী (রাঃ)-গণ ইসার অনুশীলনে ছিলেন তুলনাহীন। তাঁদের ঘটনা উপলব্ধি করলে মনে হয় তাঁরা যেন ইসারের জন্যে জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। এর জন্য তাঁদের এত আকুলতা যে, নিজে না খেয়েও অন্যের জন্যে কষ্ট করতে এতটুকু দ্বিধা করতেন না। এ সম্পর্কে তাঁদের মাঝে আল্লাহ্র আদেশ-নিষেধের প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। আল্লাহ্ বলেন, "আমি তাদেরই সদগুনের প্রশংসা করছি। কারণ তারা নিজে উপবাস করেও অপরের প্রয়োজনকেই বেশী বড় মনে করে অর্থাৎ নিজে না খেয়েও অপরকে খাওয়ায়।"

যে ত্যাগের তুলনা হয়না

ইয়ারমুকের যুদ্ধক্ষেত্রে আবু জাহিম ইব্নে হুযাফা (রাঃ) তাঁর চাচাত ভাই এর খোঁজে বের হয়েছিলেন। তখন সাথে ছিল এক মশক পানি। মনে করলাম, যদি তাঁকে তৃষ্ণার্ত দেখি তাহলে এ পানি পান করাব। এক স্থানে হঠাৎ তাঁকে দেখতে পেলাম মুমূর্ষু অবস্থায়। তাঁর মৃত্যু যন্ত্রণা হচ্ছিল। আমি তাঁকে পানি দেব কিনা জিজ্ঞেস করলে সে ইশারায় সম্মতি জানাল। এমন সময় কাছেই আর একটি মুমূর্ষু লোক চীৎকার করলেন। তাঁরও মৃত্যু সন্নিকট ছিল। আমার ভাই তাঁর চীৎকার শুনে আমাকে তাঁর কাছে পানি নিয়ে যেতে ইঙ্গিত করলেন। তিনি ছিলেন হিশাম ইব্নে আবিল আস। আমি তাঁর কাছে পৌছলে পাশে আর একজন সাহাবী মৃত্যু যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠলেন। এ সাহাবীর ইশারায় আমাকে তাঁর কাছে যাবার অনুরোধ জানালে তাঁর কাছে আমি পৌছে দেখি তাঁর মৃত্যু হয়েছে। ফিরে এসে তখন হিশামের কাছে দাঁড়ালে দেখি তিনিও মৃত্যু বরণ করেছেন। সেখান থেকে আমার ভাইয়ের কাছে যখন এলাম তখন তাঁকেও জীবিত পেলামনা। কি অদ্ভুত সহানুভূতি! প্রাণ ওষ্ঠাগত, তৃষ্ণার্ত, মৃত্যু সন্নিকট

জেনেও নিজ প্রয়োজনকে তুচ্ছ করে অন্যের প্রয়োজন মিটবার জন্যে কি অতুলনীয় ত্যাগই না স্বীকার করলেন। মানবীয় ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্ত সত্যিই বিরল।

বাতি নিভিয়ে মেহমানদারী

হযরত রসূলে করীম (সাঃ)-এর দরবারে এক সাহাবী হাযির হয়ে নিজের ক্ষুধা, কষ্টের উল্লেখ করলে রাসূল (সাঃ) খাদ্যের খোঁজে বাড়ীতে লোক পাঠিয়ে জানালেন দেয়ার মত খাবার নেই। তিনি সাহাবী (রাঃ)-গণকে বললেন, 'এ ব্যক্তির মেহমানদারী তোমাদের কেহ কি করতে পার?' একজন আনসারী সাহাবী (রাঃ) বললেন,'ইয়া রাসুলাল্লাহ' আমি তাঁর মেহমানদারী করব।' সাহাবী (রাঃ) লোকটিকে বাড়ী নিয়ে স্ত্রীকে বললেন, ইনি রাসূল (সাঃ)-এর মেহমান। যা আছে ঘরে তাই তাঁকে খেতে দাও। স্ত্রী বললেন, 'আল্লাহ্র কসম! শিশুদের খাবার ব্যতিত আর কিছুই অবশিষ্ট নেই।' আনসারী সাহাবী বললেন, ' শিশুদের কোন ক্রমে ঘুম পাড়িয়ে দাও। এরা ঘুমালে খাবারগুলো এনে হাযির কর। আমিও সাথে বসে খাব। বাতি পরিষ্কার করার অজুহাতে খাওয়ার আগে বাতিটি নিভিয়ে দেবে। তারপর অন্ধকারে আমরা খেতে থাকব।' স্ত্রী স্বামীর কথা প্রতিপালন করলেন। মেহমান সকল খাদ্যেই খেলেন আর আনসারী সাহাবী অন্ধকারে না খেয়ে শুধু খাওয়ার অভিনয় করলেন। এভাবে সবাই মেহমানের জন্যে না খেয়ে রাত কাটলেন। এ কাজটি লক্ষ্য করে আল্লাহ্ বলেন, 'যদিও তারা উপবাসী তবুও তারা অন্যের প্রয়োজনকে বেশি বড় মনে করত।'–(সুরা হাশর ঃ ৯)

রোযাদারের উদ্দেশ্যে বাতি নিভিয়ে দেয়া

অনবরত রোযা রাখার অভ্যাস ছিল এক সাহাবী। ইফতার করার তাঁর কিছু থাকতনা। আনসারী সাহাবী সাবেত বিষয়টি টের পেয়ে স্ত্রীকে বললেন, আজ রাতে একজন মেহমান নিয়ে আসব। তখন খাওয়ার সময় বাতি ঠিক করার অজুহাতে নিভিয়ে দেবে। মেহমানের পেট না ভরা পর্যন্ত আমি কিছুই খাবনা। স্ত্রী সে মতই কাজ করলেন। মেহমান খেতে বসলে তিনিও সাথে শরীক হলেন। বাতি নিভিয়ে ঘর অন্ধকার করার কারণে তিনি কিছু খাননি কিছু মেহমান তা জানতে পারলেন না। হযরত সাবেত (রাঃ) সকালে মসজিদে গেলে রাসূল (সাঃ) তাঁকে বললেন, গত রাতে 'মেহমানের জন্য তোমার ব্যবহারে আল্লাহ্ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছেন'। –(দুররে মনসুর)

উটের মাধ্যমে যাকাত আদায়

একবার হযরত উবাই ইব্নে কাব (রাঃ)-কে 'রাসূল (সাঃ) যাকাত উসূল করতে পাঠালে এক সাহাবীর কাছে গিয়ে সম্পদের হিসাব করে দেখলেন তাঁকে যাকাত বাবদ এক বছরের একটি উটের বাচ্চা যাকাত বাবদ দিতে হয়।' যাকাত প্রদানকারী সাহাবী বললেন, 'এ দিয়ে কি হবে? এর দুধও খাওয়া যাবে না। সওয়ারও হওয়া যাবে না। তিনি একটি মোটা তাজা অল্প বয়স্ক উটনী এনে বললেন, এটা নিন। আমি বললাম, এটা আমি নিতে পারবনা। হিসাব ব্যতিত অধিক বস্তু গ্রহণ করার আদেশ আমার নেই। তুমি দিতে চাইলে রাসূল (সাঃ)-এর কাছে নিয়ে যাও। যদি তিনি তা গ্রহণ করেন আমার আপত্তি নেই। অমুখ স্থানে তিনি অবস্থান করছেন, চল উট নিয়ে আমার সাথে। আমার কথামত সাহাবী উটনী নিয়ে হযরত রাসূল (সাঃ) -এর খিদমতে হাযির হয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার লোক আমার কাছে যাকাত আদায় করতে গিয়েছিলেন। আজ পর্যন্ত কোন লোক আমার কাছে যাকাতের জন্য যান নাই। এতে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে আমার যাকাতের সামানা সামনে হাযির করলে তিনি হিসার করে একটি এক বছরের উটের বাচ্চা দাবি করলেন। আমি বললাম এক বছরের বাচ্চা কি কাজে আসবে, এতে চড়াও যাবেনা দুধও খাওয়া যাবেনা বলে এজন্যে খুব ভাল একটা উট দিতে চাইলাম । তিনি তা নিতে অস্বীকার করলেন। আর এজন্যে নিজেই তা আপনার খিদমতে উপস্থিত করেছি।

রাসূল (সাঃ) বললেন, তিনি হিসাব করে যা বলেছে তাই তোমার উপর ওয়াযিব। যদি তুমি এর চেয়েও উৎকৃষ্ট কিছু দিতে চাও তাহলে আমি তা গ্রহণ করব। তোমার এ দানের জন্যে আল্লাহ্ তোমাকে পুরষ্কৃত করবেন। সাহাবীর এ উটটি রাসূল (সাঃ) গ্রহণ করে দোয়া করলেন তাঁর বরকতের জন্যে।

দান-খয়রাতের প্রতিযোগিতা

হযরত ওমর (রাঃ) বর্ণনা, আমাদেরকে একবার রাসূল (সাঃ) সদ্কা করতে আদেশ দিলেন। তখন আমার কিছু সম্পদ জমা ছিল বলে ভাবলাম "আজ আবু বকরকে পরাজিত করব যাকাত প্রদান করে। তাঁর চেয়ে বেশি দিয়ে সম্পদের হার মানাব।' এ ভেবে আমার সমুদয় সম্পদের অর্ধেক নিয়ে রাসূল (সাঃ)-এর খিদমতে হাযির হলে তিনি (সাঃ) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, পরিবারের জন্যে কি রেখে এসেছ?" বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল, কিছু রেখে এসেছি। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, কি রেখে এসেছ? আমি বললাম, অর্ধেক রেখেছি।

এর পর হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) তাঁর সমস্ত সম্পদ নিয়ে হাযির হলেন। রাসূল (সাঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, আবু বকর, ঘরে কি রেখে এসেছ? তিনি বললেন, আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলকে। হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, কোন সময়ই আমি দান খয়রাতে হযরত আবু বকর (রাঃ) কে অতিক্রম করতে পারিনি। সৎ কাজে অন্যের সাথে প্রতিযোগিতা করার জন্য কোরআনে তাকিদ দেয়া হয়েছে। তাবুকের যুদ্ধের সময় সদ্‌কার প্রতিযোগিতা হয়েছিল। রাসূল (সাঃ) তখন সদ্‌কার উপর বিশেষ করে গুরুত্ব দিয়েছিলেন এবং জিহাদের ব্যয় নির্বাহের জন্যে সকলকে যথাসাধ্য প্রদান করতে ঘোষণা করলে সাহাবী (রাঃ)-গণ সামর্থ অনুযায়ী আল্লাহ্‌র রাস্তায় সদ্‌কা করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন।

হযরত আমীর হামযার কাফন

রাসূল (সাঃ)-এর চাচা হযরত আমীর হামযা (রাঃ)। তিনি ওহুদের যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন। কাফেররা তাঁর মৃতদেহের অবমাননা করে তাঁর নাক,কান এবং অন্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে বুক ছিঁড়ে তার হৃদপিন্ড বের করে নিয়ে যায়। যুদ্ধের পর রাসূল (সাঃ) এবং অন্য সাহাবী (রাঃ)-গণ শহীদগণের লাশ একত্র করে তাঁদের গোর-কাফণের ব্যবস্থা করছিলেন। রাসূল (সাঃ) নিজের চাচাকে বিকৃত অবস্থায় দেখে খুবই ব্যথিত হয়ে একটি চাঁদর দিয়ে ঢেকে দিলেন। এ সময় হযরত হামযা (রাঃ) এর আপন বোন হযরত সাফিয়া (রাঃ) নিজের ভাইকে দেখতে চাইলেন। কিন্তু রাসূল (সাঃ) ভেবেছিলেন নিজের ভাইকে এমন বীভৎস অবস্থায় দেখলে সহ্য করতে পারবেনা। তাই তিনি নিষেধ করলেন।

সেখানে হযরত সাফিয়া (রাঃ) গেলে হযরত যুবাইর (রাঃ) বললেন, রাসূল (সাঃ) আপনাকে লাশের কাছে যেতে নিষেধ করেছেন। তিনি বললেন, আমি শুনলাম কাফেরেরা আমার ভাইয়ের নাক, কান ইত্যাদি কেটে ফেলেছে। আল্লাহ্‌র রাস্তায় সে শহীদ হয়েছে। মৃত্যুর পরেও তাঁর নাক, কান সহ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কাটা গেছে। এ তো খুবই সৌভাগ্যের বিষয়! আমার মনে এতে একটুও কষ্ট হচ্ছেনা বরং আনন্দই হচ্ছে। কাজেই তাঁকে ভয়ানক এবং বিকলাঙ্গ অবস্থায় দেখেও সহ্য করতে পারব। শুধু একবারের জন্যে আমাকে তাঁকে দেখতে দাও। তাঁর এ আবেদন রাসূল (সাঃ)-এর খিদমতে পেশ করলে তিনি

হামযা (রাঃ)-কে দেখার জন্যে অনুমতি দিলে নিজের শহীদ ভাইকে দেখে 'ইন্না লিল্লাহ পাঠ করে দোয়া করলেন। অন্য এক হাদীসে উল্লেখ রয়েছে যে, ওহুদের যুদ্ধক্ষেত্রে শহীদদের মৃতদেহ যেখানে ছিল সেখানে এক স্ত্রীলোক অতি দ্রুত আসতে দেখে রাসূল (সাঃ) সাহাবী (রাঃ)-গণকে বললেন, 'দেখ একজন স্ত্রীলোক আসছে। এদিকে আসতে তাকে নিষেধ কর।'

হযরত যুবায়ের (রাঃ) বলেন, আমি দেখলাম আমার মা আসছেন। তখন তাঁকে বাধা দিলে তিনি আমাকে এক ধাক্কায় বললেন, যা সরে যা। আমি তখন বললাম, ওদিকে যাওয়া যাবে না। রাসূল (সাঃ)-এর নিষেধ। এ কথায় হঠাৎ থেমে গেলেন। এরপর দুটি কাপড় বের করে বললেন, ভাইয়ের শাহদাতের কথা শুনে কাফন নিয়ে এসেছি। নাও, এ কাপড় দিয়েই তাঁকে কাফন দাও। আমরা এ কাপড় দিয়েই হযরত হামযা (রাঃ)-কে দাফন করলাম। পাশেই সোহায়ল নামে একজন আনসারী (রাঃ) শহীদ হয়েছিলেন। কাফেরেরা তাঁকেও বিকলাঙ্গ করেছিল। তাঁর কাফনের জন্যে কোন কাপড় ছিলনা। অথচ হযরত হামযা (রাঃ)-এর ছিল দুখানা কাপড়; তাই একখানা কাপড় এ আনসারীর জন্যে দিয়ে দিলাম। কিন্তু কাপড় দু'খানা সমান ছিলনা। একটি ছিল একটু বড়। কাজেই কাকে কোন কাপড় দেয়া হবে সেজন্যে সিদ্ধান্ত নেয়া হল। সিদ্ধান্তে ছোট কাপড়টি গিয়ে পড়ল হযরত হামযা (রাঃ)-এর ভাগে । কাফন দেয়ার সময় দেখা গেল এ কাপড়টি দিয়ে সমস্ত শরীর আবৃত করা যাচ্ছেনা-মাথা ঢাকলে পা খালি থাকে এবং পা ঢাকলে মাথা খালি থাকে। রাসূল (সাঃ) তখন বললেন, কাপড় দিয়ে মাথা ঢেকে দাও এবং পাগুলো ঢেকে দাও লতাপাতা দিয়ে। -(খামীস)

রাসূল (সাঃ)-এর চাচার কাফনের এ অবস্থা। নিজের বোন কাফনের কাপড় দুটি দিলেন তাও শেষ পযর্ন্ত ভাগে পড়ল ছোট কাপড়খানা। মৃতের মাথা ঢাকা হল কাপড় দিয়ে আর পা ঢাকা হল ঘাস-পাতা দিয়ে। এ কাপড়ের ভিতরেও ইসার ও পরোপকারের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত রয়েছে।

যারা দানশীলতা ও পরোপকারের অহংকার করে থাকে, তাদের এ মহাপ্রাণ, চিরস্বরণীয় সাহাবী (রাঃ)-গণের দৃষ্টান্ত অনুধাবন করা কর্তব্য। সাহাবী (রাঃ)-গণ শুধু বক্তৃতা করেই শেষ করেননি, বরং প্রতিটি কাজ নিজেরা করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

অদ্ভুত সহানুভূতি

হযরত ইব্‌নে ওমর (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি কোন এক সাহাবী (রাঃ)-কে বকরীর মাথা হাদিয়া স্বরূপ উপহার দিলে তিনি তা তাঁর এক সাথী ভাইকে দিয়ে দিলেন। কারণ তাঁর ভাইয়ের ছিল অনেক লোক এবং অভাবগ্রস্থ। উপহার পেয়ে এ সাথী ভাইয়ের আবার আর একজনের কথা মনে হলে তিনি বকরীর এ মাথাটি তাঁর নিকট পাঠিয়ে দিলেন। তিনিও তা আবার অন্য একজনের নিকট পাঠিয়ে দিলেন এবং এভাবে সাত বাড়ি পর্যন্ত মাথাটি অতিক্রম করে প্রথম ব্যক্তির কাছে আবারও ফিরে আসে। অপরের অভাবকে প্রত্যেকেই নিজের অভাবের চেয়ে বেশি মনে করে হাদিয়া ফিরিয়ে দিলেন। একেই বলে ইসার। সাহাবায়ে কিরামের প্রায় প্রতিটি কাজেই ইসারের উদাহরণ দেখা যায় এবং তাঁরা প্রায় সকলেই দরিদ্র ছিলেন তাঁরা নিজের অভাবকে অপরের অভাবের তুলনায় সামান্যই মনে করতেন।

হযরত ওমর (রাঃ) এক মুসাফিরকে সাহায্য প্রদান

হযরত ওমর (রাঃ) খিলাফত যুগে প্রায় রাতেই ছদ্মবেশে এলাকা ভ্রমণ করে জন সাধারণের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতেন। একদিন ভ্রমণ করতে করতে এক ময়দানে একটি তাঁবু দেখতে পেলেন। এ স্থানে তাঁবুটি ইতিপূর্বে ছিলনা। তিনি তাঁবুর কাছে গিয়ে দেখলেন তাঁবুর বাইরে একটি লোক বসে রয়েছে আর তাঁবুর ভিতর কার জানি কাতর ধনি শোনা যাচ্ছে। লোকটিকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কে? লোকটি উত্তর দিল; আমি মুসাফির, গ্রামে থাকি খলিফার কাছে নিজের দুঃখ-অভাব জানতে এসেছি। দেখি সাহায্য পাওয়া যায় কিনা? হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, তাঁবুর ভিতর হতে কিসের শব্দ আসছে? লোকটি বলল, শুনে কি হবে তোমার? বরং তুমি তোমার নিজের কাজে যাও। হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, না, বল। কার যেন কষ্ট হচ্ছে! লোকটি বলল, হ্যাঁ, আমার স্ত্রীর প্রসব ব্যথা শুরু হয়েছে। হযরত ওমর (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, তার কাছে কি অন্য কোন স্ত্রীলোক আছে? লোকটি বলল, না, আর কেহ নেই।

একথা শোনার পর হযরত ওমর (রাঃ) সেখান থেকে সোজা বাড়ি ফিরে স্ত্রী উম্মে কুলসুমকে বললেন, একটা বড় রকমের সওয়াবের কাজ ঠিক করে তোমাকে সাথে নিতে এসেছি। এক্ষুণি চল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কি কাজ বলবেন কি? হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, গ্রামের একটি অতি দরিদ্র স্ত্রীলোক ময়দানে পড়ে প্রসাব-ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছে। তার সাথে কোন স্ত্রীলোক নেই। হযরত

উম্মে কুলসুম (রাঃ) শুনে অত্যন্ত উদগ্রীব হয়ে বললেন, আপনার আদেশ পেলে আমি এখনই তৈরী হয়ে নিচ্ছি। হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, দেরী নয়, এখনই তৈরী হয়ে নাও। আর প্রসবের সময় যা দরকার তাও সাথে নিতে ভুলনা।

তাঁরা আবশ্যকীয় সকল জিনিস পত্র সাথে নিয়ে রওয়ানা হলেন। হযরত ওমর (রাঃ) তাঁর পিছনে পিছনে হেঁটে তাঁবুর কাছে গিয়ে হযরত উম্মে কুলসুম তাঁবুর ভিতরে যেতে বললেন। হযরত ওমর(রাঃ) নিজে রান্না শুরু করলেন। এ সময় মহিলার প্রসব সম্পন্ন হয়ে গেল। ভিতর থেকে হযরত উম্মে কুলসুম হযরত ওমর (রাঃ)-কে ডেকে বললেন, আমীরুল মুমেনীন! সুসংবাদ দিন আপনার বন্ধুর ছেলে হয়েছে। আমিরুল মুমেনীন কথাটি লোকটি শুনে অত্যন্ত ভীত হলে হযরত ওমর (রাঃ) তখন বললেন, ভয়ের কিছু নেই । এ নাও, হাড়িটা প্রসূতিকে এ থেকে খাবার খেতে দাও। হযরত ওমর (রাঃ) এ লোকটিকে হাঁড়ি থেকে খাবার খেতে বললেন। সমস্ত রাত তুমি জেগে কাটিয়েছ। এখন শুয়ে পড়। আমার কাছে কাল সকালে এস। তোমার একটা ব্যবস্থা করে দেব।

বর্তমান কালের রাষ্ট্রনায়কগণ তো দূরের কথা, মামুলি ধরণের যে ধনী কয়জন আছেন–যে নিজের স্ত্রীকে নিয়ে দূরবর্তী কোন স্থানে একজন অসহায়া দরিদ্র স্ত্রীলোকের প্রসবে সাহায্য করতে যাবে? এমন কয়জন দয়ালুই বা পাওয়া যাবে যে, নিজের বাড়ী থেকে চাল-আটা বহন করে নিয়ে একজন অজানা মুসাফিরকে নিজ হাতে খাবার পরিবেশন করবে? মালদারের কথা বাদ দিয়ে কয়জন দিনদার পাওয়া যাবে যে, এতটুকু ত্যাগ এবং কষ্ট স্বীকার করবে? আমাদের বুঝা উচিত যাঁদের দোহাই দিয়ে আমরা বরকত হাসিল করতে চাই, তাঁদের শুধু কথা নয়, তাঁদের জীবনাদর্শ কিছুটা অনুসরণ করা আমাদের একান্তভাবেই প্রয়োজন।

হযরত আবু তালহার বাগান দান

মদীনায় তখন সকলের চেয়ে বেশী বাগান ছিল আবু তালহা আনসারী (রাঃ)-এর। বীরেহা নামের একটি অতি সুন্দর বাগানকে তিনি ভালবাসতেন। মসজিদে নববীর সন্নিকটে এ বাগানটি ছিল এবং তাতে প্রচুর পানি ছিল। হযরত রাসূল (সাঃ)-এর উপর যখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হল–"যে পর্যন্ত তুমি তোমার প্রিয় বস্তু (আল্লাহ্‌র জন্যে) খরচ করতে না পারবে সে পর্যন্ত তোমরা নেকী লাভ করতে পারব না।" এ সময় আবু তালহা (রাঃ) রাসূল (সাঃ)-এর কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ) আমার বীরেহা বাগানটি আমার সকল বস্তুর থেকে উত্তম। আল্লাহ্ প্রিয়তম বস্তুই চান। কাজেই বীরেহা বাগানটি আমি

আল্লাহ্‌র নামে সদ্‌কা দিলাম। রাসূল (সাঃ) অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে বললেন, এটা অত্যন্ত মূল্যবান সম্পদ তাই এটা তুমি তোমার নিজের লোকদের লোককে বন্টন করে দাও। বাগানটি রাসূল (সাঃ)-এর নির্দেশে হযরত তালহা (রাঃ) তাঁর আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে ভাগ করে দিয়েছিলেন। -(দুররে মানসুর)

ওয়াজ বা কোরআনের নসীহত শুনে বা পাঠকরে আমরাও কখনো কখনো দান করার সিদ্ধান্ত করি। কিন্তু বিশেষ ধরনের কোন সদ্‌কা খয়রাতের কথা উঠলে চিন্তা করতে থাকি কেমন করে একে বাদ দেয়া যায়। যদি একটা পথ আবিষ্কৃত হয় তাতে খুশি হয়ে যাতে জীবনে কিছু খরচ করতে না হয় সে চেষ্টাই করি। তারপর মৃত্যুর পরে আমাদের ধন-সম্পদের যা কিছু হবার তাই হয়। আমরা নিজেরাই এর বিশেষ উপকার পাইনা। কিন্তু সুনামের জন্যে কিংবা বিবাহ-শাদীতে আমরা সুদের বিনিময়ে ধার করে খরচ করতে দ্বিধাবোধ করিনা। শুধু দান-খয়রাত ও সদ্‌কার বেলায়ই আমাদের যতসব বাঁধা-বিপত্তি। আমরা তখন টাকা খরচ না করার জন্যে কত মাসয়ালা-মাসায়েল বের করি।

হযরত আবুযর গিফারী (রাঃ) এর দানশীলতা

তিনি ছিলেন একজন সু-প্রসিদ্ধ ধন-সম্পদ মোহ বিবর্জিত সাহাবী। দুনিয়াতে তাঁর কোন ধন-সম্পদের মোহ ছিলনা এবং সম্পদ কখনো জমা রাখতেন না। কেহ জমা রাখুন এটাও তিনি অপছন্দ করতেন। তিনি ত্যাগী প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি সম্পদশালী লোকদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতেন। এ জন্য হযরত ওসমান (রাঃ)-এর আদেশে তিনি রাবাদাহ নামক এক জঙ্গলে এসে বাস করতেন। হযরত আবুযর গিফারী (রাঃ)-এর কয়েকটি উট ছিল। অতি বৃদ্ধ একজন লোক সেগুলো রক্ষণা-বেক্ষণ করতেন। একদিন সোলায়মান গোত্রের এক ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে বলল, আমি আপনার খিদমতে থেকে আপনার বৃদ্ধ রাখালের সাহায্য এবং আপনার সেবা করব। হযরত আবুযর গিফারী (রাঃ) বললেন, যে আমার হুকুম মানে সেই আমার সেবাকারী ও বন্ধু। লোকটি বললেন, কিরূপ কাজ করে আমি আপনার সেবা করতে পারি? তিনি বললেন, আমি যখন আমার ধন-সম্পদ খরচ করতে চাই তখন সর্বোৎকৃষ্ট বস্তুকে খরচ করতে হবে এতে কোন দ্বিধা চলবেনা। লোকটি রাজী হয়ে তাঁর কাছে অবস্থান করতে থাকতে লাগলেন। একদিন জনৈক ব্যক্তি এসে বললেন, হুযূর কিছু গরীব লোক অতি কষ্টে দিনাতিপাত করছে, এদের খাওয়া পরার কোন সঙ্গতি নাই। এ কথা শুনে হযরত আবুযর গিফারী (রাঃ) সোলায়মান গোত্রের লোকটিকে বললেন, একটা উট নিয়ে এস। লোকটি একটি উত্তম ও মোটাতাজা উট দেখতে পেয়ে ভাবলেন এতো অতি কাজের উট। এ দিয়ে মনিবের কাজ সমাধা হবে।

প্রতিজ্ঞা অনুসারে এ উটটিই তিনি নিতে মনস্থ করলেন। কিন্তু পরক্ষণেই ভবলেন, গরীব লোকরা খাবে, এত ভাল উট নিলে আমানতের খিয়ানত হবে। তাই বাধ্য হয়ে দূর্বল উটটি আনতে বাধ্য হলাম। লোকটির অবস্থা বুঝতে পেরে আবুযর গিফারী (রাঃ) উপস্থিত লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, এমন দু'জন কি কেহ আছেন যারা আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে কিছু কাজ করতে পারেন? তখন দু'ব্যক্তি দাঁড়ালেন। তখন হযরত আবুযর গিফারী (রাঃ) তাদেরকে বললেন, এ উটটি নিয়ে জবাই করে সমান ভাগ করে দিন। এদের প্রত্যেককে যত খানি দিবেন আমাকেও ততখানি দিবেন।

লোক দু'টি কাজ সমাধা করল। এরপর আবুযর (রাঃ) সোলায়মান গোত্রের লোককে বললেন, যদি তুমি আমার ওসিয়ত ইচ্ছা করে বা ভুলে গিয়ে ভঙ্গ করে থাক তবে ক্ষমা পাবে। লোকটি বললেন, হুযুর ভুলে এরূপ করি নাই। প্রথমে আমি উত্তমটি আনতে চেয়েছিলাম। কিন্তু ভাবলাম, এটা অতি কাজের, আপনার প্রায়ই দরকার হবে, ভেবে রেখে এসেছিলাম।

হযরত আবুযর (রাঃ) তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, আমার এটাই দরকারের দিন, যেদিন আমাকে কবরের ভিতর কীটের আহাররূপে ফেলে দেয়া হবে। -(দুররে মনসুর)।

সম্পদের তিনটি অংশীদার। প্রথমতঃ তকদীর, যা ভাল-মন্দ সকল প্রকার সম্পদ কারো অপেক্ষা এবং কাউকে জিজ্ঞেস না করে নিয়ে যায়। দ্বিতীয়তঃ ওয়ারিশ, যারা পিতামাতার জন্যে অপেক্ষা করে এবং তাদের মৃত্যুর সাথে সাথেই সমুদয় মাল-সম্পদ ভাগ করে নিয়ে যায়। তৃতীয়তঃ সম্পদশালী নিজে। যদি শক্তি ও সুযোগ থাকে তাহলে এসকল অংশীদারের মধ্যে তুমি সবচেয়ে শক্তিশালী হয়েও এবং নিজের অংশ নিজে জোর করে খরচ কর । কারণ কখন যে মৃত্যু এসে তোমাকে নিয়ে যাবে তার নিশ্চয়তা নেই। কাজেই মৃত্যুর পূর্বে যত বেশী পার নিজের সম্পদ আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ করে পরকালের জন্যে পূণ্য সঞ্চয় কর। তোমার সম্পদ অন্যের অধীনে গেলে তোমাকে আর কে জিজ্ঞেস করবে। কে নিজের ভোগ-বিলাস আমোদ-আহলাদ ত্যাগ করে তোমার কথা স্মরণ করে তোমার মুক্তির জন্য পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ করবে? তুমি তখন একান্ত অসহায় থাকবে, ওয়ারিশগণের উদাসীনতা দেখে তুমি তাদেরকে কিছুই বলতে পারবে না। তাদের হাত হতে সম্পদ ছিনিয়ে নেয়ার জন্যে তো তুমিত আর কবর হতে উঠে আসতে পারবে না। সুতরাং সময় থাকতে নিজের পাথেয় নিজে ঠিক করে নিজের সম্পদ নিজের হাতে ব্যয় করে

পরকালের পাথেয় সঞ্চয় কর। হাদীসে উল্লেখিত আছে যে, মানুষ বলে থাকে, আমার সম্পদ, আমার মাল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটাই সম্পদ যা সে খেয়ে ফেলে এবং খরচ করে অথবা আল্লাহ্‌র রাস্তায় সদ্‌কা করে আখিরাতের সঞ্চয় করে। তাছাড়া যা কিছু বাকি থাকে তা তো সবই পরের সম্পদ। পরের জন্যেই তুমি জমা করে রেখে যাও। আর একটি হাদীসে আছে, রাসূল (সাঃ) সাহাবী (রাঃ)-গণকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে নিজের সম্পদের চাইতে নিজের ওয়ারীশ, সম্পদের বেশী ভালবাস?সাহাবীগণ উত্তর দিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এমন কে থাকবে যে নিজের সম্পদের চেয়ে পরের সম্পদকে বেশী ভালবাসে? রাসূলে মাকবুল (সাঃ) বললেন, এটাই শুধু নিজের সম্পদ যা তোমরা খরচ করে পরকালের জন্যে জমা করে যাও। আর যা মৃত্যুর সময় ত্যাগ করে যাও তাই তোমাদের ওয়ারিশগণের সম্পদ। -(মিশকাত)

হযরত যাফর ইব্‌নে আবু তালিবের অবস্থা

হযরত যাফর ইব্‌নে আবু তালিব (রাঃ) রাসূল (সাঃ)-এর চাচাত ভাই এবং হযরত আলী (রাঃ)-এর সহোদর ভাই ছিলে। এ বংশের সকলেই দানশীলতা, বীরত্ব ও সাহসিকতার জন্যে সু-প্রসিদ্ধ ছিলেন। কিন্তু হযরত যাফর বিশেষ করে গরীবদের প্রতি বেশী অনুরক্ত হয়ে ভাল বাসতেন। তিনি কাফেরদের অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে প্রথম হাবশ দেশে হিযরত করলে সেখানেও তাঁর অনুসরণ করে। ফলে হাবশের বাদশাহর কাছে তাঁর পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তিনি হাবশ হতে ফিরে মদীনায় হিযরত করেন এবং মুতার জিহাদে শাহাদাত বরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর রাসূল (সাঃ) সমবেদনা প্রকাশার্থে তাঁর বাড়ী গিয়ে তাঁর পুত্রগণকে ডেকে অনেক সান্তনা দান ও উপদেশ প্রদান করেন। হযরত যাফরের পুত্র হযরত আবদুল্লাহ্‌, হযরত আওয়ান পিতার পদাংক অনুসরণ করেছিলেন। তবে হযরত আবদুল্লাহ্‌র মধ্যে দানশীলতা বিশেষভাবে সু-প্রসিদ্ধ ছিল বলে তাঁর উপাধি ছিল 'কুতবুস সাখা' অর্থাৎ দানশীলতার কুতুব। সাত বছর বয়সে তিনি রাসূল (সাঃ)-এর হাতে বায়াত গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন। এক ব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌নে যাফরকে দিয়ে হযরত আলী (রাঃ)-এর কাছে সুপারিশ করলেন এতে লোকটির কার্যসাধিত হয়। লোকটি খুশি হয়ে নজরানা স্বরূপ চল্লিশ হাজার দিরহাম তাঁর নিকট পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌নে যাফর এটা ফেরত দিয়ে বললেন, আমরা নেকী বিক্রয় করিনা। অন্য এক সময় এক স্থান থেকে দু' হাজার দেহারম, তাঁর কাছে নজর স্বরূপ পাঠান হলে তিনি তা সদ্‌কা করে দিয়েছিলেন।

এক ব্যবসায়ী প্রচুর চিনি নিয়ে বিক্রয় করতে আসে। কিন্তু কেহই সে চিনি কিনতে আগ্রহী না হওয়াতে ব্যবসায়ী অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়ে। হযরত আবদুল্লাহ্‌ বিন যাফর নিজের কর্মচারী দ্বারা সমস্ত চিনি কিনে বিনামূল্যে লোকদের মাঝে বিতরণ করে দেন। হযরত যুবায়ের (রাঃ) এক জিহাদে গিয়ে পুত্র আবদুল্লাহকে ডেকে বললেন, আমার মনে হয় আজ আমি শাহাদাতবরণ করব, তুমি আমার ঋণ পরিশোধ করে দিও। যেদিন এ অসিয়ত করেছিলেন সে দিনই তিনি শহীদ হয়ে গেলেন। পিতার অসিয়ত অনুসারে সমুদয় ঋণ ছিল বাইশ লাখ দেরহাম ছিল। এ ঋণ নিজের জন্যে করেননি, ঘরের জন্যে করেছিলেন। তাঁর কাছে লোকেরা টাকা গচ্ছিত রাখলে বলতেন, আমার টাকা রাখবার জায়গা নেই। আমি এ সমস্ত টাকা খরচ করব। তোমাদের যখন দরকার চেয়ে নেবে। তিনি পুত্রকে আরো অসিয়ত করেছিলেন, যখন কোন বিপদ আসবে, তখন আল্লাহ্‌র স্মরণাপন্ন হবে। হযরত আবদুল্লাহ বলেন, যখন কোন জটিল ও শক্ত জিনিস আমার সামনে আসত, তখন আমি বলতাম, হে আমার রব, আমার এ কাজটি সমাধা হচ্ছে না। তখনই আমার উদ্দিষ্ট কাজের ফায়সালা হয়ে যেত।

হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌নে যুবায়ের বলেন, আমি একবার আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌নে যাফরকে বললাম, তোমার পিতা আমার পিতার কাছ থেকে দশ লাখ দেরহাম ঋণ করেছিলেন। তাঁর ঋণের তালিকায় আমি তা দেখতে পেয়েছি। আমার কথা শুনে তিনি বললেন, যখন খুশি নিয়ে যেও। একটু পরে আমার ভুল ভাঙ্গল। আমি পুনরায় তাঁর কাছে গিয়ে বললাম, এ ঋণ তো আমার পিতার। তিনিই এ টাকাটা তোমার পিতার কাছ থেকে নিয়েছিলেন। তখন তিনি বললেন, আমি মাফ করে দিলাম। আমি বললাম, আমি মাফ চাই না। তিনি বললেন, তাহলে তুমি যখন পার পরিশোধ কর। আমি বললাম, এর পরিবর্তে আমার কিছু জমি নিয়ে যাও। হযরত আবদুল্লাহ বললেন, আচ্ছা তাই দাও। আমি তাঁকে অতি সাধারণ একখন্ড জমি দিয়ে দিলাম। তাতে পানির কোন ব্যবস্থা ছিল না বলে অনুর্বর ছিল। তিনি এ জমি গ্রহণ করে তার গোলামকে জমির উপর যায়নামায বিছিয়ে দিতে আদেশ দিলেন এবং এর উপর দু' রাকাত নামায আদায় করলেন। তিনি অনেক্ষণ পর্যন্ত সিজদাবনত রইলেন। নামায শেষে গোলামকে বললেন, এ স্থানটি খনন কর। গোলাম খুঁড়তে আরম্ভ করলে তখন দেখা গেল সেখান থেকে একটি পানির ধারা প্রবাহিত হতে শুরু করল। -(উসদুল গাবা)।

অষ্টম অধ্যায়

বীরত্ব ও সাহসিকতা এবং মৃত্যুর প্রস্তুতি

মানুষের যত চিন্তা-ভাবনা, ভয়, দুর্বলতা সবই বেঁচে থাকার জন্যে। মানুষ যখন মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে তখন তার কোনরূপ দ্বিধা থাকেনা। লক্ষ্য পথে পৌঁছার জন্য তখন সে সব কিছুই করতে পারে। এ অবস্থায় তার ধন-সম্পদ, লোকজন সব কিছুর প্রতিই বিমুখ হয়ে যায়। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কবি বলেন, "যে ব্যক্তি জীবনের আশা পরিত্যাগ করে সে যা খুশি তাই বলতে পারে।"

দু'জন সাহাবী (রাঃ)-এর আকাংখা

হযরত আবদুল্লাহ বিন্ জাহস ওহুদের যুদ্ধে হযরত সায়াদ ইব্‌নে আবি ওয়াক্কাস (রাঃ)-কে বললেন, চল ভাই আমরা একত্রে দোয়া করে। প্রত্যেকেই নিজের প্রয়োজন মোতাবেক দোয়া করে আমীন বলব। এরূপ করলে আমাদের দোয়া কবুল হওয়ার সম্ভাবনাই অত্যধিক আর দোয়া কবুলের উপযুক্ত সময় এখনই। উভয়ে এক জায়গায় বসে এরূপ সিদ্ধান্তে দোয়া করলেন। হযরত সায়দের আবেদন হে আল্লাহ্, আগামীকাল যুদ্ধে আমার সাথে যুদ্ধ করার জন্যে এমন একজন যোদ্ধা সু-নির্দিষ্ট কর যে আমাকে ভীষণভাবে আক্রমণ করবে আর আমিও ভীষণভাবে তাকে প্রতি আক্রমণ করে পরাজিত ও হত্যা করে এবং তার ধন-সম্পদ আমি গ্রহণ করি। হযরত আবদুল্লাহ্ 'আমীন' বললেন তাঁর দোয়া শুনে। এরপর আবদুল্লাহ্ বিন্ জাহস (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহ! আগামী কাল যুদ্ধে আমার সামনে একজন বীর যোদ্ধাকে উপস্থিত কর যে আমাকে প্রচন্ড আক্রমণ করবে এবং আমিও তাকে অনুরূপ করব। সে যেন আমাকে শহীদ করে নাক, কান কেটে দেয়। সেদিন কিয়ামতে তোমার সামনে উপস্থিত হব, তখন আমাকে জিজ্ঞেস করবে, আবদুল্লাহ! তোমার নাক, কান কেন কাটা কেন? আমি উত্তরে বলব হে আল্লাহ্! তোমার রাস্তায় যুদ্ধ করতে গিয়েই এরূপ হয়েছে। তাঁর দোয়ায় হযরত সায়াদ 'আমীন' বললেন। পরের দিন যুদ্ধে উভয়ের দোয়া অনুসারেই তাঁদের বাসনা পূর্ণ হয়েছিল। -(খামীস)

হযরত সায়াদ (রাঃ) বলেন, আবদুল্লাহ্ বিন্ জাহসের দোয়া আমার দোয়ার চেয়ে উত্তম ছিল। তাঁকে সন্ধ্যার সময় দেখলাম শাহাদাতবরণ অবস্থায় তিনি একস্থানে নাক, কান কাটা অবস্থায় পড়ে আছেন। যুদ্ধে তাঁর হাতের তলোয়ার ভেঙ্গে গেলে রাসূল (সাঃ) তাঁর হাতে একটা গাছের ডাল দিলে এটাই তলোয়ারের মত কাজ করছিল। যুদ্ধের পরেও বহুদিন পর্যন্ত এ ডালটা বর্তমান ছিল এবং শেষ পর্যন্ত বিক্রি হয়েছিল তা দু'শত দিনারে। -(ইসাবা)

লক্ষ্য পথে পৌঁছার জন্য শহীদ হওয়ার আকুল আকাঙ্খায় দুনিয়ায় সকল প্রকার অপমান ও অত্যাচার বরণ করে নেয়ার দৃষ্টান্ত সত্যই বিরল। জিহাদে শুধু যোগদান করেই সাহাবীগণ গাজী নামের গৌরব লাভ করতে চাননি বরং তাঁরা কঠোর যুদ্ধ করে বীর যোদ্ধাদের মোকাবেলা করতে আকাঙ্খা করেছেন। জিহাদে হযরত সায়াদ অংশগ্রহণ করে ক্ষান্ত হননি, তিনি শক্তিশালী যোদ্ধার সাথে যুদ্ধ করতে আকাঙ্খা করেছিলেন। তিনি গাজী হতে চাননি, প্রবলতম শত্রুর সাথে যুদ্ধ করে তিনি শহীদ হতে চেয়েছেন। শুধু তাই নয়, তাঁর মৃতদেহের উপর অপমান ও অত্যাচার গ্রহণ করে আল্লাহ্ প্রেমের অতুলনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপনে জগতবাসীর কাছে ধন্য হয়েছেন। এমন অভূতপূর্ব ত্যাগের দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে আর কটি পাওয়া যাবে?

যুদ্ধে মুসলিম মহিলাদের প্রথম অংশগ্রহণ

যুদ্ধক্ষেত্রে যোদ্ধাদের মনোবল অব্যাহত রাখার এবং সমরসঙ্গীত গাওয়ার জন্য মহিলাদেরকেও যুদ্ধের ময়দানে নিয়ে যাওয়ার প্রচলন অরবদের মধ্যে থাকলেও ৩রা হিজরীতে ওহুদ যুদ্ধেই সর্বপ্রথম মুসলিম মহিলারা অংশগ্রহণ করেছিলেন। ওহুদ ময়দানে কোরায়েশ-কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে মুসলমানদের শাহাদত এবং যুদ্ধের তীব্রতার সংবাদ মদীনায় এসে পৌঁছলে মুসলিম মহিলারা তা সহ্য করতে না পেরে অভিলম্বে সেখানে গিয়ে পৌঁছেন। উম্মুল মুমেনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) আহত নবীর মুখমণ্ডল থেকে রক্তের দাগ ধুয়ে দিতেন। হযরত সফিয়া বিনতে আবদুল্ল মুত্তালিব তাঁর ভাই হযরত হামযা (রাঃ)-এর লাশ দেখে ইন্নালিল্লাহহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন পাঠ করেন এবং তাঁর জন্য মাগফিরাত কামনা করেন। স্বামী হযরত মুসআব (রাঃ) ইবনে ওমাইরের লাশ দেকে হযরত হামনাহ (রাঃ) বিনতে জাহশ এর মুখ থেকে সহসা চিৎকার বেরিয়ে আসে এবং তিনি অজ্ঞান হয়ে যান। কোন কোন আনসার মহিলা নিজেদের শহীদদের লাশের পাশে বসে পড়েন। সত্যি এটি ছিল এক মর্মান্তিক দৃশ্য; একদিকে দূর দুরান্ত পর্যন্ত ওহুদ ময়দানে মুসলিম মুজাহিদদের ৭০ টি লাশ বিক্ষিপ্ত পড়েছিল অপরদিকে আহত মুজাহিদরা মাটিতে পড়ে কাতরাচ্ছিলেন আর মহিলারা তাদেরকে পানি পান করাতেন, তাদের জখমে পট্টি বাঁধতে এবং অন্যান্য পরিচর্যায় ব্যস্ত ছিলেন।

ওহুদের যুদ্ধে হযরত আলী (রাঃ)-এর বীরত্ব

মুসলমানদের ওহুদ যুদ্ধে শোচনীয় পরাজয়ের ইতিহাস পাঠকমাত্রই কিছুনা কিছু অবগত আছেন। রাসূল (সাঃ)-এর শুধুমাত্র একটি আদেশ অমান্যের কারণে

মুসলমানদের পরাজয় বরণ করতে হয়েছিল। একটিমাত্র ভুলের কারণে বিজয়ী মুসলমানরা হঠাৎ চারদিক থেকে অতর্কিত শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে পরাজিত হয়েছিলেন। এ যুদ্ধে বহু সহাবী শাহাদাত বরণ করেন এবং অনেক সাহাবী যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করেছিলেন। এ যুদ্ধে রাসূল (সাঃ) একদল কাফির দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে পড়লে তখন এ কথাও প্রচার হয়েছিল যে রাসূল (সাঃ) শাহাদাত বরণ করেছেন। এ হৃদয় বিদারক সংবাদের সাহাবীগণ অত্যন্ত চিন্তিত ও বিচলিত অবস্থায় অনেকে ছত্রভঙ্গ হয়ে এদিক ওদিক ছুটাছুটি করেন। অনেকেই পলায়নের পথ খুঁজেছিলেন।

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, রাসূল (সাঃ) যখন আমার চোখের আড়াল হয়ে গেলেন, যখন মুসলমানদেরকে কাফিররা ঘিরে ফেলল, তখন আমি তাঁকে সর্ব প্রথম জীবিতদের মধ্যে অনুসন্ধান করে না পেয়ে আমি শহীদদের কাতারে তাঁকে অনুসন্ধান করে ব্যর্থ হয়ে ভাবলাম, এমনও তো হতে পারে তিনি পলায়ন করেছেন। তাহলে হয়ত আমাদের গুনাহর জন্যে আল্লাহ্ তাঁর রাসূলকে উঠিয়ে নিয়েছেন। তখন আমি তরবারি হাতে কাফেরদের মধ্যে ঢুকে পড়ে প্রচন্ডভাবে তাদেরকে আক্রমণ করতে থাকি। আর এ আক্রমণে তারা পিছন হটতে শুরু করে। এমন সময় নজর পড়ল রাসূল (সাঃ)-এর উপর। তাঁকে দেখতে পেয়ে আমি যারপরনাই আনন্দিত হয়ে অনুসরণ করলাম, আল্লাহ্ তাআলা তাঁর ফেরেশতাদের সাহায্যে তাঁর হাবীবকে রক্ষা করেছেন। আমি রাসূল (সাঃ)-এর কাছে যাওয়ার মাথে সাথেই একজন কাফের আমাকে 'আক্রমণ' করতে আসে। তিনি (সাঃ) তখন আমাকে বললেন, আলী, একে বাধা প্রদান কর। আমি একাই এর সম্মুখীন হলে আমার আক্রমণে পিছু হটতে বাধ্য হল আর কেহ কেহ নিহত হল। অন্য একদল কাফের রাসূল (সাঃ)-কে আক্রমণ করতে অগ্রসর হলে তিনি (সাঃ) এবারও আমাকে বললেন, আলী! এদেরকে প্রতিহত কর। আমি একাই তাদের সম্মুখীন হলে কাফেররা জীবনের মায়ায় পালিয়ে গেল। এমন সময় রাসূল (সাঃ) ওহীপ্রাপ্ত হলেন। হযরত জিব্রাঈল (আঃ) এসে হযরত আলী (রাঃ)-এর বীরত্ব ও সাহায্যের প্রশংসা করলেন। তখন রাসূল (সাঃ) বললেন, "নিশ্চয়ই আলী আমার থেকে এবং আমি আলী থেকে।" হযরত জিব্রাঈল (আঃ) এ কথা শুনে বললেন এবং আমি আপনাদের উভয় থেকেই। -(কুররাতুল আইন)

রাসূল বিহীন জীবনের কোন সার্থকতা নাই। রাসূল (সাঃ) না থাকলে বেঁচে থাকার সার্থকতা কি? এ কথা মনে করে হযরত আলী (রাঃ) শুধু শহীদ হবার

লক্ষ্যে শত্রুদের উপর বীর বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। রাসূল (সাঃ)-কে যখন তিনি জীবিত অবস্থায় দেখতে পেলেন তখন কি আনন্দ তার মনে প্রাণে! কত আকুল হয়ে কত উদ্ভ্রান্ত হয়ে তিনি ছুটে গেলেন রাসূল (সাঃ)-এর সন্নিকটে। আবার রাসূল (সাঃ)-এর আদেশে তাঁকে শত্রুর কবল থেকে রক্ষা করার জন্যে নিজের জীবনকে তুচ্ছ করে একাই ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তাঁর এ আত্মত্যাগ, সাহস ও বীরত্ব দেখে আল্লাহ্ কতই না প্রশংসা করলেন।

সাহাবী জীবনের এটিই ছিল প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য। তাঁরা সকলেই আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের জন্যেই জীবন ধারণ করতেন। নিজেদের স্বার্থের কিংবা দুনিয়ার সুখ-শান্তির জন্য তাঁরা এক মুহূর্তেও বেঁচে থাকার চিন্তা তাঁদের মনে কখনো উদয় হয়নি।

যে সাহাবী (রাঃ)-কে গোসল দিলেন ফেরেশ্তারা

নতুন বিয়ে করার কারণে ওহুদ যুদ্ধে হযরত হানযালা (রাঃ) প্রথম দিকে যোগদান করেননি। নববধূর সাথে রাত যাপন করার এমন সময় হঠাৎ শুনতে পেলেন ওহুদ যুদ্ধে মুসলমানদের শোচনীয় পরাজয় ঘটেছে। এ সংবাদ তিনি আর সহ্য করতে না পেরে নাপাক অবস্থায়ই তলোয়ার হাতে নিয়ে ওহুদ প্রান্তরে অগ্রসর হয়ে সোজা শত্রুদের মধ্যে ঢুকে পড়ে যুদ্ধ করতে করতে অবশেষে শাহাদাতবরণ করেন। শরীর নাপাক থাকলেও বিনা গোসলেই শহীদকে দাফন করা চলে। হযরত হানযালাকে বিনা গোসলেই দাফনের আয়োজন করা হয়। রাসূল (সাঃ) বলেন ফেরেশতাগণ হযরত হানযালাকে গোসল করাচ্ছেন। আর এ কথা তিনি সাহাবী (রাঃ)-গণকেও জানিয়েছিলেন। আবু সাঈদ সায়াদী বললেন, আমি রাসূল (সাঃ)-এর সংবাদ শুনে হযরত হানযালাকে দেখলাম তাঁর চুল থেকে পানি ঝরে পড়ছে। মদীনায় প্রত্যাবর্তনের পর রাসূল (সাঃ) হযরত হানযালার সংবাদ নিয়ে জানতে পারলেন যে, তিনি সেদিন নাপাক আবস্থায় যুদ্ধে গিয়েছিলেন। -(কোররা)

বীরের উপযুক্ত যুদ্ধের দামামা, জিহাদের ডাক এবং রাসূলের প্রেম তাঁকে আত্মভোলা করে তুলবে এতে আশ্চর্যের কি আছে? হযরত হানযালা সত্যিকার বীর এবং রাসূল প্রেমিক ছিলেন। তাঁর শিরায় শিরায় শাহাদাতের রক্ত প্রবাহিত হত। যুদ্ধক্ষেত্রে মুসলমানদের বিপর্যয়ে রাসূল (সাঃ) শত্রুর কবলে পড়েছেন- এ সংবাদ পেয়ে তিনি কেমন করে গোসল করার জন্য অপেক্ষা করবেন? একেই বলে রাসূলের প্রতি রাসূল প্রেমিকের ভালবাসা ও সুমহান আত্মত্যাগ।

হযরত আমর ইব্নে জুমূহ (রাঃ)-এর আকাঙ্খা

হযরত আমর ইব্নে জুমূহ (রাঃ) চার পুত্রের জনক এবং তিনি ছিলেন খোঁড়া। তাঁর পুত্রগণ অধিকাংশ সময় হযরত রাসূল (সাঃ)-এর সান্নিধ্যে সময় অতিবাহিত করতেন এবং জিহাদে শরীক হতেন। ওহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার জন্যে হযরত আমর ইব্নে জুমূহ (রাঃ)-এর প্রবল বাসনা ছিল। লোকেরা বললেন, আপনি অসমর্থ, হাঁটতে পারেন না, আবার যুদ্ধে যাবেন কি করে? তিনি বললেন, বড়ই দুঃখের কথা যে আমার ছেলেরা জান্নাতে যাবে আর আমি যেতে পারব না। তাঁর স্ত্রী বিদ্রুপ করে বললেন, আমি দেখতে পাচ্ছি যে, আমার স্বামী যুদ্ধ থেকে পালিয়ে এসেছেন। তিনি এ সমস্ত কথা শুনে তরবারী হাতে পবিত্র কাবার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, হে আল্লাহ্! আমাকে আমার পরিবারের কাছে ফিরিয়ে এনোনা।

এরপর তিনি রাসূল (সাঃ)-এর খিদমতে গিয়ে হাযির হয়ে নিজ পরিবার-পরিজনের বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে এবং নিজ ইচ্ছা প্রকাশ করে বললেন, আমি খোঁড়া বলেই পায়ে হেঁটে জান্নাতে যেতে চাই, আপনি আমাকে অনুমতি দিন। রাসূল (সাঃ) বললেন, আল্লাহ্ যেহেতু তোমাকে পঙ্গু করেছেন জিহাদে না গেলেই কি ক্ষতি হবে? তিনি পুনরায় নিজের ইচ্ছা ব্যক্ত করলে রাসূল (সাঃ) তাঁকে অনুমতি প্রদান করলেন জিহাদে শরীক হওয়ার জন্য। হযরত আবু তালহা (রাঃ) বলেন, আমি দেখেছি আমর খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়ার সময় বলছেন, আল্লাহ্র কসম, আমি জান্নাত লাভের আশা করি। তাঁর এক পুত্রও তাঁর সাথী হলেন। পিতা-পুত্র উভয়ের জিহাদের ময়দানে শাহাদতবরণ করলেন এবং তাঁর স্ত্রী নিজ স্বামী ও পুত্রের লাশ উটের পিঠে করে মদীনায় আনতে চাইলেন কিন্তু উটটি হঠাৎ বসে পড়ল। বহু চেষ্টা করেও উটকে উঠানো আর সম্ভব হলনা। অবশেষে বহু চেষ্টার পর যখন তাকে খাড়া করা হল তখন সে ওহুদের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে রইল। আমরের স্ত্রী রাসূল (সাঃ)-কে এ ব্যাপারে অবগত করালে তখন রাসূল (সাঃ) বললেন, এরূপ করার জন্য তো উটটিকে হুকুম দেয়া হয়েছে। আমরের অন্তিম ইচ্ছাই পূর্ণ হয়েছে! এরই নাম জান্নাতের আকাংখা আর এটাই আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের জন্য প্রকৃত ভালবাসা। এ প্রেমের ঢেউ মৃত্যুর পরও শেষ হয়না। হযরত আমর (রাঃ) জীবনে যা আকাঙ্খা করেছিলেন, ঐকান্তিক ভাবে যা কামনা করেছিলেন, তা সম্পূর্ণরূপে নিজ জীবনে বাস্তবায়িত হয়েছিল। আল্লাহর ইচ্ছায় উটও তাঁর আকাঙ্খা পূরণে সহায়তা করেছিল।

হযরত মুসয়াব ইব্নে উমায়েরের শাহাদত

পারিবারিক সূত্রেই হযরত মুসযার ইব্নে উমায়ের (রাঃ) ছিলেন সম্পদশালী। তিনি অতি সুখ-স্বচ্ছন্দ ও প্রাচুর্যে প্রতিপালিত হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন সুন্দর সুঠামদেহি যুবক। পিতা তাঁকে বহুমূল্যবান পোশাক পরাতেন। সম্পদশালী পরিবারের সন্তান বিধায় জীবনে আরাম-আয়েশ পূর্ণমাত্রাই তিনি ভোগ করেছিলেন। ইসলাম প্রচারে প্রথমেই তিনি বাড়ি থেকে পালিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। এ সংবাদ অবগত হয়ে বাড়ির লোকজন বন্দী করে রাখে। এভাবে কিছুদিন বন্দী অবস্থায় জীবন কাটাতে বাধ্য হন। একদিন সুযোগ পেয়ে পালিয়ে হাবশে হিযরতকারী মুসলমানদের সাথে মিলিত হন। সেখান থেকে ফিরে মদীনায় হিযরত করেন এবং নিতান্ত দারিদ্যের মত জীবন-যাপনে অভ্যাস্ত হয়ে পড়েন। তার এ অবস্থা দর্শনে রাসূল (সাঃ) ব্যথিত হলেন। তিনি উমায়রের গায়ে একটি জীর্ণশীর্ণ চাদর দেখতে পেয়েছিলেন। এটি কয়েক জায়ায় ছিন্ন এবং তালি দেয়া ছিল। তাঁর অতীত এবং বর্তমান অবস্থা চিন্তা করে রাসূল (সাঃ)-এর চোখে অশ্রু এসেছিল।

ওহুদ যুদ্ধে মুহাজিরদের পতাকা হযরত মুসাইয়াবের হাতে ছিল। যুদ্ধে বিপর্যয় ঘটায় মুসলমানরা যখন ছত্রভঙ্গ হয়ে চারদিকে ছুটাছুটি করেছিলেন তখন তিনি এক জায়গায় পতাকা হাতে অটল হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। তখন এক কাফেরের কাছে এসে তরবারির আঘাতে তাঁর ডান হাতটি কেটে দেয়, তিনি তখন বাম হাতে পতাকা ধারণ করলে কাফিরটি তাঁর সে হাতটিও কেটে ফেলে। তিনি উভয় বাজু ও বুকের সাহায্যে পতাকাটি চেপে ধরে রাখেন অথচ কোন ক্রমেই পতাকা মাটিতে পড়তে দিলেন না। কাফেরটি তখন তাঁর প্রতি একটি তীর নিক্ষেপ করলে মাটিতে লুটিয়ে পড়া অবস্থায় শাহাদতবরণ করেন। দাফন করবার সময় দেখা গেল তাঁর সাথে একটি চাদর আছে এবং তাও এত ছোট যে তাঁর শরীর ঢাকা যায় না। মাথা ঢাকলে পা খালি থাকে আর পা ঢাকলে মাথা খালি থাকে। এটি দেখে রাসূল (সাঃ) বললেন, চাদর দিয়ে মাথা ঢেকে দাও এবং গাছের পাতা দিয়ে পা ঢেকে দাও। সীমাহীন সুখে লালিত-পালিত হওয়া সত্ত্বেও তাঁর অন্তিম জীবন ছিল এ রকম। তিনি দুনিয়া চাননি। দুনিয়ার সুখ শান্তি, তাঁর কাম্য ছিলনা। পরকালের, সুখ-শান্তির জন্যে তিনি ব্যাকুল হয়ে ইসলাম গ্রহণ করে কাম্য বস্তু লাভে সমর্থ হয়েছিলেন। যাঁরা সত্যিকার মুসলমান পরকালের আশায় দুনিয়ার সকল কিছুই বিসর্জন দিতে সর্বদা প্রস্তুত থাকেন।

হযরত সায়াদ (রাঃ)-এর প্রতি খলিফার অসিয়ত

হযরত ওমর (রাঃ) তখন মুসলিম জাহানের খলিফা। ইরাকের যুদ্ধে সেনাপতিত্ব করবার আলোচনায় হযরত সায়াদ ইব্‌নে আবি ওয়াক্কাসের নাম উল্লেখিত হয়েছিল। তিনি ছিলেন আরবীয়দের অন্যতম। তাই সবাই তাঁকেই মনোনীত করলে ইরাক যুদ্ধের নেতৃত্ব দেয়া হল। যখন তিনি তাঁর সৈন্যদল নিয়ে কাদেসিয়া আক্রমণ করতে গেলেন, তখন পারস্যের বাদশাহ বিশ্ববিখ্যাত রুস্তমকে তাঁর মোকাবেলা করতে আদেশ দিলেন। কিন্তু রুস্তম যুদ্ধে না যাওয়ার জন্যে নানা অজুহাতে বাদশাহকে জানালেন যে, তিনি রাজধানী থেকেই সৈন্যদলকে পরিচালনা করতে পারবেন এবং প্রয়োজনে সৈন্যদলকে সর্বপ্রকার সাহায্য প্রদান করবেন। কিন্তু বাদশাহ তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে যুদ্ধে যেতে বাধ্য করলেন।

হযরত সায়াদ যখন মদীনা থেকে রওয়ানা হন তখন হযরত ওমর (রাঃ) তাঁকে এ অসিয়ত করলেন যে, হে সায়াদ! এ কথায় যেন তুমি ধোকায় না পড় যে তুমি একজন সাহাবী এবং রাসূল (সাঃ)-এর মামা। আল্লাহ্‌ অপবিত্র দ্বারা অন্য কোন কিছুকে পরিশুদ্ধ করেন না। বরং পবিত্র বস্তু দ্বারা অপবিত্র কে ধৌত করেন। আল্লাহ্‌ তা'য়ালা বান্দার বন্দেগীই শুধু গ্রহণ করেন। আল্লাহ্‌র কাছে সকলেই সমান। সকলেই তাঁর বান্দা এবং তিনি সকলেরই প্রভু। তাঁর কাছে থেকে পুরস্কার লাভ করতে হলে তা শুধু ঐকান্তিক গোলামীর সাহায্যেই সম্ভব। প্রতিটি শব্দে রাসূল (সাঃ)-এর আদর্শ অনুসরণ আনুগত্য করাই আমল করার বস্তু। তুমি আমার উপদেশ স্মরণ রাখ যে, তোমাকে একটা কাজের জন্যে পাঠানো হচ্ছে। এর সাফল্য নির্ভর করবে শুধু আল্লাহ্‌র প্রতি আনুগত্যের উপর। নিজকে এবং নিজের সঙ্গীদিগকে সৌন্দর্য,পবিত্রতা অবলম্বন করতে অভ্যস্ত করবে। আল্লাহ্‌কে ভয় করবে। দু'টি বস্তুর সাহায্যে একমাত্র আল্লাহ্‌র ভয় লাভ হয়। আল্লাহর বন্দেগীতে এবং গুনাহ থেকে বেঁচে থাকায়। -(আশহা)

এ উপদেশ পাওয়ার পর মনে-প্রাণে তা গ্রহণ করে হযরত সায়াদ (রাঃ) রুস্তমের মোকাবেলায় সৈন্যদের নিয়ে যাত্রা শুরু করেন।

ওহুদ যুদ্ধে হযরত ওয়াহাব ইব্‌নে কাবুসের শাহাদত

হযরত ওয়াহাব ইব্‌নে কাবুস (রাঃ) ছিলেন একজন গ্রাম্য সাহাবী। তিনি গ্রামে বাস করে ছাগল চরাতেন। একদিন নিজের ছাগলগুলো ভ্রাতুষ্পুত্রের ছাগলের সাথে রেখে তিনি মদীনার দিকে চলে গেলেন। সেখানে তিনি জানতে পারলেন যে রাসূল (সাঃ) ওহুদ গমন করেছেন। একথা শুনে তিনি ওহুদের

যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে রাসূল (সাঃ)-এর সাথে দেখা করলেন। ঠিক এ সময়ে একদল কাফের রাসূল (সাঃ)-কে আক্রমণ করতে অগ্রসর হলে রাসূল (সাঃ) বললেন, 'যে লোক এ লোকদেরকে তারিয়ে দিতে পারবে সে আমার সাথে জান্নাতে যাবে।' হযরত ওয়াহাব (রাঃ) একথা শুনে অতিদ্রুত তাদের উপর তরবারির আক্রমণ চালাতে লাগলেন এবং এতে কাফেরেরা পালাতে বাধ্য হল। পুনরায় একদল এসে রাসূল (সাঃ)-এর উপর আক্রমণোদ্যত হলে রাসূল (সাঃ) এবারও একই উক্তি করলেন। হযরত ওয়াহাব (রাঃ) এবারও লোকগুলোকে হটিয়ে দিলেন। তৃতীয়বার একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হলে হযরত ওয়াহাব (রাঃ) তাদের সাথে যুদ্ধ করে শাহাদতবরণ করলেন।

হযরত সায়াদ ইব্‌নে আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) বলেন, হযরত ওয়াহাবকে আমি যেরূপ বীরত্ব প্রদর্শন করতে দেখেছি এমন আর কাউকে দেখিনি। তাঁর মৃত্যুর সময় আমি রাসূল (সাঃ)-কে হযরত ওয়াহাবের শিয়রে দাঁড়ান অবস্থায় দেখলাম। তিনি বলেছিলেন, আল্লাহ্‌ তোমার উপর সন্তুষ্ট, আমিও তোমার উপর সন্তুষ্ট। অতঃপর তিনি (সাঃ) তাঁকে নিজ হাতে দাফন করেন। ওহুদ যুদ্ধে রাসূল (সাঃ) আহত হয়েছিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, হযরত ওয়াহাবের আত্মত্যাগ দেখে আমি খুবই আশ্চার্যন্বিত হয়েছিলাম, এমন আর কারো ত্যাগে এরূপ হইনি। তাঁর ন্যায় আমল নিয়ে যদি আমি আল্লাহ্‌র কাছে যেতে পারতাম। -(ইসাবা ও কুরবা)

বীরে মাওনার যুদ্ধ

একটি সু-প্রসিদ্ধ যুদ্ধ হিসাবে বীরে মাওনাকে ইতিহাসের পাতায় অভিহিত করা হয়। এ যুদ্ধে সত্তরজন সাহাবীর একটি দল শত্রু কর্তৃক সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হয়েছিল। এ দলের সকলেই হাফেযে কোরআন ছিলেন। এ দলকে বলা হত 'কোরা' অর্থাৎ কোরআন বিশেষজ্ঞ দল। এ দলের কয়েকজন মুহাজির ব্যতীত আর সকলেই ছিলেন আনসার। এ দলটিকে রাসূল (সাঃ) অতিশয় ভালবাসতেন। কারণ তাঁরা রাতে যিকর এবং কোরআন পাঠ করতেন। তা ছাড়া দিনে তাঁরা রাসূল (সাঃ)-এর নানা কাজ-কর্মে অংশগ্রহণ করতেন। নজদের অধিবাসী আমের ইব্‌নে মালেক দলটিকে তাবলীগ করাবার অজুহাতে নিজ স্থানে নিয়ে গিয়েছিল। রাসূল (সাঃ) দ্বিধাবোধ করে বলেছিলেন, আমার ভয় হচ্ছে, না জানি আমার সাহাবীদের কোনরূপ বিপদ ঘটে। কিন্তু এ লোকটি রাসূল (সাঃ)-কে অনেক সান্ত্বনা দেয়ায় অবশেষে তিনি সাহাবীদেরকে তার সাথে যাবার

অনুমতি প্রদান করেন। তাঁদের রওয়ানা হওয়ার পূর্বে রাসূল (সাঃ) আমের ইবনে তোফায়েলকে একটি পত্রে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিয়েছিলেন। সাহাবীদের এ দলটি যখন মদীনা অতিক্রম করে বীরে মাওলা নামক স্থানে এসে উপনীত হন। তাঁদের মাঝে দু'জন ব্যক্তি হযরত ওমর ইব্‌নে উমাইয়া এবং হযরত মুনযর ইব্‌নে ওমর সকলের উট নিয়ে চরাতে গেলেন এবং হযরত হারাম দু'জন সাথী নিয়ে আমের ইব্‌নে তোফায়েলের কাছে রাসূল (সাঃ)-এর পত্রটি পৌঁছাতে গেলেন। আমেরের বাড়ির কাছে গিয়ে হযরত হারিস তাঁর সাথীদ্বয়কে বললেন, তোমরা এখানেই অবস্থান কর। আমি আগে গিয়ে দেখি সে আমার সাথে কি ব্যবহার করে। যদি ভাল ব্যবহার করে তাহলে তোমরাও পরে এস। অন্যথায় এখান থেকেই ফিরে যেও। কারণ তিন জনের মরার চেয়ে একজনের মরাই যুক্তিসঙ্গত বলে মনে করি। আমের ইব্‌নে মালেকের ভাতিজা ছিল আমের ইব্‌নে তোফায়েল। সে ছিল মুসলমান বিদ্বেষী। পত্রটি হযরত হারিস তার হাতে দিলে সে তাঁকে বর্শা দ্বারা এমনভাবে বিদ্ধ করল তৎক্ষণাৎ তিনি শাহাদাত বরণ করলেন।

আমের তার গোত্রীয় লোকদেরকে একত্রে করে আদেশ করল, যাও, এখানকার একটি মুসলমানও যেন জীবিত ফেরত না যায় তোমরা তারই ব্যবস্থা কর, কিন্তু সাহাবীগণ আমের ইব্‌নে মালেকের আশ্রয়ে আছেন বলে তারা দ্বিধাবোধ করতে লাগল। আমেরের বিরাট দলকে মুষ্টিমেয় সাহাবীর সাথে লড়াই করতে হুকুম দিল। বিরাট দলের সাথে অল্প সংখ্যক সাহাবী প্রাণপণ যুদ্ধ করে সকলেই শেষ পর্যন্ত শাহাদাত বরণ করলেন। তাঁদের মাঝে মাত্র জীবিত ছিলেন হযরত কা'ব ইব্‌নে যায়েদ। তিনি গুরুতর আহত অবস্থায় মরার মত পড়ে রয়েছিলেন। তাই কাফেররা সকলকে মৃত মনে করে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে চলে যায়।

উট চরাতে যে দু'জন সাহাবী গিয়েছিলেন তাঁরা আকাশে দেখলেন শকুন উড়ছে। তারা তখন মনে করলেন নিশ্চয় কোন বিপদাপদ ঘটেছে। খোঁজ নিতে এসে দেখলেন, তাঁদের সাথীরা সকলেই শাহাদাত বরণ করেছেন। আর তাঁদের সাওয়ারীগুলো রক্তমাখা অবস্থায় ঘুরে বেড়াচ্ছে সন্ত্রস্ত অবস্থায়। হযরত ওমর ইব্‌নে উমাইয়া তাঁর সাথীকে বললেন, চল আমরা ফিরে গিয়ে রাসূল (সাঃ)-কে এ দুঃখ জনক সংবাদ দেই। খবর তো তিনি পাবেনই হযরত মুনযির বললেন। শাহাদাতের সুযোগ ছেড়ে এ স্থান ত্যাগ করতে আমার এখন আর ইচ্ছে হচ্ছে না। এখানে আমার সাথী বন্ধুরা শুয়ে আছেন। চল এগিয়ে গিয়ে আমরাও তাঁদের

সাথে মিলিত হই। এ কথা বলেই উভয়েই যুদ্ধে লাফিয়ে পড়লেন। এক পর্যায়ে হযরত মুনযির শহীদ হলেন এবং হযরত ওমর ইব্‌নে উমাইয়া হলেন বন্দী। আমেরের মায়ের একটি মানত ছিল গোলাম আযাদ করার। হযরত ইব্‌নে উমাইয়া সে মানত উপলক্ষে মুক্তি লাভ করেন। ইসলামের গৌরব এ সমস্ত সাহাবীরা। তাঁদের উদ্দেশ্যে ইসলাম আজ প্রতিষ্ঠিত। তাঁদের কাছে শাহাদাত ব্যতীত আর কোন বস্তুই প্রিয়তর ছিলনা। তাঁরা শহীদ হওয়াকে গৌরব মনে করতেন। দুনিয়াতে আল্লাহ্‌কে খুশি করা ছাড়া আর কোন কাজকেই তাঁরা পছন্দ করতেন না। খাওয়া-পরা সবই যে তারা শুধু আল্লাহ্‌র খুশির নিমিত্তেই করতেন। নিজের জীবনটি উৎসর্গ করতে তাঁরা সব সময়েই প্রস্তুত হয়ে থাকতেন। বড় দান জীবন দানের চেয়ে আর কি হতে পারে? আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করার জন্যে এটিই তাঁরা দান করতে সর্বদা প্রস্তুত ছিলেন।

হযরত উমায়ের (রাঃ) এর বাণী

বদরের যুদ্ধক্ষেত্রে হযরত রাসূল (সাঃ) একটি তাবুতে অবস্থান করে তিনি সাহাবীগণকে বললেন- উঠ, অগ্রসর হও। ঐ জান্নাতের দিকে এগিয়ে চল, যার প্রশস্ততা আসমান-যমীন হতেও অনেক বেশি এবং যা পুণ্যবানের জন্যে তৈরী হয়েছে। হযরত ওমায়ের ইব্‌নে ইলহাম নামে এক সাহাবী রাসূল (সাঃ)-এর কথাগুলো শুনে বলে উঠলেন, চমৎকার। রাসূল (সাঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, কোন কথায় এটা বললে? তিনি উত্তরে বললেন, ইয়া রসূলুল্লাহ! আমারও ইচ্ছা হচ্ছে এ জান্নাতের মধ্যে থাকতে। রাসূল (সাঃ) বললেন, এর মধ্যে তুমিও থাকবে। একথা শুনে হযরত উমায়ের (রাঃ) কটি খেজুর বের করে খেতে খেতে বললেন, এগুলো খাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করছি। আবার বললেন, এগুলো কখন শেষ হবে? এতক্ষণ কে অপেক্ষা করবে? একথা বলেই তিনি খেজুরগুলো ফেলে দিয়ে তরবারী নিয়ে শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে কিছুক্ষণের যুদ্ধে তিনি শহীদ হয়ে তাঁর আকাংখিত জান্নাতে প্রবেশ করলেন। -(তাবকাত)

প্রকৃতপক্ষে তাঁরাই জান্নাতের মূল্য অনুধাবন করতেন। যদি আমাদেরও ঈমান সঠিক হয়ে যায় তাহলে সকল কাজই আমাদের পক্ষে সহজ হয়ে যাবে।

হযরত ওমর (রাঃ)-এর হিযরত

ইসলামের প্রারম্ভে মুসলমানরা যখন দুর্বল এবং সংখ্যালঘু তখন রাসূল (সাঃ) ইসলামের শক্তি বৃদ্ধির মানসে হযরত ওমরকে মুসলমান করে দেয়ার

জন্যে আবদুল্লাহ্ কাছে আবেদন করলে সে দোয়া কবুল হয়েছিল। হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌নে মাসউদ (রাঃ) বললেন, যে পর্যন্ত না ওরা মুসলমান হয়েছিল সে পর্যন্ত আমরা কাবার ধারে কাছেও নামায পড়তে পারিনি। হযরত আলী (রাঃ) বলেন, প্রথম দিকে সকলেই লুকিয়ে হিযরত করেছিলেন। কিন্তু ওমর হিযরত করার যখন ইচ্ছা করলেন তখন তিনি তীর-তরবারী নিয়ে প্রথমে কাবা শরীফে গেলেন। তার পর খুব ধীর স্থির হয়ে তওয়াফ শেষে নামায পড়ে কাফেরদের আস্তানায় গিয়ে বলেন, যারা নিজের মাতাকে পুত্রহারা, স্ত্রীকে বিধবা এবং সন্তানকে এতিম করতে চায় তারা যেন মক্কার বাইরে গিয়ে আমাকে বাধা দেয়। কাফেরদের বিভিন্ন আস্তানায় একথা জানিয়ে নির্ভিকচিত্তে মদীনার দিকে বলে গেলেন, তখন তাঁকে বাধা প্রদান করতে সাহস করেনি কোন কাফের।

মুতার জিহাদ

রাসূল (সাঃ) বুসরাধিপতি কিংবা রোম সম্রাটের নামে এক পত্র পাঠিয়েছিলেন। আরব ও সিরিয়ার সীমান্ত এলাকাসমূহে যে সমস্ত আরব নেতা বা গোত্রপ্রধান প্রশাসক নিযুক্ত ছিল তাদের একজনের নাম ছিল শুরাহ্‌বীল ইবনে আমর। সে রোম সম্রাটের অধীনে বল্‌কা এলাকার প্রশাসক ছিল। হারেস ইবনে ওমাইর (রাঃ) রাসূল (সাঃ)-এর এ পত্র নিয়ে গিয়েছিলেন। শুরাহ্‌বীল রাসূল (সাঃ)-এর পত্রবাহককে হত্যা করল। এর প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে হযরত (সাঃ) তিন হাজার সৈন্যের এক বাহিনীকে এক বাহিনীকে সিরিয়া অভিমুখে পাঠালেন। রাসূল (সাঃ)-এর আযাদকৃত ক্রীতদাস যায়েদ-ইবনে হারেসাকে এ বাহিনীর সেনাপতি নিযুক্ত করে রাসূল (সাঃ) নির্দেশ দিলেন, "যদি যায়েদ-ইবনে হারেসা শাহাদাতবরণ করে, তবে যাফর তাইয়্যার সেনাপতি হবে। যদি সে-ও শহীদ হয়, তাহলে আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা সেনাপতিত্ব করবে।"

যায়েদ (রাঃ) আযাদকৃত হলেও যেহেতু পূর্বে ক্রীতদাস ছিলেন, হযরত যাফর তাইয়্যার (রাঃ) হযরত আলী (রাঃ)-এর সহোদর ভাই এবং হযরতের বিশেষ প্রিয় ছিলেন, আর আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা ছিলেন বিশিষ্ট আনসার ও প্রখ্যাত কবি। অতএব, জনগণ বিস্মিত হলেন যে হযরত যাফর তাইয়্যার (রাঃ) ও আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহার মত খ্যাতনামা ব্যক্তিগণ বর্তমান থাকতে কোন্ ভিত্তিতে যায়েদ (রাঃ)-কে সেনাপতি মনোনীত করা হল। বিষয়টি নিয়ে নগরবাসীর মধ্যে আলোচনা চলতে লাগল। কিন্তু ইসলাম জগতে যে সাধারণ সমতা নিয়ে এসেছে, তা কায়েম করার উদ্দেশ্যেই এ ধরনের ত্যাগ ও

কোরবানীর প্রয়োজন ছিল। পরবর্তীকালে উসামার অভিযানে যোগদানের জন্য রাসূল (সাঃ) সমস্ত মুহাজিরদের প্রতি নির্দেশ দান করেন। সে অভিযানেও এ যায়েদ ইবনে হারেসার পুত্র উসামাকে সেনাপতিত্ব দান করা হয়। তখনও জনগণের মধ্যে অনেক আলোচনা-সমালোচনা চলে। তখন রাসূল (সাঃ) বিষয়টি জানতে পেরে এক ভাষণ প্রসঙ্গে বললেন; তোমরা তার পিতাকে সেনাপতি করার সময়ও আপত্তি তুলেছিলে; অথচ নিঃসন্দেহে সে সেনাপতি পদের যোগ্য ছিল।" জগদ্বিখ্যাত হাদীস গ্রন্থ সহীহ বোখারীর 'মাগাজী; অধ্যায়ে 'বা'ছে-উসামা' শিরোনামে এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ বর্ণিত হয়েছে। দৃশ্যত যদিও এ অভিযান প্রতিশোধমূলক ছিল, কিন্তু যেহেতু ইসলামের সমস্ত যুদ্ধ-বিগ্রহের মূল লক্ষ্যই ছিল ইসলাম; সুতরাং রাসূল (সাঃ) নির্দেশ দিলেন যে সর্বপ্রথম সিরিয়াবাসীদের ইসলামের দাওয়াত দেবে। যদি তারা ইসলাম কবুল করে, তবে যুদ্ধের প্রয়োজন নেই। রাসূল (সাঃ) এ নির্দেশও দিলেন যে যেখানে হারেস ইবনে ওমাইর স্বীয় কর্তব্য সম্পাদনে জীবন দান করেছেন, সমবেদনা প্রকাশের নিমিত্ত সেখানে যাবে। খোদ রাসূল (সাঃ) সেনাবাহিনীর সাথে সাথে 'সানিয়াতুল বিদা' নামক স্থান পর্যন্ত এগিয়ে গেলেন। সাহাবায়ে কিরাম আল্লাহর দরবারে নিরাপত্তা ও বিজয়ের কাতর প্রর্থনা জানালেন।

মদীনা থেকে সেনাবাহিনী সিরিয়া অভিমুখে রওয়ানা হল। গুপ্তচর মারফত শুরাহবীল এ খবরপ্রাপ্ত হল। শুরাহবীল মোকাবিলার জন্য পূর্ব থেকেই প্রায় এক লক্ষ্য সৈন্য প্রস্তুত রেখেছিল। এদিকে রোম সম্রাট হিরাকল স্বয়ং আরব গোত্রসমূহের অসংখ্য সৈন্যসহ মা'আব নামক স্থানে অবস্থান করছিল। এটি বলকার অন্তর্গত একটি স্থানের নাম। হযরত যায়েদ বিষয়টি জানতে পেরে মনে করলেন, বিষয়টি সম্পর্কে রাসূল (সাঃ)-এর দরবারে খবর পাঠিয়ে পরবর্তী নির্দেশের অপেক্ষা করা যাক। কিন্তু আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা বললেন, "আমাদের আসল উদ্দেশ্য বিজয় লাভ নয় বরং শাহাদত লাভ। আর শাহাদত লাভের সুযোগ সর্বাবস্থায়ই মিলতে পারে।" অবশেষে ক্ষুদ্র এ বাহিনীই এগিয়ে গেল এবং এক লাখ সৈন্যের উপর আক্রমণ করল। হযরত যায়েদ (রাঃ) বর্শার আঘাতে শহীদ হলেন। হযরত যাফর (রাঃ) ঝাণ্ডা তুলে নিলেন। প্রথমে তিনি ঘোড়া থেকে নেমে তার ঘোড়ার পা দুটি কেটে ফেললেন। অতঃপর তিনি এমন দুঃসাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করতে লাগলেন যে অবশেষে তিনি তরবারির আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে ধরাশায়ী হলেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর বর্ণনা করেন, আমি যা'ফরের লাশ দেখেছিলাম। তাঁর দেহে তরবারি এবং বর্শার ৯০টি আঘাত

ছিল। প্রত্যেকটিই তাঁর শরীরের সম্মুখভাগে ছিল। তাঁর পিঠে একটি জখমের দাগও বহন করেনি। হযরত যাফরের পর আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা ঝাণ্ডা হাতে নিলেন। তিনিও বীর বিক্রমে যুদ্ধ করে শহীদ হল। এবার হযরত খালেদ (রাঃ) যুদ্ধের পতাকা হাতে বীরবিক্রমে যুদ্ধ শুরু করলেন। সহীহ বোখারী গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে সেদিন হযরত খালেদের হাতে আটখান তরবারি ভেঙে খানখান হয়ে পড়ে। কিন্তু এক লাখ সৈন্যের বিরুদ্ধে তিন হাজার সৈন্যের কি যুদ্ধ হবে? খালেদ (রাঃ)-এর বিশেষ কৃতিত্ব ছিল এ যে তিনি শত্রুর কবল থেকে সেনাদলকে বাঁচিয়ে আনলেন। বাহ্যত এ পরাজিত সেনাবাহিনী মদীনার কাছে পৌঁছলে নগরবাসিগণ তাদের স্বাগত জানাতে বেরিয়ে এলেন। তখন তাঁরা তাদের সমবেদনা জানাবার পরিবর্তে তাঁদের চেহারায় ধূলি নিক্ষেপ করলেন এবং বললেন, "রে-হতভাগ্য পশ্চাদপরসরণকারীর দল! তোরা আল্লাহ্‌র রাস্তা থেকে ফিরে এসেছিস।" এ ঘটনায় রাসূল (সাঃ) অত্যন্ত মর্মাহত হল। হযরত যাফরকে তিনি বিশেষ স্নেহ করতেন। তাঁর শাহাদতে তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হলেন। রাসূল (সাঃ) মসজিদে গিয়ে শোকার্ত হৃদয়ে বসে রইলেন।

এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি এসে নিবেদন করলেন যে যাফরের বাড়িল মহিলারা শোকে মুহ্যমান হয়ে উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করছে। হযরত তাদের আহ'জারী ও ক্রন্দন করতে নিষেধ করে পাঠালেন। লোকটি চলে গেলেন এবং ফিরে এসে বললেন, "আমি নিষেধ করলাম, কিন্তু তারা বিরত হয়নি।" হযরত তাঁকে পুনরায় পাঠালেন। তিনি পুনরায় গেলেন এবং ফিরে এসে বললেন, "আমাদের কথা কোন কাজেই আসেনি।" একথা শুনে রাসূল (সাঃ) নির্দেশ দিলেন যে "যাও তুমি তাদের মুখে মাটি পুরে দাও।" এ ঘটনা হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে সহীহ বোখারীতে বর্ণিত আছে। সহীহ বোখারীতে বর্ণিত আছে যে হযরত আয়েশা (রাঃ) সে ব্যক্তিকে বলেছিলেন, "আল্লার কসম! তুমি এরূপ করবে না (অর্থাৎ তাদের মুখে মাটি পুরে দেবে না) কারণ এর দ্বারা রাসূল (সাঃ) মনে কষ্ট শুধু বৃদ্ধি পাবে।"

মৃত্যুর মুখোমুখি সত্যের সোচ্চার কণ্ঠ

হযরত সাঈদ ইব্‌নে যুবায়ের (রাঃ) ছিলেন তাবেয়ীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ফকীহ ও মুহাদ্দিস। ৩৭ হিজরীতে কুফায় তাঁর জন্ম এবং ইন্তিকাল ৯৪ হিজরীতে। সাহাবদের একটি নির্বাচিত দলের থেকে তিনি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন হযরত আলী ইব্‌নে আবু তালেব (রাঃ) হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাঃ) এর ন্যায় শ্রেষ্ঠ

সাহাবীগণ। তিনি ছিলেন বিচক্ষণ ফকীহ। ইলমের বিভিন্ন শাখার বড় বড় ইমামরা তাঁর কাছে আসতেন ফিকহের বিভিন্ন বিষয়ের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য। ইমাম আহমদ ইব্‌নে হাম্বল বলতেন ঃ হাজ্জাজ সাঈদ ইব্‌নে যুবায়েরকে হত্যা করেছে, অথচ সারা পৃথিবীতে এমন এক ব্যক্তি নেই যে তাঁর ইলমের মুক্ষাপেক্ষী নয়। সত্য প্রকাশের ব্যাপারে তিনি ছিলেন নির্ভীক। তিনি সত্যকে সত্য এবং মিথ্যাকে মিথ্যা বলতে কুণ্ঠিত হতেন না, এটিই ছিল তাঁর দোষ। এ জন্য রক্তপিপাসু গভর্নর হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ তাঁর রক্তের পিয়াসী হয়ে পড়েন। কুফার গভর্নর প্রসাদে বসে আছেন বনী উমাইয়ার রক্ত পিপাসু গভর্নর হাজ্জাজ ইব্‌নে ইউসুফ। হাজ্জাজ ছিলেন শাহী তখতের চিরায়ত গোলাম। শাসক যা করবেন সবই ঠিক এর বিরুদ্ধে কোন কথা বলা যাবে না। শাসকের জুলুম, জুলুম নয়, বরং প্রজার প্রাপ্য, এর বিরুদ্ধে বলা দন্ডনীয় অপরাধ। এ ছিল জুলুমের বিরুদ্ধে সোচ্চার কণ্ঠ।

রাসূল (সাঃ) বলেন–

أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ -

অর্থাৎ–অত্যাচারী শাসককে উচিত কথা বলাই সর্বোত্তম জিহাদ।

হাজ্জাজ দরজার দিকে তাকিয়ে আছেন। তাকে খুবই উত্তেজিত দেখাচ্ছে। তিনি কারোর আগমন প্রতীক্ষা করছেন। এমন সময় এক কয়েদীর উদয় হল। হাতে-পায়ে শিকল জড়ানো, গায়ের রং কাল। মাথা ও দাঁড়ির চুল সাদা। হাজ্জাজের দু' চোখ থেকে আগুন জ্বলছে। ক্রুদ্ধ স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার নাম কি?"

"সাঈদ ইবনে যুবায়ের।"

"না, সাঈদ নয়, শাকী, (অর্থাৎ সৌভাগ্যবান নয়, দুর্ভাগ্য।)

"আমার মা আমার নামের ব্যাপারে তোমার চেয়ে ভাল জানতেন।"

'তোমার মা ছিল দুর্ভাগ্য আর তুমিও দুর্ভাগ্য।

"গায়েবের খবর রাখের অন্য কোন সত্তা, তুমি নও।

"আমি তোমাকে জ্বলন্ত আগুনের মধ্যে ফেলে দেব।"

" আমি যদি একথা বিশ্বাস করতাম, তাহলে তোমাকে আল্লাহ্ বলে মেনে নিতাম।"

"মুহাম্মদ (সাঃ) সম্পর্কে কি বল?"

"নবী রাসূল (সাঃ) সম্পর্কে?"

"হ্যাঁ।"

"তিনি ছিলেন আদমের সন্তানদের নেতা। মুস্তফা, নির্বাচিত মনোনীত নবী। মানব জাতির সবাসিত পুষ্প।"

"আবু বকর সম্পর্কে কি বল।"

"তিনি সিদ্দীক ছিলেন। তিনি সততার মধ্যে জীবন-যাপন করেন এবং যখন মারা যান নিজের পিছেনে রেখে যান সুনাম ও সুখ্যতি। জীবনভর চলতে থাকেন তাঁর রাসূলের পথে এবং তাঁর পথ থেকে এক চুলও সরে আসেননি।"

"উমরের ব্যাপারে কি চিন্তা কর?"

"উমর ছিলেন ফারুক। হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টিকারী। আল্লাহ্‌র মকবুল বান্দা এবং তাঁর রাসূলের প্রিয় সাথী। নিজের দু'জন বন্ধুর পথেই তিনি চলেছেন এবং তা থেকে একটু বিচ্যুত হওয়া পছন্দ করেননি।"

"উসমান সম্পর্কে কি বল?"

"মজলূম ও শাহাদতপ্রাপ্ত। প্রাচুর্যের মধ্যেও কৃচ্ছ্র সাধনকারী। রুমার কুয়া মুসলমানদের জন্য ওয়াফ করেছিলেন, জান্নাতে নিজের গৃহ ক্রয়কারী আল্লাহ্‌ রাসূলের জামাতা ও বন্ধু।"

"আলীকে কেমন মনে কর?"

"আল্লাহ্‌র ও রাসূলের চাচাত ভাই। কিশোরদের মধ্যে প্রথম মুসলিম। ফাতেমাতুয যোহরার স্বামী এবং হাসান ও হোসাইনের সম্মানিত পিতা।"

"আবদুল মালেকের ব্যাপারে তোমার বক্তব্য কি?"

"এমন ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছ যার বহু গুনাহের মধ্যে একটি গুনাহ হচ্ছে তোমার অস্তিত্ব?"

"আমার ব্যাপারে তুমি নিজেই ভাল জান।"

"তবুও আমি তোমরা মুখ থেকে জানতে চাই?"

"তুমি অসন্তুষ্ট হবে এবং রেগে যাবে।"

"তবুও বল।"

"এ ব্যাপারে আমাকে মাফ কর।"

"যদি আমি তোমাকে মাফ করি, তাহলেও আল্লাহ্‌ আমাকে মাফ করবেন না।"

"আমি তো এতটুকু জানি যে, আল্লাহ্‌র কিতাবের নাফরমানী করা তোমার জীবনের মূলনীতিতে পরিণত হয়েছে। নিজের প্রবৃত্তির ইংগিতে তুমি এমন সব কাজ কর যার মাধ্যমে তোমার ভীতি মানুষের মনে জগদ্দল পাথরের মত বসে যায়। কিন্তু এ বিষয়টি তোমাকে ধ্বংস করে দেবে।"

"হে সাঈদ! তোমার জন্য আফ্‌সোস।"

"আফ্‌সোস তার জন্য যাকে জান্নাত থেকে বাঞ্চিত করে জাহান্নামে ঠেলে দেয়া হয়েছে।'

হাজ্জাজ হুকুম দিলেন, সাঈদের সামনে মণি-মুক্তা-ইয়াকুতের স্তূপ সাজাও।"

"যদি তুমি এ উদ্দেশ্যে মণি-মুক্তার স্তূপ করে থাক যে,এর বিনিময়ে তুমি কিয়ামতের দিনের ভীতি থেকে নিজেকে মুক্ত করবে তাহলে সন্তানের কথা ভুলে যাবে। দুনিয়ার স্বার্থ কামাবার উদ্দেশ্যে যাকে জমা করা হয়েছে তার মধ্যে নেকী নেই, তবে যদি তা হালাল ও পবিত্র হয়।"

"তুমি হাসনা কেন?'

"সে ব্যক্তি কেমন করে হাসতে পারে যাকে সৃষ্টি করা হয়েছে মাটি থেকে এবং মাটিকে আগুন পোড়ায়?"

এরপর হাজ্জাজ বলতে শুরু করেন ঃ

"আমি তোমাকে এমনভাবে হত্যা করব যেভাবে আজ পর্যন্ত কাউকে হত্যা করিনি এবং আগামীতেও করব না।"

"তুমি আমার দুনিয়া বরবাদ করবে, আমি তোমার আখিরাত বরবাদ করে দেব।"

"হে সাঈদ! নিজের জন্য যে ধরনের মৃত্যু পছন্দ করতে চাও কর।"

হাজ্জাজ! আখিরাতে নিজের জন্য যে ধরনের হত্যা পছন্দ হয় তাই এখানে অবলম্বন কর।"

"তমি কি চাও আমি তোমাকে মাফ করে দেই?"

"যদি মাফ করে দাও তাহলে মাফ হবে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে, এতে

তোমার কোন অবদান থাকবে না। তুমি এ থেকে দায়িত্ব মুক্ত হবে না। এবং তোমার কোন ওজর কবুলও করা হবে না।"

হাজ্জাজ হুকুম দিলেন, নিয়ে যাও এবং হত্যা কর।"

সাঈদ দরজা দিয়ে বের হতে গিয়ে হেসে ফেললেন। হাজ্জাজের কাছে খবর পৌঁছে গেল। তাঁকে ফিরিয়ে আনলেন। জিজ্ঞেস করলেন, হাসলে কেন?

"আল্লাহ্‌র মোকাবিলায় তোমার দুঃসাহজ এবং তোমার মোকবিলায় আল্লাহ্‌র হুকুম দেখে আমি অবাক হয়েছি।"

হাজ্জাজ হুকুম দিলেন, "যে চামড়ার পর হত্যা করা হবে সেটি বিছিয়ে দাও।" চামড়া বিছান হল। হুকুম হল, এবার হত্যা কর।"

সাঈদ কিবলার দিকে মুখ করে পড়লেনঃ ইন্নী ওয়াজ্জাহতু ওয়াজহিয়া লিল্লাযী ফাতারাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদা হানীফাঁউ ওয়ামা আনা মিনাল মুশরিকীন, "আমি একান্তভাবে নিজের মুখ সে সত্ত্বার দিকে ফিরালাম যিনি পৃথিবী ও আকাশ সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মুশরিকদের দলভূক্ত নই।"

হাজ্জাজ চিৎকার করে ওঠলেন, "ওর মুখ কিব্‌লার দিক থেকে ফিরিয়ে দাও।"

"সাঈদ বললেন, আইনামা তুওয়াল্লু ফাছাম্মা ওয়াজহুল্লাহ্‌" যে দিকে মুখ ফেরাও সেদিকেই আছেন আল্লাহ্‌র সত্ত্বা।"

হাজ্জাজ ক্রোধে চিৎকার দলিলেন, "তাকে জমিনের ওপর উপুড় করে দাও।"

সাঈদ বললেন, "মিনহা খালাকনাকুম ওয়া ফীহা নূয়ীদুকুম ওয়া মিনহা নুখরিজুকুম তারাতান উখরা।" এ জমিন থেকে তোমাদের সৃষ্টি করেছিলাম, এর মধ্যেই তোমাদের ফিরিয়ে নেব, সকলকে এর ভিতর থেকে তোমাদর পুনরায় বের করে আনব।

হাজ্জাজ হুংকার দিলেনঃ ওকে শিগগির জবাই কর।

সাঈদ কালেমা শাহাদত পড়ে বললেন, "হাজ্জাজ এবার বলল রোজ কিয়ামতে তোমর সাথে দেখা হবে। 'হে আল্লাহ্‌ আমার পরে আর কোন ব্যক্তিকে হত্যা করার ক্ষমতা যেন তার না থাকে।" এরপর জল্লাদের তরবারী তাঁকে দ্বি-খন্ডিত করল।

নবম অধ্যায়

সাহাবায়ে কিরামের যুগে জ্ঞানচর্চা

কুরআনের খিদমত

মুরতাদদের শায়েস্তা করা, বিদ্রোহীদের দমন করা এবং মিথ্যা নবীদের চিরতরে নিচিহ্ন করে দেয়া যেমন ফরয ছিল, ঠিক তেমনই কুরআন পাকের খিদমত করা এবং চিরকালের জন্য সুশৃঙ্খলভাবে লিখিত আকারে নকল করে রাখাও ফরয ছিল। অন্যথায় পরবর্তীকালে মতানৈক্য সৃষ্টি হওয়ার সমূহ আশঙ্কা ছিল। অপরাপর কাজের ন্যায় এটাও কোন রকমে কম গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিলনা। কারণ বহু হাফেয রাসূল (সাঃ)-এর যুগেই ইন্তিকাল করেন। তারপর বার শত হাফেয শুধু ইয়ামামার যুদ্ধেই শাহাদতবরণ করেন। তখন পর্যন্ত অনেকের কাছে আংশিকভাবে কুরআন লিখিত ছিল। আবার কেহ কেহ পূর্ণ হাফেয ছিলেন। রাসূল (সাঃ) এ প্রয়োজনের দিকে কোন সময় ইঙ্গিত করেননি। কিন্তু সিদ্দিকে আকবর (রাঃ)-এর খিলাফতের যুগে বিশেষত ইয়ামামার যুদ্ধের পর সর্বপ্রথম হযরত উমর (রাঃ) হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ)-এর খিদমতে অনুরোধ জ্ঞাপন করেন যে কুরআন পাকের হিফাযত করা হোক।

কুরআনের হিফাযত স্বয়ং আল্লাহ্‌ নিজ দায়িত্বে নিয়াছেন বলে ওয়াদা করেছেন। তাই প্রথমে হযরত সিদ্দিকে আকবর (রাঃ)-বলেছেন–"যে কাজ স্বয়ং রাসূল (সাঃ) করেননি, এটা আমি কিভাবে করতে পারি।" কিন্তু পরিস্থিতি গুরুতর দেখে তিনিও এ কাজের গুরুত্ব অনুধাবন করেন। আল্লাহ্‌ পাক তাঁর সীনা খুলে দিলেন এবং তিনি পূর্ণ প্রেরণা নিয়ে এ কাজে মনোযোগী হন।

অতঃপর তিনি কাতিবে ওহী হযরত যায়েদ ইব্‌নে সাবিত আনসারী (রাঃ)-কে এ গুরু দায়িত্বে নিযুক্ত করেন। প্রথমে হযরত যায়েদ (রাঃ)-ওযর পেশ করেন, "যে কাজ স্বয়ং রাসূল (সাঃ) করেননি, আমি কিভাবে এটা পারব।" কিন্তু হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) কাজের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করার পর তিনিও এতে সম্মত হন এবং পূর্ণ উদ্যম নিয়ে এ কাজে মনোযোগী হন। অতঃপর বিভিন্ন স্থান হতে লিখিত অংশসমূহ সংগ্রহ করে কিতাবের আকার দান করতে আরম্ভ করেন। আল্লামা ইবনে হাজার আস্‌কালানী (রাঃ) ফতহুল বারী গ্রন্থে লিখেছেন–"হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ)-এর আদেশে হযরত যায়েদ ইব্‌নে

সাবিত (রাঃ) বিভিন্ন স্থানে এবং বিভিন্ন ব্যক্তির সাহায্যে কুরআনের বিভিন্ন অংশ একত্রিত করে কিতাবের রূপ দান করেন। হযরত উসমান (রাঃ) স্বীয় খিলাফাতের কালে এর বহু কপি নকল করে বিভিন্ন দেশে প্রেরণ করেন।"

বর্তমানে আমাদের কাছে কুরআন মজীদের যে সমস্ত কপি আছে, এটা হযরত উমর (রাঃ)-এর পরামর্শ, হযরত সিদ্দিকে আকবর (রাঃ)-এর আদেশ এবং হযরত যায়েদ ইব্‌নে সাবিত (রাঃ)-এর নিঃস্বার্থ প্রচেষ্টারই সুফল। এর তরতীব, সূরাসমূহের নাম ইত্যাদি ওহী যোগে আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে রাসূল (সাঃ)-কে অবগত করান হয়েছিল।

অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করে এ কিতাব নকল করা হয়। মসজিদে নববীতে হাফেযগণের সাহায্য নিয়ে প্রত্যেক নামাযের পর কুরআন নকল করার কাজ সম্পন্ন করা হত। কিতাব পূর্ণ হওয়ার পর হযরত সিদ্দিকে আকবর (রাঃ) এটা রাষ্ট্রীয় ট্রেজারীতে সংরক্ষণ করেন। তাঁর পর এটা হযরত উমর (রাঃ)-এর হিফাযতে আসে। এর পর হযরত উসমান (রাঃ) এর বহু কপি নকল করে বিভিন্ন দেশে প্রেরণ করেন।

ওহী লিখার কাজে সাহাবায়ে কিরামের অবদান

ইসলাম আল্লাহ্‌র মনোনীত একমাত্র দ্বীন। অন্যান্য ধর্মের মত ইসলাম শুধু অনুষ্ঠান সর্বস্ব ধর্ম নয়। এর যাবতীয় কিছু সত্য ও ইতিহাস নির্ভর। বনোয়াট বা কল্পনা প্রসূত কোন কিছু সৃষ্ট বা তাঁর কথিত বাণী নয় তার সত্যতা ও বাস্তবতা নিখুঁতভাবে রক্ষিত হয়েছে। এ বাণী সংরক্ষনের জন্যে রাসূল (সাঃ) বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করেন। ওহী নাযিল হলে তিনি সেটাকে নিজে কেবল মুখস্ত রাখতেন না বা অন্যকেও মুখস্ত করাতেন না, কাতিব বা লেখকদের দ্বারা সেটা লিখিয়ে রাখতেন, যাতে সেটার সামান্যতম ভুল বা বিকৃতি না ঘটে। রাসূল (সাঃ) তাঁর সুযোগ্যতম সাহাবীদের দিতে এ গুরুত্বপূর্ণ কাজটি সমাধা করতেন। একথা সর্বজন বিদিত যে রাসূল (সাঃ) নিজে লিখা-পড়া জানতেন না। যাঁরা এ মহান কাজটি লিখার কাজে নিয়োজিত থাকতেন তাঁদের বলা হয় কাতিব। কাতিব শব্দের অর্থ লেখক বহু বচন কাতিবীন অর্থাৎ লেখকবৃন্দ। ওহী এককভাবে কারো দ্বারা লিখিত হয়নি। এ মহতী কাজটিতে অনেকেই অংশগ্রহণ করেছেন। তাই ওহী লিখার কাজে নিয়োজিত পূণ্যাত্ম্যাগণকে কাতিবীনে ওহী বলা হয়। আর ওহী শব্দের আভিধানিক অর্থ হলঃ আল্লাহ্‌র ঐ কালামকে যা অবতীর্ণ করা হয়েছে কোন নবীর উপর। বিভিন্ন সূত্রে অনেক গবেষণার পর ওহী লিখকদের সংখ্যায় ৪০

জনের নাম পাওয়া যায়। এঁদের মধ্যে এমন অনেকেই রয়েছেন যাঁরা তেমন প্রসিদ্ধ নয়। সর্বশেষ গবেষণায় ওহী লিখকদের মধ্যে ২১ জনের নাম পাওয়া যায়। কোন সনে কোন তারিখে ওহী লিখার কাজ শুরু হয়েছিল তা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না বা ইতিহাসে তেমন কোন বিবরণ উল্লেখ নাই। সর্বপ্রথম এবং সর্বশেষ কে লিখেন তা অবগত হওয়া যায়। হযরত খালিদ ইব্‌নে সাঈদ (রাঃ) যিনি ইসলাম গ্রহণের দিকে পঞ্চম তাঁর কণ্যা বলেন, আমার পিতাই সর্বপ্রথম বিস্‌মিল্লাহ হির রাহমানির রাহীম লিখেন। এটা হিজরী চতুর্থ সনের রবীউল আউয়াল মাসের কথা। এ হিসাবে দেখা যায় হযরত খালিদ ইব্‌নে সাঈদ (রাঃ) সে পুন্যাত্মা যিনি সর্বপ্রথম ওহী লিখার সৌভাগ্য অর্জন করেন। সর্বশেষ ওহী যা রাসূল (সাঃ)- এর ওফাতের আট কিংবা নয় দিন পূর্বে নাযিল হয়েছিল তার লিখক ছিলেন হযরত উবাই ইব্‌নে ক্বাব (রাঃ)। তিনি সর্বাধিক ওহী লেখকদের তালিকার শীর্ষে রয়েছেন। হযরত যায়েদ ইব্‌নে সাবিত (রাঃ) এবং পরবর্তীতে হযরত আমীর মু'য়াবিয়া (রাঃ)- এর পরবর্তীতে হযরত উসমান (রাঃ)। কাতিব চার প্রকার যথাঃ কাতিবে তকদীর, কাতিবে নেক ও বদ; কাতিবে ওহী এবং কতিবে কোরআন ও হাদীস। প্রথমোক্ত তিন প্রকারের কাতিব সম্পর্কে আশা করি বেশী কিছু বলার প্রয়োজন নাই। কারণ কাতিবে তাকদীর হলেন স্বয়ং আল্লাহ্‌ পাক, কাতিবে নেক ও বদ তথা আমল নামার লেখক হলেন আল্লাহ্‌র নিযুক্ত ফেরেশতা এবং কাতিবে ওহী হলেন সে সমস্ত নিষ্পাপ সাহাবা যাঁদের কে স্বয়ং রাসূল (সাঃ) আসমানী বাণী লেখার অনুমতি দান করেছেন কিংবা নিযুক্ত করেছেন।

সুতরাং এ তিন প্রকারের কতিবের মর্যাদা আল্লাহ্‌র কাছে যে কতটুকু তা বলে শেষ করা যায় না। অবশ্য শেষাক্তে কাতিবে কোরআন ও হাদীসের সর্বদা সম্বন্ধে চিন্তা করুন। তাঁরা সুন্দর আরবী হস্তাক্ষরের মাধ্যমে কোরআন পাক নকল করেছেন।

ওহী লিখার কাজে যে সমস্ত পূন্যাত্মাগণ খিদমতে আনজাম দিয়েছেন তাঁরা হলেন- (১) হযরত খলিদ ইব্‌নে সাঈদ ইবনুল আস (রাঃ) (২) হযরত যায়েদ ইব্‌নে সাবিত (রাঃ) (৩) হযরত আমীর মু'আবিয়া (রাঃ) (৪) হযরত উসমান ইব্‌নে আফফান (রাঃ) (৫) হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌নে রওয়াহা (রাঃ) (৬) হযরত সাবিত ইব্‌নে কাইস (রাঃ) (৭) হযরত আলী ইব্‌নে আবু তালিব (রাঃ) (৮) হযরত মোহাম্বিনে মুসলিমা (রাঃ) (৯) হযরত হোযায়ফা ইবনুল ইয়ামন (রাঃ) (১০)· হযরত মুগিরা ইব্‌নে ওরা (রাঃ), (১১) হযরত যুবায়ের ইবনুল আওয়াম

(রাঃ), (১২) হযরত শুরাহবীল ইব্‌নে হাসান (রাঃ), (১৩) হযরত আবান ইব্‌নে সাঈদ ইবনুল আস (রাঃ), (১৪) হযরত ওমর বিন খাত্তাব (রাঃ), (১৫) হযরত আমর ইবনুল আস (রাঃ), (১৬) আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ), (১৭) হযরত হানযালা ইব্‌নে রবীয়া (রাঃ), (১৮) হযরত আমের ইব্‌নে কুহাইরা (রাঃ), (১৯) হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে আকরাম (রাঃ), (২০) হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে উবাই (রাঃ), (২১) হযরত উবাই ইব্‌নে কাব (রাঃ)।

ভন্ডনবী মুসালামা হত্যা এবং কোরআন সংকলন

রাসূল (সাঃ)-এর ইন্তেকালের পর সুযোগ সন্ধানী ইসলামের শত্রুদল মাথাচড়া দেয়ার সুযোগ পেল। যারা স্বয়ং রাসূল (সাঃ)-এর জীবনে বিবিধ উপায়ে ইসলামের বিরোধিতা করত তাদের ধারনা ছিল যে, ইসলামের এ শৃঙ্খলা রাসূল (সাঃ)-এর জীবদ্দশা পর্যন্ত সীমিত। তাঁর অবর্তমানে মুসলমানদের এ ঐক্য বিনষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু তারা অল্প দিনের মধ্যে অবগত হল যে রাসূল (সাঃ) যে মাযহাবের ভিত্তি স্থাপন করেছেন, প্রকৃতপক্ষে তা তাঁর ব্যক্তিগত ধর্ম নয়, বরং তা আল্লাহ প্রদত্ত সত্য ধর্ম। এর ভিত্তি স্থাপনে রাসূল (সাঃ) স্বীয় সাহাবীদের মধ্যে যে প্রেরণা দান করেছেন, তা ধ্বংস করার মত নয়। সুতরাং রাসূল (সাঃ)-এর পরও তাঁর প্রতিষ্ঠিত ভিত্তি ঠিক সে রকমই সু-দৃঢ় থাকবে। ইতিহাস সাক্ষী দেয় যে রাসূল (সাঃ)-এর পর সুযোগ সন্ধানী ইসলামের শত্রুরা চারদিক থেকে মাথাচড়া দিয়ে উঠেছিল, কিন্তু প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) -এদের অস্তিত্ব নির্মূল করে চিরতরে তাদের ধ্বংস করেন। মুসায়লামা কায্‌যাবই প্রথম মিথ্যা নবুয়তের দাবীদার, যে রাসূল (সাঃ)-এর জীবিতকালেই হিজরী দশম সনে নবুয়তের দাবী জানায়। একবার বনু হানিফার এক প্রতিনিধি দল ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে রাসূল (সাঃ)-এর খিদমতে উপস্থিত হলে এ দলে মুসাইলামা বিন তামামাও ছিল। সে ইসলাম গ্রহণের কথা উল্লেখ করে বলে-আমি এ শর্তে মুসলমান হতে পারি মুহাম্মদ নিজের পরে আমাকে খলিফা নিযুক্ত করবেন। এ সময় রাসূল (সাঃ)-এর হাতে খেজুরের একটি ডাল দেখিয়ে তাকে বলেন, তুমি যদি ইসলাম গ্রহণের বিনিময়ে এ ডালটিও চাও, আমি তাও তোমাকে দেবনা। এর পর রাসূল (সাঃ) বললেন, আমি দেখতে পাচ্ছি যে, তুমি সে মিথ্যাবাদী, যার সম্পর্কে ইতিমধ্যে আমাকে স্বপ্নে দেখান হয়েছে। একবার রাসূল (সাঃ) স্বপ্নে হাতে দু'টি কংকন দেখে ভীষণ চিন্তিত হলেন। তাঁকে ফুঁক দিতে বলা হলে তিনি তাই করলেন, সাথে সাথে কংকন

দু'টি উঠে যায়। পরে তিনি এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা এভাবে ব্যক্ত করলেন যে, আরবে দু'জন মিথ্যাবাদী নবীর আবির্ভাব হবে। তাদের একজন আসওয়াদ আনাসী এবং মুসাইলামা কায্‌যাব। (মুসলিম)

এর পর মুসাইলামা কায্‌যাব নিরাশ হয়ে দেশে ফিরে যায় এবং পরবর্তীতে রাসূল (সাঃ)-এর অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে নবুয়তের দাবী করে সে বলে নবুয়তীতে আমাকে মোহাম্মদের অংশীদার করে দেয়া হয়েছে। এ মর্মে রাসূল (সাঃ)-এর কাছে একটি চিঠি লেখে-আল্লাহ্‌র রাসূল মুসাইলামার পক্ষ হতে আল্লাহ্‌র রাসূল মোহাম্মদ (সাঃ)-এর নামে। আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। নবুয়তী আমাকে আপনার শরীক করা হয়েছে। সুতরাং পৃথিবীর অর্ধেক আপনার এবং অর্ধেক আমার। কিন্তু এ বিষয়ে আপনি ইনসাফ করবেন বলে আমি আশাবাদী না। রাসূল (সাঃ) তার পত্রের জবাবে রাসূল (সাঃ) লিখেন-'যে হিদায়েত অনুসরণ করে, তাকে সালাম। এ পৃথিবী মূলতঃ আল্লাহ্‌র। তিনি যাকে ইচ্ছা তাকেই নিজের উত্তরাধিকারী মনোনয়ন করেন। আর মুত্তাক্বীদের পরিণাম অত্যন্ত সাফল্যজনক হয়ে থাকে।'

মুসায়লামা ব্যতিত তালিহা ইব্‌নে খুয়ায্‌লদও নবুয়তের দাবী করেছিল। গিফতার গোত্রের লোক তার অনুসারী ছিল এবং ওয়াইনা ইব্‌নে হাসান ফেরারী ছিল তার মন্ত্রণাদাতা। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে আসওয়াদ আনাসী ইয়ামানীও নবুয়তের দাবী করেছিল। সাজ্জাহ বিনতে হারিসা নামে জনৈক মহিলাও নবুয়তের দাবী করে এবং আশআস ইব্‌নে কাইসকে তার মুখপাত্র নিযুক্ত করে। তারপর সে ইসলামের বিরুদ্ধে শক্তি অর্জনের উদ্দেশ্যে মুসায়লামাকে স্বামীরূপে বরণ করে। অথচ আশআদও সাজ্জাহকে বিবাহ করার ইচ্ছা পোষণ করত। মুসালামার সাথে বিবাহ হলে সে হতভম্ভ হয়ে পড়ে। এভাবে নারী-পুরুষের মধ্যে এ রোগ বিস্তার লাভ করে বহুলোককে পথভ্রষ্ট করে।

রাসূল (সাঃ)-এর ওফাতের পর হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) ইকরিমা ইব্‌নে আবী জাহেলকে মুসালামার বিরুদ্ধে পাঠিয়ে তাঁর পিছনে শুরাহবিল ইব্‌নে হাসানাকে সাহায্যের জন্য প্রেরণ করেন আর ইকরিমাকে বলেন যেন শুরাহবিলের জন্য যেন অপেক্ষা করা হয়। কিন্তু ইকরিমা বিজয়ের মুকুট এককভাবে গ্রহণের জন্য শুরাহবিলের জন্য অপেক্ষা না করেই মুসাইলামাকে আক্রমণ করলে পরাজয় বরণ করে। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) এ সংবাদে খুবই মর্মাহত এবং অসন্তুষ্ট হন। পরবর্তীতে তিনি মুসাইলামার বিরুদ্ধে হযরত

খালেদ বিন ওয়ালীদ (রাঃ)-কে প্রেরণ করেন এবং শুরাহবিলকে তাঁর জন্য অপেক্ষা করতে বলেন। হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রাঃ)-এর আগমণ সংবাদ অবগত হয়ে মুসাইলামা চল্লিশ হাজার সু-বিশাল বাহিনীসহ অগ্রসর হয়। খালিদ (রাঃ) এদের অগ্রযাত্রা প্রতিহত করে বহু দূর পর্যন্ত ধাওয়া করে মুসাইলামাকে মোকাবেলার জন্য আহ্বান করলে তার পক্ষে টিকে থাকা অসম্ভব হলে সে পলায়ন করে একটি বাগানে আশ্রয় গ্রহণ করে। ইতিমধ্যে“ তার বাহিনীও পালাতে থাকে। মুসাইলামা বাগানে আশ্রয় নেয়ার পর বাগানের ফটক বন্ধ করে দেয়া হয়। মুসাইলামা এ বাগানটির নাম রেখেছিল হাদীকাতুর রহমান। এখানে সে আশ্রয় গ্রহণ করে নিজকে একটু নিরাপদ মনে করেছিল। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই মুসলিম সৈন্যদের রণকৌশল দেখে সে ভরসাও তার শেষ হল। দুধর্ষ মুসলিম যোদ্ধা হযরত রাবা ইব্‌নে মালিক আনসারী (রাঃ) বললেন আমাকে তোমরা বাগানে নিক্ষেপ করে দাও, তাঁরা তাঁকে বাগানে নিক্ষেপ করলে তিনি একাই বাগানে প্রবেশ করে প্রহরীদের হত্যা করে বাগানের প্রবেশদার খুলে দিলে দলে দলে মুসলিম সৈন্যদল বাগানে প্রবেশ করে মুসাইলামার সহচরদের হত্যা করতে লাগলেন। অবশেষে মুসাইলামাও আল্লাহ্‌র তরবারী হতে রক্ষা পেলনা। মুসালামাকে যাঁরা হত্যা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে হযরত হামযা (রাঃ)-এর হত্যাকারী ওয়াহ্‌শীও ছিলেন। এ ওয়াশী মক্কা বিজয়ের পর তিনি মুসলমান হন। তিনি যে বল্লম দ্বারা হযরত হামযা (রাঃ)-কে হত্যা করেছিলেন ঐ বল্লম দ্বারাই একই পদ্ধতিতে নাভীমূলে আঘাত করে মুসাইলামাকে হত্যা করেন। মুসায়লামার সাথে রণক্ষেত্রে তার স্ত্রী সাজ্জাও উপস্থিত ছিল। স্বামী নিহত হবার সংবাদ পেয়ে বসরার দিকে সে পলায়ন করে এবং কিছু দিন পর সে মারা যায়। এ যুদ্ধে মুসায়লামার সতের হাজার সৈন্য নিহত হয় এবং মুসলমানদের নিহত হন এক হাজার দুই শত সৈন্য। এদের সকলেই প্রায় কুরআনে হাফেয ছিলেন।

দ্বিতীয় মিথ্যা নবুয়তের দাবীদার ছিল তালীহা ইব্‌নে খুয়ায়লদ আ'সাদী। সে ছিল অত্যন্ত সুযোগ সন্ধানী। হযরত খালিদ ইব্‌নে ওয়ালীদ তার মোকাবেলা করেন সু-দীর্ঘ সময়। শেষ পর্যন্ত টিকতে না পেরে সে শাম দেশের দিকে পলায়ন করে। তার বহু সৈন্য নিহত হল এবং পলায়ন করলে নিরুপায় দেখে শেষে হযরত ওমর (রাঃ)-এর আমলে ইসলাম গ্রহণ করেন।

তৃতীয় মিথ্যা নবুয়তের দাবীদার লকীত ইব্‌নে মালিক। আম্মান এলাকায় সে এ বলে জনগণকে ধোঁকা দিয়ে প্রচার করেছিল যে, মুহাম্মদ (সাঃ)-এর নবুয়ত আল্লাহ্ তাকে দান করেছেন। তার আহ্বানে বহু মুরতাদ এবং ইসলামের

শত্রতার অনুসারী হয়। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) তাকে সমোচিত শিক্ষা দেয়ার জন্য সেনাবাহিনী তার বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। লকীতের সৈন্যবাহিনী যেমন ছিল শক্তিশালী তেমনি ছিল অভিজ্ঞ সু-নিপুণ যোদ্ধা। ফলে উভয়পক্ষের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ইসলামের জন্য প্রাণ উৎসর্গকারী মুসলিম সৈন্যদের মোকাবেলায় শত্রুপক্ষ পরাজয় বরণ করে পালাতে শুরু করে। মুসলিম সৈন্যরা শত্রু এলাকায় ভিতরে প্রবেশ করে লকীতের অনুসারীদের চিরতরে শেষ করেন। আসওয়াদ আনসারীও ছিল নবুয়তের আরেক দাবীদার। রাসূল (সাঃ)-এর জীবনে সেও মুসায়লামার ন্যায় দাবী জানিয়েছিল। রাসূল (সাঃ)-এর ওফাতের পর সে বিশেষভাবে তার নবুয়তের প্রচার আরম্ভ করে। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) তার বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করেন কিন্তু সেনাবাহিনী তার মোকাবেলা করার পূর্বেই কাইস এবং ফিরোযা নামক দু'ব্যক্তি তাকে হত্যা করে। তার অনুসারীরা তার লাশ কাঁধে তুলে তাকে 'শহীদে মাযহাব' উপাধীতে ভূষিত করে তার মাযহাবের প্রচারনা চালাতে থাকে। ইতিমধ্যে মুসলিম সৈন্যদল বীরত্বের সাথে এদের প্রতিহত করে নিচিহ্ন করেন।

হাদীসের খিদমত

আরবদের স্মরনশক্তি ঃ হাদীসের হিফাজতের ক্ষেত্রে মুখস্তকরনটা ছিল সে যুগের এক নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা, কারণ আরবীয় লোকদের স্মরনশক্তি ছিল অস্বাভাবিকভাবে প্রখর। তাঁরা শত শত কবিতা মুখস্ত রাখতেন কেবল নিজেদের বংশ তালিকা নয়, পালিত গোড়ায় বংশ ধারাও তাদের মুখে মুখে থাকত। এটা জাগতিক নিয়ম যে, যে শক্তির যত বেশী ব্যবহার চলে, তত বেশী তার উন্নতি সাধিত হয়। সাহাবীও তাবেয়ীগণের জমাত তাঁদের মেধা স্মরণশক্তিকে নানান উপায়ে সতেজ ও শানিত করেছিলেন এবং এ ক্ষেত্রে অভাবনীয় উন্নতি লাভ করেছেন। সে যুগের হাফিযে কোরআন হাদীস হিফয করে একেকজন মুহাদ্দিস হাজার হাজার এমনকি কয়েক লক্ষ হাদীস মুখস্ত রাখতেন। তাই সে যুগে হাদীসের হাফিয হওয়া ছিল অনেকটা সাধারণ ব্যাপার। উম্মতে মোহাম্মদদীর মধ্যে পূর্ব যুগে শতাধিক হাফিজুল হাদীস ছিলেন বলে বর্ণিত আছে।

হযরত ওয়াহশী (রা:)-এর স্মরনশক্তি ঃ ইমাম বুখারী (রা:) বর্নণা করেন যে হযরত যাফর আমর জামরী বলেছেনঃ আমি উবাইদুল্লাহ ইব্‌নে সাদী ইবনুল খিয়ার (রা:)-এর সাথে সাক্ষাত করতে গিয়েছিলাম। হযরত উবাইদুল্লাহ্ ও খাহশী (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন আপনি কি আমাকে চিনেনঃ তিনি বললেন আমি

আপনাকে তো চিনি না, তবে স্মরণ পড়েছে। প্রায় বছর খানেক পূর্বে আমি একদিন আদী ইবনুল খিয়াস নামক জনৈকের কাছে যাই। সে দিন আদীর ঘরে একটি ছেলে ভূমিষ্ট হয়। ছেলেটাকে চাঁদের দ্বারা আবৃত করে ধাত্রীর কাছে নিয়ে গেল। বাচ্ছাটির সমস্ত শরীর ঢাঁকা ছিল। আমি শুধু তার পা দুটি দেখেছিলাম সেই বাচ্চার পায়ের সাথে তোমার পায়ের বেশ মিল রয়েছে। (বস্তুতঃ হযরত উবাইদুল্লাহ্ই সেই বাচ্চা) বুখারী ঃ (২/৫/৮৩)

ইতিপূর্বে বর্ণিত হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর স্মরণ শক্তির ঘটনা ও আলোচ্য ঘটনা দুটিকে গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যায় সাহাবায়ে কিরামের স্মরণশক্তির প্রখরতা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট হয়ে যায়। নির্ভরযোগ্য ইতিহাসের পাতায় এরূপ অজস্র ঘটনা লিপিবদ্ধ রয়েছে।

রাসূল (সাঃ)-এর যুগে হাদীস লিখা

রাসূল (সাঃ)-এর যুগে যদিও নিয়মিতভাবে লেখা-পড়ার ব্যবস্থা ছিলনা, তার পরেও সবকিছু লিপিবদ্ধাকারে সম্পন্ন হত। আবার এসব লিখাকে সংরক্ষণ করা হত। এ কাজের জন্যে সাধারণ 'কাতিব' ছাড়াও কতিপয় বিশিষ্ট লিখক নির্দিষ্ট ছিলেন। তাঁদের উপর অর্পিত খিদমত যথাসাধ্য অতি সুন্দরভাবে দায়িত্ববোধের সাথে আদায় করে যেতেন। ঐতিহাসিক 'জাহশিয়ারী' তাঁর 'কিতাবুল ওয়াজারাই ওয়াল-কুত্তাব' গ্রন্থে (আসমাউ মান সাবাতা আলা কিতাবাতি রসূলিল্লাহি (সাঃ)) শিরোনামে এ সকল সাহাবীদের নাম উল্লেখ করে বলেছেন–"হযরত আলী ও হযরত উসমান (রাঃ) এরা দু'জনই ওহী লিখতেন। কোন সময় তাঁরা অনুপস্থিত থাকলে হযরত উবাই ইবনে কা'আব ও হযরত যায়েদ ইব্‌নে সাবিত (রাঃ) এ কাজটি আঞ্জাম দিতেন। খালিদ ইব্‌নে সাঈদ ইবনে আ'স ও মুয়াবিয়া ইব্‌নে আবি সুফিয়ান (রাঃ) এরা দু'জন রাসূল (সাঃ)-এর ব্যক্তিগত প্রয়োজনাদি লিখে রাখতেন। হযরত মুগীরাহ ইব্‌নে শো'বা ও হোসাইন ইব্‌নে নুমাইর (রাঃ) এরা দু'জন জনসাধারণের কার্যাবলী ও পারস্পরিক লেন-দেনের ব্যাপারাদি লিখতেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌নে আরকম ইব্‌নে আবদেয়াগূস ও আলী ইব্‌নে উকবা (রাঃ) আবর গোত্রগুলোর কূপসমূহ এবং আনসারীদের স্বামী-স্ত্রীর বিষয়াদি লিখতেন। হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রাঃ) যেমন ওহী লিখতেন তেমনি বিভিন্ন রাজা বাদশাহগণের প্রতি চিঠি পত্র এবং দাওয়াতনামা লিখার দায়িত্বও তাঁর উপর ছিল। হযরত মুয়াইকীব ইব্‌নে আবু ফাতিমা (রাঃ) মালে গণিমতের ব্যাপারসমূহ লিখে রাখতেন। হযরত

হান্‌জালা ইব্‌নে রবী (রাঃ) এ সকল কাতিবের অনুপস্থিতিতে তাঁদের ভারপ্রাপ্ত হিসাবে কাজ চালিয়ে যেতেন। তাই তাঁর উপাধি ছিল 'আল-কাতিব'।

উপরোক্ত বর্ণনা দ্বারা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, রাসূল (সাঃ)-এর যুগে প্রত্যেক বিভাগের জন্য দু'জন করে দায়িত্বশীল লিখক নিযুক্ত ছিলেন। তাঁদের অনুপস্থিতিতে অন্যান্য লিখকগণ দায়িত্ব পালন করে যেতেন। এমনিভাবে রাসূল (সাঃ)-এর যাবতীয় কার্যক্রম লিপিবদ্ধ হয়ে সংরক্ষিত হয়ে যায়। রাসূল (সাঃ)-এর সকল চুক্তিপত্র, সন্ধিপত্র, দাওয়াতনামা ও অন্যান্য চিঠিপত্র ও লিখাগুলো প্রথমে কাতিবের দ্বারা লিখাতেন। অতঃপর তা নিজে শুনে সত্যায়িত করতেন। সুতরাং ওহীর পর রাসূল (সাঃ)-এর এ সকল চিঠিপত্রের মর্যাদা সবার শীর্ষে। এগুলো গ্রহণযোগ্য ও প্রমাণসিদ্ধ হওয়াতে কোন রকমের শোবা-সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে না। রাসূল (সাঃ)-এর কোরআন তিলাওয়াত, কোরআনের মর্মবাণী শিক্ষাদান এবং অবিরাম মৌখিক উপদেশ দান ও সতর্কীকরণের পাশাপাশি আশ-পাশের রাজা-বাদশাহ, গোত্রপতি এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের বরাবরে পত্র প্রেরণ করে তাদেরকে দ্বীনের প্রতি দাওয়াত দিয়েছেন। এসব পত্র হাদীস, তফসীর, নির্ভরযোগ্য হাদীসগ্রন্থ, সীরাত ও ইতিহাস গ্রন্থাদিতে সযত্নে সংরক্ষিত হয়েছে। এসব পত্রের সংখ্যা শতাধিক।

হাদীস লিপিবদ্ধকরণ

হাদীস হিফাযতের ক্ষেত্রে সুদৃঢ় ও নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থার মাধ্যমে হাদীস সংরক্ষিত হয়েছে। আর তা হচ্ছে হাদীস লিপিবদ্ধকরণ। বস্তুতঃ হাদীস সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় সকল সম্ভাব্য ব্যবস্থাই যথা সময় গ্রহণ করা হয়েছে। হাদীসকে যেমন মুখস্থ ও স্মরণ রাখা হয়েছে, নানাভাবে চর্চা করা হয়েছে, নানা তথ্য দ্বারা সর্বতোভাবে নিঃসন্দেহ করে তোলা হয়েছে, অনুরূপভাবে এর জন্য যথা সময় যথেষ্ট পরিমাণে লিখনীশক্তির ব্যবহার এবং প্রয়োগ করা হয়েছে। আবার প্রায় একই সময়ে একই সাথে এসব ব্যবস্থা নিয়মানুযায়ী কার্যকর করা হয়েছে। "আসলে মুসলমানদের মধ্যে রাসূল (সাঃ)-এর হাদীস সংকলন ও লিপিবদ্ধ করার কাজ তিন পর্যায়ে অগ্রসর হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে প্রত্যেক ব্যক্তি কেবল ব্যক্তিগতভাবে তথ্য সংগ্রহ করেছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রত্যেক শহরে সংগৃহীত তথ্যাবলী একত্রিত করা হয়েছে এবং সেগুলোই বর্তমানে পুস্তকাকারে আমাদের কাছে রয়েছে। প্রথম পর্যায় সম্ভবত ১০০ হিজরী পর্যন্ত, দ্বিতীয় পর্যায় ১৫০ হিজরী পর্যন্ত এবং তৃতীয় পর্যায় ১৫০ হিজরী থেকে তৃতীয় শতাব্দীর পরেও কিছুকাল বর্তমান ছিল।

হাদীস রাসূল (সাঃ)-এর লিখিত সম্পদ

রাসূল (সাঃ)-এর যুগে কোরআনের মত না হলেও রাসূল (সাঃ)-এর হাদীসগুলো অতি যত্নসহকারে লিখিতকারে সংরক্ষণ করা হত। এখানে তার কিছু বিবরণ দেয়া হল–রাসূল (সাঃ) মদীনায় হিযরত করে মদীনায় স্থায়ী বসবাস শুরু করার পর সর্বপ্রথম যে সব গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদন করেন, মদীনার ইয়াহুদী ও আশ-পাশের খৃষ্টান এবং মদীনার আনসার ও মুহাজির মুসলমানদের পারস্পরিক আক্রমণ ও অন্যান্য শর্ত সম্বলিত এক দীর্ঘ চুক্তিনামা রচনা করা তার অন্যতম।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, মক্কা বিজয়েরৎসর (৮ম হিজরী) 'খোজায়া' গোত্রের লোকেরা 'লাইছ' গোত্রের এক ব্যক্তিকে হত্যা করে। এ খবর রাসূল (সাঃ) পর্যন্ত পৌছলে তিনি সাওয়ার থাকাবস্থায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দান করেন। তাতে তিনি হেরম শরীফের মর্যাদা, শ্রেষ্ঠত্ব, মাহাত্ম এবং নরহত্যার দন্ড ও দিয়ত সংক্রান্ত যাবতীয় হুকুম আহকাম বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেন। ভাষণ শেষে আবুশাহ নামক জনৈক সাহাবী রাসূল (সাঃ)-কে বলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল! আমার জন্য ভাষণটি লিখে দেন"। তাঁর আবেদন মঞ্জুর করতঃ জনৈক সাহাবীকে বললেন, এ ভাষণটি আবুশাহকে লিখে দাও।

সাহাবীদের হাদীস মোতাবেক আমল

হাদীস হিফাযতের ক্ষেত্রে হাদীস অনুযায়ী আমল করা একটি অন্যতম উপায়। তাই উম্মতে মোহাম্মদীর সর্বপ্রথম দল অর্থাৎ সাহাবীদের কে আমরা এ ব্যাপারে অধিক যত্নবান দেখতে পাই। তাঁরা রাসূল (সাঃ) থেকে প্রাপ্ত হাদীসকে কেবল মুখস্ত রেখে ও বৈঠক সমূহে এর মৌখিক প্রচার ও পর্যালোচনা করে ক্ষান্ত হননি। বরং প্রতিটি হাদীসের বাস্তব অনুসরণ ও সে মতে আমল করে হাদীসে রাসূল (সাঃ)কে সাহাবায়ে কিরাম তা মুখস্ত করে মন মগজে দৃঢ়বদ্ধ করে নিয়ে সে মতে স্ব স্ব আক্বীদা বিশ্বাস গড়ে তুলতেন। আর যখন কোন আদেশ সূচক ও নিষেধ মূলক উক্তি করতেন, কোন শাসনতান্ত্রিক ফরমান জারী করতেন তখন সাহাবায়ে কিরাম সাথে সাথে তাকে বাস্তব রূপে দেখার চেষ্টা করতেন। অনেক সাহাবী বলতেনঃ রাসূল (সাঃ)-কে এরূপ করতে দেখেছি বা এরূপ বলতে শুনেছি। মূলত ঃ যে কাজের উপর আমল হয় তা মানসপটে খুদাই হয়ে যায়। সাহাবায়ে কিরামগণের জামাত ফরয, ওয়াযীব তো বটেই, প্রিয় রাসূল (সাঃ)-এর প্রত্যেক অঙ্গ ভঙ্গীকে পর্যন্ত নিজ নিজ আমলে রূপায়িত করেছিলেন। কারণ, তাঁরা ছিলেন প্রিয় রাসূল (সাঃ) এর জন্য জানমাল কোরবানকারী সাচ্চা আশেক এবং নিষ্ঠাবান প্রেমিক।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্নে মাসউদ (রাঃ) বলেছেনঃ আমাদের কেহ যখন ১০টি আয়াত শিক্ষালাভ করতেন তখন এর অর্থ ভালরূপে হৃদয়ঙ্গম ও তদানুযায়ী আমল করার পূর্বে তিনি অন্য কিছু শিখার জন্য অগ্রসর হতেন না। (জামিউ বায়ানিল ইলম) ইসলামের মৌলিক আইন কানুনকে সাহাবীদের জীবনে রূপায়িত করে তোলার দিকে রাসূল (সাঃ) নিজে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতেন। মুসলমান ব্যক্তিগত জীবনে রাসূল (সাঃ)-এর আদেশ মেনে চলে কিনা, সে দিকে তিনি কড়া নযর রাখতেন। অর্থাৎ ইসলামের ব্যবহারিক আচর আচরণ অনুসরণের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করা হত।

নামায সম্পর্কে রাসূল (সাঃ) বলেছেনঃ তোমরা আমাকে যেভাবে নামায পড়তে দেখ, ঠিক সেভাবেই নামায পড়। (বুখারী) হজ্বের ব্যাপারে তিনি বলেনঃ তোমরা আমার কাছ থেকে হজ্ব উদ্‌যাপনের নিয়ম কানুন গ্রহণ কর। উল্লেখিত উক্তি দ্বারা বুঝা যায় হযে, নামায, রোযা ইত্যাদি ইবাদত ও আন্যান্য কাজের বিস্তারিত নিয়ম পদ্ধতি শিক্ষা দানের জন্য রাসূল (সাঃ) নিজে প্রথম সে কাজ করে লোকদের সামনে বাস্তব দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। শুধু তাই নয়, কাজে তাঁদের কোন ভুল ক্রটি হলে তিনি সাথে সাথে তা সংশোধন করে দিতেন। একদিন তিনি মসজিদে নববীতে একজন সাহাবীর নামায পড়া লক্ষ্য করে করলেন। নামায শেষে সে সাহাবী তাঁর কাছে এলে তিনি বসলেনঃ তুমি ফিরে গিয়ে পুনরায় নামায পড়, কেননা তেমার নামায পড়া হয়নি অর্থাৎ নিয়ম, তোমাবেক আদায় হয়নি। এভাবেই সাহাবীগণ রাসূল (সাঃ) এর সামনে সংস্পর্শে থেকে ইসলামের আদর্শিক রীতি নীতির বাস্তব শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। মোট কথা রাসূল (সাঃ) এর যাবতীয় ইবাদত, মোয়ামালাত, কথাবার্তা, লিবাস-পোশাক, খাওয়া-পড়া চলা-ফিরা, উঠা-বসা, শয়ন-জাগরণ এমন কোন বিষয় নেই যে বিষয়ে সাহাবীগণ তাঁর অনুকরণ করার চেষ্টা করেননি। বস্তুতঃ সাহাবীদের এরূপ অনুসরণের মাধ্যমেই রাসূল (সাঃ)-এর প্রতিটি কথা ও কাজ এবং কাজের বিবরণ চিরদিনের জন্য সুরক্ষিত রয়েছে।

ফরায়েয শাস্ত্র. হল অত্যন্ত জটিল বিষয়। পবিত্র কোরআনে যদিও ফরায়েযের সমস্ত মাসআলা সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু রাসূল (সাঃ) এর ফায়সালা এবং নির্দেশাবলী ও সাহাবায়ে কিরামের ফতওয়া ইত্যাদি হচ্ছে

এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা। মীরাস সম্পর্কে কোরআনে যা কিছু উল্লেখ রয়েছে তা খুবই সংক্ষিপ্ত। যথা স্বামী-স্ত্রী, সন্তান-ছেলে, মেয়ের, মাতা-পিতা, ভাই-বোন ও কালালা ইত্যাদি কয়েক প্রকারের ওয়ারিসের কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং তাদের জন্য অংশ নির্ধারিত করে দেয়া হয়েছে। এরপরও বলা হয়েছে যে তা হল আল্লাহ্‌র দেয়া সীমা। অতএব যারা এ সীমা লংঘণ করবে, তারা নিজেদের উপরই জুলুম করবে। রাসূল (সঃ) স্বীয় রায় দান এবং আদেশ নির্দেশের মাধ্যমে এ সংক্ষিপ্তের ব্যাখ্যা করেছেন। তারপর হয়ত যয়েদ ইব্‌নে সাবিত (রাঃ) ফরায়েয বিদ্যাকে এমনি উন্নতি করেছেন যে, শেষ পর্যন্ত তা রীতিমত একটি শাস্ত্রে পরিণত হল।

অনেক বড় বড় সাহাবী হযরত যায়েদ বিন সাবিত (রাঃ) এর কাছে ফরায়েয সম্বন্ধীয় মাসয়ালা জিজ্ঞেস করতেন। হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌নে ওমর (রাঃ) এর ইলম ও ফযল সমস্ত সাহাবায়ে কিরাম স্বীকার করতেন তা সত্ত্বেও তিনি এর এক গোলাম মারা মাওয়ার পর হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌নে ওমর (রাঃ) হযরত যায়েদ (রাঃ)-এর কাছে জিজ্ঞেস করলেন যেঃ এ মৃত গোলামের পরিত্যাক্ত সম্পদ হতে এর কন্যাদের অংশ দিলেই ভাল হয়। অবশ্য ইচ্ছা করলে দেয়া যাবে। অতঃপর ওমর (রাঃ) হযরত যায়েদ (রাঃ) এর কথায় এভাবে আমল করলেন যে, হযরত ওমর (রাঃ)-এর যে কজন গোলামের মৃত্যু হয়েছে, কারও পরিত্যাক্ত সম্পদ হতে ওমর (রাঃ)-এর কন্যাদের অংশ দিলেন না। অর্থাৎ গোলামের মৃত্যু হলে মালিক কন্যা সে গোলামের ওয়অরিশ হয় না। ইয়ামামাবাসীদের মৃত্যুর পর অর্থাৎ ইয়ামামা যুদ্ধে যারা মারা গিয়েছিল তার কোন সঠিক প্রমাণ না থাকায় তাদের পরিত্যাক্ত সম্পদের ব্যাপারে হযরত যায়েদ (রাঃ) এর ফতওয়া মুতাবেক হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) আমল করেছিলেন। অর্থাৎ যারা জীবিত ছিল তাদেরকে কেবল ওয়ারিশ সাব্যস্ত করেছিলেন। প্রত্যেককে ওয়ারিশ করা হয় নাই। -(কানযুল উম্মাহ)

আমওয়াস নামক স্থানে প্লেগ রোগে অনেক লোকের মৃত্যু হল। কোন কোন পরিবারে কেহই অবশিষ্ট ছিল না। হযরত ওমর (রাঃ) তখন হযরত যায়েদ (রাঃ)-এর ফতওয়া মুতাবেক আমল করেছিলেন। একদিন হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস (রাঃ) নিজের শাগরেদ হযরত ইকরামাকে হযরত যায়েদ (রাঃ)-এর কাছে পাঠিয়ে জিজ্ঞেস করলেন যে, এক ব্যক্তি মারা গিয়েছে তার স্ত্রী এবং মা রয়েছে। এখন তাদের মধ্যে মৃত ব্যক্তির পরিত্যাক্ত সম্পত্তি কিভাবে

ভাগ করা যাবে। তিনি উত্তরে বলেন- স্ত্রী পাবে এক চতুর্থাংশ, অবশিষ্ট সম্পদের এক তৃতীয়াংশ মায়ের অংশ। অতপর অবশিষ্ট সম্পদ পিতা পাবে। হযরত আব্বাস (রাঃ) এর ধারণা ছিল যে, সম্পূর্ণ সম্পদের এক তৃতীয়াংশ মাকে দিতে হবেই তিনি পুনরায় ইকরামাকে পাঠিয়ে জিজ্ঞেস করলেন যে, কোরআনে কি সে রকম আছে যা আপনি বলেছেন, না এটা আপনার ব্যক্তিগত অভিমত। তখন তিনি বললেন এটা আমার ব্যক্তিমত অভিমত কেমনা আমি বাপের উপর মায়ের প্রাধান্য দিতে পারি না অর্থাৎ যেহেতু সম্পূর্ণ সম্পদের এক তৃতীয়াংশ মাকে দিলে বাপের অংশ হ্রাস পাবে। তাই স্ত্রীকে সম্পূর্ণ সম্পদের এক চতুর্থাংশ দেয়ার পর অবশিষ্ট সম্পদের এক তৃতীয়াংশ দেয়ার ফতওয়া দেয়া হল। (কালযুল উম্মাল- ৬)

পবিত্র কুরআনে মিরাস সর্ম্পকে যা কিছু উল্লেখ রয়েছে সেগুলো ছাড়া হযরত যায়েদ (রাঃ)-এর চিন্তাধারা আরও অনেক রকমের সম্ভাব্য মাসায়েল বের করেছেন। সেই নতুন নতুন দিক সমূহ শেষ পর্যন্ত ফরায়েয শাস্ত্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে পরিগণিত হয়েছে। যেমন গোলামের মীরাস নীতির মীরাস। ভাইয়ের মীরাস, দাদার মীরাস, মীরাস হতে বঞ্চিত ব্যক্তি যায় কারণে অন্য ব্যক্তি বঞ্চিত হয়। প্রভৃতি আরও বহু প্রকারের মাসায়েল তিনি উদ্ভাবন করেন। তিনি দাদার মীরাস সম্বন্ধে সে অভিমত ব্যক্ত করেন তাতে সাহাবাদের মধ্যে অনেকেই এর বিরোধিতা করেন। ব্যতিত যাচাই করার পর দেখা যায় যে হযরত যায়েদ (রাঃ)-এর মতামতই শরীয়তসম্মত।

প্রকৃতপক্ষে ফরায়েয শাস্ত্রে দাদার মীরাস সম্পর্কীয় আলোচনাই সর্বাধিক দীর্ঘ এবং জটিল। এ প্রসঙ্গে তিনি বিভিন্ন ধরনের মতামত ব্যক্ত করেছেন। তবে তার সর্বশেষ মতামত কোন রকমের মত পরিবর্তন করেন নাই। হযরত ওমর (রাঃ) এবং হযরত উসমান (রাঃ) তাঁর কার্যকারিতাই শরীয়ত সম্মত বলে ধার্য করেছেন। হযরত ওমর (রাঃ) হলেন সর্বপ্রথম ব্যক্তি যিনি দাদা হিসাবে নিজের মৃত নাতির পরিত্যাক্ত সম্পত্তির ওয়ারিশ হয়েছিলেন। তাঁর এক নাতির মৃত্যু হলে তিনি নিজেকে সে মৃত নাতির সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী বলে মনে করলেন। এতে অপরাপর সাহাবীগণ সম্মতি দিলেন না বরং এর বিরুদ্ধে মতামত ব্যক্তি করলেন। অতঃপর হযরত ওমর (রাঃ) এ ব্যাপারে ফতওয়ার জন্য হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রাঃ)-এর ঘরে পৌছলে যায়েদ (রাঃ) বললেন আমি সে নাতির মীরাস সম্পর্কীয় মাসয়ালা জিজ্ঞেস করতে এসেছি। ইতিপূর্বে এ মীরাসের ব্যাপারে যা করেছি সকলেই এর বিরোধিতা করছে। এজন্য আমি

আপনার নিকট এসেছি। এ ব্যাপারে যদি আপনার মতামতাদি আমার স্বপক্ষে হয় তাহলে তা কার্যকর হবে আর যদি বিপক্ষে হয় তাতে কোন আপত্তি নাই। এমতবস্থায় হযরত যায়েদ (রাঃ) ফতওয়া দিতে অস্বীকার করলে তিনি প্রত্যাবর্তন করলেন। দ্বিতীয় দিন হযরত ওমর (রাঃ) পুনরায় যায়েদ (রাঃ) এর কাছে উপস্থিত হলে তিনি বললেনঃ আমার ফতওয়াটা আমি আপনাকে মুখে না দিয়ে কাগজে লিখে দিব। অতএব হযরত যায়েদ (রাঃ) রীতিমত শাজরা তৈরী করে লিখিত আকারে ওয়ারিশদের অংশ ভাগ করে হযরত ওমর (রাঃ)-এর হাতে দিলেন। অতঃপর হযরত ওমর (রাঃ) উপস্থিত জন সমক্ষে খুতবা দানের মাধ্যমে বলেন- হযরত যায়েদ বিন সাবিত আমাকে বিতর্কিত মাসয়ালাটি লিখিতভাবে জানিয়েছেন। আমি এর স্বীকৃতি দিচ্ছি এবং এর কার্যকারিতা ঘোষণা করছি।

হাদীসের হিফাযত

কোরআন মজীদের জীবন্ত ব্যাখ্যা হিসাবে হাদীসে রাসূল (সাঃ)-এর এ মর্যাদা ও গুরুত্বের কারণে তার হিফাযত ও রক্ষণা-বেক্ষণের ক্ষেত্রে মুসলিম উম্মাহ শুরু থেকে এ পর্যন্ত যে অসীম ত্যাগ ও সাধনা এবং কঠোর সতর্কতা ও বিশ্বস্ততার স্বাক্ষর রেখেছেন, বিশ্ব ইতিহাসে তার নযীর পাওয়া যাবে না। বস্তুতঃ রাসূল (সাঃ)-এর যুগে হাদীসের হিফাযত ও সংরক্ষণ কার্য শুরু হয়ে যায়। সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) অক্লান্ত পরিশ্রম ও অতিশয় কষ্টের মাধ্যমে হাদীসের হিফাযতের ব্যবস্থা করেন। অতঃপর তাবেয়ীন, তাবে-তাবেয়ীন এবং আজ পর্যন্ত যুগ যুগ ধরে ওলামায়ে কিরাম হাদীসের হিফাযত ও প্রচারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছেন।

হাদীস হিফাযতের বিভিন্ন উপায়

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, উম্মতে মুহাম্মদী শুরু থেকে আজ পর্যন্ত রাসূল (সাঃ)-এর হাদীসের হিফাযত ও সংরক্ষেণের ক্ষেত্রে প্রধানতঃ চারটি পন্থা অবলম্বন করে আসছেন। (১) হাদীসের শিক্ষা গ্রহণ ও মুখস্থকরণ, (২) হাদীসের শিক্ষাদান, (৩) হাদীস মোতাবেক আমল, (৪) হাদীস লিপিবদ্ধকরণ।

সাহাবা যুগে হাদীসের শিক্ষা গ্রহণ ও মুখস্তকরণ-

হাদীসের প্রথম ধারক ও বাহক ছিলেন রাসূল (সাঃ)-এর পবিত্র সান্নিধ্য প্রাপ্ত সাহাবায়ে কিরামের মুবারক জামাত। তাঁরা প্রিয় রাসূল (সাঃ)-এর মুখে যা

শুনেছেন এবং যা দেখেছেন তার সবই সংরক্ষণ করে পরবর্তী উম্মতের কাছে আমানত রেখে চলে গেছেন। রাসূল (সাঃ)-এর বিদায় হজ্বের সময় তাঁদের সংখ্যা ছিল এক লাখের কাছাকাছি।

হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীদের সংখ্যা

হযরতের কাছ থেকে সরাসরিভাবে অথবা অন্য সাহাবীদের মাধ্যমে হাদীস বর্ণনা করেছেন এমন সাহাবীদের সংখ্যা ছিল ইমাম আবু জুরআ রাজীর মতে একলাখ চৌদ্দ হাজার। রাসূল (সাঃ)-এর ইন্তেকালের সময় কেবল মক্কা ও মদীনায় সাহাবীদের সংখ্যা ছিল ইমাম শাফেয়ীর মতে ষাট হাজার। তন্মধ্যে প্রায় ১০ হাজার সাহাবীর জীবন ও কীর্তিকলাপের বিবরণ ইতিহাসের পাতায় সুরক্ষিত আছে। তাঁদের প্রত্যেকে কিছু না কিছু হাদীস পরবর্তী উম্মতের কাছে পৌছিয়ে দিয়েছেন। তাঁরা কে কি পরিমাণ হাদীস বর্ণনা করেছেন তারও একটি পরিসংখ্যান ইতিহাসে আছে। সাহাবায়ে কিরামের অনেকে হাদীসের শিক্ষা গ্রহণ ও মুখস্থকরণের জন্যে নিজেদের জীবনকে ওয়াক্‌ফ করে দিয়ে দিয়েছেন। যথা ঃ আসহাবে সুফ্‌ফা আর যাঁরা অন্যান্য দায়িত্বের দরুণ সর্বক্ষণ রাসূল (সাঃ)-এর খিদমতে হাযির থাকতে পারতেন না তাঁরা যখনই সুযোগ পেতেন রাসূল (সাঃ)-এর খিদমতে হাযির হওয়ার চেষ্টা করতেন বা অন্যের নিকট রাসূল (সাঃ)-এর দরবারে কখন কি ঘটছে তা জেনে নেয়ার চেষ্টা করতেন। কেহ কেহ তো এর জন্যে অন্যের সাথে পালা ঠিক করে নিয়েছিলেন। হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) বলেন–"আমি ও আমার এক আনসারী প্রতিবেশী আত্‌বান ইবনে মালিক মদীনার উপকণ্ঠে বাস করতাম। সুতরাং আমরা রাসূল (সাঃ)-এর খিদমতে হাযির হওয়ার জন্যে পালা ঠিক করে নিয়েছিলাম। তিনি একদিন রাসূল (সাঃ)-এর খিদমতে হাযির হতেন আর আমি একদিন হাযির হতাম। যে দিন আমি হাজির হতাম সে দিনের ওহী এবং অন্যান্য বিষয়ের খবর আমি তাঁকে দিতাম এবং তিনি যে দিন হাযির হতেন সে দিন তিনি এরূপ করতেন।"

আসহাবে সুফ্‌ফা

হাদীসের প্রথম ধারক হিসাবে হাদীসের ইতিহাসে আসহাবে সুফ্‌ফার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। সুফ্‌ফার অধিবাসীগণ দিন-রাত রাসূলের দরবারে পড়ে থাকতেন। এদের কোন ঘর সংসার ছিল না, আয়-উপার্জনের তেমন প্রয়োজনও ছিল না। তাই অন্যান্যদের তুলনায় তারা যে রাসূল (সাঃ)-এর সাহচর্যে অধিক সময় লাগাতে সক্ষম হয়েছেন এতে সন্দেহ থাকার কথা নয়। ফলে মসজিদে

নববী একটি আবাসিক বিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছিল। স্বয়ং রাসূল (সাঃ) ছিলেন এর প্রধান উস্তাদ আর সাহাবীরা ছিলেন শিক্ষার্থী।

হাদীস শিক্ষার জন্যে তাঁদের সফর

অনেক সময় অনেকে দূর দুরান্ত থেকে সফর করে রাসূল (সাঃ)-এর কাছে আসতেন হাদীস শিক্ষার জন্যে। যেমন ইমাম বুখারী (রাঃ) হযরত উক্বা ইবনে হারিসের একটি ঘটনা সহীহ বুখারী শরীফে বর্ণনা করেছেন যে, একদিন হযরত উক্বাকে এক মহিলা সংবাদ দিল যে, মহিলাটি তাঁকে এবং তার স্ত্রীকে দুগ্ধপান করিয়েছে। তখন হযরত উক্বা মক্কায় ছিলেন। কথাটি শোনার সাথে সাথে তিনি মদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। মদীনায় পৌঁছে রাসূল (সাঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, যে ব্যক্তি অজানা অবস্থায় নিজের দুগ্ধবোনকে বিবাহ করে ফেলে, পরে উভয়কে যে দুধপান করিয়েছিল সে মহিলা অবগত করিয়ে দেয়, সে ব্যক্তির ব্যাপারে আল্লাহ্‌র বিধান কি? উত্তরে রাসূল (সাঃ) বললেন, যখন মহিলাটি সাক্ষ্য দিল তখন কি করে সম্ভব? (অর্থাৎ এখন আর তোমাদের উভয়ের মধ্যে বিবাহ বন্ধন থাকতে পারে না) একথা শুনে তৎক্ষণাৎ তিনি নিজ স্ত্রীকে তালাক দিয়েছিলেন। অতঃপর তাঁর স্ত্রীর অন্যত্র বিবাহ হল।

অনুরূপভাবে রাসূল (সাঃ) ইন্তেকালের পরেও সাহাবীদের অনেকে অপর সাহাবীর নিকট হাদীস শিক্ষা করার জন্যে শত শত মাইল সফরের কষ্ট স্বীকার করতেন। হযরত জাবির ইবনে আব্বদুল্লাহ (রাঃ) কেবল একটিমাত্র হাদীস শোনার জন্যে মদীনা থেকে এক মাসের পথ সুদূর সিরিয়ায় সফর করেছিলেন।

হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রাঃ) (মৃঃ-৫০ হিজরী) একটি হাদীস সম্পর্কে সন্দেহ নিরসন উদ্দেশ্যে মদীনা থেকে মিসরের উদ্দেশ্যে যাত্র করেছিলেন।

হযরত আনাস (রাঃ) হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উনাইসের কাছ থেকে একটি হাদীস সংগ্রহ করার জন্যে এক মাসের পথ সফর করেছিলেন।

হযরত ফজালা ইবনে উবাইদের নিকট হাদীস জিজ্ঞাসা করার জন্যে হযরত আনাস (রাঃ) মিসর গমন করেছিলেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হাদীস সংগ্রহ করার জন্যে বয়োবৃদ্ধ সাহাবীদের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়াতেন।

সাহাবায়ে কিরামের হাদীস সংগ্রহ সংক্রান্ত আরও বহু চমকপ্রদ ঘটনা ইতিহাসের পাতায় চির স্মরণীয় হয়ে আছে।

সাহাবীদের হাদীস মুখস্তকরণ

হাদীস হিফাযতের অন্যতম পন্থা হচ্ছে হাদীস কণ্ঠস্থ করা। সাহাবীগণ কোরআন মজীদের যে ভাবে হিফয ও আলোচনা করতেন সেভাবে হাদীসকেও তাঁরা নিজ নিজ সাধ্যমত মুখস্ত করে রাখতেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস(রাঃ) বলেন- আমরা রাসুল (সাঃ)-এর সময় হাদীস মুখস্ত করতাম। -(মুসলিম)

মহান আল্লাহ্ স্বাভাবিকভাবে স্মরনশক্তি সম্পন্ন আরব জাতীকেই হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর নবুওয়াত ও তাঁর বাণীর সংরক্ষণ হিসোবে নিযুক্ত করেছিলেন। প্রখর স্মরণশক্তি সম্পন্ন এসব হৃদয়কে কোরআনের আয়াত্ ও রাসূল (সাঃ) এর হাদীস মুখস্থ রাখার জন্য পূর্ণ মাত্রায় প্রস্তুত করেছিলেন।(আল হাদীস ওয়াল মুহাদ্দিসুন)

প্রসিদ্ধ তাবী হযরত কাতাবা ইবনে দেয়ামাহ দাবী করে বলেন:আল্লাহ এ জাতিকে (উম্মতে মুহাম্মদী কে) স্মরণশক্তির এমন প্রতিভা দান করেছেন যা অন্য কোন জাতিকে দান করা হয়নি। এটা এমন এক গুন যা কেবল তাদেরকেই দেয়া হয়েছে আর এটা এমন এক সম্মান ও মর্যাদা যার দ্বারা শুধু তাদেরকেই সম্মানিত করা হয়েছে। -(যুরকানী)

হাদীস লিখার জন্যে সাহাবীদের প্রতি রাসূল (সাঃ)-এর আদেশ

সাহাবীদের মধ্যে কিছু লোক জাহিলিয়্যাতের যুগেই লিখা-পড়া জানতেন এবং অনেক যুবক সাহাবীই শিক্ষা লাভ করেছিলেন। ফলে তাঁদের অনেকেই রাসূল (সাঃ)-এর কাছে শ্রুত হাদীস ব্যক্তিগতভাবে লিখে রাখতে সমর্থ ছিলেন। রাসূল (সাঃ) প্রথম পর্যায়ে সাধারণভাবে সকলকেই হাদীস লিখতে নিষেধ করে থাকলেও পরে এর জন্য সাধারণ অনুমতি দান করেছিলেন। বরঞ্চ সাহাবীদেরকে এ বিষয়ে তাগিদ দিয়ে থাকতেন। আবার এ ব্যাপারে কোন অসুবিধা বা প্রতিবন্ধকতা দেখা দিলে তা তিনি অপসারণও করে দিতেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (সাঃ)-এর থেকে শ্রুত প্রত্যেকটি কথাই হিফাযতের উদ্দেশ্যে লিখে নিতাম। তা দেখে কুরইশী সাহাবীগণ আমাকে এ কাজ করতে নিষেধ করেন। আমাকে তাঁরা বলেন-"তুমি রাসূল (সাঃ)-এর মুখে যা শুন, তা সবই কি লিখে রাখ? অথচ রাসূল (সাঃ) একজন মানুষ। কখনো সন্তোষ আর কখনো ক্রোধের মধ্যে কথা

বলেন” হযরত আবদুল্লাহ বলেন, অতঃপর আমি হাদীস লিখা বন্ধ করে দিই এবং ব্যাপারটি রাসূল (সাঃ)-কে জানাই। তখন রাসূল (সাঃ) স্বীয় দু' ওষ্ঠের দিকে ইঙ্গিত করে আমাকে বলেন–“তুমি লিখতে থাক। আল্লাহ্‌র শপথ, আমার এ মুখ থেকে প্রকৃত সত্য কথা ছাড়া কিছুই বের হয় না। (সুনানে দারিমী)

এর পর হযরত আবদুল্লাহ জিজ্ঞাসা করলেন–হে রাসূল! আপনার কাছে যা কিছু শুনতে পাই তার সবই কি লিখে রাখব? রাসূল (সাঃ) বললেন, হ্যাঁ। হযরত আবদুল্লাহ পুনারায় জিজ্ঞাসা করলেন–অর্থাৎ ক্রুদ্ধ ও সন্তোষ উভয় অবস্থায় বলা সব কথাই কি লিখব, রাসূল (সাঃ) চূড়ান্তভাবে বললেন–‘হ্যাঁ, সকল অবস্থায় আমি প্রকৃত সত্য ছাড়া আর কিছুই বলিনা’।

উল্লেখিত এ বর্ণনা থেকে সুস্পষ্টভাবে বুঝা গেল যে প্রথমতঃ রাসূল (সাঃ) ছিলেন নিষ্পাপ, তাঁর মুখ থেকে কখনও সত্যের বিপরীত কোন কথা বের হত না। দ্বিতীয়ঃ হাদীস লিখে রাখার কেবল অনুমতিই ছিল না, বরঞ্চ সব সময় ও সর্বাবস্থায় বলা সব কথাই লিখে রাখার জন্যে রাসূল (সাঃ) সুস্পষ্ট আদেশও দিয়েছিলেন। কারণ, রাসূল (সাঃ) ছিলেন সর্ব সাধারণ মুসলিমের জন্যে সকল সময়ে ও সকল অবস্থাতেই অনুসরণীয়। তাঁর প্রত্যেকটি অবস্থাও সব সময়ের সকল কথা ও সকল প্রকার কাজই ইসলামী শরীয়তের উৎস।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর বলেন, রাসূল (সাঃ) বলেছেন–‘ইলমে হাদীসকে বন্দী করে সংরক্ষিত কর’, আমরা জিজ্ঞেস করলাম–তাকে কি করে বন্দী করব? রাসূল (সাঃ) বললেন–অর্থাৎ তাকে লিখে নাও। (মুস্তাদরাক)

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন–একজন আনসার সাহাবী রাসূল (সাঃ)-এর খিদমতে বসে তাঁর বাণী শুনতেন। তা তাঁর খুবই ভাল লাগত। কিন্তু তিনি ভালভাবে স্মরণ রাখতে পারতেন না। একদিন তাঁর এ অসুবিধার কথা রাসূল (সাঃ)-কে জানালে তিনি তাঁকে বলেন–অর্থাৎ তোমার ডান হাতের সাহায্য গ্রহণ কর। এ বলে রাসূল (সাঃ) হাত দ্বারা লিখার কথাই বুঝিয়ে ছিলেন। (তিরমিযী)

সাহাবীদের যুগে লিখিত হাদীস অমূল্য সম্পদ

হাদীস লিখার ব্যাপারে সাহাবীদের মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আসকে দেখা যায় সর্বাগ্রে। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন–“রাসূল (সাঃ)-এর সাহাবীদের মধ্যে আমার অপেক্ষা অধিক কেহ হাদীস বর্ণনা

করেননি। তবে আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস অধিক বর্ণনা করেছেন। এর কারণ তিনি হাদীস লিখে রাখতেন আর আমি লিখে রাখতাম না। (বুখারী শরীফ)

সুহুফে আবু হুরায়রা

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) প্রথম দিকে হাদীস লিখতেন না। শুধু স্মরণশক্তির উপর নির্ভর করতেন। কিন্তু পরে তিনিও বিপুল সংখ্যক হাদীস লিপিবদ্ধ করে নিয়েছিলেন। তাঁর লিখিত হাদীসের সংখ্যা ছিল পাঁচ সহস্রাধিক। (মুস্তাদরাক হাকেম)

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) এর এক শাগরিদ হাসান ইবনে আমর ইবনে উমাইয়া জমরী একদিন তাঁকে একটি হাদীস মুখস্থ শোনান এবং বলেন, ‘এটি আপনার কাছে শুনেছি’, তখন হযরত আবু হুরায়রা বললেন–‘আমার কাছে শুনে থাকলে তা অবশ্যই আমার কাছে লিপিবদ্ধ থাকবে’, অতঃপর হাসানের হাত ধরে নিজের ঘরে নিয়ে গেলেন এবং তাঁর লিখিত হাদীসসমূহের এক বিরাট স্তুপ দেখিয়ে বললেন–তোমার বর্ণিত হাদীসটি এতে লিপিবদ্ধ আছে। হযরত হাসান বলেন–অর্থাৎ ‘তিনি আমাকে বিপুল সংখ্যক কিতাব দেখালেন। তথায় রাসূল (সাঃ)-এর হাদীস লিখিত ছিল। (ফতহুল বারী)

প্রায় আটশত কিংবা ততোধিক সাহাবী ও তাবী হযরত আবু হুরায়রা থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। (তাহজীবুত-তাহজীব)

‘মুসনাদে আবু হুরায়রা’ নামক গ্রন্থটি সাহাবীদের যুগেই সংকলিত হয়। (তাবকাতে ইবনে সা'আদ)

হযরত আনাস -এর সংকলন

হযরত আনাস (রাঃ) ও হাদীস লিখে রাখতেন। দশ বছর বয়স কালেই তিনি হাদীস লিখতেন ও পড়তেন। তাঁর পিতা তাঁকে রাসূল (সাঃ)-এর খিদমতের জন্য পেশ করে বলেছিলেন–‘হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এ আমার পুত্র, লিখা জানা এক বালক। (উসদুল গাবা)

তিনি দশ বছর যাবত রাসূল (সাঃ)-এর খিদমত করেছিলেন। যা কিছু রাসূলের মুখে শুনতেন তার সবই লিখে রাখতেন তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। সাঈদ ইবনে হেলাল বলেন–“আমরা আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) কে হাদীস

বর্ণনা করার জন্য শক্ত করে ধরলে তিনি একটি চোঙ্গা বের করে বললেন–এ সব হাদীস আমি রাসূল (সাঃ)-এর কাছে শুনেছি এবং লিখে নেয়ার পর আবার তাঁকে পড়ে শুনিয়েছি। (মুস্তাদরাকে হাকেম)

হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌নে মাসউদের সংকলন

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) ও হাদীসের এক সংকলন তৈরী করেছিলেন। তাঁর ইন্তেকালের পর এ সংকলন তাঁর পুত্রদের কাছে সংরক্ষিত ছিল। তাঁর পুত্র আবদুর রহমান একটি হস্তলিখিত হাদীস সংকলন দেখিয়ে বলতেন–"আল্লাহ্‌র শপথ, এটি আব্বাজানের হস্তলিখিত হাদীস সংকলন।"

হযরত সামুরা ইব্‌নে জুনদাব এর সংকলন

হযরত সামুরা ইবনে জুনদাব (রাঃ) ও হাদীস লিপিবদ্ধ করে রাখতেন, তাঁর ইন্তেকালের পর এ হাদীস গ্রন্থ মীরাসী সুত্রে তাঁর পুত্র সালমান লাভ করেন। আল্লামা ইবনে সীরীন বলেন–'সামুরার সংকলিত হাদীসগ্রন্থে ইলম সন্নিবেশিত আছে।' তাহজীবুত্-তাজীব)

হযরত ইবনে আব্বাস এর সংকলন

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) যেসব হাদীস শুনতে পেয়েছিলেন তা সবই গ্রন্থাকারে সংকলিত করেছিলেন। তাফেয়ের কিছু লোক তাঁর কাছে শুনে এ পূর্ণ গ্রন্থটি নকল করে নিয়ে গিয়েছিলেন। (তিরমিযী শরীফ) তিনি চিঠি পত্র লিখেও হাদীস প্রচার করতেন। (আবু দাউদ, কিতাবুল আক্‌যিয়া)

তিনি ইন্তেকালের সময় এক উট বোঝাই হাদীসগ্রন্থ রেখে গিয়েছিলেন। (তাবকাতে ইবনে সা'আদ) তাঁর ইন্তেকালের পর তাঁর পুত্র আলী বহু সংখ্যক হাদীস সংকলন উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেন। (তাবকাতে ইবনে সা'আদ) মুহাদ্দিস আল কাত্তানী হযরত আবু রাফের স্ত্রী সালমার একটি কথা উল্লেখ করেছেন যে–'আমি ইবনে আব্বাসকে লিখার কিছু পাত্র নিয়ে তাতে আবুরাফে' থেকে রাসূল (সাঃ) কাজ-কর্ম সম্পর্কে কিছু লিখতে দেখিছি। (আত তারাতীবুল ইদারিয়্যা)

ইমাম মুসা ইবনে উক্‌বা বলেন–"আল্লাহ শপথ ইবনে আব্বাসের গোলাম কুরাইব আমাদের সম্মুখে ইবনে আব্বাসের লিখিত হাদীস গ্রন্থ সমূহের এক উষ্ট্র বোঝাই সম্পদ পেশ করে।" (তাবকাতে ইবনে সা'আদ)

হযরত মুগীরা ইবনে শুবার সংকলন

হযরত মুগীরা ইবনে শু'বা (রাঃ) হযরত মুআ'বিয়া (রাঃ) কে তাঁর অনুরোধক্রমে বহু সংখ্যক হাদীস লিখে দিয়েছিলেন। (সহীহ বুখারী শরীফ।

মহিলা সাহাবীদের অবদান

পুরুষ সাহাবায়ে কিরামের ন্যায় মহিলা সাহাবীগণও হাদীস সাধনায় অনেক আগে ছিলেন। রীতিমত তাঁরাও হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং অন্যদের শিক্ষা দিয়েছেন।

হযরত আয়েশা (রাঃ)

এদের মধ্যে সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারী ছিলেন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ)। তাঁর বর্ণনাকৃত হাদীসের সংখ্যা ২২১০। প্রায় ২৮৬টি হাদীস বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে স্থান পেয়েছে। শতাধিক সাহাবা, তাবীন তাঁর কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর শা'গরিদগণের মধ্যে ছিলেন উরওয়া ইবনে জুবাইর, সাঈদ ইবনে মুসায়্যিব, আবদুল্লাহ ইবনে আমের, মসরুক ইবনুল আজদা, ইকরামা ও আলকামা প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ।

হযরত উম্মে সালমা (রাঃ)

হযরত আয়েশার ন্যায় হযরত উম্মে সালমারও হাদীসের সাথে গভীর সম্পর্ক ছিল। তাঁর বর্ণনাকৃত হাদীসের সংখ্যা হল ৩৭৮। হযরত উসামা ইবনে যায়েদ, সুলাইমান ইবনে য়াসাব,, আবদুল্লাহ ইবনে রাফে, সাঈদ ইবনে মুসায়্যিব, উরওয়া ইবনে জুবাইর ও তাঁর কন্যা হযরত যায়নাব প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ তাঁর কাছ থেকে হাদীসের শিক্ষা গ্রহণ করেছেন।

হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) ফতোওয়াও প্রদান করতেন। তাঁর অনেক ফতোওয়া সংগৃহীত আছে। হাফিয ইবনে কায়্যিম বলেন–তাঁর ফতোওয়াগুলো সংকলন করা হলে একটি পুস্তক তৈরী হয়ে যেত।

হযরত হাফ্‌সা (রাঃ)

হযরত হাফ্‌সা থেকে ৬০টি হাদীস বর্ণিত আছে। তাঁর কাছ থেকে বড় বড় সাহাবীগণ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

হযরত মায়মুনা (রাঃ)

হযরত মায়মুনা (রাঃ) থেকে ৪৫টি হাদীস বর্ণিত আছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ), যায়েদ ইবনে আসেম ও আতা ইবনে য়াসার প্রমুখ মুহাদ্দিগণ তাঁর কাছে হাদীস শিক্ষা করেছেন।

এ ছাড়া উম্মাহাতুল মুমেনীনদের অন্যরাও কম বেশী হাদীস বর্ণনা করেন। রাসূল (সাঃ)-এর কন্যা হযরত ফাতিমা (রাঃ) থেকেও কিছু সংখ্যক হাদীস বর্ণিত আছে। অনেক বড় বড় মুহাদ্দিসগণ তাঁর কাছ থেকে হাদীসের শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। আবার সাধারণ মহিলা সাহাবীরাও হাদীসের শিক্ষা গ্রহণ, শিক্ষাদান ও বর্ণনায় অনেক এগিয়ে ছিলেন। যে সকল মহিলা সাহাবী একাধিক হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল তাঁদের সংখ্যা ১৩০ বলেছেন। অনেক গ্রন্থাকারের মতে এদের সংখ্যা ছিল ৫০০ শত। এদের মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েকজন হলেন ঃ হযরত আসমা বিনতে উমাইস। তিনি ১৬০টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। হযরত আসমা বিনতে আবি বকর। তিনি ৫৬টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। অনেক সাহাবায়ে কিরাম এ দু'জনের কাছে হাদীস শিক্ষা করতেন।

হযরত উম্মেহানী ৪৬টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। হযরত উম্মুল ফযল থেকে ৩০টি হাদীস বর্ণিত আছে। এ ছাড়া আরও অনেক মহিলা সাহাবী আছেন, যাদের অবদান হাদীসের ব্যাপারে চির স্মরণীয় থাকবেন।

সাহাবা যুগে হাদীস পর্যালোচনা ও শিক্ষাদান

সাহাবায়ে কিরাম রাসূল (সাঃ)-এর কাছে হাদীস শ্রবণ করে আসার সময় সুযোগ ও প্রয়োজন মতে একত্র হয়ে বসতেন এবং পারস্পরিক চর্চা ও আলোচনায় লিপ্ত হতেন। কোন কোন সময় তাঁরা হাদীস আলোচনার জন্যে বিশেষ বৈঠকের অনুষ্ঠান করতেন। সাধারণতঃ মসজিদে নব্বীতে এ ধরনের বৈঠক অনুষ্ঠিত হত। আবার কখনো তাঁদের বাড়ীতেও অনুরূপ বৈঠক বসত। এ সকল বৈঠক এর আলোচ্য বিষয় থাকত রাসূল (সাঃ)-এর কথা, কাজ ও উপদেশাবলী। এতে করে তাঁদের কারো পূর্বে কোন বিষয়ে অজ্ঞতা থাকলে সে সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হতে পারত আর কারো কোন বিষয়ে সন্দেহ থাকলে তারও নিরসন হয়ে যেত। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন-"আমরা রাসূল (সাঃ)-এর কাছে হাদীস শ্রবণ করতাম। তিনি যখন মজলিস থেকে উঠে চলে যেতেন, তখন আমরা বসে শ্রুত হাদীসসমূহ পরস্পর পুনরাবৃত্তি করতাম, চর্চা

করত, পর্যালোচনা করতাম। আমাদের এক একজন করে সব কয়টি হাদীস মুখস্থ শুনিয়ে দিত। এ রকমের প্রায় বৈঠকেই অন্ততঃ ষাট সত্তরজন লোক অবশ্যই উপস্থিত থাকত। এ বৈঠক থেকে আমরা যখন উঠে যেতাম, তখন আমাদের প্রত্যেকের সবকিছু মুখস্থ হয়ে যেত।" (মাজমাউ-জাওয়ায়েদ)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর বলেন-একদিন রাসূল (সাঃ) তাঁর কোন এক হুজরা থেকে বের হয়ে আসলেন এবং মসজিদে দু'টি জনসমাবেশ দেখতে পেলেন। একটিতে সমবেত লোকেরা কোরআন পাঠ করছিল ও আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া প্রার্থনায় মগ্ন ছিল। আর অপরটির লোকেরা হাদীসের শিক্ষা গ্রহণ করে ছিল ও শিক্ষাদান করেছিল। রাসূল (সাঃ) বললেন, উভয় সমাবেশের লোকেরা কল্যাণের কাজ করছে। এরা কোরআন পাঠ করছে ও আল্লাহ্‌কে ডাকছে। আল্লাহ্ চাইলে তাদের প্রার্থিত জিনিস দান করবেন, আর না চাইলে দিবেন না। আর অপর দলের লোক জ্ঞান ও হাদীস শিক্ষা করছে এবং শিক্ষা দিচ্ছে। আমি শিক্ষক হিসাবে প্রেরিত হয়েছি। 'আবদুল্লাহ ইবনে আমর বলেন' "অতঃপর তিনি তাঁদের সাথে বসে পড়লেন।" (দারিমী)

হযরত মুবাবিয়া (রাঃ) বর্ণনা করেন-"আমি একদিন রাসূল (সাঃ)-এর সাথে ছিলাম। তিনি মসজিদে প্রবেশ করে একদল লোককে উপবিষ্ট দেখতে পেলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কেন বসে আছ? তাঁরা বললেন, আমরা ফরয নামায পড়েছি অতঃপর বসে আল্লাহ্‌র কিতাব ও তাঁর নবীর সুন্নাত সম্পর্কে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনা করছি।" (মুসতাদরাকে হাকীম)

সাহাবীদের শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন

কোরআন হাদীসের শিক্ষাদানের জন্যে সাহাবায়ে কিরাম নিজ নিজ এলাকায় শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন। রাসূল (সাঃ)-এর জীবদ্দশাতেই মদীনা শরীফে নয়টি মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তাতে যেমন পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাতের সাথে পড়া হত, তেমনি প্রত্যেকটিতে দ্বীনে ইসলাম শিক্ষা দানেরও ব্যবস্থা ছিল। (উলুমুল হাদীস ওয়া মুসতালাহুহু)

আবদুল কায়স গোত্রের আগত প্রতিনিধি দল প্রত্যাবর্তন করে সবাইকে জানিয়ে দিলেন যে, আনসারগণ আমাদেরকে আল্লাহ্‌র কিতাব ও রাসূলের সুন্নাত শিক্ষা দিয়ে ছিলেন।

ইবনে সাআ'দ বলেন, ফরহাদ ইবনে মালিক (রাঃ) ইয়েমেন থেকে আগমন করেন এবং কোরআন ইসলামের ফরযসমূহ ও শরীয়তের বিধান শিক্ষা করেন।" (তাবকাত ইবনে সায়াদ)

বিভিন্ন স্থানে সাহাবীদের হাদীস শিক্ষাদান কার্য

রাসূল (সাঃ)-এর ইন্তেকালের পর সাহাবীদের এক জামাত হাদীস শিক্ষাদান কার্যে ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং সমগ্র আরব ভূমিকে হাদীসের জ্ঞানে উদ্ভাসিত করেন।

মদীনায় ঃ হযরত আয়েশা, হযরত ইবনে ওমর ও হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) প্রমুখের দরস চলতে থাকে। **মক্কায়ঃ** হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হাদীস শিক্ষার এক বিরাট কেন্দ্র স্থাপন করেন। **কুফায়ঃ** হযরত আলী, হযরত ইবনে মাসউদ ও হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) প্রমুখ বিশিষ্ট সাহাবীগণ হাদীস চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। **বসরায়ঃ** হযরত আবু মুসা আশআরী (রাঃ) শাসনকার্য পরিচালনার সাথে সাথে হাদীসের দরসও অব্যাহত রাখেন। তাঁর সাথে সহযোগী হিসাবে হযরত ইমরান ইবনে হুসাইনও ছিলেন। **মিসরে ঃ** হযরত আমর ইবনুল আ'স ও আসলাম ইবনে মুহাম্মদ (রাঃ) এ দায়িত্ব গ্রহণ করেন। **সিরিয়ায়ঃ** হযরত আবু সাঈদ খুদরী ও আবদুল্লাহ ইবনে উনাইস (রাঃ) এ কাজ আঞ্জাম দেন। **ইয়েমেনে ঃ** হযরত মু'আজ ইবনে জবল (রাঃ) হাদীস চর্চা করেন। **হিমৃস শহরে ঃ** হযরত উবাদা ইবনে ছামিত (রাঃ) হাদীসের দরস দেন। হযরত আবু মূসা আশআরী বসরায় পৌঁছার পর বলেছিলেন 'আমাকে হযরত ওমর (রাঃ) তোমাদের প্রতি পাঠিয়েছেন যেন আমি তোমাদেরকে আল্লাহর কিতাব ও হাদীসে রাসূলের শিক্ষা দিই। (দারমী)

নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন

মদীনার বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত দ্বীনি শিক্ষাকেন্দ্র সমূহে সাধারণতঃ দিনের বেলায় শিক্ষাদান করা হত। সে কারণে অনেক শ্রমজীবি ও বিভিন্ন পেশা অবলম্বনকারী লোক তথায় শরীক হয়ে ও ইলম হাসিল করার সুযোগ পেতেন না। এ জন্যে তাঁরা নৈশ বিদ্যালয় ধরনের শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করতে বাধ্য হন। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল এ সকল বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সম্পর্কে বলেন, 'রাতের অন্ধকারে যখন তাদেরকে ডাকা হত' তখন তাঁরা মদীনায় অবস্থিত তাদের শিক্ষাকেন্দ্রের দিকে চলে যেতেন এবং সেখানে তাঁরা সকাল বেলা পর্যন্ত পড়া শোনার কাজে মশগুল থাকতেন। (আল-ইমাম)

হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে সাহাবীদের শ্রেণীভাগ

যদিও সাহাবায়ে কিরামের প্রায়ই হাদীস শিক্ষাদান কার্যে নিয়োজিত ছিলেন, তবে এ ব্যাপারে সকল সাহাবীর সমান সুযোগ ছিল না। যারা এক

হাজার বা ততোধিক হাদীস শিক্ষা দিয়েছেন মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় তাদের 'মুকসিরীন ফিল হাদীস' বলা হয়। যাঁরা পাঁচ শত থেকে হাজারের কম হাদীস শিক্ষা দিয়েছেন তাঁদের বলা হয় 'মুতাওয়াস্সিতীন'। আর যাঁরা চল্লিশ থেকে চার শত পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন তাঁদেরকে 'মুকিল্লীন' বলা হয়। তার চেয়েও কম হাদীস বর্ণনাকারীদের 'আকল্লীম' বলা হয়।

সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীগণ

সাহাবীদের মধ্যে যারা সর্বাধিক হাদীস বর্ণনা করেছেন তাঁরা হলেন মোট সাত জন।

(১) হযরত আবু হুরায়রা (ইনতিকাল ঃ ৫৯ হিজরী) থেকে ৫৩৭৪ হাদীস। (২) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (ইনতিকাল ঃ ৭৩ হিজরী) থেকে ২৬৩০ হাদীস। (৩) হযরত আনাস ইবনে মালিক (ইনতিকাল ঃ ৯৩ হিজরী) থেকে ২২৮৬ হাদীস। (৪) হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (ইনতিকাল ঃ ৫৭ হিজরী) থেকে ২২১০ হাদীস। (৫) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (ইনতিকাল ঃ ৬৮ হিজরী) থেকে ১৬৬০ হাদীস। (৬) হযরত জাবীর ইবনে আব্বাস (ইনতিকাল ঃ ৭৮ হিজরী) থেকে ১৫৪০ হাদীস (৭) হযরত আবু সাঈদ খুদরী (ইনতিকাল ঃ ৭৪ হিজরী) থেকে ১১৭০ হাদীস।

হযরত আবুদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (ইনতিকাল ঃ ৬৭ হিজরী) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তাঁর লিখিত হাদীসের সংখ্যা সাত বা আট হাজার। সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবী হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) এর উক্তি দ্বারা তা সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয়।

তিনি বলেন–'আবদুল্লাহ ইবনে আমর ব্যতীত রাসূল (সাঃ) কোন সাহাবীই আমার অপেক্ষা অধিক হাদীস অবগত নন। কেননা তিনি লিখতেন আমি লিখতাম না। (বুখারী শরীফ)

দশম অধ্যায়

মহিলাদের শিক্ষাদান পদ্ধতি ও নানান ঘটনা

প্রকৃতপক্ষে মহিলাদের মধ্যে দ্বীনের আগ্রহ এবং নেক আমলের জয্বা পয়দা হয় তাহলে তাঁর সন্তান সন্তুতির উপরও এ প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণে পরিলক্ষিত হবে তা নিঃসন্দে বলা যায়। বর্তমানে যুগে ছেলে-মেয়েদেরকে প্রথম হতেই এমন পরিবেশে রাখা হয় যার, দরুন শুরু থেকেই তাদের মধ্যে দ্বীনের বিরূপ মনোভাব না হলেও কমপক্ষে অবহেলা তো নিশ্চয়ই সৃষ্টি হয়। তাদের এ ধরনের প্রতিক্রিয়ার জন্য পিতা-মাতাই অধিকাংশে দায়ী বললে ভুল হবে না। প্রাথমিক অবস্থায় যদি এরূপ পরিবেশে প্রতিপালিত হয় তবে তাদের ভবিষ্যত কিরূপ হবে তা সহজেই অনুমান করা যায়।

তাস্‌বীহে ফাতেমী

হযরত আলী (রাঃ) একদিন জনৈক ব্যক্তিকে বললেন, আমি তোমাদেরকে রাসূল (সাঃ)-এর সবচেয়ে স্নেহের কন্যা ফাতিমার জীবন বৃত্তান্ত বলবে, তিনি ফাতিমা (রাঃ) নিজে আটা পিষতেন, যার দরুন তাঁর হাতে দাগ পড়ে গিয়েছিল এবং নিজেই মশক ভরে পানি আনতেন, তাই তাঁর বুকে মশকের রশির দাগ সুস্পষ্ট বিদ্যমান ছিল। আবার নিজেই ঘর ঝাড় দিতেন, যে কারণে পরিধেয় কাপড় ময়লাযুক্ত থাকত। রাসূল (সাঃ)-এর কাছে একবার কিছু গোলাম ও বাঁদী আসলে আমি ফাতিমা (রাঃ) কে বললামঃ তুমি গিয়ে রাসূল (সাঃ)-এর কাছ থেকে একজন খাদেম নিয়ে আস। তোমার কাজে কর্মে তাহলে কিছুটা সাহায্য হবে। হযরত ফাতিমা (রাঃ) রাসূল (সাঃ) খিদমতে হাযির হলেনঃ তখন সেখানে অনেক লোকজন ছিল (তিনি অতিমাত্রায় লাজুক ছিলেন বিধায়) লোক সম্মুখে কিছু না বলেই ফিরে আসলেন।

দ্বিতীয় দিন স্বয়ং রাসূল (সাঃ) আমাদের ঘরে এসে ইরশাদ করলেন, ফাতিমা! তুমি গতকাল কি জন্য আমার কাছে এসেছিলে? তিনি লজ্জায় চুপ রইলে আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ফাতিমার অবস্থা নিজ হাতে চাক্কী চালনার কারণে হাতে দাগ পড়ে গেছে। সে নিজেই মশক ভরে পানি আনে, যার দরুন বুকে রশির দাগ পড়ে গেছে। তদুরপরি ঘর দুয়ারে ঝাড় দেয়ার কারণ কাপড় চোপড় ময়লা থাকে। তাই গতকাল বলেছিলাম, আপনার

খিদমতে গিয়ে একজন খাদেম আনার জন্য। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, ফাতিমা (রাঃ) বলেছিলেন, আব্বাজান; আমার আর আলীর জন্য মেষের চামড়ার একটি মাত্র বিছানা, আমরা রাত্রি বেলায় এটা বিছিয়ে শয়ন করি আর দিনের বেলায় এর মধ্যেই উট বকরীকে খাওয়াতে হয়। এ কথা শুনে রাসূল (সাঃ) বললেন ঃ ফাতিমা! ধৈর্যধারণ কর। হযরত মূসা (আঃ) ও তাঁর স্ত্রীর কাছে দশ বছর যাবত একটি মাত্র বিছানা ছিল। মূলতঃ তা হযরত মূসা (আঃ)-এর জুব্বা ছিল। রাত্রি বেলায় এর মধ্যেই শয়ন করতেন। অতঃপর রাসূল (সাঃ) বলেন, ফাতিমা! আল্লাহ্‌কে ভয় করে, পরহেযগারী কর, তাঁর হুকুম আহকাম পালন কর, আর ঘরের কাজকর্ম নিজ হাতেই সম্পাদন করতে থাক এবং রাত্রে শোয়ার জন্য বিছানায় যাবে তখন ততবার সোব্‌হানাল্লাহ্ ৩৩ বার আল হামুদুলিল্লাহ এবং ৩৪ বার আল্লাহু আকবার পড়ে শয়ন করবে। মনে রাখবে, এরূপ করা খাদেম হতে অধিক উত্তম। হযরত ফাতিমা (রাঃ) আরয করলেন, আমি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের উপর রাজী আছি। (আবু দাউদ)

হযরত ফাতিমা (রাঃ) এর কথার অর্থ হল, আমার জন্য আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল যা ব্যবস্থা করেছেন আমি তাতেই সন্তুষ্ট। এটাই ছিল শেষ নবী (সাঃ)-এর স্নেহের কন্যার সংসার জীবন। আর আজকাল আমরা একটু সচ্ছল হয়ে গেলেই সংসারের কাজ কর্ম তো দূরের কথা, ব্যক্তিগত কাজকর্মও আমাদের দ্বারা করা সম্ভব হয় না। উপরে বর্ণিত হাদীসে তিন তাসবীহের বর্ণনা শুধু শয়নের সময় এসেছে; কিন্তু অন্য হাদীসে প্রত্যেক নামাযের পর এগুলো পড়ার নির্দেশ এসেছে, তবে সেখানে আল্লাহু আকবার ৩৩ বার আর শেষে একবার "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা-শারীকা-লাহু লাহুল মুল্‌কু ওয়া লাহুল, হামদু ওয়া হওয়া আলা কুল্লি শাইরিন কাদীর" পড়ার হুকুম এসেছে।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা (রাঃ) এর দানশীলতা

একবার হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর খিদমতে লক্ষাধিক দেরহাম স্বর্ণমুদ্রা আসলে তিনি তৎক্ষণাৎ দেরহামগুলো দান করতে লাগলেন এবং তা সন্ধ্যা পর্যন্ত তিনি একটি দেরহামও নিজের জন্য রাখলেন না। তিনি রোযাদার ছিলেন তাই সন্ধ্যার সময় বাঁদী ইফতারের একটি রুটি এবং কিছু যয়তুনের তেল পেশ করে আরয করল, একটা দেরহামের গোশ্‌ত খরিদ করে আনলে কতই না ভাল হত! তা দ্বারা ইফতার করতে পারতেন। তিনি বললেন, এখন আর অভিযোগ করে লাভ কি? তখন স্মরণ করিয়ে দিলেই তো হত। উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়িশা (রাঃ)-এর জন্য এ ধরনের হাদীয়া হযরত মোয়াবিয়া (রাঃ) ও হযরত আবদুল্লাহ

ইব্‌নে যোবায়ের (রাঃ) পাঠাতেন, কিন্তু তিনি সেগুলো অকাতরে বিলিয়ে দিতেন। কত বড় দানশীলতা! এত বিরাট অংকের টাকা দান করে দিলেন অথচ ইফতারের জন্য একটি মাত্র দেরহাম রাখতেও ভুলে গেলেন। বর্তমান যুগে এসব ঘটনার সত্যতা সম্পর্কেও আমাদের মনে সন্দেহের উদ্রেক হয়। অবশ্য সাহাবীদের জীবনে এ ধরনের শত শত ঘটনাবলীর তেমন কোন গুরুত্ব ছিল না। কেননা, এটাই ছিল এসব মহা মানবদের সাধারণ অভ্যাস।

আরেকটি ঘটনা একদিন তিনি রোযা ছিলেন। এক ভিক্ষুক এসে ভিক্ষা চাইলে ঘরে একটি মাত্র রুটি ছিল। তিনি মহিলা খাদেমকে বললেন, ভিক্ষুককে তা দিয়ে দাও। সে বলল, উম্মুল মুমিনীন! ইফতারের জন্য ঘরে আর কোন ব্যবস্থা নেই। তিনি বললেন, তাতে কি? তুমি তাকে তা দিয়ে দাও। আরও একটি ঘটনা একবার তিনি একটা সাপ মেরেছিলেন। স্বপ্নযোগে দেখলেন, কেহ যেন বলছে, আপনি একজন মুসলমান হত্যা করেছেন। তিনি বললেন, মুসলমান হলে সে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর স্ত্রীগণের ঘরে প্রবেশ করত না। উত্তর এল, সে পর্দার সাথে এসেছিল। তাঁর ঘুম ভেঙ্গে গেলে একজনের হত্যার জরিমানা স্বরূপ বার হাজার স্বর্ণমুদ্রা সদ্‌কা করে দিলেন। একদিন হযরত ওরওয়া (রাঃ) বলেন, খালা আম্মাকে আমি সত্তর হাজার স্বর্ণ মুদ্রা সদ্‌কা করতে দেখেছি, অথচ তখনও তাঁর পরণে ছিল তালিযুক্ত কাপড়।

হযরত আয়িশা (রাঃ)-কে সদ্‌কা থেকে বিরত রাখা

হযরত ইবনে যোবায়ের (রাঃ) হযরত আয়িশা (রাঃ)-এর ভাগ্নে। শৈশবে তিনিই আবদুল্লাহ ইব্‌নে যোবায়ের (রাঃ)-কে প্রতিপালন করেন। তাই তাঁকে খুব স্নেহ করতেন। হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌নে যোবায়ের (রাঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর মুক্ত হস্তে সর্বস্ব দান করার উপর পেরেশান হয়ে বললেন, খালা আম্মা এভাবে দান খয়রাতের দরুন হযত কষ্ট পেতে পারেন। কাজেই যেকোন ভাবে দানের হাতকে বন্ধ করতে হবে। ঘটনাক্রমে এ উক্তি হযরত আয়িশা (রাঃ)-এর কানে পৌছলে ইব্‌নে যোবায়ের তাঁর দানের হাত বন্ধ করতে চায় এ দুঃখে অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে কসম খেয়ে বসলেন, বাকী জীবনে কখনও তার সাথে কথা বলবেন না। এ কসমের শুনে ইব্‌নে যোবায়ের (রাঃ)-এর মনে ভীষণ আঘাত লাগল। তিনি খালা আম্মার অসন্তুষ্টি দূর করার জন্য বহু লোক দ্বারা সুপারিশ করালেন, কিন্তু হযরত আয়েশা (রাঃ) নিজের কসমের কথা উল্লেখ করে ক্ষমা করলেন না। অবশেষে হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে যোবায়ের (রাঃ) যার পর নাই

পেরেশান হয়ে রাসূল (সাঃ)-এর নানার বংশের দু'জন প্রভাবশালী ব্যক্তিকে সুপারিশের জন্য সাথে নিয়ে খালার কাছে গেলেন। তাঁরা দু'জন অনুমতি নিয়ে ঘরে প্রবেশ করলেন এবং ইবনে যোবায়েরও তাঁদের সাথে চুপে চুপে ঘরে ঢুকে গেলেন। হযরত আয়িশা (রাঃ) পর্দার ভিতর থেকে যখন এ দু'ব্যক্তির সাথে কথা বলেছিলেন, তখন হঠাৎ ইবনে যোবায়ের পর্দার ভিতর ঢুকে গেলেন এবং খালাকে জড়িয়ে ধরে ভীষণ ক্রন্দন করতে লাগলেন এবং খালাকে মানানোর জন্য খোশামোদ করতে লাগলেন। মুসলমানদের সাথে কথা বর্জন করা সম্পর্কিত রাসূল (সাঃ)-এর হাদীস সমূহ শুনাতে লাগলেন। হযরত আয়িশা (রাঃ) রাসূল (সাঃ) বাণীসমূহ শুনে কাঁদতে লাগলেন। অবশেষে তাঁকে ক্ষমা করে দিয়ে কথা শুরু করলেন। কিন্তু কসমের কাফ্‌ফারা তিনি আদায় করলেন। পরবর্তী জীবনে যখনই সে কসম ভঙ্গ করার কথা মনে হত এত বেশী ক্রন্দন করতেন যে, চোখের পানিতে উড়না ভিজে যেত। –(বুখারী)

এখনে চিন্তার বিষয় হল যে, আমরা সকাল থেকে সন্ধা পর্যন্ত কত শত কসম খেয়ে থাকি, কিন্তু যাঁদের কাছে আল্লাহ্‌র নামের মর্যাদা ও তাঁর নাম নিয়ে কসম করার গুরুত্ব রয়েছে একমাত্র তাঁরাই অনুধাবন করতে পারেন ওয়াদা ভঙ্গ করলে অন্তরে কিরূপ আঘাত লাগে?

ওয়াদা ভঙ্গকারীদের পরিণতি

আল্লাহ্ বলেছেনঃ "তোমরা ওয়াদা পালন কর। নিশ্চয়ই ওয়াদা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে।" আল্লাহ্ যা কিছু আদেশ করেছেন এবং যা কিছু করতে নিষেধ করেছেন, তার সবই ওয়াদার অন্তর্ভূক্ত। কেননা এসব পালনে মুসলমানরা আল্লাহ্‌র সাথে ওয়াদাবদ্ধ। আল্লাহ্ আরো বলেছেনঃ "হে মুমিনগণ! তোমরা চুক্তি পালন কর।"

হযরত ইবনে আব্বাস বলেনঃ চুক্তির অর্থ যা কিছু কুরআনে হালাল ও হারাম করা হয়েছে এবং যা কিছু নিয়ন্ত্রিত ও সীমিত করা হয়েছে। মুকাতিল বলেনঃ চুক্তি অর্থ কুরআনের মাধ্যমে বান্দার ওপর আরোপিত হালাল ও হারাম এবং বৈধ ও অবৈধ সংক্রান্ত আল্লাহ্‌র বিধান এবং মুসলমান ও কাফেরদের মধ্যে ও সাধারণ মানুষের মধ্যে সম্পাদিত যাবতীয় চুক্তি, অংগীকার ও প্রতিশ্রুতি। রাসূল (সাঃ) বলেছেনঃ চারটি দোষ যার মধ্যে থাকবে সে পুরোপুরি মুনাফিক। আর যার মধ্যে এর কোন একটি দোষ থাকবে, তার মধ্যে মুনাফেকরীর একটা উপাদান থাকবে যতক্ষণ সে তা বর্জন না করেঃ যখন সে কথা বলে তখন মিথ্যা

বলে, যখন তার কাছে কোন জিনিস আমানত, গচ্ছিত রাখা হয়, তখন সে সে তা ভংগ করে এবং যখন কারো সাথে তার বিরোধ দেখা দেয়, তখন সে সীমা ছড়িয়ে যায়। (বুখারী ও মুসলিম) একটি হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ্ বলেনঃ তিন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কিয়ামতের দিন আমি বাদী হবঃ যে ব্যক্তি ওয়াদা করে। যে ব্যক্তি কোন স্বাধীন ব্যক্তিকে বিক্রী করে তার মূল্য ভোগ করে এবং যে ব্যক্তি কোন কর্মচারী নিয়োগ করে তার কাছ থেকে পুরো কাজ আদায় করে কিন্তু তার পারিশ্রমিক দেয় না। (বুখারী)। রাসূল (সাঃ) আরো বলেন, যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মারা যায় যে, সে কোন অঙ্গীকার আবদ্ধ নয় সে জাহেলী মৃত্যু বরণ করে। -(মুসলিম)

হযরত অয়িশা (রাঃ)-এর আল্লাহ্‌ভীতি

রাসূল (সাঃ) হযরত আয়িশা (রাঃ)-কে কতটুকু ভালবাসতেন তা কারো অজানা নেই। এমন কি কোন একজন সাহাবী রাসূল (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি স্ত্রীগণের মধ্যে কাকে সবচেয়ে বেশী ভালবাসেন। রাসূল (সাঃ) উত্তর দিলেন, আয়িশাকে। হযরত আয়িশা (রাঃ) রাসূল (সাঃ)-এর সবচেয়ে প্রিয় স্ত্রী ছিলেন। তদুপরি শরীয়তের মাসআলা মাসায়েল সম্পর্কে তিনি এত সুদক্ষ ছিলেন যে, বড় বড় সাহাবায়ে কিরাম পর্যন্ত মাসায়েল শিক্ষা করার জন্য তাঁর শরণাপন্ন হতেন। হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ) তাঁকে সালাম করতেন। তিনি বেহেশতের মধ্যে রাসূল (সাঃ)-এর স্ত্রী থাকবেন এ সুসংবাদ তাঁকে দেয়া হয়েছে। মোনাফিকরা তাঁর উপর যে অপবাদ দিয়েছিল তা খন্ডন করে কুরআন মাজীদে তাঁর পবিত্রতার উপর আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি নিজে বলেন, দশটি বিশেষ কারণে আমি রাসূল (সাঃ)-এর অন্যান্য স্ত্রীগণ থেকে শ্রেষ্ঠ। তাঁর মুক্ত হস্তে দান খয়রাতের বহু কাহিনী হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে। এতসব গুণের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও সর্বদা আল্লাহ্‌র ভয়ে এত বেশী জড়সড় থাকতেন যে, অধিকাংশ সময় বলতেন, হায় আফসোস্! আমি যদি বৃক্ষ হতাম তবে সর্বদা আল্লাহ্‌র তাসবীহ পড়তে থাকতাম এবং পরকালে আমাকে হিসাব দিতে হত না। কখনও বলতেন, হায়! আমি যদি পাথর হতাম! কখনো কখনো বলতেন, হায়! আমি যাদি মাটির ঢিলা হতাম অথবা আমি যদি গাছের পাতা হতাম কিংবা কোন তৃণলতা হতাম। আল্লাহ্‌ভীতির এরূপ অপূর্ব নিদর্শন একমাত্র তাঁদের নসীবেই লেখা ছিল।

উম্মে সালমা (রাঃ)-এর জন্য স্বামীর দোয়া ও হিযরত

উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) রাসূল (সাঃ) এর স্ত্রীর হওয়ার পুর্বে আবু সালমা নামক সাহাবীর স্ত্রী ছিলেন। স্বামী আবু সালমার সাথে তাঁর আফুরন্ত ভালবাসা ছিল। তার নিদর্শন একটি ঘটনা থেকে পাওয়া যায় যে, একবার উম্মে সালমা (রাঃ) আবু সালমা (রাঃ)-কে বললেন, আমি শুনেছি স্বামী স্ত্রী উভয়ে জান্নাতী হলে, স্ত্রী যদি দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ না করে থাকে, তাহলে সে নিজের স্বামীকে পাবে। তদ্রুপ স্বামী যদি দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ না করে তাহলে, সেও নিজের স্ত্রীকে পাবে। হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) আবু সালমা (রাঃ) কে এ কথা বলার পর বললেন, আসুন আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই যে, আমাদের যে কেহ আগে মৃতুবরণ করলে অপরজন আর দ্বিতীয় বিবাহ করব না। এর উত্তরে হযরত আবু সালমা (রাঃ) বললেন, তুমি কি আমার কথা শুনবে? তিনি বললেন, আমি তো আপনার কথা শুনার জন্যই পরামর্শ করছি। হযরত আবু সালমা (রাঃ) বললেন, আমি আগে মারা গেলে তুমি অন্য স্বামী গ্রহণ করে নিও। অতঃপর তিনি দোয়া করলেন, হে আল্লাহ্! আমার পর উম্মে সালমাকে আমার চেয়ে উত্তম স্বামী দিও। যে স্বামী তাকে কোনরূপ কষ্ট দিবেনা।

আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর দোয়া কবুল করেছেন এবং তাঁর মৃত্যুর পর উম্মে সালমা (রাঃ) রাসূল (সাঃ)-এর স্ত্রী হওয়ার সৌভাগ্য দান করেন। রাসূল (রাঃ) এর সাথে বিবাহের পূর্বে তিনি স্বামী আবু সালমার সাথে হিযরত কিভাবে করেন (উম্মে সালমা (রাঃ) তাঁর বর্ণনা এভাবে দিয়েছেন। আবু সালমা (রাঃ) যখন হিযরতের ইচ্ছা করেন, তখন আমাকেও একমাত্র ছেলে সালমাকে উটের উপর বসিয়ে তিনি নিজের উটের লাগাম ধরে টেনে চললেন। আমার আত্মীয় বণী মুগীরার লোকেরা তা দেখে আবু সালমাকে বলল, তুমি নিজের ব্যাপারে স্বাধীন; কিন্তু আমাদের মেয়েকে শহরে শহরে ঘুরানোর জন্য তোমার সাথে দিতে পারি না। এ কথা বলে তারা আবু সালমার হাত থেকে উটের রুজ্জু জোরপূর্বক ছিনিয়ে নিয়ে আমাকে বাড়ী ফিরে যেতে বাধ্য করল। এদিকে আমার শুশুরালয়ের বনী আবদুল আসাদের লোকজন এসে আমার বংশীয় আত্মীয়দের সাথে ঝগড়া বাঁধিয়ে দিল যে, তোমরা তোমাদের মেয়েকে রাখতে পার কিন্তু আমাদের বংশের ছেলে সালমাকে তোমাদের কাছে রাখব না। এ বলে তারা সালমাকে আমার কোল থেকে কেড়ে নিল। এরপর স্বামী একাই হিযরত করে মদীনায় চলে গেলেন।

এভাবে আমরা স্বামী-স্ত্রী পুত্র তিনজন তিন জায়গায় থেকে বিচ্ছেদের আগুনে জ্বলতে লাগলাম। স্বামী মদীনায়, আমি পিত্রালয়ে আর ছেয়ে তার দাদার বাড়ীতে। আমার অবস্থা এরূপ ছিল যে, আমি দুঃখে শোকে জর্জরিত হয়ে প্রত্যেহ ময়দানের দিকে বের হয়ে যেতাম এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত সেখানে শুধু ক্রন্দন করতাম। এভাবে বিচ্ছেদের অনলে জ্বলে পুড়ে দীর্ঘ একটি বছর কেটে গেল। আমাকে এভাবে ক্রন্দনাবস্থায় দেখে আমার এক চাচাত ভাইয়ের মনে দয়ার উদ্রেক হল। সে আমার বংশের লোকদের কাছে বলল, এ বেচারীর জন্য কি তোমাদের একটুও দয়া হয় না?

সে আমাকে মদীনায় আমার স্বামীর কাছে পাঠানোর ব্যাপারে তাঁদের সাথে কথাবার্তা বলল, অবশেষে তারা এতে রাজী হয়ে আমাকে বলল, তুমি ইচ্ছা করলে স্বামীর কাছে মদীনায় চলে যেতে পার। আমি মদীনায় যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলাম। এটা শুনে আমার শ্বশুরালয়ের লোকেরা আমার ছেলে সালমাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিল।

আমি একটি উট সংগ্রহ করে ছেলেকে কোলে নিয়ে একাকী মদীনায় পথে রওয়ানা হয়ে গেলাম। তিন চার মাইল পথ অতিক্রম করার পর তানঈম নামক স্থানে হযরত ওসমান ইবনে তালহা (রাঃ) নামক সাহাবীর সাথে সাক্ষাত হল। তিনি বললেন, আপনি একাকী কোথায় যাচ্ছেন? আমি বললাম, আমার স্বামীর কাছে মদীনায় যাচ্ছি। তিনি বললেন আপনার সাথে আর কে আছে? আমি বললাম, আল্লাহ্ ছাড়া আমার আর কেহ নেই।

এ কথা শুনে তিনি আমার উটের লাগাম ধরে আগে আগে রওয়ানা হলেন। আল্লাহ্র কসম! হযরত ওসমানের মত উত্তম লোক আমি আর কোন দিন দেখিনি। যখন আমি কোথাও অবতরণ করার ইচ্ছা করতাম তখন তিনি লাগাম ছেড়ে দূরে গিয়ে গাছের আড়ালে দাড়িয়ে থাকতেন। আবার যখন উটের উপর আরোহনের সময় হত তখন তিনি আসবাবপত্র সহ উটকে আমার কাছে বসিয়ে দিতেন। আমি সওয়ার হওয়ার পর পুনরায় উটের রুজ্জু ধরে তিনিও পথ চলা শুরু করতেন। এভাবেই আমরা মদীনায় পৌঁছে যাই। তখন পর্যন্ত আমার স্বামী আবু সালমা (রাঃ) কোবাতেই অবস্থান করছিলেন। সেখানেই তাঁর সাতে আমাদের সাক্ষাত হয়ে যায়। হযরত ওসমান (রাঃ) আমাকে স্বামীর কাছে পৌঁছিয়ে মক্কায় ফিরে আসেন। আল্লাহ্র কসম! তাঁর চেয়ে ভাল মানুষ আমি

কখনও দেখিনি। সে সময় স্বামী পুত্র হারিয়ে তাঁদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আমি যতটুকু দুঃখ কষ্ট ভোগ করেছি সেরূপ দুঃখ কষ্ট জীবনে কেহ পায়নি।

আল্লাহ্র উপর কতটুকু ভরসা থাকলে একাই হিযরতের উদ্দেশ্যে বের হওয়া যায়। বস্তুতঃ যাঁরাই আল্লাহ্র তায়ালার উপর ভরসা করে তাঁদেরকেই আল্লাহ্ এভাবেই সাহায্য করেন।

হযরত উম্মে যিয়াদ (রাঃ)-এর খায়রার যুদ্ধে অংশগ্রহণ

রাসূল (সাঃ)-এর যুগে পুরুষগণ যেভাবে অদম্য আগ্রহের সাথে জিহাদে অংশগ্রহণ করতেন, তদ্রূপ নারীগণও যুদ্ধে অংশগ্রহণের ব্যাপারে পিছিয়ে ছিলেন না। বরং সুযোগ পেলেই তাঁরা যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছে যেতেন। হযরত উম্মে যিয়াদ (রাঃ) বলেন, আমরা ছয়জন মহিলা খায়বারের যুদ্ধে শরীক হই। আমাদের অংশগ্রহণের বিষয়টি জানতে পেরে রাসূল (সাঃ) আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমি যখন খিদমতে হাযির হলাম তখন তিনি (সাঃ)-এর মোবারক চেহারায় কিছুটা ক্রোধের চিহ্ন দেখতে পেলাম। রাসূল (সাঃ) বললেন, তোমরা কার হুকুমে এখানে এসেছ এবং কার সাথে এসেছ? উত্তরে আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি পশম বুনতে পারদর্শী যা যুদ্ধের সময় অপরিহার্য। তাছাড়া আহতদের জন্য জখমের ঔষধ আমাদের সাথে রয়েছে। আর কিছু করতে না পারলেও মুজাহিদীনদের জন্য তীর তো কুড়িয়ে দিতে পারব। কেহ অসুস্থ হলে তার সেবা করতে পারব। তাঁদেরকে ছাতুগুলে খাওয়াতে পারব। আমার এসব কথা শুনে রাসূল (রাঃ) আমাদেরকে অংশগ্রহণের অনুমতি দিলেন। -(আবু দাউদ)

সে যুগে মেয়েদের মধ্যে যেরূপ জিহাদী প্রেরণা ছিল আজকাল পুরুষদের মধ্যেও তা পরিলক্ষিত হয় না।

হযরত উম্মে হারাম (রাঃ)-এর আকাংখা

হযরত উম্মে হারাম (রাঃ) হযরত আনাস (রাঃ) এর খালা ছিলেন। রাসূল (সাঃ) অধিকাংশ সময় তাঁর ঘরে গিয়ে দুপুরে বেলায় আরাম করতেন। এক দিন রাসূল (সাঃ) আরাম করা অবস্থায় উম্মে হারাম (রাঃ) রাসূল (সাঃ)-কে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার মাতা-পিতা আপনার উপর কুরবান হোক, আপনি কেন হাসলেন? উত্তরে রাসূল (সাঃ) বললেন, আল্লাহ্ তায়ালা এখন আমাকে দেখালেন যে, আমার উম্মতের কিছু মুজাহিদ সামুদ্রিক অভিযানে এভাবে যাচ্ছে যে, যেমন সিংহাসনে উপবিষ্ট কোন বাদশাহ্। তখন হযরত উম্মে হারাম (রাঃ)

আরয করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! দোয়া করুন আমিও যেন সে অভিযানে শরীক হতে পারি। রাসূল (সাঃ) বললেন, তুমি তাঁদের মধ্যেই থাকবে। অতঃপর রাসূল (সাঃ) কিছুক্ষণ আরাম করার পর পুনরায় হেসে উঠলেন। হযরত উম্মে হারাম পুনরায় হাসির কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি (সাঃ) পূর্বের ন্যায় উত্তর দিলেন। হযরত উম্মে হারাম (রাঃ) আবার আরয করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! দোয়া করুন আমি যেন, তাদের দলভুক্ত হতে পারি। রাসূল (সাঃ) বললেন, তুমি প্রথম দলে শরীক হবে। রাসূল (সাঃ) ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে হযরত ওসমান (রাঃ)-এর খিলাফত যুগে সিরিয়ার শাসনকর্তা হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) সাইপ্রাস আক্রমণ করার অনুমতি চাইলেন। হযরত ওসমান (রাঃ) অনুমতি দিলেন। তারপর হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) একটি সৈন্য বাহিনী নিয়ে সাইপ্রাস আক্রমণ করেন। সামুদ্রিক এ অভিযানে হযরত উম্মে হারাম (রাঃ) ও শরীক ছিলেন। এভাবে হযরত উম্মে হারাম (রাঃ) সম্পর্কে রাসূল (সাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে পূরণ হয়েছিল। এ অভিযান থেকে ফেরার পথে খচ্চরের পিঠ থেকে পড়ে হযরত উম্মে হারাম (রাঃ)-এর গাড় ভেঙ্গে যায় এবং তিনি শাহাদত বরণ করেন। আর সেখানেই তাঁকে দাফন করা হয়। এখানে লক্ষ্যনীয় যে একজন নারী হয়ে যুদ্ধে শরীক হওয়ার জন্য কি অদম্য স্পৃহাই না ছিল তাঁর।

স্বামীর সন্তুষ্টি অর্জন

হযরত আনাস (রাঃ)-এর মাতা হযরত উম্মে সালীম (রাঃ)-এর স্বামীর মৃত্যুর পর হযরত আবু তালহা (রাঃ)-এর সাথে দ্বিতীয় বিবাহ হয়। সে ঘরে আবু ওমায়ের নামে একটি ছেলে জন্ম হয়। রাসূল (সাঃ) যখন তাঁদের ঘরে যেতেন তখন আবু ওমায়ের নিয়ে হাসি খুশী করতেন। হঠাৎ একদিন ছেলেটি মারা যায়। মৃত্যুর পর হযরত উম্মে সালীম (রাঃ) গোসল করিয়ে চৌকির উপর শোয়ায়ে রাখেন এবং নিজে খুব সেজে গুজে খুশবু লাগিয়ে স্বামীর আসার অপেক্ষা করেন। হযরত আবু তাহলা (রাঃ) রাত্রি বেলায় ঘরে ফিরে যখন ছেলের কথা জিজ্ঞেস করলেন, তখন উম্মে সালীম (রাঃ) বললেন, এখন একটু আরামে আছে, মনে হয় একেবারে সুস্থ হয়ে গেছে। অতঃপর স্বামী স্ত্রী উভয়ে শুয়ে পড়লেন এবং মিলনও হল। ভোরে হযরত উম্মে সালীম (রাঃ) স্বামীকে বললেন, একটি কথা জিজ্ঞেস করার ছিল। আর কথাটা হল এ যে কোন ব্যক্তি কারো কাছে কোন কিছু আমানত রাখে এবং পরে যদি তা ফেরত চায়, তবে তার

জিনিস তাকে ফেরত দেয়া উচিত কি না? স্বামী বললেন, নিশ্চয়ই ফেরত দেয়া উচিত। এরূপ জিনিস ফেরত না দেয়ার কি অধিকার আছে? এ কথা শুনে হযরত উম্মে সালীম (রাঃ) বললেন, তোমার ছেলে যা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আমানত স্বরূপ ছিল তা আল্লাহ্ তাআলা নিয়ে গেছেন। এভাবে ছেলের মৃত্যুর সংবাদ শুনে হযরত আবু তালহা (রাঃ) কিছুটা দুঃখিত হয়ে বললেন, তুমি প্রথমেই আমাকে বলনি কেন? তিনি সকাল বেলায় রাসূলূল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে সমস্ত ঘটনা বিস্তারিত খুলে বললেন। রাসূল (সাঃ) এ মর্মান্তিক ঘটনা শুনে খুশী হয়ে দোয়া করে বলেন, হয়ত আল্লাহ্ তায়ালা এ রাতে তোমাদের জন্য বরকত রেখেছেন। একজন আনসারী সাহাবী বর্ণনা করেন, রাসূল (সাঃ)-এর দোয়ার বরকতে সে রাতে হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে তালাহা (রাঃ) মাতৃগর্ভে যান। পরবর্তীতে হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে তালহা (রাঃ)-এর নয়টি ছেলে সন্তান হয়েছিল আর সবাই ছিলেন কুরআনের হাফিয।

কত বড় ধৈর্যের কথা। পুত্রের মৃত্যুশোক সহ্য করে স্বামীকে কষ্ট থেকে বাঁচালেন। কেননা খবর পেলে স্বামী না খেয়ে কষ্ট পেতেন।

উম্মে হাবীবা (রাঃ)-এর কুফুরের প্রতি ঘৃণা

উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে হাবীবা (রাঃ) রাসূল (সাঃ)-এর স্ত্রী হওয়ার পূর্বে আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে জাহানের স্ত্রী ছিলেন। তাঁরা স্বামী-স্ত্রী একত্রে মুসলমান হয়ে আবিসিনিয়ায় হিযরত করেন। সেখানে তাঁর স্বামী মুরতাদ হয়ে ইসলাম ধর্ম ত্যাগ কাফের অবস্থায় মারা যায়। হযরত উম্মে হাবীবা (রাঃ) সেখানে বিধবা অবস্থায় দিন অতিবাহিত করেছিলেন।

এ সংবাদ শুনে রাসূল (সাঃ) হাবশার বাদশাহার মারফত হযরত উম্মে হাবীবার সাথে নিজের বিয়ের প্রস্তাব পাঠালে তিনি রাজী হয়ে যান এবং বাদশাহ নিজে এ বিবাহ পড়িয়ে দেন। বিয়ের পর তিনি মদীনায় চলে আসেন। তাঁর পিতা আবু সুফিয়ান হোদাবিয়ার সন্ধির পর এ সম্পর্কিত কিছু কথা বলার জন্য মদীনায় আসলে, হযরত উম্মে হাবীবা (রাঃ)-এর সাথে সাক্ষাত হয়। উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে হাবীবা (রাঃ)-এর ঘরে গিয়ে সে বিছানায় বসতে চাইলে তিনি উক্ত বিছানায় পিতাকে বসতে দেননি। এতে আবু সুফিয়ান আশ্চর্য হয়ে বলে আমি কি এ বিছানার উপযুক্ত নই? উত্তরে তিনি পিতাকে বললেন এটা রাসূল (সাঃ)-এর পবিত্র বিছানা। সুতরাং আপনি কাফির ও নাপাক হয়ে কি করে এর মধ্যে বসতে পারেন? এতে আবু সুফিয়ান খুবই দুঃখিত হয়ে বলল, আমার

থেকে পৃথক হওয়ার পর তুমি পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছ। উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে হাবীবা (রাঃ)-এর অন্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর মর্যাদা এভাবেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

আসমানী বিবাহ

উম্মুল মুমিনীন হযরত যয়নব বিনতে জাহাশ (রাঃ) ছিলেন রাসূল (সাঃ) এর কুফাত বোন। তিনি ছিলেন ইসলামে প্রাথমিক যুগের মুসলমান। প্রথমে হযরত যায়েদ (রাঃ)-এর সাথে তাঁর বিবাহ হয়। হযরত যায়েদ (রাঃ) রাসূল (সাঃ)-এর মুক্তি প্রাপ্ত ক্রীতদাস ও পৌষ্যপুত্র ছিলেন। তিনি যয়নব (রাঃ)-কে তালাক দিয়ে দেন। জাহেলিয়াত যুগে পৌষ্যপুত্রকে ঔরসজাত সন্তানের ন্যায় মনে করা হত। তাই ছেলের তালাক প্রাপ্ত স্ত্রীকে অর্থাৎ পৌষ্যপুত্র বধুকে বিবাহ করা নিষিদ্ধ ছিল। এ কুসংস্কারকে খন্ডন করার লক্ষ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) নিজের জন্য হযরত যয়নব (রাঃ)-এর কাছে বিয়ের প্রস্তাব পাঠালে হযরত যয়নব (রাঃ) বললেন, আমি আমার প্রতিপালকের সাথে একটু পরামর্শ করার কথা বলে নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন। এ সময় আল্লাহ্ তায়ালা কুরআন কারীমে আয়াত নাযিল করে রাসূল (সাঃ)-এর সাথে হযরত যয়নব (রাঃ) এর বিবাহের ঘোষণা দিয়ে দিলেন।

যখন হযরত যয়নব (রাঃ)-কে যখন এ আয়াত নাযিল হওয়ার সুসংবাদ দেয়া হল, তখন আল্লাহ্র শোকরিয়া আদায়ার্থে সিজদায় লুটিয়ে পড়ে এবং দু' মাস রোযা রাখার মানত করলেন। হযরত যয়নব (রাঃ)-এর জন্য নিশ্চয় গৌরবের বিষয় ছিল যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর অন্যান্য সমস্ত স্ত্রীগণের বিবাহ আত্মীয় স্বজনগণ পড়িয়েছেন কিন্তু তাঁর বিবাহ আসমানে হয়েছে অর্থাৎ কুরআন মজীদে এ বিবাহ সম্পর্কে আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে, আল্লাহ্ তায়ালা স্বয়ং বলেন, (হে নবী!) আমি স্বয়ং যয়নবকে আপনার সাথে বিবাহে দিয়ে দিলাম। এ কারণেই তিনি হযরত আয়িশা (রাঃ)-কে বলতেন, তোমার গৌরবের বিষয় হল এ যে, তুমি রাসূল (সাঃ)-এর সবচেয়ে প্রিয় স্ত্রী আর আমার গৌরবের বিষয় হল যে, তোমার বিয়ে জমীনে হয়েছে আর আর বিয়ে হয়েছে আসমানে।

হযরত খান্সা (রাঃ)-এর চার পুত্রসহ যুদ্ধে অংশগ্রহণ

হযরত খান্সা (রাঃ) বিখ্যাত মহিলা কবি ছিলেন। তিনি স্বগোত্রীয় কিছু সংখ্যক লোকসহ মদীনায় এসে মুসলমান হন। ইব্নে আসীর বলেন, ঐতিহাসিকগণ এ বিষয়ে একমত হয়েছেন যে, হযরত খান্সা (রাঃ) থেকে উত্তম

কবিতা আর কোন নারী লিখেনি, তাঁর পূর্বেও না, আর পরেও না। হযরত ওমর (রাঃ)-এর খিলাফতের যুগে ১৬ হিজরীতে কাদেসীয়ার প্রসিদ্ধ যুদ্ধ সংগঠিত হয় যার মধ্যে হযরত খান্সা (রাঃ)-তাঁর চার পুত্রসহ অংশগ্রহণ করেন। যুদ্ধে যাওয়ার একদিন পূর্বে তিনি ছেলেদেরকে নসীহত করেন, তারা যেন বীর বিক্রমে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে, হে আমার সন্তানেরা! তোমরা স্বেচ্ছায় মুসলমান হয়ে হিযরত করেছ, সে পবিত্র সত্ত্বার কসম! যিনি একমাত্র উপাস্য, যেভাবে তোমরা মায়ের উদর থেকে জন্মগ্রহণ করেছ, তদ্রুপ তোমরা একই পিতার সন্তান। আমি আমার চরিত্রের মধ্যে তোমাদের পিতার খিয়ানত করিনি অথবা আমি তোমাদের মামাদেরকেও অপমানিত করিনি। তোমাদের বংশগত মর্যাদায় কোন ত্রুটি নেই। তোমাদের জানা উচিত, কাফের-মুশরিকদের সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণের কি কি সওয়ার নিহীত রয়েছে। তোমাদের এ কথাও জানা আছে যে, আখিরাতের চিরস্থায়ী জীবন, দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবন থেকে অনেক উত্তম। আল্লাহ্ তায়ালার ইরশাদ করেন–"হে মুমিনগণ! তোমরা সব ধরনের কষ্টে ধৈর্যধারণ কর, বিশেষভাবে রণক্ষেত্রে ধৈর্যধারণ কর আর কাফের মুশরিকদের সাথে যুদ্ধের জন্য সদা প্রস্তুত থাক। তবে তোমরা পরিপূর্ণ সফলকাম হবে।" অতএব আগামী কাল যখন যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু হবে, মোকাবেলা যখন প্রবল থেকে প্রবলতর হতে থাকবে তখন তোমরা কাফেরদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্র সাহায্য প্রার্থনা করতে করতে যুদ্ধক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে শত্রুদের ভীড়ে ঢুকে কাফেরদের সরদারের সাথে মোকাবেলা করবে। ইন্শাআল্লাহ্ তোমরা সফলকাম হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

সুতরাং পরের দিন যখন তুমুল যুদ্ধ শুরু হল তখন চার ভাইয়ের মধ্যে এক একজন মায়ের নসীহতগুলো পাঠ করতে করতে আগ্রসর হত আর বীর বিক্রমে শত্রুর মোকাবিলা করত। একজন শহীদ হয়ে গেলে অপরজন মায়ের নসীহত গুলো আবৃত্তি করে করে মধ্যে শক্তি সঞ্চার করত আর বীর বিক্রমে শত্রুদের ভীরে ঢুকে মোকাবিলা করত এবং শহীদ না হওয়া পর্যন্ত ক্ষান্ত হত না। এভাবেই একের পর এক চার ভাই শাহাদাত বরণ করলেন। যখন হযরত খান্সা (রাঃ)-এর কাছে তাঁর চারপুত্রের শাহাদাতের সংবাদ পৌছল, তখন তিনি আল্লাহ্র শোকরিয়া আদায় করে বললেন, তিনিই ছেলেদের শহীদ হওয়ার দ্বারা আমাকে সম্মানীত করেছেন। আমি আশাবাদী যে, আল্লাহ্ তায়ালা চার ছেলের সাথে আমাকেও তাঁর রহমতের ছায়াতলে আশ্রয় দিবেন।

উপলব্ধি করায় বিষয় তাঁরা কেমন মা ছিলেন। চারটি ছেলে একই যুদ্ধে শহীদ হল, তাতেও আল্লাহ্‌র শোকরিয়া আদায় করলেন এবং নিজেকে ধন্য মনে করলেন।

হযরত সফিয়্যাহ (রাঃ) ও এক ইয়াহুদী হত্যা

হযরত সফিয়্যাহ (রাঃ) রাসূল (সাঃ)-এর আপন ফুফু আর হযরত হামযা (রাঃ)-এর আপন বোন ছিলেন। তিনি ওহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। রাসূল (সাঃ) খন্দকের যুদ্ধে সকল মহিলাদেরকে একটি দূর্গের মধ্যে আবদ্ধ করে সখানে হযরত হাস্‌সান ইবনে সাবিত (রাঃ)-কে তাঁদের প্রহরী নিযুক্ত করেন। ইসলামের চির শত্রু ইয়াহুদীরা কেল্লার ভিতর শুধু মহিলাদের অবস্থান জানতে পেরে আর এটাকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করে হামলার পরিকল্পনা করে। এ উদ্দেশ্যে কেল্লার ভিতরের অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য এক ইয়াহুদী কে নিয়োগ করে। হযরত সফিয়্যাহ্ (রাঃ)- তাবুর একটি খুঁটি হাতে নিয়ে তার মাথায় সজোরে আঘাত করে চূর্ণবিচূর্ণ করে হযরত হাস্‌সান (রাঃ)-কে বললেন, তার মস্তক কেটে নিয়ে কেল্লার দেওয়ালেরর উপর দিয়ে যেখানে ইয়াহুদীরা সমবেত ছিল সেখানে নিক্ষেপ করতে। এ দৃশ্য দেখে ইয়াহুদীরাও বলাবলি করতে লাগল, আমরা পূর্বেই ভেবেছি, মুহাম্মদ দূর্গের ভিতর শুধু মহিলাদেরকে একা রেখে যাননি। নিশ্চয় তাঁদের সাথে পুরুষ রক্ষীরা রয়েছে।

হযরত সহিয়্যাহ্ (রাঃ) ২০ হিজরীতে ৭৩ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। খন্দকের যুদ্ধ ৫ম হিজরীত অনুষ্ঠিত হয়। এ বয়সে একাই একজন শক্তিশালী পুরুষকে হত্যা করা কতটুকু সাহসের প্রয়োজন তা সহজেই অনুমান করা যায়।

নারীদের নেকী সম্পর্কে প্রশ্ন

হযরত আসমা বিনতে ইয়াযিদ (রাঃ) একদিন রাসূল (সাঃ)-এর খিদমতে হাযির হয়ে আরয করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার মাতা-পিতা আপনার উপর কুরবান। আমি মুসলিম রমনীদের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি হিসাবে এসেছি। আল্লাহ্ তায়ালা আপনাকে নিঃসন্দেহে নারী-পুরুষ উভয়ের প্রতি নবী হিসাবে প্রেরণ করেছেন। আর এ জন্য আমরা নারী সমাজ আপনার এবং আল্লাহ্‌র উপর ঈমান এনেছি। আমরা পর্দার মধ্যে থেকে বাড়ী ঘর দেখা শোনা করি। আমাদের মাধ্যমে তাঁদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করা হয়, তাদরে সন্তানদেরকে আমরা গর্ভে ধারণ করে থাকি। এসব কিছু সত্ত্বেও পুরুষরা অনেক ক্ষেত্রে আমাদের তুলনায় নেক কাজে অগ্রগামী। যেমন ঃ তারা জুমার নামাযে শরীক হয়, পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে

জামাতে শরীক হয়, রুগী দেখতে যায়, জানায়ায় শরীক হয়, হজ্বের পর হজ্ব করতে থাকে, তদুপরি তারা জিহাদের অংশগ্রহণ করে। যখন তারা হজ্বে বা ওরমায় কিংবা জিহাদে যায় তখন আমরা নারীরা তাদের বাড়ী ঘর ও মাল আসবাবের হিফাযত করে সংসারের নানান কাজে লিপ্ত থাকি। এখন প্রশ্ন হল- আমরা কি তাদের নেক আমল সমূহের সওয়াবের মধ্যে অংশীদার হব না?

রাসূল (সাঃ) এ প্রশ্ন শুনে সাহাবায়ে কিরামদের দিকে মুখ করে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি কখনও দ্বীন সম্পর্কে এ মহিলার চেয়ে উত্তম প্রশ্ন করতে কখনও শুনেছ? সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ)-গণ আরয করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাদের ধারণাও ছিল না যে, কোন নারী এরূপ প্রশ্ন করতে পারে? তারপর রাসূল (সাঃ) হযরত আসমা (রাঃ) এর দিকে মুখ করে ইরশাদ করলেন, মনযোগ দিয়ে শুনে বুঝে নাও এবং যে সকল মহিলারা তোমাকে পাঠিয়েছেন তাঁদেরকে বলে দাও যে, স্বামীর সাথে উত্তম ব্যবহার করা এবং তাঁর সন্তুষ্টি তালাশ করা, যে কাজে স্বামী সন্তুষ্ট সে অনুযায়ী আমল করা এসব আমলের নেকীর সমান। হযরত আসমা (রাঃ) এ জওয়াব শুনে অত্যন্ত সন্তুষ্টচিত্তে ফিরে গেলেন।

নিজের স্বামীর সাথে উত্তম ব্যবহার করা, তাঁর অনুগত ও বাধ্যগত হয়ে জীবন যাপন করা অত্যন্ত উত্তম। কিন্তু এ যুগে স্ত্রীগণ এর থেকে অনেক উদাসীন। সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) একবার রাসূল (সাঃ)-এর কাছে আরয করলেন, অন্যান্য জাতীয় লোকেরা তাদের বাদশাহের সিজদা করে থাকে কিন্তু এ ব্যাপারে আপনি সবচেয়ে বেশী যোগ্য যে, আমরা আপনাকে সিজদা করি। রাসূল (সাঃ) এরূপ করতে নিষেধ করে বললেন, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকে সিজদা করার অনুমতি থাকলে আমি স্ত্রীগণকে হুকুম করতাম তারা যেন তাদের স্বামীগণকে সিজদা করে। অতঃপর রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেন, ঐ আল্লাহ্‌র কসম, যার কুদরতী হাতে আমার জীবন নারীরা ঐ পর্যন্ত তাদের রবের হক আদায়ে সক্ষম হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের স্বামীদের হক আদায় না করে।

অন্য একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, একবার একটি উট রাসূল (সাঃ)-এর কাছে এসে তাঁকে সিজদা করল, তখন সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এ উট একটি পশু হয়ে আপনাকে সিজদা করছে। অথচ আপনাকে সিজদা করার ব্যাপারে আমরাই বেশী উপযোগী। তখন রাসূল (সাঃ) এরূপ করতে নিষেধ করে বললেন, আমি যদি কাউকে সিজদা করার অনুমতি দিতাম, তবে স্ত্রীদেরকে নির্দেশ দিতাম যে, তারা যেন তাদের

স্বামীদেরকে সিজদা করে। একটি হাদীসে বর্ণিত আছে, যে স্ত্রী এরূপ অবস্থায় মৃত্যু বরণ করে যে, স্বামী তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট আছে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

একটি হাদীসে বর্ণিত আছে, যে স্ত্রী রাগ বশতঃ তার স্বামী থেকে পৃথক হয়ে রাত্রি যাপন করে, ফেরেশ্তারা সারা রাত তার উপর লা'নত বর্ষণ করতে থাকেন।

একটি হাদীসে বর্ণিত আছে, দু'জন ব্যক্তির দোয়া কুবল হওয়ার জন্য আসমানের দিকে (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নিকট) তার মাথা থেকে সামান্যতম উপরেও উঠে না। তম্মেধ্যে একজন হল ঐ কৃতদাস যে তার মুনিব থেকে পালিয়ে যায় আর দ্বিতীয় জন হল ঐ স্ত্রী যে তার স্বামীর অবাধ্য।

উম্মে আম্মারা (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণ

হযরত উম্মে আম্মারা (রাঃ) এ সকল আনসারী মহিলাদের মধ্যে অন্যতম যাঁরা ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় মুসলমান হয়েছেন। তিনি বাইয়াতুল আক্বাবায় শরীক ছিলেন। আক্বাবা শব্দের অর্থ ঘাঁটি। রাসূল (সাঃ) শুরুতে চুপে চুপে মুসলমান করতেন, কেননা তখন কাফের মুশরিকরা মুসলমানদের উপর কঠিন নির্যাতন করত। হজ্ব মৌসুমে মদীনা থেকে যেসব লোক মুসলমান হওয়ার জন্য মক্কায় আসতেন তাঁরা মিনায় পাহাড়ের ঘাটির মধ্যে চুপে চুপে মুসলমান হত। তৃতীয় বার যে দলটি মদীনা থেকে মুসলমান হওয়ার জন্য মক্কায় এসেছিলেন তার মধ্যে হযরত উম্মে আম্মারা (রাঃ)ও ছিলেন। হিযরতের পর যখন একের পর এক যুদ্ধ হতে লাগল, তখন তিনি অধিকাংশ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। বিশেষভাবে ওহুদ, হোদাইবিয়া, খায়বর, উমরাতুল কাযা, হোনাইন ও ইয়ামামার যুদ্ধে তিনি শরীক ছিলেন। ওহুদ যুদ্ধের কাহিনী তিনি নিজেই বর্ণনা করেন যে, আমি তৃষ্ণার্ত ও আহতদেরকে পানি পান করানোর জন্য মশক ভরে পানি নিয়ে ওহুদে যাই। তখন আমার বয়স ৪৩ বছর। আমার স্বামী ও ছেলে এ যুদ্ধে শরীক ছিল। প্রথম দিকে মুসলমানরা বিজয়ী হচ্ছিল।

কিন্তু পরবর্তীতে কাফেররা শক্তিশালী আক্রমণ করল, তখন আমি রাসূল (সাঃ)-এর কাছাকাছি চলে গেলাম। যখন কোন কাফের আক্রমণের উদ্দেশ্যে সেদিকে অগ্রসর হত, আমি তাকে হটিয়ে দিতাম। শুরুতে আমার কাছে ঢাল ছিল না, পরে যখন ঢাল সংগ্রহ হয়েছে তখন ঢালের মাধ্যমে আক্রমণ প্রতিহত করেছি। কোমরের মধ্যে একটি কাপড় বেঁধে রেখেছিলাম তাতে অনেক নেকড়া

ছিল। যখন কেহ আহত হত তখন নেকড়া পুড়ে ক্ষতস্থানে ভরে দিতাম। আমার নিজেরও বার তেরটি স্থানে জখম হয়েছিল। তন্মধ্যে একটি ছিল খুব গভীর। হযরত উম্মে সাঈদ (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি হযরত উম্মে আম্মারা (রাঃ)-এর কাঁধে একটা বড় ধরনের যখম দেখে জিজ্ঞেস করলাম, এত বড় যখমের ঘটনা কিভাবে ঘটেছিল? তিনি বললেন, ওহুদ যুদ্ধে লোকজন যখন এদিক সেদিক ছুটাছুটি করছিল তখন ইব্‌নে কুমাইয়্যাহ্ এ বলে রাসূল (সাঃ)-এর দিকে অগ্রসর হল যে, আমাকে বল মুহাম্মদ (সাঃ) কোথায়? আজ তিনি যদি বেঁচে যান, তাহলে আমার রক্ষা নেই।

হযরত মুসআব ইব্‌নে ওমায়ের (রাঃ)-সহ আমরা কতিপয় লোক তার মুখোমুখী হয়ে গেলাম, সে আমার কাঁধে আঘাত করলে, আমি তার উপর কয়েকবার আঘাত করি। আমার কাঁধের যখমটি এত বড় ছিল যে, এক বছরেও তা ভাল হয়নি। এরই মাঝে রাসূল (সাঃ) হযরত উম্মে আম্মারা (রাঃ)-ও প্রস্তুতি নিলেন। কিন্তু ক্ষতস্থান এত কাচা ছিল যে তাই অংশগ্রহণ করতে পারেননি। রাসূল (সাঃ) যুদ্ধ থেকে মদীনায় ফিরে সর্ব প্রথম হযরত উম্মে আম্মারা (রাঃ) এর খবর নেন এবং কিছুটা সুস্থতার সংবাদ শুনে অত্যন্ত আনন্দিত হন। হযরত উম্মে হাকীক (রাঃ) এর ইসলাম গ্রহণ করেন এবং এ যুদ্ধে স্বামী স্ত্রী উভয়ে শরীক হন। হযরত ইকরিমা (রাঃ) এ যুদ্ধে শহীদ হন। তারপর অলীদ ইব্‌নে সাঈদ (রাঃ) এর সাথেও তিনি যুদ্ধে শরীক হন। যুদ্ধে অলীদ ইব্‌নে সাঈদ (রাঃ) শহীদ হয়ে যান। হযরত উম্মে হাকীম (রাঃ) স্বামীর সাথে যে তাবুর মধ্যে রাত্রি যাপন করেন, শত্রুবাহিনী তার মধ্যে হামলা করলে তুমুল লড়াই করতে করতে শাহাদাত বরণ করেন। হযরত উম্মে হাকীম (রাঃ) তাবুর একটি খুঁটি হাতে নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করে একাই সাত জনকে হত্যা করে।

হযরত সুমাইয়্যা (রাঃ)-এর শাহাদত

হযরত আম্মার (রাঃ) এর মাতা ছিলেন হযরত সুমাইয়্যা (রাঃ)। হযরত সুমাইয়্যা (রাঃ)ও পুত্র আম্মার (রাঃ) এবং স্বামী হযরত ইয়াসের (রাঃ)-এর ন্যায় ইসলামের জন্য বিভিন্ন ধরনের অকথ্য নির্যাতন সহ্য করেছেন। কিন্তু ইসলামের সত্যিকার মহব্বত তাঁর অন্তরের অন্তঃস্থলে বদ্ধমূল ছিল, তাই যে কোন ধরনের কঠোর নির্যাতনেও তিনি ছিলেন অটল ও অটুট। তাঁকে আরবের অগ্নিসম প্রখর রোদ্রে গরম পাথরের চটানের উপর ফেলে রাখা হত, কখনও লোহার পোশাক পরিয়ে উত্তপ্ত রৌদ্রে দাঁড় করিয়ে রাখা হত যাতে লোহা গরম হয়ে কষ্ট হয়।

রাসূল (সাঃ) এসব দেখে তাঁকে ধৈর্যধারনের উপদেশ দিতেন এবং জান্নাতের ওয়াদা করতেন। একবার হযরত সুমাইয়া (রাঃ) দাড়ানো অবস্থায় আর হঠাৎ করে আবু জাহ্ল সেখানে উপস্থিত হয়ে অকথ্য ভাষায় কতক্ষণ গালি গালাজ করে তাঁকে শহীদ করে দিল। একজন নারী হয়ে ইসলামের জন্য কি পরিমাণ ধৈর্য ও দৃঢ়তার পরিচয় দিলেন তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

আসমা বিন্‌তে আবু বকর (রাঃ)-এর জীবনে অনটন

হযরত আসমা (রাঃ) হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর কন্যা এবং হযরত আয়িশা (রাঃ) এর বোন এবং হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে যোবায়ের (রাঃ)-এর মাতা ছিলেন। তিনি ছিলেন প্রসিদ্ধ মহিলা সাহাবীদর মধ্যে অন্যতম। প্রাথমিক অবস্থায় তিনি ৭০ জনের পর তিনি মুসলমান হন। রাসূল (সাঃ) ও আবু বকর (রাঃ) হিযরত করে মদীনায় চলে যাওয়ার পর হযরত যায়েদ (রাঃ)-সহ কয়েকজনকে তাঁদের পরিবার পরিজনের লোকদের নিয়ে আসার জন্য মক্কায় পাঠান। তাঁদের সাথে হযরত আসমা (রাঃ) ও মদীনায় চলে আসেন। তিনির গর্ভবতী ছিলেন আর কুবা নগরীতে পৌঁছালে আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রাঃ) জন্মগ্রহণ করেন। হিযরতের পর তাঁর জন্মগ্রহণই প্রথম। তখন মুসলমানগণ চরম অভাব অনটনের মধ্যে জীবন যাপন করছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁদের সাহসিকতা ও ত্যাগ, ধৈর্যের কথা উদাহরণে আজ পরিণত হয়ে রয়েছে।

হযরত আসমা (রাঃ) নিজেই বর্ণনা করেন যে, যখন যোবায়েরের সাথে আমার বিবাহ হয়, তখন তিনি নিঃস্ব ছিলেন। শুধু একটি উট ছিল। আর বাড়ীর যাবতীয় কাজ নিজে করতাম। আমি ভালভাবে রুটি তৈরী করতে পারতাম না বলে প্রতিবেশী আনসারী মহিলারা রুটি তৈরী করে দিতেন।

মদীনায় রাসূল (সাঃ) যোবায়ের (রাঃ) কে একটি জমিন দিয়েছিলেন, যা বিরাট প্রশস্ত ছিল। আমি সেখান থেকে খেজুর মাথায় করে নিয়ে আসতাম। রাসূল (সাঃ) আমাকে দেখে ফেলেন। তিনি আনসারদের এক জামাতের সাথে উটের পিঠে সওয়ার হয়ে আসছিলেন। আমাকে তিনি উটে আরোহন করতে বলেন। রাসূল (সাঃ)-এর সাথে বসতে আমার লজ্জা হল। এটা বুঝতে পেরে তিনি চলে গেলেন। আমি ঘরে এসে যোবায়ের (রাঃ)-কে সমস্ত ঘটনা খুলে বললাম। যোবায়েব (রাঃ) আমাকে না আসার কারণ জিজ্ঞেস করলে বললাম তোমার মনে কষ্ট পাবে তাই আমি বসিনি। তখন যোবায়ের (রাঃ) বলল, তোমার মাথার উপর গাঠুরী নিয়ে আসা আমার মনে এর চেয়েও বেশী কষ্ট হয়। এ সমস্ত সাহাবায়ে কিরামের করার কিছুই ছিল কেননা, তাঁরা অধিকাংশ সময়

জিহাদের কাটিয়ে দিতেন তাই, বাড়ী ঘরে যাবতীয় কাজ কাম মহিলাদেরই করতে হত। কিছুদিন পর আমার আব্বা হযরত আবু বকর (রাঃ) আমার জন্য একটি খাদেম পাঠিয়ে দেন। আর এ খাদেমটি রাসূল (সাঃ) তাঁকে দিয়েছিলেন। খাদেম আসার পর থেকে ঘর-বাড়ীর কাজ-কর্ম থেকে কিছুটা মুক্তি পেয়েছি। এ হল তখনকার যুগে মুসলমানদের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর কন্যার জীবন যাপনের চিত্র।

হিযরতের সময় হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর ধন-সম্পদ

হযরত আবু বকর (রাঃ) যখন রাসূল (সাঃ) এর সাথে হিযরতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন তখন তাঁর সমস্ত মাল সাথে নিয়ে নিলেন এ ভেবে যে, কত দিনের সফর আর কখন কি প্রয়োজন জানা নেই। রাসূল (সাঃ) ও আবু বকর (রাঃ)-এর বিদায় হয়ে যাওয়ার পর হযরত আবু বকর (রাঃ) এর পিতা আবু কুহাফা (তখন পর্যন্ত মুসলমনা হননি এবং অন্ধ ছিলেন) নাতনীদের কাছে এসে আফসোস করতে লাগল যে, আবু বকর (রাঃ) সন্তানদের থেকে বিচ্ছিনন্ন হয়ে সমস্ত মাল সাথে নিয়ে গেছে। দাদার এ কথা শুনে হযরত আসমা (রাঃ) বলেন, তিনি তো অনেক কিছুই রেখে গেছেন, এরপর দাদা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন। হযরত আসমা (রাঃ) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! আব্বা তখন কিছুই রেখে যাননি। আমি শুধু দাদাকে শান্তনা দেয়ার জন্য এরূপ বলেছিলাম। যাতে তিনি মর্মাহত না হন।

কত বড় ত্যাগ স্বীকার ও এমতাবস্থায় তো দাদার কাছে পিতার বিরুদ্ধে অভিযোগ করার কথা ছিল। কেননা জীবিকা নির্বাহের জন্য যে অর্থ ছিল তা তিনি পুরোটাই নিয়ে গেছেন। এদিকে মক্কার অবস্থা ছিল ভয়াবহ। আসল কথা হল সাহাবায়ে কিরাম পুরুষ হোক আর মহিলাই হোক দ্বীনের জন্য ত্যাগ ও কুরবানীর বিষয়ে তাঁদের উদাহরণ তাঁরাই ছিলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) শুরুতে অত্যন্ত বিত্তশালী ও বড় ব্যবসায়ী ছিলেন। কিন্তু ইসলামের জন্য প্রয়োজনে এ পরিমাণ খরচ করেছেন যে, তাবুকের যুদ্ধে সমুদয় মাল রাসূল (সাঃ)-এর খিদমত পেশ করেন। এ কারণেই রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেন, আমি অন্য কারও সম্পদ দ্বারা এ পরিমাণে উপকৃত হই নাই, যে পরিমাণে আবু বকরের মাল দ্বারা হয়েছি এবং আমি প্রত্যেকের এহসানের প্রতিদান দিয়েছি কিন্তু আবু বকরের ইহসান আমার উপর এত বেশী যে, তাঁর প্রতিদান দেয়া আমার পক্ষে সম্ভব হল না, আল্লাহ্ তায়ালাই তাঁকে উপযুক্ত প্রতিদান দিবেন।

স্বামীর মুক্তিপণে হযরত যয়নব (রাঃ)

রাসূল (সাঃ)-এর প্রথম সন্তান হযরত যয়নব (রাঃ) হিজরতের দশ বছর পূর্বে রাসূল (সাঃ) এর ৩০ বছর বয়সে মক্কায় জন্ম গ্রহণ করেন। খালাত ভাই আবুল আ'স ইব্‌নে রাবী'র সাথে তাঁর বিবাহ হয়। হিজরতের সময় তিনি রাসূল (সাঃ) সাথে যেতে পারেন নি। স্বামী আবুল আ'স কাফেরদের পক্ষে বদরের যুদ্ধে শরীক হয় এবং অন্যান্য কাফেরদের সাথে বন্দী হয়ে মদীনায় আনীত হয়। মক্কা বাসীরা যখন মুক্তিপণ দিয়ে নিজের আত্মীয় স্বজনকে আযাদ করে নিয়ে যাচ্ছিল তখন হযরত যয়নব (রাঃ) ও স্বামীর মুক্তির জন্য মাল পাঠিয়েছিলেন যার মধ্যে এ হার খানিও ছিল যা হযরত খাদীজাতুল কুবরা (রাঃ) তাঁকে বিয়ের সময় দিয়েছিলেন। রাসূল (সাঃ)-এর সামনে যখন সে হারটি পেশ করা হল তখন হযরত খাদীজা (রাঃ)-এর কথা মনে পড়ে যায় এবং রাসূল (সাঃ)-এর দু' চোখ বয়ে অশ্রু প্রবাহিত হয়ে যায়। রাসূল (সাঃ) সাহাবাদের বললেন, যয়নাবের পাঠানো মাল ফেরত দাও আর আবুল আ'সকে এ শর্তে মাল ছাড়াই মুক্ত করে দাও যে, সে মক্কায় যেয়ে যয়নবকে মদীনায় পাঠিয়ে দিবে। রাসূল (সাঃ) দু'ব্যক্তিকে আবুল আ'সের সাথে পাঠিয়ে দিলেন এ বলে যে, তারা মক্কার বাইরে অপেক্ষা করবে আর আবুল আ'স যয়নবকে তাদের কাছে পৌছিয়ে দিবে। মক্কায় পৌছে আবুল আ'স তার ছোট ভাই কানানার সাথে যয়নব (রাঃ)-কে পাঠিয়ে দেয়। হযরত যয়নব উটের পিঠে সওয়ার হয়ে রওয়ানা হন। হযরত যয়নব (রাঃ) এভাবে প্রকাশ্য দিবালোকে হিজরত করে চলে যাচ্ছেন এ খবর ছাড়িয়ে পড়লে মক্কার কাফের মুশরিকরা ক্ষোভে ও রাগে ফেটে পড়ে। তারা যয়নব (রাঃ)-কে ধাওয়া করে। হযরত যয়নব (রাঃ)-এর মামাত ভাই হিবার ইব্‌নে আসওয়াদ আর এক সঙ্গী সহ তাঁর উপর বর্শা দ্বারা আক্রমণ করলে তিনি গুরুতর আহত হয়ে উটের পিঠ থেকে লুটিয়ে পড়েন। তিনি অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। এ মর্মান্তিক ঘটনায় তার গর্ভপাত হয়ে যায়। তিনি শত্রুর সাথে তীরের সাহায্যে মোকাবিলা করেন। আবু সুফিয়ান তাকে বলে যে, এ ভাবে প্রকাশ্যে মুহাম্মাদের কন্যাকে নিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না। তোমরা এ মুহূর্তে ফিরে যাও। পরে কখনো চুপে চুপে পাঠিয়ে দিও। তাই তারা বড়ী ফিরে যান এবং দু'তিন পর পুনরায় রওয়ানা হন। অবশেষে ৮ম হিজরীতে তিনি ইন্তিকাল করেন। রাসূল (সাঃ) স্বয়ং কবরে নেমে তাঁকে দাফন করেন। কবরে নামার সময় তাঁকে খুব চিন্তিত দেখা গেছে কিন্তু কবর থেকে বের হয়ে আসার পর রাসূল (সাঃ) এর চেহারায় খুশীর চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়। উভয় অবস্থার কথা জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, জয়নবের ব্যাপারে আমার একটু চিন্তা ও দূর্বলতা ছিল। আর এখন তা দূর হয়েছে।

একাদশ অধ্যায়

সাহাবা যুগে শিশু-কিশোরদের ধর্মীয় ভাবধারা

আগেকার যুগে শিশু কিশোরদের মাঝে যে ধর্মীয় অনুপ্রেরণা ও অনুভূতি পরিলক্ষিত হয় মূলতঃ তা ছিল অভিভাবকদের সঠিক শিক্ষা-দীক্ষা পথ নির্দেশনার ফসল। শৈশবেই যদি অভিভাবকগণ সন্তানদেরকে মাত্রারিক্ত সোহাগ করে ধ্বংস করার পরিবর্তে তাদেরকে ধর্মীয় জ্ঞান হাসিল করার সুযোগ করে দেন এবং ধর্মীয় মানসিকতা সৃষ্টির প্রয়াস পান তাহলে শিশুকাল থেকেই তাদের অন্তরে ধর্মের প্রতি ধর্মীয় অনুভুতি বদ্ধমূল হতে থাকে এবং প্রাপ্ত বয়স্ক হবার পরও তার মাঝে সে অনুভূতিই তাকে পরিচালিত করে। কিন্তু আমরা প্রথমেই স্নেহ মমতায় আত্মহারা হয়ে সন্তানদেরকে উশৃংখল ভাবে ছেড়ে দেই, আর মনে করি বড় হলে সব ঠিক হয়ে যাবে এবং এরূপ অবস্থা আর থাকবে না। কিন্তু এ ধারণাটা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসাত্মক চিন্তা-ভাবনা ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রাথমিক স্তর থেকেই সন্তানদেরকে দ্বীনিশিক্ষা দান ও আমলের অভ্যাস করানো অভিভাবকদের দায়িত্ব। এ ব্যাপারে সাহাবায়ে কিরামগণ অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন। একবার রমযান মাসে শরাব পানের অপরাধে জনৈক ব্যক্তিকে হযরত ওমর (রাঃ) এর দরবারে উপস্থিত করা হল । তিনি বললেন, ছিঃ! লজ্জা করা উচিত, আমাদের শিশুরা পর্যন্ত রোযাদার। অপরাধের শাস্তি স্বরূপ লোকটিকে আশিটা বেত্রাঘাত করে মদীনা মুনাওয়ারা ছেড়ে চলে যাবার নির্দেশ দিলেন।

শিশুদের রোযা

রুকাইয়া বিন্‌তে মুআব্বিয (রাঃ) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করলেন, আজ আশুরার দিন, সবাই রোযা রাখ। এরপর থেকে আমরা সবাই আশুরার রোযা রেখেছি, শিশুরদেরকেও বলেছি, তারাও রোযা রেখেছে। ক্ষুধার যন্ত্রণায় শিশুরা কান্নাকাটি করলে, আমরা বিভিন্নভাবে তাদেরকে শান্ত করতাম এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত এভাবেই ক্ষুধা যন্ত্রণার কষ্ট ভুলিয়ে রাখতাম। কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে, মায়েরা রমযান মাসে সন্তানদেরকে দুধ পর্যন্ত খাওয়াতেন না। এতে সন্দেহ নেই যে, সেকালে মা শিশু উভয়ের শক্তি সামর্থ বর্তমান যুগের

তুলনায় ছিল বেশী। কিন্তু বর্তমান যুগে যাদের দ্বারা সম্ভব সেসব শিশুদের রোযা রাখানোর ব্যাপারে অভিভাবকগণ কতটুকু চেষ্টা করেন বা তাকিদ দেন, সেটাই চিন্তার বিষয়।

হাদীস বর্ণনায় হযরত আয়েশা (রাঃ)

রাসূল (সাঃ)-এর সাথে হযরত আয়েশা (রাঃ) এর বিবাহ মাত্র ছয় বছর বয়সে এবং নয় বছর বয়সে মদীনায় রুখসতী হয় আর আঠার বছর বয়সে রাসূল (সাঃ)-এর ইন্তিকাল হয়। এত অল্প বয়সে হযরত আয়েশা (রাঃ) অসংখ্য হাদীস বর্ণনা করেছেন। হযরত মাসরুক (রঃ) বলেন, হযরত আয়েশা (রাঃ) সাহাবাদের মধ্যে সুবিজ্ঞ আলেম ছিলেন। বড় বড় সাহাবাগণ তাঁর কাছে মাস্‌আলা-মাসায়েল জিজ্ঞেস করতেন। হযরত আবু মুসা আশআরী (রাঃ) বলেন, যখন কোন মাস্‌আলা সম্পর্কে সমস্যা দেখা দিত, তখন হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর কাছে তার সমাধান পাওয়া যেত। অন্তত দু'হাজার দু'শত হাদীস তিনি বর্ণনা করেছেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) নিজেই বর্ণনা করেন, শিশুকালে আমি একবার মক্কা মুকাররমায় খেলা-ধুলা করছিলাম, এ সময় রাসূল (সাঃ)-এর উপর সূরা কামারের আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। তিনি আট বছর বয়স পর্যন্ত মক্কায় ছিলেন। এত অল্প বয়সে কুরআনের আয়াত সম্পর্কে অবগত হওয়া, তা আবার মুখস্থ রেখে সংরক্ষণ করা দ্বীনের সাথে গভীর সুসম্পর্ক থাকলেই সম্ভব।

কিশোর বয়সে বদর যুদ্ধে যোগদান

হযরত সা'আদ ইব্‌নে আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি বলেন, বদরের যুদ্ধের প্রস্তুতির দিন আমি দেখলাম আমার ভাই ওমায়ের (রাঃ) চুপে চুপে শুধু গা ঢাকা দিয়ে ঘোরাফিরা করা অবস্থায় আমি আশ্চর্য হয়ে এর কারণ জিজ্ঞেস করলাম। সে বলল, ছোট শিশু মনে করে রাসূল (সাঃ) যুদ্ধে হয়ত আমাকে নাও নিতে পারেন, অথচ আমার মন চায় যুদ্ধে শরীক হয়ে শহীদ হওয়ার সৌভাগ্য নসীব হয়। যা ভয় ছিল তাই হল। রাসূল (সাঃ) অল্প বয়স্ক হবার কারণে বাদ দিলে তিনি কাঁদতে লাগলেন তাঁর আগ্রহ দেখে অবশেষে রাসূল (সাঃ) অনুমতি দিলেন। হযরত সা'আদ (রাঃ) বললেন সে ছোট ছিল, আর তলোয়ার ছিল বড়, তাই আমি তলোয়ারের রশিতে গিরা লাগিয়ে দিলাম যাতে মাটিতে না ঠেকে।

আবু জাহ্‌লের হত্যাকারী দু'শিশু

আবদুল্লাহ্ রহমান ইব্‌নে আউফ (রাঃ) বলেন, বদরের যুদ্ধে হঠাৎ আমার দু'পার্শ্বে দু'টি অল্প বয়স্ক শিশুকে দেখতে পেলাম। ভাবলাম শিশু না হয়ে যদি দু"জন বলিষ্ট লোক হত, তাহলে হয়ত একে অপরের সাহায্য করতে পারতাম। ইত্যবয়সে একটি ছেলে বলে উঠল, চাচা! আপনি কুখ্যত আবু জাহ্‌লকে চিনেন? আমি বললাম নিশ্চয়! কিন্তু তুমি তার পরিচয় দিয়ে কি করবে? সে বলল, আমি শুনেছি সে নাকি আমার প্রিয়নবী (সাঃ)-কে অশ্লীল ভাষায় গালি গালাজ করে। আমি আল্লাহ্‌র পাক জাতের কসম খেয়ে বলছি, যাঁর হাতে আমার প্রাণ আজ আমি তাকে দেখা মাত্র আর ছাড়ব না। হয়ত আমি মরব না হয় তাকে জাহান্নামে পাঠাব। ছেলেটির প্রশ্নোত্তরে আমি আশ্চর্য হলাম। ইতিমধ্যেই দ্বিতীয় ছেলেটিও প্রথমটির প্রশ্নোত্তর করল। আমি হঠাৎ করে আবু জাহ্‌লকে ময়দানে দৌঁড়াতে দেখে উভয়কে বললাম, এ যে, তোমাদের শিকার যাচ্ছে। শুনামাত্র ছেলে দু'টি তলোয়ার হতে বিদ্যুৎবেগে ছুটে গিয়ে আবু জাহ্‌লের উপর ঝাপিয়ে পড়ল এবং লড়তে লড়তে কিছুক্ষণের মধ্যেই তাকে ধরাশায়ী করে ফেলল। বাচ্চা দু'টির নাম হল, মুআয ইব্‌নে আমর আর মুআয ইব্‌নে ইফরা (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)। বাচ্চা সৈনিক হযরত মুআয ইব্‌নে আমর (রাঃ) বলেন, আমি লোক মুখে শুনলাম, আবু জাহল এত শক্তিশালী যে তাকে নাকি কেউ মারতে পারবে না। কারণ, সে অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে নিজেকে হিফাযত করে। আমি তখনই প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, তাকে মারবই মারব। যুদ্ধের ময়দানে এ ছেলে দু'টি ছিল পদাতিক আর আবু জাহল ছিল ঘোড়ার পিঠে। আবু জাহল কে দেখা মাত্র একজন বিদ্যুৎবেগে ছুটে গিয়ে তার ঘোড়ার উপর হামলা করল অপর জন আবু জাহলের পায়ে আঘাত হানল, এতে ঘোড়াও পড়ে গেল, আবু জাহলও কাবু হয়ে মাটিতে পড়ে গিয়েছিল। সে যেন পুনরায় উঠে দাঁড়াতে না পারে, মুআয ইব্‌নে ইফরার ভাই তার উপর ক্রমাগত কয়েকটি আঘাত করলে কিছুক্ষণের মধ্যেই আবু জাহল নিস্তেজ হয়ে যায়। কিন্তু সম্পূর্ণরূপে খতম করলেন না।

অবশেষে হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে মাসউদ (রাঃ) তার গর্দান দ্বিখন্ডিত করে ফেলেন। হযরত মুআয ইব্‌নে আমর (রাঃ) বলেন, যখন আমি আবু জাহলের গায়ে আঘাত করি তখন তার ছেলে ইকরামা পাশেই ছিল, সে আমার কাঁধে তলোয়ার দ্বারা আঘাত করলে আমার একটি হাত কেটে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। হাতটি সামান্য চামড়া সাথে ঝুলে থাকে, যা আমি পিঠের দিকে ফেলে রাখি। আর এক হাতেই যুদ্ধ করতে থাকি। যখন অধিক কষ্ট হতে লাগল, তখন পায়ের নীচে রেখে তা ছিড়ে ফেলে দেই।

রাসূল (সাঃ)-এর পাহারাদার

হযরত রাসূল (সাঃ)-এর অভ্যাস ছিল যখন কোন অভিযানে মদীনা থেকে বের হতেন তখন সৈন্যদল পর্যবেক্ষণ করে দেখতেন। দলে অল্প বয়স্ক কোন ছেলে থাকলে তাকে মদীনায় ফেরত পাঠিয়ে দিতেন। এ যুদ্ধে যাদেরকে ফেরত পাঠানো হয়েছিল তারা হলেন, আবদুল্লাহ ইব্‌নে ওমর, যায়েদ ইব্‌নে সাবিত, ওসামা ইব্‌নে যায়েদ, যায়েদ ইব্‌নে আকরাম, বারা ইব্‌নে আযেব, আমর ইব্‌নে হেজাম, উসায়েদ ইব্‌নে যোহায়ের, আরাবা ইব্‌নে আওস, আবু সাঈদ খুদরী, সামুরা ইব্‌নে জুন্‌দুব এবং রাফে ইব্‌নে খাদীজ (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুম আজমায়ীন)। ফেরত পাঠানোর নির্দেশ শুনে হযরত খাদীজ (রাঃ) বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার ছেলে রাফে অত্যন্ত দক্ষ তীরন্দাজ তাকে অনুমতি দিন, এদিকে হযরত রাফে (রাঃ) ও পায়ের আঙ্গুলের উপর ভর দিয়ে উচু হয়ে দাড়ানোর চেষ্টা করছিল যাতে তাকেও বড়দের মত দেখা যায়। পিতার সুপারিশে রাসূল (সাঃ) রাফে' (রাঃ)-কে অনুমতি দিলেন। এ দেখে হযরত সামুরা ইবনে জুন্‌দুব (রাঃ) তাঁর পিতাকে বললেন, রাসূল (সাঃ) রাফে' কে অনুমতি দিলেন, অথচ আমি রাফে' থেকে অধিক শক্তিশালী। তাঁর সাথে কুস্তি মোকাবিলা হলে, আমি অনায়াসে তাকে হারিয়ে দিব। একথা শুনে রাসূল (সাঃ) উভয়ের মধ্যে কুস্তির আদেশ দিলেন। সত্যিই হযরত সামুরা (রাঃ) হযরত রাফে (রাঃ)-কে পরাজিত করলেন। এতে সন্তুষ্ট হয়ে রাসূল (সাঃ) তাকেও অনুমতি দিলেন।

অতপর আরো কয়েকজন ছেলে চেষ্টা করে এরূপে অনুমতি লাভ করল। এভাবে প্রস্তুতির ব্যস্ততায় রাত হয়ে গেল। রাসূল (সাঃ) সৈন্যদলের পাহারার জন্য পঞ্চাশ জনকে নিযুক্ত করে দিলেন। অতপর বললেন, আজ রাতে কে আমাকে পাহারা দিবে? একজন সাহাবী দাঁড়ালেন। রাসূল (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাম কি? সে বলল, যাকওয়ান। রাসূল (সাঃ) বললেন, তুমি বস। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, আজ রাতে আমার পাহারায় কে থাকবে? এবারও একজন সাহাবী উঠে দাঁড়ালেন। তিনি বললেন, তোমার নাম কি? সাহাবী বললেন, আবু সাব্‌আ। তিনি বললেন, আচ্ছা তুমিও বস। রাসূল (সাঃ) পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, আজ রাতে আমাকে কে পাহারা দিবে? এবারও একজন সাহাবী দাঁড়ালেন। রাসূল (সাঃ) তাঁর নাম জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন, ইব্‌নে আবদুল কায়েস। রাসূল (সাঃ) বললেন, আচ্ছা বস। কিছুক্ষণ চুপ থেকে রাসুল (সাঃ) বললেন, তোমরা তিন জন আমার কাছে এস। তখন মাত্র এক ব্যক্তি উপস্থিত হল। রাসূল (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, তোমার অপর

দু'জন সাথী কোথায়? নবীজীর জন্য জান উৎসর্গকারী সাহাবী বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! প্রত্যেক বার আমি একাই উঠেছি। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জন্য দোয়া করে, পাহারায় নিযুক্ত করেন। তিনি সারা রাত জেগে রাসূল (সাঃ-এর তাঁবু পাহারা দিলেন। দ্বীনের জন্য আগ্রহ ও উদ্দীপনার এটাই ছিল অপূর্ব নিদর্শন। তাঁদের ধর্মের খাতিরে আপন জান কুরবান করাই ছিল যেন জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। এ কারণেই সফলতা তাঁদের পদচুম্বন করত।

কুরআন মজীদ বেশী তিলাওয়াত করার মর্যাদা

হিযরতের সময় হযরত যায়েদ ইব্‌নে সাবিত (রাঃ)-এর বয়স ছিল মাত্র এগার বছর। সে সময় তিনি হিযরত করেন। ছয় বছর বয়সে এতিম হন। বদর ও উহুদ যুদ্ধে ছোট হওয়ায় শরীক হওয়ার অনুমতি পাননি। অবশ্য এর পর থেকে সমস্ত অভিযানে তিনি যোগদান করেন। তাবুকের যুদ্ধে বনী মালেকের পতাকা হযরত আম্মারা (রাঃ)-এর হাতে ছিল। রাসূল (সাঃ) এ পতাকা তাঁর হাত থেকে নিয়ে হযরত যায়েদ (রাঃ)-এর হাতে দিন। এতে হযরত আম্মারা (রাঃ) ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়লেন, তিনি ভাবলেন, হয়ত আমার দ্বারা কোন বে-আদবী হয়েছে। তিনি অত্যন্ত বিনয়ের সাথে রাসূল (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার দরবারে আমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ এসেছে কি? রাসূল (সাঃ) বলেন, তোমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই, তবে যায়েদ কোরআন মজীদ তোমার চেয়ে বেশী পড়েছে। কুরআন মজীদ তাঁকে ইসলামের পতাকা বহন করার জন্য অগ্রগামী করবে। রাসূল (সাঃ)-এর অভ্যাস ছিল, অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাহাবাদেরকে দ্বীনের কারণে অগ্রাধিকার দিতেন। যাঁরা কুরআন মজীদ অধিক পরিমাণে শিখেছেন তাঁদেরকে অগ্রাধিকার দিতেন।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)-এর পিতার ইন্তিকাল

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, উহুদের যুদ্ধে শরীক হবার জন্য আমাকে হুকুম করা হল। তখন আমার বয়স মাত্র তের বছর ছিল, তাই রাসূল (সাঃ) অনুমতি দিলেন না। আমার পিতা এ বলে রাসূল (সাঃ)-এর কাছে সুপারিশ করলেন যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ। ছেলেটি বেশ শক্তিশালী এবং তার হাড়ও খুব শক্ত। রাসূল (সাঃ) আমার দিকে উপর নীচে বার বার তাকিয়ে অনুমতি দিলেন না। আমার পিতা এ যুদ্ধে শহীদ হয়ে যান। তিনি আমাদের জন্য কোন সম্পদ রেখে যাননি। আমি রাসূল (সাঃ)-এর কাছে কিছু চাওয়ার জন্য হাযির হলাম। রাসূল (সাঃ বলেন, যে আল্লাহ্‌র কাছে সবর চায় তাঁকে আল্লাহ্‌ তা'য়ালা সবর প্রদান করেন। যে পবিত্রতা চায়, তাঁকে পবিত্রতা দান করেন। আর যে আত্মনির্ভরতা চায়, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে আত্মনির্ভরশীল করেন। আবু সাঈদ

খুদরী (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (সাঃ)-এর নসীহত শুনে চুপে চুপে ফিরে এলাম। তার পর আল্লাহ্ তা'য়ালা আমাকে এমন মর্যাদা দান করলেন যে, যুবক সাহাবাদের মধ্যে অন্য কেহ সে মর্যাদায় পৌঁছেছে কিনা সন্দেহ। অল্প বয়স, পিতৃহারা ও কপর্দকহীন বালক, অথচ রাসূল (সাঃ)-এর একটিমাত্র নসীহত শুনে নিরবে ফিরে আসা এবং নিজের অভাব অনটনের কথা প্রকাশ পর্যন্ত না করা বর্তমান যুগে কোন বয়স্ক লোকের পক্ষেও কি সম্ভব? বাস্তবিকই মহান রাব্বুল আলামীন বিশ্বনবীর সহচর হবার জন্য এমন মহাপুরুষদেরকে নির্বাচন করেছিলেন যাঁরা এর যথার্থ উপযুক্ত ছিলেন। রাসূল (সাঃ) বলেন, আল্লাহ্ তা'য়ালা সমগ্র মানব জাতির মধ্যে আমার সাহাবাদেরকে বাছাই করেছেন।

হযরত সালমা ইব্নে আক্ওয়া (রাঃ) এর গাবা প্রান্তরে দৌড়

মদীনা মুনাওযারা থেকে চারপাঁচ মাইল দূরে গাবা প্রন্তরে রাসূল (সাঃ)-এর উটসমূহ বিচরণ করত। আবদুর রহমান ফাযারী কাফেরদের একটি ক্ষুদ্র দল নিয়ে সেখানকার উটগুলো লুট করে নিয়ে গেল। তারা সবাই সশস্ত্র অশ্বারোহী ছিল। হযরত সালমা ইব্নে আক্ওয়া (রাঃ) তীর ধনুক নিয়ে সকাল বেলা সেদিকে গিয়েছিলেন। হঠাৎ লুণ্ঠনকারী কাফেরদের এ দলের উপর তাঁর দৃষ্টি পড়ল । তিনি অল্প বয়স্ক বিধায়, দৌড়ে খুবই পারদর্শী ছিলেন। কথিত আছে, দৌড়ে ঘোড়া তাকে অতিক্রম পারত না, তদুপরি অত্যন্ত সুদক্ষ তীরন্দাজ ছিলেন। তিনি এ দুর্ঘটনা দেখে একটি টিলার উপর দাঁড়িয়ে মদীনার দিকে মুখ করে এক বিকট শব্দে চিৎকার করে রাসূল (সাঃ)-এর উট লুট হওয়ার বিষয়টি ঘোষণা করলেন এবং একাই তীর ধনুক নিয়ে ডাকাত দলের পিছনে ধাওয়া করলেন। তাদের নিকটবর্তী হয়ে এমন বিচক্ষণতার সাথে তড়িৎগতিতে তীর ছুড়তে লাগলেন যে, শত্রু দল তাকে একটি বড় দল মনে করতে লাগল। কেহ পিছনের দিকে ঘোড়া দৌঁড়িয়ে তার দিকে আসলে তিনি কোন গাছের আড়ালে আশ্রয় নিয়ে তীর মেরে ঘোড়াকে আহত করে ফেলতেন। ফলে আরোহী ধরা পড়ার ভয়ে ঘোড়া রেখেই ছুটে পলায়ন করত। হযরত সালমা (রাঃ) বলেন, এরূপ আক্রমণ চলতে চলতে রাসূল (সাঃ) এর সমস্ত লুণ্ঠিত উট আমার পিছনে চলে যায়। ডাকাতরা ত্রিশটা বর্শা এবং ত্রিশখানা চাদর ফেলে গেল। ইত্যবসরে উয়াইনা ইব্নে হিস্নের নেতৃত্বে একটি দল শত্রু বাহিনীর সাহাযার্থে উপস্থিত হল। এতে তাদের শক্তি বৃদ্ধি পেল এবং তারা এটাও বুঝে ফেলল যে, আমি একাই যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছি। তারা আমাকে পিছন দিক থেকে ধাওয়া করল। আমি মুহূর্তের মধ্যে একটি পাহাড়ের চূড়ায় উঠে গেলাম। তারাও পাহাড়ে আরোহণ করে আমার নিকটবর্তী হলে আমি দুর্জয় সাহসে বজ্রকণ্ঠে হুংকার ছেড়ে বললাম,

তোমরা কি আমাকে চিন্তে পেরেছ আমি কে? তারা বলল, তুমি কে? আমি বললাম, আমি সালমা ইব্নে আকওয়া। আল্লাহ্র কসম, যিঁনি মুহাম্মদ (সাঃ)-কে ইজ্জত দান করেছেন. তোমরা শত চেষ্টা করলেও আমাকে পাকড়াও করতে পারবে না, আর আমি তোমাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা পাকড়াও করতে পারব, সে কিছুতেই আমার হাত থেকে রক্ষা পাবে না।

হযরত সালমা (রাঃ) বলেন, তাদের সাথে আমার কথা কাটাকাটির উদ্দেশ্য ছিল,যাতে ইতিমধ্যেই মদীনা থেকে আমার জন্যও সাহায্য এসে যায়। আমি মাঝে মাঝে গাছের আড়াল দিয়ে মদীনার দিকে দেখতাম, হঠাৎ একদল অশ্বারোহী লোক আমার দৃষ্টিগোচর হল, যার অগ্রভাগে আখ্রাম আসাদী (রাঃ) ছিলেন। তাঁরা দ্রুত গতিতে শত্রু বাহিনীর নিকটবর্তী হয়ে গেলেন।

হযরত আখ্রাম আসাদী (রাঃ) এসেই শত্রু বাহিনীর সর্দার আবদুর রহমানের ঘোড়া আহত করল, কিন্তু সে পাল্টা আক্রমণ করে হযরত আখ্রাম (রাঃ)-কে শহীদ করে, আখ্রাম (রাঃ) ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে গেল। মুহূর্তের মধ্যেই হযরত আবু কাতাদা আবদুর রহমানের উপর হামলা করলেন, কিন্তু আবদুর রহমান পাল্টা হামলা করে হযরত আবু কাতাদা এর ঘোড়ার পা কেটে ফেলল। তিনি ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে দুর্বার গতিতে উঠেই আবদুর রহমানের উপর পুনরায় আক্রমণ করে তাকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দিয়ে তিনি হযরত আখ্রাম আসাদী (রাঃ)-এর ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে গেলেন। এ যুদ্ধে শুধু আখ্রাম (রাঃ) শহীদ হয়েছিলেন, আর কাফেরদের পক্ষে অনেক লোক মারা গিয়েছিল। শত্রুরা পলায়ন করার পর হযরত সালমা (রাঃ) রাসূল (সাঃ)-এর কাছে আবেদন করলেন যে, আমার সাথে একশত লোক দিন আমি তাদের ধাওয়া করব। রাসূল (সাঃ) বললেন, তারা এতক্ষণে নিজেদের দলেই পৌঁছে গেছে। ঐতিহাসিকগণ বলেন, হযরত সালমা (রাঃ) এর বয়স তখন মাত্র তের বছর ছিল। এ ক্ষুদ্র বয়সে এত বড় অশ্বারোহী দলকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলা এবং এত বড় শত্রু বহিনী ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পলায়ন করা মূলতঃ এসব সাহাবাদের ইখলাসের বদৌলতেই সম্ভব ছিল।

বদরের যুদ্ধে হযরত বারা (রাঃ)-এর আগ্রহ

ইসলামের ইতিহাসে বদরের যুদ্ধই সর্বশ্রেষ্ট। এতে মাত্র তিন শত তের জন মুসলিম মুজাহিদের কঠোর মোকাবিলা হয় এক হাজার সৈন্যের বিশাল সশস্ত্র বহিনীর সাথে। মুসলমানদের ছিল মাত্র তিনটি ঘোড়া, ছয়টি বা নয়টি লোহার পোশাক, আটটি তরবারী এবং সত্তর টি উট। এক একটির উপর কয়েক জন লোক পালাক্রমে সওয়ার হতেন। পক্ষান্তরে কফেরদের ছিল একশত ঘোড়া,

সাতশত উট এবং পর্যাপ্ত রণসামগ্রী, তদুপরি তারা রণবাদ্য বাজিয়ে গায়িকাদের গান বাজনা সহকারে রণক্ষেত্রে অবতরণ করেছিল। এদিকে রাসূল (সাঃ) সাহাবা (রাঃ)-দের দুর্বলতা উপলব্ধি করে প্রবল উৎকণ্ঠার সাথে আল্লাহ্‌র কাছে এ বলে ফরিয়াদ করলেন, হে আমার রব! এ অসহায় মুসলিম সেনাদল নগ্নপদ, তুমি তাঁদের সওয়ারীর ব্যবস্থা কর, এরা বস্ত্রহীন, তুমিই তাঁদের বস্ত্রের ব্যবস্থা কর। এরা ক্ষুধার্ত, তুমিই তাঁদের ক্ষুধা নিবারণ কর। এরা অর্থহীন, তুমিই তাঁদের অর্থশালী করে দাও। আল্লাহ্ তাঁর রাসূলের দোয়া কবুল করলেন এবং সাহাবাদের অবস্থা সম্পূর্ণ পরিবর্তন করে দিলেন। এত কঠিন যুদ্ধে হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌নে ওমর ও বারা ইব্‌নে আযেব এই দু'জন অল্প বয়স্ক সাহাবী প্রবল আগ্রহ সহকারে যুদ্ধে যাওয়ার অনুমতি চাইলেন রাসূল (সাঃ)-এর কাছে। রাসূল (সাঃ) অনুমতি না দিয়ে তাদেরকে ফেরত পাঠিয়ে দেন। এ দু'জনকে উহুদের যুদ্ধেও অনুমতি দেয়া হয়নি। অথচ উহুদের যুদ্ধ বদর যুদ্ধের এক বছর পর সংঘটিত হয়েছে। এসব সাহাবায়ে কিরামের শিশু কাল থেকেই দ্বীনের প্রতি প্রবল আগ্রহ ছিল। অল্প বয়স্ক হওয়া সত্বেও তাঁরা যুদ্ধে শরীক হবার জন্য আগ্রহ প্রকাশে বার বার অনুমতি চাইতেন।

মুনাফিক সরদার পুত্র আবদুল্লাহ (রাঃ)-এর ঘটনা

হিজরী ৫ম সনে বিখ্যাত বনু মস্‌তালিক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে পরস্পরে এক মুহাজির ও এক আনসারীর সাথে সামান্য একটি বিষয় নিয়ে বাক বিতন্ডা হয়। উভয়ে নিজ গোত্রের লোকদের কাছে সাহায্য কামনা করে এবং উভয় পক্ষে দু'টি দল তৈরী হয়। কিন্তু কয়েক ব্যক্তির মধ্যস্থতায় ঝগড়া মিটমাট হয়ে যায়। মুনাফিক সর্দার আবদুল্লাহ ইব্‌নে উবাই যখন এ ঘটনা সম্পর্কে অবগত হল, তখন সে রাসূল (সাঃ)-এর শানে অনেক বে-আদবী ও অভদ্র শব্দ ব্যবহার করল। সে বাহ্যতঃ নিজেকে মুসলমান বলে প্রকাশ করত, তাই তার বিরূদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হত না। সাধারণতঃ সমস্ত মুনাফিকদের সাথে এরূপ ব্যবহারই করা হত। তাই আবদুল্লাহ ইব্‌নে উবাই বে-পরওয়া অশোভনীয় কথাবার্তা বলে। সে আনসারদেরকে লক্ষ্য করে বলল, এসব তোমাদের কৃতকর্মের ফসল। তোমরাই এসব লোককে নিজের শহরে আশ্রয় দিয়েছ। অর্ধেক ধনসম্পদ তাঁদের মধ্যে বন্টন করে দিয়েছ। এখনও যদি তোমরা তাঁদেরকে সাহায্য করা ত্যাগ কর তবে তাঁরা এ শহর ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হবে। সে বলল, আল্লাহ্‌র কসম মদীনায় পৌঁছে আমরা সম্মানিতগণ মিলে এসব

অপদস্ত লোকদেরকে মদীনা থেকে তাড়িয়ে দিব। হযরত যায়েদ ইব্‌নে আকরাম (রাঃ) অল্প বয়স্ক বালক তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। এ কথা শুনে সহ্য করতে না পেরে ক্ষুব্দ হয়ে বলে উঠলেন, আল্লাহর কসম তুই অসভ্য, অভদ্র, আপন গোত্রের লোকদের মাঝেও তুই হেয় প্রতিপন্ন ও অপদস্ত। আমার রাসূল (সাঃ) সম্মানিত। আল্লাহ্ তাঁকে সম্মান দান করেছেন। তিনি স্বগোত্রিয় লোকদের মাঝেও সম্মানিত। আবদুল্লাহ ইব্‌নে উবাই বলল, বেটা! তুমি তো বুঝতেই পারনি। আমি তো এমনিই একটু হাসি মজাক করছিলাম কিন্তু হযরত যায়েদ (রাঃ) ঘটনাটি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে বলে দিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) আরয করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! অনুমতি হলে এখনই তার গর্দান উড়িয়ে দিব। এদিকে দুষ্টমতি আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে উবাই যখন জানতে পারল যে, রাসূল (সাঃ) ঘটনা সম্পর্কে জেনে ফেলেছেন। তখন রাসূল (সাঃ)-এর খিদমতে হাযির হয়ে মিথ্যা কসম খেয়ে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! ওসব বাজে কথা, যায়েদ আপনার কাছে সাজিয়ে মিথ্যা কথা বলেছে। আনসারদের কিছু লোক এসে সুপারিশ করলেন যে, ইব্‌নে উবাই কওমের সর্দার, সবাই তাকে বড় মনে করে। তাই একটি বাচ্চার কথা তার ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য নয়। সম্ভবতঃ সে ভুল শুনেছে অথবা বুঝার মধ্যে কিছুটা ভুল হয়েছে।

রাসূল (সাঃ) তাঁদের সুপারিশ গ্রহণ করলেন। হযরত যায়েদ (রাঃ) যখন শুনলেন যে, দুষ্ট ইব্‌নে উবাই মিথ্যা কসম খেয়ে নিজেকে সত্যবাদী প্রকাশ করেছে, তখন তিনি লজ্জায় ঘর থেকে বের হওয়া বন্ধ করে দিলেন। এমনকি লজ্জায় রাসূল (সাঃ)-এর দরবারেও আসা বন্ধ করে দিলেন। অবশেষে আল্লাহ্ সূরা মুনাফিকুন নাযিল করে হযরত যায়েদ (রাঃ)-এর সত্যতা এবং মুনাফিকদের সর্দার আবদুল্লাহ ইব্‌নে উবাই এর মিথ্যাচারিতা প্রকাশ করে দিলেন। এতে শত্রু মিত্র সবার মধ্যে হযরত যায়েদ (রাঃ)-এর মর্যাদা বৃদ্ধি পেল এবং আবদুল্লাহ ইব্‌নে উবাই সবার মাঝে চরমভাবে অপদস্ত হল। ঘটনার দিন তার ছেলে আবদুল্লাহ্ (রাঃ) যিনি খাটি মুসলমান ছিলেন, খোলা তরবারী হাতে নিয়ে মদীনার প্রবেশ পথে দাড়িয়ে পিতাকে বললেন, আমি তোকে ঐ সময় পর্যন্ত মদীনায় ঢুকতে দিবনা যতক্ষণ পর্যন্ত তুই স্বীকার না করবি যে, তুই অপদস্ত আর মুহাম্মদ (সাঃ) সম্মানিত। সে আশ্চর্য হয়ে বলল, ছেলেটি তো আমার বাধ্যগত, কখনও বে-আদবী করেনি। তার বুঝতে বিলম্ব হলনা যে, রাসূলুল্লাহর শানে বে-আদবী সে সহ্য করতে পারেনি। অবশেষে পিতা বাধ্য হয়ে স্বীকার করল যে, আমিই নিকৃষ্ট, অপদস্ত আর মুহাম্মদ (সাঃ) উৎকৃষ্ট ও সম্মানিত। তারপর সে মদীনায় প্রবেশ করতে পারল।

হামরাওল আসাদ অভিযানে হযরত জাবের (রাঃ)-এর অংশ গ্রহণ

উহুদ যুদ্ধ শেষে সাহাবায়ে কিরাম মাত্র মদীনায় ফিরেছেন। এ মুহূর্তে হঠাৎ সংবাদ এল যে, আবু সুফিয়ান হামরাওল আসাদ নামক স্থানে মুসলমানদেরকে সমূলে ধ্বংস করার জন্য এবং (নাউযুবিল্লাহ) রাসূল (সাঃ)-কে কতল করার উদ্দেশ্য পুনরায় মদীনায় আক্রমণ করার পরিকল্পনা করছে। এ সংবাদ শুনে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ঘোষণা দিলেন যে, যাঁরা উহুদে শরীক ছিল, শুধুমাত্র তারাই এ যুদ্ধে শরীক হবে। ক্ষত বিক্ষত, আহত এবং রণক্লান্ত জীবন উৎসর্গকারী সাহাবায়ে কিরাম রাসূল (সাঃ)-এর ঘোষণায় মুহূর্তের মধ্যেই হামরাওল আসাদ অভিমুখে অভিযানের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন। হযরত যাবের (রাঃ) এসে আরয করলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ! উহুদে শরীক হবার আমার প্রচন্ড আকাঙ্খা ছিল কিন্তু আমার পিতা আমাকে এ বলে অনুমতি দেননি যে, আমার সাতটি বোন বাড়িতে। অন্য কোন পুরুষ লোক নেই, তাদের রক্ষণাবেক্ষণ কে করবে? তিনি একাই শরীক হলেন আর শহীদ হয়ে গেলেন। ইয়া রাসূলুলুল্লাহ! অনুগ্রহ করে এ অভিযানে আমাকে অংশ গ্রহণের অনুমতি দিন। রাসূল (সাঃ) তাঁর আগ্রহ দেখে অনুমতি দিয়ে দিলেন। হযরত যাবের (রাঃ) এর ধর্মের প্রতি আগ্রহ ও যুদ্ধে অংশ গ্রহণের তীব্র আকাঙ্খা লক্ষ্যনীয়। যুদ্ধে পিতা শহীদ হয়ে গেলেন। এদিকে পিতা অনেকগুলো ঋণ রেখে গেছেন তাও আবার এক ইহুদী থেকে, যে অত্যন্ত কঠোর হৃদয়ের ছিল। তদুপরি সাতটি বোনের ভরণ পোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব। এহেন কঠিন পরিস্থিতিতেও যুদ্ধের আগ্রহ সব কিছুকে ম্লান করে দিয়েছে।

রোম যুদ্ধে হযরত ইব্নে যোবায়ের (রাঃ)-এর বীরত্ব

২৬ হিজরী। হযরত ওসমান (রাঃ)-এর খিলাফতের যুগে আ'মর ইব্নে আ'সের পরিবর্তে হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্নে আবি মারাহ তখন মিশরের প্রথম শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। তখন তিনি রোমীদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য বিশ হাজার সৈন্যের এক বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হন। রোমীদের সৈন্য সংখ্যা ছিল প্রায় দু'লক্ষ। উভয় পক্ষের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। রোমান বাদশাহ জারজীর ঘোষণা করে, যে ব্যক্তি মুসলিম সেনাপতি আবদুল্লাহ্ ইব্নে আবি সারাহর মস্তক এনে দিতে পারবে তার কাছে আমার কন্যা বিবাহ দিব এবং তাকে একলক্ষ স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার দেয়া হবে। এতে মুসলিম সৈন্যদলে চিন্তার সঞ্চার হল। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্নে যোবায়ের (রাঃ) বললেন, এতে বিচলিত

হবার কোন কারণ নেই। আমাদের পক্ষ থেকেও ঘোষণা করা হোক, যে ব্যক্তি জারজীরের মাথা এনে দিতে পারবে, জারজীরের কন্যা তাকেই দান করা হবে এবং লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার দেয়া হবে। তদুপরি তাকে এ শহরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হবে। উভয় পক্ষে দীর্ঘক্ষণ তুমুল যুদ্ধ চলতে থাকে। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্নে যোবায়ের (রাঃ) দেখলেন, জারজীর একা সৈন্যবাহিনীর পিছনে। দু'জন বাদী ময়ূরের পাখা দিয়ে তাকে ছায়া করে আছে। তিনি সবার অলক্ষ্যে তার উপর হামলা করলেন এবং তার মস্তক কেটে বর্শার মাথায় ঝুলিয়ে নিয়ে আসলেন। সবাই তাঁর দিকে অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। জারজীর ভেবেছিল তিনি হয়ত কোন সন্ধির আলোচনা করতে তার কাছে এসেছেন। কিন্তু কোন কিছু বুঝে উঠার আগেই তিনি তাকে হত্যা করে অসাধারণ বীরত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

হিযরতের পর মক্কাবাসী মুহাজিরীনদের প্রথম সন্তান হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্নে যোবায়ের (রাঃ। হিযরতের পর এক বছর পর্যন্ত মুহাজিরীনদের কোন পুত্রসন্তান না হওয়ার করণে ইহুদীরা দাবী করেছিল যে, তাদের উপর আমরা যাদু করেছি। এ কারণেই তাদের কোন ছেলে সন্তান জন্ম হয় না। কোন শিশু শিশুকে রাসূল (সাঃ) বাইয়াত করাতেন না। কিন্তু হযরত আবদুল্লাহ ইব্নে যোবায়ের (রাঃ)-কে তিনি মাত্র সাত বছর বয়সে বাইআত করান। এ যুদ্ধের সময় তাঁর বয়স মাত্র ২৫ বছর ছিল। এ বয়সে দু'লক্ষ সৈন্যকে ডিঙ্গিয়ে বাদশাহর মাথা কেটে আনা সহজ ব্যাপার নয়।

কাফের অবস্থায় কুরআন মুখস্ত

হযরত আ'মার ইব্নে সালমা (রাঃ) বলেন আমরা মদীনায় এক স্থানে বসবাস করতাম। আমাদের পাশদিয়ে মদীনাবাসীরা আসা যাওয়া করত। মদীনা থেকে আসার পথে লোকজনদেরকে নবীজী সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তারা বলত, তাঁর কাছে অহী আসে এবং আয়াত অবতীর্ণ হয়। আমি তখন অল্প ছিলাম বিধায় তাঁদের কাছে যা শুনতাম তাই আগ্রহ সহকারে মুখস্ত করে নিতাম। কুরআনের অনেকাংশ এভাবে ইসলাম গ্রহণের পূর্বেই আমি মুখস্থ ও কণ্ঠস্থ করে ফেলি। আরবের লোকেরা ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে মক্কাবাসীদের দিকে তাকিয়ে ছিল। ফত্হে মক্কার পর অষ্টম হিজরীতে যখন লোকজন ইসলাম গ্রহণের জন্য মদীনায় দলে দলে আসতে লাগল তখন পিতাও একদল লোক নিয়ে নিজ গোত্রের প্রতিনিধি হয়ে মদীনায় আসেন। রাসূল (সাঃ) তাঁদেরকে শরীয়তের হুকুম আহকাম শিক্ষা দিয়ে বললেন, তোমাদের মধ্যে কুরআন মাজীদ যে বেশী জানবে, তাঁকে ইমামতি করতে দেবে। ঘটনাক্রমে তখন আমিই সবচেয়ে বেশী কুরআন মজীদের অংশ মুখস্ত করেছিলাম বলে সর্বসম্মতিক্রমে আমাকেই ইমাম

নিযুক্ত করা হল। বড় জামাত বা জানাযার ইমামতি আমিই করতাম। অথচ আমার বয়স তখন মাত্র ছয় বছর ছিল। -(বোখারী)

দ্বীনের প্রতি স্বভাবজাত আগ্রহের ছিল নমুনা এটাই যে, ইসলাম গ্রহণের পূর্বেই কুরআনের অনেকগুলো আয়াত মুখস্থ করে ফেলা।

ক্রীতদাসের পায়ে বেড়ী

বিখ্যাত তাবেয়ী হযরত ইকরামা (রহঃ) বলেন, আমার মনিব হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌নে আব্বাস (রাঃ) আমাকে কুরআন হাদীস ও শরীয়তের আহকাম শিক্ষার উদ্দ্যেশ্য পায়ে বেড়ী দিয়েছিলেন, যাতে কোথাও আসা যাওয়া করতে না পারি। এভাবেই তিনি আমাকে কুরআন ও হাদীস শিক্ষা দিয়েছিলেন। বাস্তবিকই ইলমে দ্বীন শিক্ষা করা এরূপ অবস্থায়ই সম্ভব। না হয় যারা লেখাপড়ার সময় বাজারে ও রাস্তায় ঘুরা ফেরা করে অথবা বিলাস ভ্রমণে যায়, তারা অযথা জীবন নষ্ট করে। বেড়ীর কারণেই ক্রীতদাস ইকরামা, হযরত ইকরামা হতে পেরেছিলেন। যাঁকে পরবর্তীতে হিবরুল উম্মত বা উম্মতের বিদ্যার সাগর উপাধিতে ভূষিত করা হয়। হযরত কাতাদা (রহঃ) বলেন, চারজন শ্রেষ্ট তাবেয়ীর মধ্যে ছিলেন অন্যতম হযরত ইকরামা।

হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌নে আবাস (রাঃ) শৈশবে কুরআন হিফ্‌য

হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রাঃ) নিজেই বলেন, তোমরা আমার কাছে কুরআন মজীদের তাফসীর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে পার। কেননা, শৈশবেই আমি কুরআন হিফয করে তাফসীর শাস্ত্র আয়ত্ব করেছি। এক বর্ণনায় বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি দশ বছর বয়সে কুরআন মজিদের শেষ মঞ্জিলের তাফসীর আয়ত্ব করতে সামর্থ হই। তখনকার যুগের কোরআন পড়া বর্তমান যুগের পড়ার মত ছিল না। তাঁরা যা পড়তেন, তাফসীর সহই পড়তেন। তাফসীর শাস্ত্রের অধিকাংশ হাদীস হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌নে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌নে মাসউদ (রাঃ) বলেন, আবদুল্লাহ ইব্‌নে আব্বাস (রাঃ) সবচেয়ে বড় মুফাস্‌সিরে কুরআন ছিলেন।

হযরত আবু আবদুর রহমান (রাঃ) বলেন, আমাদের উস্তাদ সাহাবায়ে কিরাম বলতেন, আমরা রাসূল (সাঃ)-এর কাছ থেকে দশটি করে আয়াত শিখতাম তারপর অন্য দশ আয়াত এ সময় পর্যন্ত শিখতাম না যতক্ষণ পর্যন্ত দশ আয়াতের উপর আমল না হত। রাসূল (সাঃ)-এর ইন্তিকালের সময় হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌নে আব্বাস (রাঃ) এর বয়স ছিল তের বছর। এ বয়সেই হাদীস ও তাফসীর বিদ্যায় তিনি যে মর্যাদা লাভ করেছিলেন, তা কিরামত ছাড়া আর কিছু

নয়। বড় বড় সাহাবাগণ তাঁর কাছে তাফসীর জিজ্ঞেস করতেন। অবশ্য রাসূল (সাঃ)-এর একটি দোয়ার ফলশ্রুতিতে হাদীস ও তাফসীর শাস্ত্রে তিনি এরূপ উচ্চমর্যাদা লাভ করেছিলেন। একবার রাসূল (সাঃ) ইস্তেঞ্জার জন্য বাইরে গেলেন। ফিরে এসে দেখেন যে, পাত্র ভর্তি পানি রয়েছে। জিজ্ঞেস করে জানতে পারলেন যে, এ খিদমতটুকু আবদুল্লাহ ইব্‌নে আব্বাস (রাঃ) করেছেন। এতে সন্তুষ্ট হয়ে রাসূল (সাঃ) তাঁর জন্য দোয়া করলেন, হে আল্লাহ্! তাঁকে কুরআনের ইল্‌ম দান কর।

একবার রাসূল (সাঃ) নামায পড়ছিলেন। তিনি রাসূল (সাঃ) পিছনে নিয়ত করলেন। রাসূল (সাঃ) হাতে ধরে তাঁর বরাবর দাঁড় করিয়ে দিলেন। কিন্তু তিনি একটু পিছে হটে দাঁড়ালেন। নামাযের পর রাসূল (সাঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এরূপ কেন করলে? তিনি আরয করলেন, আপনি আল্লাহ্‌র রাসূল, আমি কি করে আপনার বরাবর দাঁড়াতে পারি? রাসূল (সাঃ) সন্তুষ্ট হয়ে দোয়া করলেন, হে আল্লাহ্! তুমি তার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দাও।

আবদুল্লাহ ইব্‌নে আমর (রাঃ)-এর হাদীস হিফ্‌য

যেসব সাহাবায়ে কিরাম দৈনিক এক খতম কুরআন তিলওয়াত করতেন, দিনে রোযা রাখতেন এবং সারারাত ইবাদতে মাশগুল থাকতেন হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌নে আমর (রাঃ) ছিলেন তাঁদের অন্যতম। তাঁর মাত্রাতিরিক্ত পরিশ্রম দেখে রাসূল (সাঃ) একদিন বললেন, এতে তোমার শরীর দুর্বল হয়ে পড়বে, অধিক রাত্রি জাগরণে চোখে পানি আসবে, শরীরেরও হক রয়েছে পরিবার পরিজন ও আত্মীয় স্বজনেরও হক আছে। তিনি বলেন, আমি দৈনিক এক খতম কুরআন পড়তাম জানতে পেরে রাসূল (সাঃ) আমাকে বললেন, এক মাসে এক খতম করবে। আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার শক্তি ও যৌবনকাল দ্বারা আমাকে উপকৃত হবার সুযোগ দিন। রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করলেন,আচ্ছা ঠিক আছে, বিশ দিনে এক খতম করবে। আমি আরয করলাম, হায় রাসূলুল্লাহ! এত খুবই সামান্য। আমাকে আমার শক্তি ও যৌবন কাল থেকে উপকৃত হবার সুযোগ দান করুন। এভাবেই আমি অনুরোধ করতে থাকি। অবশেষে তিনি (সাঃ) আমাকে তিন দিনে এক খতম করার অনুমতি দেন। হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌নে আমর (রাঃ) এর অভ্যাস ছিল, তিনি রাসূল (সাঃ)-এর কাছ থেকে যা কিছু শুনতেন, তাই লিপিবদ্ধ করে করতেন, যাতে ভুলে না যান। এমন কি লিখতে লিখতে একটি কিতাব তৈরী হয়ে যায়, যার নাম তিনি সাদেকা রেখে দেন। তাঁকে নসীহত করেন, তুমি সব কথাই লিখে ফেল? অথচ রাসূল (সাঃ) অনেক সময় রাগ করে অযথা হাসি-ঠাট্টা করেও কথা বলেন। কাজেই সব কথা লেখা ঠিক নয়। এর পর তিনি লেখা ছেড়ে দিলেন।

রাসূল (সাঃ)-এর কাছে যখন এ কথা প্রকাশ করা হল তখন তিনি বললেন, তুমি লিখতে থাক, ঐ আল্লাহ্‌র কসম খেয়ে বলছি, যাঁর হাতে আমার জীবন, রাগে হোক ধা খুশীতে হোক, এ মুখ থেকে হক কথা ছাড়া অন্য কিছু বের হয় না। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌নে আমর ইব্‌নে আস (রাঃ) বড় আবেদ ও মুত্তাকী ছিলেন,। এতদসত্ত্বেও তিনি ব্যতীত অন্য কোন সাহাবী আমার চেয়ে বেশী রেওয়ায়েত করেননি। আমি লেখতাম না, তিনি লিখে রাখতেন। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে তাঁর রেওয়ায়েত বেশী। যদিও আমাদের যুগে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতই অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়।

হযরত যায়েদ (রাঃ) -এর কুরআন হিফ্য করা

অনেক বড় বুজুর্গ সাহাবী ছিলেন হযরত যায়েদ ইব্‌নে সাবিত (রাঃ)। তিনি ছিলেন মদীনা মুনাওয়ারার মুফ্‌তী, এছাড়াও বিচার, ফারায়েয, ইলমে কিরাআত প্রভৃতি বিষয়ে ছিলেন প্রথম শ্রেণীর সাহাবী। রাসূল (সাঃ)-এর হিযরতের সময় তাঁর বয়স মাত্র এগার বছর ছিল। অল্প বয়স্ক হওয়ার দরুণ তিনি বদর ও উহুদ যুদ্ধে শরীক হতে পারেননি। রাসূল (সাঃ)-এর হিযরতের পাঁচ বছর পূর্বে মাত্র ছয় বছর বয়সে তিনি এতিম হয়ে যান। হিযরতের পর মদীনা মুনাওয়ারায় লোকজন দরবারে তাদের বাচ্চাদেরকে সাথে নিয়ে এসে রাসূল (সাঃ) এর খিদমতে হাযির হত। হযরত যায়েদ (রাঃ) বলেন, আমাকে যখন রাসূল (সাঃ) এর খিদমতে হাযির করা হল, তখন লোকেরা রাসূল (সাঃ)-এর কাছে আরয করল এ ছেলেটি বনী নাজ্জার গোত্রীয়। আপনার মদীনায় আসার পূর্বেই সে সতেরটি সূরা মুখস্ত করেছে। রাসূল (সাঃ) পরীক্ষা করার জন্য আমাকে পড়তে বললেন, আমি সূরা ক্বাফ পড়ে শুনালাম। রাসূল (সাঃ) আমার পড়া খুব পছন্দ করলেন। ইয়াহুদীদের কাছ থেকে যেসব চিঠি পত্র লেখা হত সেগুলো ইহুদীদের দ্বারাই লেখানো হত। কেননা তাদের ভাষা ছিল ইবরানী।

একবার রাসূল (সাঃ) আমাকে বললেন, ইহুদীদের দ্বারা পত্র লেখানো আমার পছন্দ হচ্ছে না, তুমি ইহুদীদের ভাষা শিখে নাও। মাত্র পনের দিনে তাদের ভাষা শিখে ফেললাম। তারপর থেকে ইবরানী ভাষায় যাবতীয় চিঠি আমিই লিখতাম এবং পড়তাম। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, রাসূল (সাঃ)-এর নির্দেশে সুরইয়ানী ভাষা তিনি মাত্র সতের দিনে শিখে ফেলেন।

হযরত হাসান (রাঃ)-এর শৈশবে জ্ঞানচর্চা

তৃতীয় হিযরী রমযান মাসে হযরত ইমাম হাসান (রাঃ)-এর জন্মগ্রহণ

করেন। রাসূল (সাঃ)-এর ইন্তিকালের সময় তাঁর বয়স ছিল সাত বছর। এ বয়সেই তিনি বেশ কয়েকটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবুল হাওরা নামক এক ব্যক্তি হযরত হাসান (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, রাসূল (সাঃ)-এর কোন কথা আপনার স্মরণে আছে কি? বলেন, হ্যাঁ আছে। আমি একদিন রাসূল (সাঃ)-এর সাথে যাচ্ছিলাম। পথিমধ্যে সদকার খেজুরের স্তুপ থেকে আমি খেয়ে ফেলি। রাসূল (সাঃ) কাখ্‌ কাখ্‌ বলে তা আমার মুখ থেকে ফেলে দিয়ে বললেন আমরা সদকার খেজুর খাই না। তিনি আরও বলেন, আমি পাঁচ ওয়াক্ত নামায রাসূল (সাঃ)-এর কাছ থেকে শিখেছি। তিনি বলেন, বিতরের নামাযে পড়ার জন্য রাসূল (সাঃ) আমাকে এ দোয়াটি শিক্ষা দিয়েছেন।

اَللّٰهُمَّ اهْدِنِىْ فِيْمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِىْ فِيْمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِىْ فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِىْ فِيْمَا اَعْطَيْتَ وَقِنِىْ شَرَّمَاقَضَيْتَ فَاِنَّكَ تَقْضِىْ وَ لَايُقْضٰى عَلَيْكَ اِنَّهٗ لَايَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ ـ

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ্‌ যাঁদেরকে আপনি সরল পথ দেখিয়েছেন তাঁদের মত আমাকেও সরল পথ দেখান, যাঁদেরকে সুস্থতা দান করেছেন তাঁদের মত আমাকে সুস্থতা দান করুন, আপনি যাঁদের অভিভাবক হয়েছেন আমাকেও তাঁদের মধ্যে শামিল করুন, আপনি আমাকে যা কিছু দান করেছেন তার মধ্যে বরকত দান করুন, ভাগ্যের পরিহাস থেকে আমাকে রক্ষা করুন, আপনি যা ইচ্ছা করেন তাই হয়ে থাকে, আপনার উপর কারো কর্তৃত্ব চলে না, আপনি যাঁর বন্ধু, সে কখনও অপদস্ত হয়না। হে রব! আপনি বড় বরকতময় এবং বড় মর্যাদাশীল।" হযরত ইমাম হাসান (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (সাঃ)-এর কাছে শুনেছি, যে ব্যক্তি ফযরের নামাযের পর সূর্যোদয় পর্যন্ত নামাযের স্থানে বসে থাকে, সে জাহান্নামের আগুন থেকে নাযাত পাবে। হযরত ইমাম হাসান (রাঃ) পায়ে হেটে কয়েকবার হজ্ব করেছেন। তিনি বলতেন,আমার লজ্জা হয় যে, কিয়ামতের দিন আমি আল্লাহ্‌কে কি করে মুখ দেখাব? যদি পায়ে হেঁটে তাঁর ঘরের দিকে না যাই। তিনি অত্যন্ত ধৈর্যশীল এবং পরহেযগার ছিলেন। তিনি তেরটি হাদীস বর্ণনা করেছেন বলে

মুহাদ্দিসীনগণের অভিমত। সাত বছর বয়সে হাদীস মুখস্থ করা এবং বর্ণনা করা কি সাধারণ ব্যাপার? অথচ আমরা সাত বছর বয়সে দ্বীনের সামান্য জ্ঞানও শিখতে সক্ষম হইনি।

হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ)-এর জ্ঞানচর্চা

হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ) তাঁর বড় ভাই হযরত ইমাম হাসান (রাঃ) থেকে এক বছরের ছোট ছিলেন। রাসূল (সাঃ)-এর ইন্তিকালের সময় বয়স ছিল মাত্র ছয় বছর কয়েক মাস। এ বাচ্চা কতটুকু দ্বীন শিখতে পারে? তবুও তিনি আটটি হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন। মুহাদ্দিসীনগণ তাঁকে এসব বর্ণনাকারীদের অন্তরভুক্ত করেছেন যাঁরা আটটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি, যে কোন ব্যাক্তি মুসিবতগ্রস্থ হবার অনেক দিন পরেও তা স্মরণ আসলে যদি إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ পড়ে তাহলে সে প্রথম বার মুসিবতগ্রস্থ হবার ন্যায় নেকী পাবে। তিনি আরও বলেন, রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি জলপথে ভ্রমণ করার সময় بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرِيْهَا وَمُرْسٰهَا إِنَّ رَبِّيْ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ - এ দোয়া পড়বে সে পানিতে ডোবা থেকে নিরাপদ থাকবে। হযরত হোসাইন (রাঃ) ২৫ বার পায়ে হেঁটে হজ্ব করেছেন।

মোট কথা দ্বীনের প্রতিটি কাজ অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে অধিক পরিমাণে করতেন। হযরত রাবীয়া (রাঃ) বলেন, আমি হযরত হোসাইন (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূল (সাঃ)-এর কোন কথা আপনার স্মরণ আছে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি একবার একটি জানালার উপর রাখা কিছু খেজুর থেকে একটি মুখে দিয়ে ফেলি। রাসূল (সাঃ) আমাকে বললেন, ওটা ফেলে দাও। আমাদের জন্য সদকা জায়েয নয়। হযরত হোসাইন (রাঃ) বলেন, রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, মুসলমানের অভ্যাস হল, অযথা সময় নষ্ট না করা।

এ ধরনের শিশুকালের অসংখ্য ঘটনাবলী সাহাবায়ে কিরাম বর্ণনা করেছেন। হযরত মাহমুদ ইব্নে রাবী (রাঃ) বলেন, রাসূল (সাঃ)-এর ইন্তিকালের সময় আমার বয়স মাত্র পাঁচ বছর ছিল। আমি জীবনভর এ কথা ভুলব না যে, একদিন রাসূল (সাঃ) আমাদের বাড়ী এসে কুয়া থেকে পানি পান করলেন এবং একটি কুলি আমার মুখে করলেন। আমরা আজে বাজে সত্য

মিথ্যা কিছু কাহিনী শুনিয়ে আমাদের বাচ্চাদের নষ্ট করে থাকি। ভুত, পেতনীর ভয় না দেখিয়ে আল্লাহ্, আযাবের ভয় দেখানো উচিত।

শিশুদেরকে সাহাবায়ে কিরাম ও আল্লাহ্ ওয়ালাদের কিচ্ছা কাহিনী শুনিয়ে দ্বীনের প্রতি আগ্রহী করা উচিত। তবেই তো তারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টি সম্পর্কে অবগত হবে। এতে তারা দুনিয়া ও আখিরাতের উপকৃত হবে। শিশুকালে স্মরণশক্তি অত্যন্ত প্রখর হয়ে থাকে। এ সময় শিশুকে যা শিখানো হয়, তা সে কখনো ভুলে না। শিশুকালে বাচ্চাদেরকে কুরআন হিফয করানো খুবই সহজ, মুখস্তও দ্রুত হয়, সময়ও কম লাগে, শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা যাকারিয়া কান্ধলবী (রহঃ) বলেন, আমার পিতা মায়ের দুধ ছাড়ানোর পূর্বেই এক পারা চতুর্থাংশ হিফয করে ছিলেন। তিনি সাত বছর বয়সে পুরা কুরআনের হাফেয হন। আমার দাদা তাঁকে বলে দিয়েছিলেন, দৈনিক এক খতম কুরআন পড়ে নিবে তারপর সারাদিন ছুটি। এ সাত বছর বয়সেই তিনি হিফযের ফাঁকে ফাঁকে ফার্সীর পহেলী থেকে নিয়ে বুস্তাঁ, সেকান্দর নামা এসব জটিল জটিল কিতাবের বেশির ভাগ তিনি এ সময়ের মধ্যেই পড়েছেন। তিনি বলেন, গরম মৌসুমে ফযরের নামাযের পর আমি ঘরের ছাঁদে বসে ছয় সাত ঘন্টায় কুরআন মজীদ পুরা এক খতম করে দুপুরের খানা খেতাম। বিকালে অত্যন্ত আনন্দের সাথে ফার্সী কিতাব সমূহ পড়তাম। ছয় মাস পর্যন্ত আমার এ অভ্যাস নিয়মিত চলতে থাকে। ছয় মাস পর্যন্ত দৈনিক এক খতম করা, সাথে সাথে অন্যান্য কিতাব পড়া কি চাট্টিখানি কথা? এ দূরহ কাজটি তিনি সম্পাদন করেছেন মাত্র সাত বছর বয়সে।

দ্বাদশ অধ্যায়

নবী প্রেমের কয়েকটি অপূর্ব কাহিনী

সাহাবায়ে কিরামের এ যাবত যেসব ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, সব কটি ঘটনাই ছিল মহব্বতের নিদর্শন। একমাত্র রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর প্রেম ও ভালবাসার সংস্পর্শেই তাঁরা জান-মালের, মান-ইজ্জতের, ধন-সম্পদের, দুঃখ-দৈন্যের পরওয়া না করে অসাধ্য সাধন করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। মহব্বত কোন দেখার বস্তু নয়। মহব্বত হল ভাষার উর্দ্ধে একটি অনুভূতির নাম। যখন অন্তরে সে প্রেমের আগুন জ্বলে উঠে, প্রাণপ্রিয় মাহবুবের মোকাবিলায় তার মান-ইজ্জত, লজ্জা-শরম সব কিছুই তুচ্ছ হয়ে যায়। মেহেরবান পরওয়ারদেগার প্রিয় মাহবুব নবীর উসিলায় আমাদের অন্তরে যদি মহব্বত দান করে দেন, তবে যে কোন ইবাদতের মধ্যে স্বাদ পাওয়া যাবে। দ্বীনের প্রয়োজনে যে কোন মুসিবতই শান্তির মনে হবে।

হযরত আবু বকর (রাঃ) কর্তৃক ইসলামের প্রথম ভাষণ

ইসলামের প্রাথমিক যুগে কেহ ইসলাম গ্রহণ করলে যথাসম্ভব তা গোপন রাখার চেষ্টা করত। কাফেরদের নির্যাতনের ভয়ে স্বয়ং রাসূল (সাঃ)ও গোপন রাখার ব্যাপারে নও মুসলিমদের উৎসাহ দান করতেন। যখন মুসলমানদের সংখ্যা উন্নতি হয়ে উনচল্লিশে দাঁড়ায়, তখন হযরত আবু বকর (রাঃ) রাসূল (সাঃ)-এর কাছে প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচারের অনুমতি চাইলে, প্রথমে অনুমতি দিতে অস্বীকার করেন। পরে অবশ্য হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ)-এর বারংবার অনুরোধে সম্মত হন। তিনি নব দীক্ষিত মুসলমানদের নিয়ে কা'বা ঘরে উপস্থিত হয়ে খুত্বা দিলেন। এটাই ইসলামের প্রথম ভাষণ । সে দিনই রাসূল (সাঃ)-এর চাচা হযরত হাম্যাহ্ (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করার মাত্র তিন দিন পর হযরত ওমর (রাঃ) ইসলামে দীক্ষিত হন।

হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর খোত্বা শুরু হওয়ার সাথে সাথেই চারদিক থেকে কাফেররা মুসলমানদের উপর প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে উৎপীড়ন ও নিপিড়ন শুরু করে। হযরত আবু বকর (রাঃ) যথেষ্ট প্রভাবশালী ও বিত্তবান হওয়া সত্ত্বেও কাফেররা তাঁকে এমন মারধর করে যে, তাঁর চেহারা, রক্তাক্ত এবং ভীবৎস হয়ে যায়। তাঁকে দেখে চেনার কোন উপায়ই ছিল না। জালেমদের নিষ্ঠুর অত্যাচারে তিনি বেহুস হয়ে যান। এ মর্মান্তিক খবর শুনে বনী তাইমের লোকজন তাঁকে নিয়ে যায়। অনেকেরই ধারণা ছিল যে, তিনি আর

বাঁচবেন না। হারাম শরীফে দাঁড়িয়ে বনী তাইমের বীর পুরুষরা ঘোষণা করল যে, এ দুর্ঘটনায় যদি আবু বকর (রাঃ) মারা যায়, তাহলে আমরা প্রতিশোধে ওতবা ইব্নে রাবীয়াকে হত্যা করব, কারণ তার ভূমিকা ছিল আবু বকর (রাঃ)-কে মারধরের ব্যাপারে অধিক।

হযরত আবু বকর (রাঃ) সন্ধ্যা পর্যন্ত অচেতন অবস্থায় থাকার পর যখন হুশ ফিরে এল, তখন প্রথম কথাই ছিল যে, আমার রাসূল (সাঃ) কি অবস্থায় আছেন? বনী তাইমের উপস্থিত লোকজন এ কথা শুনে তাঁকে নানান কথা বলতে লাগল যে, যার কারণে তোমার এ করুণ অবস্থা, আবারও তারই নাম। তারা তাঁর মাতা উম্মুল খায়ের (রাঃ)-কে বলে গেল যে, তাঁর জন্য কিছু আহারের ব্যবস্থা করতে। তাঁর মাতা কিছু খানা তৈরী করে তাঁকে খেতে বলল। একই কথা যে, আমার রাসূল (সাঃ)-এর অবস্থা কি? তিনি নিরাপদে কি আছেন? তাঁর মাতা বললেন, আমার তো জানা নেই তিনি কেমন আছেন? মাতাকে বললেন ওমরের বোন উম্মে জামীলের কাছে জিজ্ঞেস করতে, তিনি ছেলের কষ্ট সহ্য করতে না পেরে উম্মে জামীলের কাছে গিয়ে রাসূল (সাঃ)-এর অবস্থা জিজ্ঞেস করলে উম্মে জামীল (রাঃ) সাধারণ নিয়মানুসারে নিজের ইসলামকে কঠোরভাবে গোপন রেখে বললেন, অনুমতি হলে তাঁকে দেখে আসতে পারি। উম্মে খায়ের তাঁকে সাথে নিয়ে হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর কাছে এলেন। উম্মে জামিল তাঁর এ অবস্থা দেখে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। জালিমরা তাঁকে কিভাবে অত্যাচার করেছে? আল্লাহ্ তাদেরকে কঠোর শাস্তি দান করুন।

হযরত আবু বকর (রাঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, বল! আমার রাসূল (সাঃ)-এর অবস্থা কি? তিনি কেমন আছেন? উম্মে জামিল তাঁর মার দিকে ইশারা করে বললেন, তার বিষয়ে ভয়ের কোন কারণ নেই। তখন তিনি বললেন, রাসূল (সাঃ) ভাল আছেন। হযরত আরকামের ঘরে আছেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলে উঠলেন, আল্লাহ্র কসম আমি ঐ পর্যন্ত কিছুই খাবনা এবং পান করবনা যতক্ষণ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে দর্শন না করব। হযরত আবু বকরের কসম শুনে তাঁর মাতা আরও অস্থির হয়ে পড়লেন। কেননা, রাসূল (সাঃ)-এর সাথে সাক্ষাতের পূর্বে তিনি কিছুই খাবেন না। বাধ্য হয়ে তিনি এর ব্যবস্থা করলেন এবং কোন দুশমন দেখে ফেলে কিনা এ ভয়ে রাত গভীর হওয়ার অপেক্ষা করলেন। রাতে তিনি হযরত আবু বকর (রাঃ)-কে নিয়ে হযরত আরকামের ঘরে পৌছলেন। হযরত আবু বকর রাসূল (সাঃ)-কে দেখা মাত্র তাঁকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলেন। আর রাসূল (সাঃ) ও তাঁকে ধরে কাঁদতে লাগলেন এবং সমস্ত মুসলমানও কাঁদতে লাগলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) উম্মে খায়েরের দিকে

ইশারা করে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইনি আমার মা। তাঁর হিদায়েতের জন্য দোয়া করে ইসলামের দাওয়াত দিন। রাসূল (সাঃ) দোয়া করে মুসলমান হওয়ার দাওয়াত দিলেন, তিনি সাথে সাথেই ইসলাম গ্রহণ করলেন।

হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর অস্থিরতা

হযরত ওমর (রাঃ)-এর বীরত্ব; শক্তি ও নির্ভীকতা প্রবাদ বাক্যরূপে বিদ্যমান। আজ চৌদ্দ শত বছর পরেও তাঁর সে- কীর্তি বিশ্বময় প্রশংসিত। তিনিই সর্ব প্রথম মুসলমান, যিনি নিজের ইসলামের কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিলেন।এত বড় বীরপুরুষ হয়েও তিনি রাসূল (সাঃ)-এর ইন্তিকালে আত্মভোলা হয়ে ধৈর্যচ্যুত হয়ে যান। রাসূল (সাঃ)-এর মহব্বতে জ্ঞান হারা অবস্থায় উন্মুক্ত তরবারী হাতে নিয়ে ঘরের বাইরে এসে ঘোষণা করলেন, যে ব্যক্তি এ কথা বলবে যে, আমার রাসূল (সাঃ)-এর ইন্তিকাল হয়েছে, আমি তার গর্দান উড়িয়ে দিব। রাসূল (সাঃ) তো স্বীয় রবের সাথে সাক্ষাত করতে গেছেন। যেমন হযরত মূসা (আঃ) তূর পাহাড়ে আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাত করতে যেতেন। অচিরেই তিনি আবার আমাদের মাঝে ফিরে আসবেন। আমি তাদের হাত পা কেটে দিব যারা রাসূল (সাঃ)-এর ইন্তিকালের খবর ছড়িয়েছে। হযরত ওসমান (রাঃ) বাকশক্তি হারিয়ে একেবারে নিঃচুপ হয়ে বসে পড়লেন। দ্বিতীয় দিন পর্যন্ত তাঁর মুখ থেকে শব্দ বের হচ্ছিল না। মৃত্যুশোকে হযরত আলী (রাঃ) নড়াচড়া করার ক্ষমতাটুকুও হারিয়ে ফেললেন। একমাত্র হযরত আবু বকর (রাঃ) পাহাড়সম ধৈর্যের পরিচয় দিলেন। রাসূল (সাঃ)-এর সাথে অসাধারণ মহব্বত থাকা সত্বেও তিনি অত্যন্ত ধীরস্থির ও শান্তভাবে ঘরে প্রবেশ করলেন এবং প্রথমে রাসূল (সাঃ)-এর কপালে চুমু খেলেন। অতঃপর ঘর থেকে বের হয়ে হযরত ওমর (রাঃ) কে বললেন, হে ওমর ! বসে পড়। তারপর সবাইকে সম্বোধন করে একটি খোতবা দিয়ে তিনি বললেন, যে ব্যক্তি মুহাম্মদ (সাঃ)-কে ভালবাসে, সে যেন জেনে নেয় যে, মুহাম্মদ (সাঃ) -এর ইন্তিকাল হয়ে গেছে। আর যাঁরা এক আল্লাহ্‌র ইবাদত করে, তাঁদের উদ্দেশ্যে বলছি, সে আল্লাহ্ চিরঞ্জীব ও অমর । অতঃপর তিনি এ আয়াতে তিলাওয়াত করলেন–

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ -

" মুহাম্মদ (সাঃ) কেবলমাত্র একজন রাসূল ছিলেন। তাঁর পূর্বেও অনেক রাসূল গত হয়েছেন। "অতএব, তিনি যদি মারা যান অথবা শহীদ হন, তাহলে কি তোমরা ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করবে? হ্যাঁ, তোমরা যদি ইসলাম থেকে ফিরে যাও, তাতে আল্লাহ্‌র কোন ক্ষতি করতে পারবেনা, বরং নিজেরাই ক্ষতিগ্রস্থ

হবে। আর যারা হকের উপর অটল থাকবে, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাদের জন্য রয়েছে উত্তম প্রতিদান। যেহেতু আল্লাহ্ হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর মাধ্যমে খিলাফতের কাজ সমাধা করবেন, তাই তাঁকে সময়োপযোগী ধৈর্য, সহ্য ও জ্ঞান দান করেছিলেন। রাসূল (সাঃ)-কে কোথায় দাফন করা হবে- মদীনায়, নাকি মক্কায়, না বায়তুল মুকাদ্দাসে? এ নিয়ে সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিলে- তিনি ফয়সালা দিলেন যে, আমি রাসূল (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি ইরশাদ করেন, 'কোন নবী যেখানে ইন্তিকাল করেন সেখানেই তাঁর কবর হয়।' এভাবে একটি জটিল সমস্যার সমাধান হয়ে যায় তাঁর মাধ্যমে এবং তা সকলে মেনে নেন। তিনি ওয়ারিশী সম্পত্তির সমস্যার সমাধান এভাবে করলেন যে, তিনি বলেন, রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, নবীদের কোন উত্তরাধিকারী হয় না। তাঁদের ত্যাজ্য সম্পত্তি সদকা হিসাবে গণ্য হয়। তিনি খিলাফতের সমস্যার সমাধান করেন যে, রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, খিলাফতের হক্বদার একমাত্র কোরায়েশ বংশের লোক। রাসূল (সাঃ) আরও বলেন, যে ব্যক্তি মুসলমানদের খলীফা নিযুক্ত করার ব্যাপারে বে- পরওয়া হয়ে কাউকে আমীর মনোনীত করে তার উপর আল্লাহ্‌র লা'নত।

রাসূল প্রেমিক এক স্ত্রীলোকের অস্থিরতা

ওহুদ যুদ্ধে মুসলমানদের বিপর্যয়ে অনেক মুসলমান শাহাদাত বরণ করেন। এ ভয়াবহ দুর্ঘটনার খবর যখন মদীনায় পৌছে, তখন মেয়েলোকেরা পর্যন্ত অস্থির হয়ে ঘর থেকে বের হয়ে লোকজনকে জিজ্ঞেস করল, আমাদের রাসূল (সাঃ) কি অবস্থায় আছেন? এ মুহূর্তে কেহ তাঁকে খবর দিল যে, তোমার পিতা শহীদ হয়েছেন। তিনি ইন্নালিল্লাহ পড়লেন এবং অস্থির হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আমার রাসূল (সাঃ) কি অবস্থায় আছেন? তখন কেহ বলে উঠল, তোমার স্বামী শহীদ হয়েছেন। তিনি এবারও ইন্নালিল্লাহ পড়লেন এবং প্রচন্ড অস্থির অবস্থায় জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা বল, আমার রাসূল (সাঃ) কেমন আছেন? এভাবে কেহ তাঁকে বলল, তোমার ছেলে শহীদ হয়েছে। একজন এসে বলল, তোমার ভাই শহীদ হয়েছে । তিনি প্রতিবারই ইন্নালিল্লাহ পড়েছিলেন আর অস্থিরতার সাথে রাসূল (সাঃ)-এর কথা জিজ্ঞেস করছিলেন। অবশেষে লোকেরা তাঁকে বলল, রাসূল (সাঃ) ভাল আছেন এবং মদীনায় আসছেন। তিনি বললেন, আমি আমার মনকে বুঝ দিতে পারছি না ঃ তোমরা বল, রাসূল (সাঃ) এখন কোথায় আছেন? লোকেরা ইশারা করে বলল, রাসূল (সাঃ) ঐ দলে আছেন। তিনি দৌড়ে গিয়ে রাসূল (সাঃ)-কে এক বার দেখে চক্ষুকে শীতল করে

বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার দর্শন লাভের পর যাবতীয় দুঃখ-কষ্ট ও মুসিবত আমার কাছে অতি তুচ্ছ হয়েছে। আমার মাতা-পিতা আপনার উপর কোরবান হোক । হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি জীবিত আছেন। তাই পিতা, স্বামী ,পুত্র ও ভাইয়ের শহীদ হয়ে যাওয়াতে আমার কোন দুঃখ নেই। আপনিই আমার পরম শান্তনা।

রাসূল (সাঃ)-এর কাছ থেকে পুরস্কারপ্রাপ্ত সাহাবী কবি

কাআব ইবনে যুহাইর মুযানী ছিলেন জাহলি যুগের বিখ্যাত কবিদের একজন। হযরত ওমর (রাঃ) তাঁকে 'আশহারুশ শোয়ারায়িল আরব' তথা আরবের সর্বাপেক্ষা বেশী খ্যাতিমান কবি বলে অভিহিত করতেন। ৬ষ্ঠ হিজরীতে তাঁর ভাই বুজাইর (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করলে কাআব অত্যন্ত রুষ্ট হয়ে ওঠেন। বুজাইর বাধ্য হয়ে হিযরত করে চলে যান। এতে কাআব রাসূল (সাঃ) ও হযরত আবু বকর (রাঃ) এর বিরুদ্ধে অসৌজন্যমূলক কবিতা লিখে লিখে মদীনাগামী লোকদের হাতে নিজের ভাই বুজাইরের কাছে পাঠাতে থাকে। তিনি এসব কবিতা সম্পর্কে রাসূল (সাঃ)-এর অবহিত করলে তিনি অত্যন্ত মর্মাহত হয়ে বলেনঃ "কাআবকে দেখা মাত্র হত্যা করবে।" তারপর থেকে কাআব মক্কায় গিয়ে নিয়মিতভাবে কোরায়েশদের সাথে মিলে ইসলাম ও মুসলিম বিদ্বেষী তৎপরতায় বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে থাকে।

তায়েফ অভিযান থেকে রাসূল (সাঃ)-এর মদীনা ফেরার পর কাআবের ভাই বুজাইর ক্বাবকে চিঠি লিখে জানান যে, রাসূল (সাঃ) কঠিন থেকে কঠিনতর বিরোধী ও বিদ্বেষীকেও ক্ষমা করে দেন! তুমিও এসে তাঁর কাছে ক্ষমা চেয়ে নাও। রাসূল (সাঃ)-এর নির্দেশ শোনার পর ক্রমাগত বিরোধী গেত্রের কাছে কাআব আশ্রয় লাভের চেষ্টা করতে থাকে। কিন্তু সবাই যখন তাকে আশ্রয় দিতে অস্বীকার করে, তখন ভীষণভাবে উদ্বিগ্ন হয়ে মদীনা অভিমুখে যাত্রা করে । তাঁর রাসূলের দরবারে পৌঁছার ব্যাপারে বিভিন্ন রকম বর্ণনা রয়েছে। তিনি রাসূল (সাঃ)-এর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করে তাঁর খিদমতে তার বিখ্যাত স্তুতি পাঠ করে শুনান। এতে ৫৮টি পংক্তি ছিল।

এ কবিতা পঙক্তিগুলো শোনার সাথে সাথে হযরত (সাঃ) অথৈ সাগর উথলে উঠে। তিনি নিজের চাদরখানা কাঁধ থেকে খুলে যুহাইরের মাথায় দিয়ে দেন। যে লোকটি আজীবন রাসূল (সাঃ) অপচর্চায় মেতে থাকত সে আজ রাসূল (সাঃ) চাদর মোবারকের কোমল স্পর্শে বিনায়াবনত হয়ে পড়ল। রাসূল (সাঃ) এর দরবার থেকে কোন কবির পুরস্কারপ্রাপ্তির এটাই সর্বপ্রথম ঘটনা। বস্তুতঃ

এটি সে পবিত্র চাদর যেটি আমীর মুয়াবিয়া তাঁর খিলাফত আমলে যুহাইরের কাছ থেকে দশ হাজার দেরহামের বিনিময়ে কিনে নিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু যুহাইর এ বলে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন যে, "রাসূল (সাঃ)-এর দেয়া পবিত্র চাদর খানা অন্য কাউকে দিয়ে আমি তাকে নিজের উপর গুরুত্ব দিয়ে পারি না।"

অবশ্য আমীর মুয়াবিয়া (রাঃ) যুহাইর (রাঃ) এর মৃত্যুর পর এ চাদরটি তার পরিবারের কাছ থেকে থেকে বিপুল অর্থের বিনিময়ে কিনে নিয়েছিলেন। পরবর্তী উমাইয়া খলীফাগণ এ চাদরটি গায়ে জড়িয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ভাষণ দান করতেন। উল্লেখ্য যুহাইরের আলোচ্য স্তুতি কাব্যে প্রভাবিত হয়েই পরবর্তীকালে আবু আবদুল্লাহ্ শরফুদ্দীন মুহাম্মদ বুসাইরীও ৬০৮-৬৯৩ হিজরী) কাসীদায়ে নামে ১৬২ পঙক্তিবিশিষ্ট একখানা কাসীদা রচনা করেন। তখন তিনি ছিলেন অসুস্থ। কাসীদাটি রচনার পর তিনি স্বপ্নযোগে রাসূল (সাঃ) এর খিদমতে পেশ করলে রাসূল (সাঃ) তাঁকে নিজের চাদর উপহার দেন এবং তাঁর শরীরে হাত বুলিয়ে দেন। এতে সুস্থ হয়ে যান।

হযরত কাআব (রাঃ) ইবনে যাহাইরকে দেয়া রাসূল (সাঃ) যে চাদরটি নাকি আজো তুরস্কে সংরক্ষিত আছে।

হুদায়বিয়ার সন্ধি ও সাহাবীদের মনোভাব

ষষ্ঠ হিজরী সনে যিলকদ মাসে প্রসিদ্ধ হুদায়বিয়ার সংঘটিত হয়। প্রায় চৌদ্দ শত সাহাবী নিয়ে রাসূল (সাঃ) ওমরা করার উদ্দেশ্যে মক্কা মুকাররমাহ রওয়ানা হন। মক্কার কাফেররা খবর পেয়ে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিল যে, মুসলমানদেরকে মক্কায় প্রবেশ করতে দেয়ার জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি শুরু করল। তারা মক্কার আশে পাশে আরবের বিভিন্ন গোত্রের প্রতি তাদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসার জন্য আহবান করল। এদিকে রাসূল (সাঃ) যুল- হুলায়ফা নামক স্থানে পৌঁছে এক ব্যক্তিকে তথ্য সংগ্রহের জন্য মক্কায় পাঠালেন। লোকটি পূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করে আসফান নামক স্থানে রাসূল (সাঃ)-এর সাথে সাক্ষাত করে তথ্য দিল যে, মক্কায় কাফেররা এক শক্তিশালী দল গঠন করছে এবং পার্শ্ববর্তী গোত্রসমুহকেও তাদের সাহাযার্থে ডেকে পাঠিয়েছে। সাহাবীদের নিয়ে পরামর্শ করলেন রাসূল (সাঃ) এ পরিস্থিতিতে কি করা যায়? রাসূল (সাঃ) নিজেই বললেন, একটা কাজ এমন করা যেতে পারে যে, আমরা বাইরে থেকে সাহায্যকারীদের ঘর বাড়ি আক্রমণ করতে পারি। যখন তারা এ খবর শুনবে তখন তারা মক্কা অভিমুখ থেকে ফিরে চলে আসবে । অথবা কোথাও আক্রমণ না করে আমরা সম্মুখে অগ্রসর হতে পারি ।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) আরয করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! (সাঃ) এখন আপনি বায়তুল্লাহ শরীফ যিয়ারতে এসেছেন। যুদ্ধের কোন ইচ্ছা আদৌ নেই। এতে যদি বাধা প্রদান করে আমরা ও তাদের সাথে যুদ্ধ করব। রাসূল (সাঃ) এ প্রস্তাবে সম্মত হয়ে হোদায়াবিয়া নামক স্থানে পৌছলেন। তখন বোদায়েল ইব্‌নে ওরাকা একদল লোকসহ রাসূল (সাঃ)-এর সাথে সাক্ষাত করে বলল, হে মুহাম্মদ! আপনাকে মক্কাবাসীরা মক্কায় প্রবেশ করতে দিবেনা। তারা যুদ্ধের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তত। রাসূল (সাঃ) বললেন, আমরা তো যুদ্ধের জন্য আসিনি, উদ্দেশ্য হল শুধু ওমরা করা। তিনি আরও বললেন, লাগাতার যুদ্ধ বিগ্রহে আমাদের যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে । আমরা ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে। তাঁরা সম্মত হলে আমরা তাদের সাথে সন্ধি করতে প্রস্তুত। যেন আমরা পরস্পর আর কোন যুদ্ধ বিগ্রহ না করি । তারা যদি এতে সম্মত না হয়, তাহলে আমি আল্লাহ্‌র কসম করে বলছি যার কুদরতী হাতে আমার জান, আমি ঐ পর্যন্ত তাদের সাথে যুদ্ধ করব যতক্ষণ পর্যন্ত ইসলাম জয়যুক্ত না হবে অথবা আমার গর্দান দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন না হবে। বোদায়েল বলল, আপনার প্রস্তাব তাদের কাছে পৌছে দিচ্ছি,। সুতরাং সে মক্কার কাফেরদের কাছে রাসূল (সাঃ) এর প্রস্তাব পৌছালে এতে তারা কোন কর্ণপাত করল না।

এভাবে কয়েক দফা আলাপ-আলোচনা চলাশেষে ওরওয়া ইব্‌নে মাসউদ সাকাফী কাফেরদের প্রতিনিধি হয়ে রাসূল (সাঃ)-এর কাছে এসে বলল, হে মুহাম্মদ! আপনি যদি চান যে, সমস্ত আরববাসীকে ধ্বংস করে দিবেন, তা কখনও সম্ভব নয়। কেননা, এরূপ কোন নজীর ইতিহাসে নেই যে, কেহ তাদেরকে ধ্বংস করতে পেরেছে। আর যদি তারা আপনার উপর জয়ী হয়, তাহলে আপনার রক্ষা নেই। কেননা, আপনার চারদিকে নীচু শ্রেণীর লোকজন দেখতে পাচ্ছি। বিপদের সময় তারা আপনাকে ছেড়ে পালিয়ে যাবে। এ কথা শুনা মাত্র হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) বজ্রকণ্ঠে বলে উঠলেন। হে দুর্ভাগা, কি করে ধারণা করলি যে , আমরা রসূল (সাঃ)-কে একাকী ছেড়ে পালিয়ে যাব?

ওরয়াহ্ জিজ্ঞেস করল, ইনি কে? রাসূল (সাঃ) বললেন, আবু বকর (রাঃ)। ওরয়াহ্ হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-কে লক্ষ্য করে বলল, তোমার বহু দিনের একটা এহ্‌সান আমার কাঁছে রয়েছে, যার প্রতিদান আমি এখনও দিতে পারিনি, নচেত আমি তোমার কথার সমুচিত জবাব দিতাম। অতঃপর সে পুনরায় রাসূল (সাঃ)-এর সাথে কথাবার্তায় লিপ্ত হল। আরবের দস্তুর মোতাবেক সে কথায় কথায় রাসূল (সাঃ)-এর দাড়ি মোবারকের দিকে হাত প্রসারিত

করত।এ দৃষ্টতাপূর্ণ আচরণ সাহাবায়ে কিরাম কিভাবে সহ্য করতেন? তাই স্বয়ং তারই ভ্রাতুষ্পুত্র হযরত মুগীরা ইব্‌নে শোবা (রাঃ) লৌহ শিরস্ত্রাণ পরিহিত অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত পাশেই দন্ডায়মান ছিলেন। তিনি তরবারীর খাপ ওরওয়ার হাতে মেরে বলে উঠল, বে- আদব, হাত সরিয়ে রাখ। ওরওয়াহ জিজ্ঞেস করল, ইনি কে? রাসূল (সাঃ) বললেন, মুগীরা ইব্‌নে শোবা।

স্বীয় ভাতিজার পরিচয় পেয়ে ওরওয়া বলল, তোর গাদ্দারীর পরিণতি আমি এখনও ভুগছি, আর তোর এরূপ ব্যবহার? হযরত মুগীরা (রাঃ) ওরওয়ার ভাতিজা ছিলেন, ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তিনি কয়েক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলেন। ওরওয়া সে হত্যার জরিমানা তখনও আদায় করছিল। একথার সে দিকেই ইঙ্গিত ছিল। অতঃপর সে রাসূল (সাঃ)-এর সাথে আলাপ আলোচনায় লিপ্ত হল। মোটকথা সে দীর্ঘক্ষণ (সাঃ) রাসূল (সাঃ) -এর সাথে কথাবার্তার ফাঁকে ফাঁকে সাহাবায়ে কিরামের অবস্থাও পর্যবেক্ষণ করতে থাকে। পরিশেষে মক্কাবাসীদের কাছে গিয়ে সে এরূপ তথ্য দেয় যে, হে কোরায়েশগণ ! আমি কায়সার ও কিসরা এবং নাজ্জাশীর শাহী দরবারে গিয়েছি। আমি দুনিয়ার কোন বাদশাহ্‌কে এত শ্রদ্ধা তার সভাসদকে করতে দেখিনি, যত শ্রদ্ধা মুহাম্মদকে তাঁর সাহাবারা করেন। মুহাম্মদ থুথু ফেললে যাঁর হাতে পড়ে সে তা মুখে ও শরীরে মেখে নেয়। তাঁর আদেশ পাওয়া মাত্র সাথে সাথে তা পালন করার জন্য সবাই ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাঁর অযূর পানি নিয়ে পরস্পরে কাড়া কাড়ি লেগে যায়। তাঁর অযূর পানি মাটি স্পর্শ করার পূর্বেই তাঁরা হাতে, গায়ে মালিশ করে নেয়। কেহ এক বিন্দুও না পেলে, অন্যের ভিজা হাত নিজের মুখে মালিশ করে। তাঁরা মুহাম্মদের সামনে খুব নীচু স্বরে কথা বলেন। শ্রদ্ধায় কেহ তাঁর দিকে মাথা উচুঁ করে তাকায় না। তাঁর মাথার অথবা দাঁড়ির কোন চুল পড়লে শ্রদ্ধার সাথে তা উঠিয়ে রাখে।

মোটকথা, মনিবের এত শ্রদ্ধা করতে আমি আর কোথাও দেখিনি। ইত্যবসরে, রাসূল (সাঃ)-এর দূত হিসাবে হযরত ওসমান (রাঃ) মক্কার নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনার জন্য সেথায় পৌছলেন । মুসলমান হলেও মক্কাবাসীদের অন্তরে তাঁর প্রতি যথেষ্ট সম্মান ছিল। এ জন্যে তাঁর ব্যাপারে তেমন ভয়ের কোন কারণ ছিলনা। তাঁকে মক্কায় পাঠানোর পর সাহাবীরা বলাবলি করতে লাগলেন, ওসমান কাবা শরীফে তাওয়াফ করবে আর আমরা রয়ে গেলাম।

তখন রাসূল (সাঃ) বললেন, আমার তো মনে হয় না, ওসমান আমাকে ছেড়ে তাওয়াফ করবে। মক্কায় আবান ইব্‌নে সাঈদ হযরত ওসমান (রাঃ)-কে আশ্রয় দিয়ে বলল, আপনি যেথায় ইচ্ছা যেতে পারেন ; কেহ আপনাকে বাধা

দিবে না। তিনি সেখানে আবু সুফিয়ান সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দের কাছে রাসূল (সাঃ)-এর প্রস্তাব পৌছে দিলেন। মক্কা থেকে ফেরার পথে কাফেররাই বলল, আপনি কাবা ঘর তাওয়াফ করে যান। তিনি বললেন, তা কখনও হতে পারে না যে, রাসূল (সাঃ) বাধাগ্রস্থ থাকবেন আর আমি তাওয়াফ করব। এতে কোরাইশগণ ক্ষুব্ধ হয়ে হযরত ওসমান (রাঃ)-কে বন্দী করলে মুসলমানদের কাছে সংবাদ পৌছে যে, ওসমান (রাঃ)-কে শহীদ করা হয়েছে। এ সংবাদে রাসূল (সাঃ) জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যুদ্ধ করার জন্য বায়আত গ্রহণ করলেন। সমস্ত সাহাবী (রাঃ)-গণ মরণপণ যুদ্ধের জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ হলেন। এ বায়আতকেই বায়আতে রিদওয়ান বলা হয়। অর্থাৎ- স্বেচ্ছায় জীবন উৎসর্গ করার অঙ্গীকার। মুসলমানদের এরূপ দৃঢ়সংকল্পের সংবাদ শুনে মক্কার কাফেররা ঘাবড়ে গিয়ে হযরত ওসমান (রাঃ) কে ছেড়ে দেয়। এ ঘটনায় হযরত আবু বকর (রাঃ) এর ওরওয়াকে গালি দেয়া, মুগীরার আঘাত, সাহাবাদের রাসূল (সাঃ)-এর সাথে সাধারণ ব্যবহার সম্পর্কীয় ওরওয়ার তথ্য, ওসমান (রাঃ)-এর তওয়াফ থেকে অস্বীকৃতি প্রভৃতি ঘটনাবলী রাসূল (সাঃ) সাথে সাহাবাদের পরম ভালবাসারই নিদর্শন।

হযরত ইব্‌নে যোবায়ের (রাঃ)-এর রক্ত পান

রাসূল (সাঃ) একবার সিঙ্গা লাগিয়ে দেহ মোবারক থেকে কিছু রক্ত বের করলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌নে যুবায়ের (রাঃ)-কে বললেন, এ রক্তগুলো কোথাও পুঁতে রাখ। তিনি এসে আরয করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহু! পুঁতে রেখেছি। রাসূল (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, কোথায়? তিনি বললেন, আমি সেগুলো পান করে ফেলেছি। রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করলেন, যে শরীরে আমার রক্ত প্রবেশ করেছে, তাঁর জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম।

হযরত আবু ওবায়দা (রাঃ)-এর রক্ত পান

ওহুদের যুদ্ধে রাসূল (সাঃ)-এর মাথায় যখন দু'টি লোহার কড়া ঢুকে গিয়েছিল তখন হযরত আবু বকর (রাঃ) দৌঁড়ে আসলেন, অন্য দিক থেকে হযরত আবু ওবায়দা (রাঃ)ও দৌড়ে এসে রাসূল (সাঃ)-এর মাথা থেকে দাঁত দ্বারা লোহার কড়া খুলতে লাগলেন। লোহার কড়া বের করলেন কিন্তু তাতে তাঁর একটি দাঁত ভেঙ্গে গেল। তিনি এদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে দ্বিতীয় কড়াটিও খুলতে লাগলেন। দ্বিতীয় কড়াটিও বের হয়ে আসল কিন্তু তাঁর আরও একটি দাঁত ভেঙ্গে গেল। কড়া খোলার ফলে রাসূল (সাঃ)-এর শরীর মোবারক থেকে রক্ত প্রবাহিত হতে লাগল। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)-এর পিতা রক্তগুলো

চুষে ফেললেন। রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করলেন, যে শরীরে আমার রক্ত ঢুকেছে তাঁকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না।

হযরত যায়েদ ইব্‌নে হারেসা (রাঃ) কর্তৃক পিতাকে অস্বীকৃতি

জাহেলিয়াতের যুগে হযরত যায়েদ ইব্‌নে হারেস (রাঃ) মাতার সাথে নানার বাড়ী যাচ্ছিলেন। রাস্তায় বনী কায়েস তাদের কাফেলাকে লুট করে, যার মধ্যে যায়েদ (রাঃ)ও ছিলেন। বনী কায়েস হযরত যায়েদ (রাঃ)-কে মক্কায় এনে বিক্রি করে দেয়। হাকিম ইব্‌নে হেযাম আপন ফুফু হযরত খাদীজাতুল কুবরা (রাঃ)-এর জন্য যায়েদ (রাঃ)-কে খরিদ করেন।

রাসূল (সাঃ)-এর সাথে হযরত খাদীজা (রাঃ)-এর বিবাহের পর তিনি হযরত যায়েদ (রাঃ)-কে হাদীয়া স্বরূপ রাসূল (সাঃ)-এর খিদমতে পেশ করেন। এদিকে যায়েদ (রাঃ)-কে হারিয়ে তার পিতা বিচ্ছেদের আগুনে দগ্ধ হতে থাকে এবং কেঁদে কেঁদে কবিতা পড়তে থাকেন। যার অর্থ এরূপ– 'আমি যায়েদের বিরহে কাঁদছি, আমি এটাও জানিনা যে, যায়েদ জীবিত না মৃত। আল্লাহ্‌র কসম! আমি এ কথাও জানিনা যে, যায়েদকে নরম জমীন ধ্বংস করল, না পাহাড়। আফ্‌সোস! আমি যদি জানতে পারতাম, তুমি আবার ফিরে আসবে কি না! তোমার ফিরে আসাটাই আমার জীবনে শেষ আশা। যখন সূর্য উঠে তখন যায়েদই আমার মনে উঁকি মারে। আর বাতাস যখন একটু বেগে চলে তখনও যায়েদ এসে আমার মনে ব্যথা দেয়।' হায়! আমার দুশ্চিন্তা ও ফিকির কত দীর্ঘ? আমি তার তালাশে দ্রুতগামী উটকে কাজে লাগাব। উট যদি ক্লান্ত হয়ে পড়ে, আমি কখনও ক্লান্ত হব না। হায়! যদি আমার মৃত্যু এসে যায়, তাহলে আমার সব আশাকে ধ্বংস করে দিবে। কিন্তু আমি আমার আত্মীয়কে অসিয়ত করে যাব। তারাও যেন আমার কলিজার টুকরা প্রিয় যায়েদকে এ ভাবেই তালাশ করা অব্যাহত রাখে। এভাবে হযরত যায়েদ (রাঃ)-এর পিতা কবিতা পড়ে পড়ে অশ্রু জলে ভাসত আর যায়েদ (রাঃ)-কে তালাশ করত। ঘটনাক্রমে তার গোত্রের কিছু লোক মক্কায় হজ্ব করতে এসে যায়েদ (রাঃ)-এর সাথে তাঁদের সাক্ষাত হয়। তাঁরা হযরত যায়েদ (রাঃ) কে চিনে ফেলে। তাঁর পিতার দুরাবস্থার কথা বলল এবং কয়েকটি কবিতা আবৃতি করে শুনাল। হযরত যায়েদ (রাঃ) পিতার কাছে তিনটি লাইন কবিতাকারে লিখে তাঁদের হাতে পাঠিয়ে দিলেন। যার অর্থ হল– 'আমি এখানে মক্কা নগরীতে বড়ই সুখে-শান্তিতে রয়েছি। আপনি কোন দুশ্চিন্তা করলেন না। আমি এখানে অত্যন্ত শরীফ লোকের ক্রীতদাস হিসাবে নিযুক্ত রয়েছে।'

তারা গিয়ে পিতার কাছে হযরত যায়েদ (রাঃ) এর খবর দিল এবং তাঁর ঠিকানাও বলে দিল। সংবাদ শুনে হযরত যায়েদ (রাঃ)-এর পিতা ও চাচা তাঁকে গোলামী থেকে মুক্ত করে নিয়ে আসার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ টাকা-কড়ি নিয়ে মক্কা নগরীর দিকে রওয়ানা হল। মক্কায় পৌঁছে রাসূল (সাঃ)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করল; 'হে হাসেমের আওলাদ! আপনারা স্বীয় কওমের সর্দার, হারাম শরীফের অধিবাসী, আল্লাহ্‌র ঘরের প্রতিবেশী। আপনারা স্বয়ং কয়েদীকে মুক্তিদান করেন আর ক্ষুধার্তকে অন্নদান করে থাকেন। আমরা আপন সন্তানের তালাশে আপনার খিদমতে উপস্থিত হয়েছি। আমাদের উপর অনুগ্রহ করে বিনিময় গ্রহণ করুণ।' তাকে মুক্তি দিন, বিনিময়ে ফিদিয়ার চেয়ে অধিক গ্রহণ করুন। রাসূল (সাঃ) বললেন, তোমাদের আসল উদ্দেশ্য কি পরিস্কার করে বল। তারা বলল, আমরা যায়েদের খোঁজে এসেছি। তারা বলল, এটাই আমাদের উদ্দেশ্য। রাসূল (সাঃ) বললেন, জিজ্ঞেস কর । সে যদি তোমাদের সাথে যায়, তাহলে নিয়ে যাও, কোন বিনিময়ের প্রয়োজন নেই। আর যদি সে স্বেচ্ছায় যেতে না চায়, তাহলে আমি তাকে যেতে বাধ্য করতে পারিনা।

হযরত যায়েদ (রাঃ)-কে রাসূল (সাঃ) বললেন, তুমি ইচ্ছে করলে তোমার পিতার সাথে চলে যেতে পার। আর ইচ্ছা করলে, তুমি আমার কাছে থেকে যেতে পার। হযরত যায়েদ (রাঃ) আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনার পরিবর্তে অন্য কাউকে গ্রহণ করতে পারি না। পিতার ও চাচার স্থলে আপনিই আমার জন্য যথেষ্ট । এ কথা শুনে হযরত যায়েদ (রাঃ)-এর পিতা ও চাচা বললেন, যায়েদ! তুমি কি আযাদ হওয়ার স্থলে গোলাম হওয়াটাকেই প্রাধান্য দিচ্ছ? আর পরিবার পরিজনের সাথে স্বাধীনভাবে সুখে-স্বাচ্ছন্দে জীবন যাপন করার স্থলে ক্রীতদাস হওয়াটা কি পছন্দ করছ? যায়েদ (রাঃ) উত্তর দিলেন, হ্যাঁ! আমি রাসূল (সাঃ)-এর মাঝে এমন জিনিস দেখেছি, যার পরিবর্তে অন্য কোন জিনিসকেই আর পছন্দ করতে পারছি না। এ কথা শুনে রাসূল (সাঃ) হযরত যায়েদ (রাঃ)-কে বুকে টেনে নিয়ে বললেন, যায়েদ, আজ থেকে তোমাকে আমার পুত্র হিসাবে গ্রহণ করলাম। এ অপূর্ব দৃশ্য দেখে যায়েদ (রাঃ) এর পিতা ও চাচা সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে রেখেই চলে গেল। হযরত যায়েদ (রাঃ) তখন অল্প বয়স্ক কিশোর ছিলেন। এমন বয়সে পিতা মাতা ও সমস্ত আত্মীয়-স্বজনকে বিসর্জন দিয়ে রাসূল (সাঃ)-এর গোলামী করা কতটুকু মহব্বতের পরিচায়ক তা বলার অপেক্ষা রাখেনা।

ওহুদের যুদ্ধে হযরত আনাস ইব্‌নে নযর (রাঃ)-এর শাহাদত

চরমভাবে ওহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের বিপর্যয় ঘটেছিল। এহেন পরিস্থিতিতে মিথ্যা খবর ছড়িয়ে পড়ল যে, রাসূল (সাঃ) শহীদ হয়েছেন। এ ভয়াবহ খবরে সাহাবীদের মধ্যে কিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তা বলাই বাহুল্য । এতে সমস্ত সাহাবী (রাঃ) নিরাশ হয়ে গেল। হযরত আনাস ইব্‌নে নযর (রাঃ) যাচ্ছিলেন, এমন সময় তিনি মোহাজির ও আনসারদের একটি জামায়াতকে দেখলেন, যার মধ্যে হযরত ওমর (রাঃ) ও হযরত তালহা (রাঃ)ও ছিলেন। তিনি সবাইকে অস্থির অবস্থায় দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কি ব্যাপার? সবাইকে অস্থির দেখা যাচ্ছে। তাঁরা উত্তর দিলেন, রাসূল (সাঃ) শহীদ হয়েছেন। এ কথা শুনে আনাস (রাঃ) বললেন, তাহলে তো আর বেঁচে থেকে কোন লাভ নেই। এ বলে তরবারী হাতে নিয়ে কাফেরদের সাথে বীর বিক্রমে যুদ্ধ করতে করতে শাহাদাত বরণ করলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল নবীর দর্শনের জন্যই জীবিত আছি, তাঁর অবর্তমানে এ জীবন থেকে আর কি হবে? তাই তিনি রাসূল (সাঃ)-এর মহব্বতে নিজের জীবন উৎসর্গ করতে দ্বিধা করলেন না।

ওহুদের ময়দানে সা'আদ ইব্‌নে রাবী (রাঃ)-এর পয়গাম

ওহুদের যুদ্ধে রাসূল (সাঃ) বললেন, না জানি সা'আদ ইব্‌নে বারীর কি অবস্থা হল? এ বলে তিনি একজন সাহাবীকে তাঁর তালাশে পাঠিয়ে দিলেন। তিনি আহতদের মধ্যে নাম ধরে ডেকে ডেকে তালাশ করতে লাগলেন । হঠাৎ এক স্থান থেকে খুব ক্ষীণ উত্তর শুনা গেল। তিনি সেখানে খুব দ্রুত গিয়ে দেখলেন যে, সাতজন শহীদের মধ্যে তিনি কাতরাচ্ছেন, মাত্র দু'একটি নিঃশ্বাস বাকী আছে। সাহাবীকে দেখা মাত্রই হযরত সা'আদ (রাঃ) বললেন, রাসূল (সাঃ) কে আমার সালাম পেশ করবে আর বলবে, আল্লাহ তাআলা আপনাকে আমার পক্ষ থেকে উত্তম বিনিময় দান করুন যা কোন নবীকে তাঁর উম্মতের পক্ষ থেকে উত্তম বিনিময় দান করেছেন। আর মুসলমানদেরকে আমার এ পয়গাম পৌঁছিয়ে দিবে যে, তোমাদের মধ্যে একজন মানুষও জীবিত থাকতে যদি কোন কাফের রাসূল (সাঃ) পর্যন্ত পৌঁছে যায়, তবে আল্লাহ্‌র দরবারে তোমাদের কোন ওযর আপত্তি চলবে না। এ কথা বলার সাথে সাথে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। বাস্তবিকই এসব মহাপুরুষগণই নবী প্রেমের পরিপূর্ণ হক আদায় করে গেছেন। আল্লাহ্ তাঁদের কবরকে নূর দ্বারা আলোকিত করে দিন।

ক্ষতবিক্ষত শরীর নিয়ে জীবনের শেষ মুহূর্তে উপনীত, তবুও নিজের জন্য নেই কোন অভিযোগ। নেই কোন অস্থিরতা, আছে শুধু প্রাণের চেয়েও অধিক প্রিয়নবী (সাঃ)-এর হিফাযতের চিন্তা। তাঁর জন্য জান কোরবান করার ফিকির। হায়! আল্লাহ্ যদি আমাদের মত অধমকেও তাঁদের মত মহব্বতের সামান্যতম অংশ দান করতেন।

রাসূল (সাঃ)-এর কবর দেখে এক রমণীর মৃত্যু

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর খিদমতে একজন মেয়ে লোক এসে আরয করল, আমাকে রাসূল (সাঃ)-এর কবর যিয়ারত করিয়ে দিন। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) হুজরা মোবারক খুলে দিলেন। মেয়েলোকটি কাঁদতে লাগলেন। অবশেষে কেঁদে কেঁদে সেখানেই তার ইন্তিকাল হল। মহব্বতের এমন নজীর কি কোথাও পাওয়া যাবে? কবর যিয়ারত করে রাসূল (সাঃ)-এর বিচ্ছেদ বেদনা সহ্য করতে পারলেন না, আর সেখানেই মৃত্যুবরণ করলেন।

সাহাবী (রাঃ)-দের নবী প্রেমের বিভিন্ন কাহিনী

হযরত আলী (রাঃ)-কে কেহ জিজ্ঞেস করল, রাসূল (সাঃ) এর সাথে আপনার কতটুকু মহব্বত ছিল? তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র কসম, রাসূল (সাঃ) আমাদের কাছে নিজেদের জান-মাল, সন্তান-সন্ততি, পিতা-মাতা ও ভীষণ পিপাসার সময় ঠান্ডা পানি থেকেও অধিক প্রিয় ছিলেন। তিনি সত্যই বলেছেন, প্রকৃতপক্ষে তাঁরাই কামেল মুমিন অর্থাৎ পরিপূর্ণ মো'মিন ছিলেন।

আল্লাহ্ তা'য়ারা ইরশাদ করেন–

قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَاۤؤُكُمْ وَاَبْنَاۤؤُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَاَمْوَالُ نِ اقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَاۤ اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَجِهَادٍ فِىْ سَبِيْلِهٖ فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰى يَاْتِىَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَاسِقِيْنَ ـ

অর্থ ঃ হে রাসূল! আপনি তাদেরকে বলেদিন, তোমাদের পিতা, তোমাদের

পুত্র, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের পরিবার পরিজন আর যে ধন সম্পদ তোমরা অর্জন করেছ আর যে সব ব্যবসায় তোমাদের ঘাটতির আশংকা নেই আর যেসব ঘর বাড়ী তোমরা পছন্দ কর এসব বস্তু যদি তোমাদের কাছে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল এবং আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করা থেকে অধিকতর প্রিয় হয়, তাহলে তোমরা সে সময়ের অপেক্ষা কর, যখন আল্লাহ্ তাআলা ধ্বংসের হুকুম নাযিল করবেন। মনে রাখবে, আল্লাহ্ তায়া'লা আদেশ অমান্যকারীদের সুপথ দেখান না। এ আয়াতে এসব বস্তু থেকে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের মহব্বত কম হওয়ার উপর শাস্তির ভয় প্রদর্শন করা হয়েছে। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, তোমাদের মধ্যে এ ব্যক্তি প্রকৃত মো'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার মহব্বত তার মাতা-পিতা, সন্তান-সন্ততি ও সমস্ত লোক থেকে বেশী না হয়। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকেও অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। ওলামাগণ এ হাদীসের এরূপ ব্যাখ্যা করেছেন যে, এখানে মহব্বত দ্বারা ইখতিয়ার ভুক্ত মহব্বত বুঝানো হয়েছে। স্বভাবজাত মহব্বত নয় যা স্বাভাবিক ভাবে ছেলে-মেয়ে ও স্ত্রী-পুত্রের জন্য হয়ে থাকে। রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেন, তিনটি বস্তু এমন রয়েছে, যার মধ্যে এগুলো পাওয়া যায়, সে ঈমানের স্বাদ গ্রহণ করে। প্রথমতঃ যাবতীয় বিষয় বস্তু থেকে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের মহব্বত অধিক হওয়া। দ্বিতীয়তঃ যাকেই ভালবাসবে একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্যই ভালবাসবে। তৃতীয়তঃ ইসলাম পরিত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে যাওয়া আগুনে পড়ে যাওয়া থেকেও অধিক কষ্টকর।

হযরত ওমর (রাঃ) একবার বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার জীবন ব্যতীত বাকী সব বস্তু থেকে আপনি আমার নিকট অধিকতর প্রিয়। রাসূল (সাঃ) বললেন, কোন ব্যক্তি প্রকৃত মো'মিন হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত সে আমাকে তার নিজের জীবন থেকেও অধিক মহব্বত না করবে। তখন হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! (সাঃ) আপনি আমার জীবন থেকেও অধিক প্রিয়। রাসূল (সাঃ) বললেন, ওমর! তুমি এ মাত্রই প্রকৃত মো'মিন বলে গণ্য হলে। অথবা তোমার এখন বুঝে আসল? অথচ এ বিষয়টি পূর্বেই বুঝে আসা উচিত ছিল। হযরত সোহায়েল তসতরী (রহঃ) বলেন, যে ব্যক্তি প্রতিটি ক্ষেত্রে রাসূল (সাঃ)-কে আপন অভিভাবক মনে করে না করে এবং নিজর নফস্‌কে নিজের অধীন মনে করে, সে ইসলামের স্বাদ গ্রহণ করতে পারবে না। এক সাহাবী

রাসূল (সাঃ)-কে দরবারে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করে কিয়ামত কবে হবে? তিনি (সাঃ) বললেন, কিয়ামতের জন্য এমন কি পাথেয় প্রস্তুত করে রেখেছ যে, এত অধির আগ্রহে অপেক্ষা করছ? তিনি বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! (সাঃ) নামায, রোযা, সদ্‌কা খয়রাত খুব একটা জমা করতে পারিনি, তাহলে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সাঃ)-এর মহব্বত আমার অন্তরে আছে।

রাসূল (সাঃ) বললেন, তুমি যাকে ভালবাসবে কিয়ামতের দিন তুমি তাঁর সাথে থাকবে। হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌নে মাসউদ (রাঃ) হযরত আবু মূসা আশয়ারী (রাঃ) হযরত সফ্‌ওয়ান (রাঃ) ও হযরত আবুযর গেফারী (রাঃ) প্রমুখ সাহাবায়ে কিরাম থেকেও অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, সাহাবায়ে কিরাম রাসূল (সাঃ)-এর বর্ণনা তাঁরা যতটুকু শুনে যতটুকু আনন্দিত হয়েছিলেন অন্য কোন কথায় এতটুকু আনন্দিত হননি। কেন হবেন না? তাঁদের প্রতিটি শিরা উপশিরা রাসূল (সাঃ)-এর মহব্বতে ছিল পরিপূর্ণ। হযরত ফাতিমা (রাঃ)-এর বাড়ী, রাসূল (সাঃ)-এর বাড়ী থেকে একটু দূরে ছিল। একদিন রাসূল (সাঃ) ফাতিমা (রাঃ)-কে বললেন, আমার মন চায় তোমার বাড়ীটা যদি আমার বাড়ীর কাছে হত! হযরত ফাতিমা (রাঃ) আরয করলেন, আব্বাজান! হারেসা (রাঃ)-এর বাড়ী আপনার বাড়ীর সবচেয়ে কাছে। আপনি বললেই আমার বাড়ীর সাথে তাঁর বাড়ী বদলে নেয়া যেতে পারে। তিনি (সাঃ) বললেন, এর পূর্বেও তাঁর সাথে একটি বাড়ী আমি বদল করেছি, এখন আবার এ কথা বলতে লজ্জাবোধ হচ্ছে। হযরত হারেসা (রাঃ) রাসূল (সাঃ)-এর এ অভিপ্রায় জানতে পেরে আরয করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! (সাঃ) আমি ও আমার যাবতীয় সম্পদ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের জন্যই। আমি জানতে পেরেছি, ফাতেমা (রাঃ)-এর বাড়ী নাকি আপনার কাছে আনতে চান। ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার বাড়ী থেকে অন্য কারও বাড়ী এর চেয়ে কাছে নেই। যে কোন বাড়ী বদল করতে আমি প্রস্তুত। হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি আল্লাহ্‌র কসম করে বলছি, আমার যে মালটিই আপনি গ্রহণ করবেন, তা এ মাল থেকে উত্তম যা আমার কাছে রয়ে যাবে। রাসূল (সাঃ) তাঁর কথায় সন্তুষ্ট হয়ে বরকতের জন্য দোয়া করে একটি বাড়ী বদল করে নিলেন।

একজন সাহাবী (রাঃ) রাসূল (সাঃ)-এর খিদমতে এসে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! (সাঃ) আপনার মহব্বত আমার অন্তরে আমার জান মাল, পরিবার

পরিজন সবকিছু থেকে অধিক। আমি যখন ঘরে থাকি আর আপনার কথা মনে পড়ে যায়, তখন যতক্ষণ পর্যন্ত খিদমতে হাযির হয়ে আপনাকে এক নযর দেখে না নেই, ততক্ষণ পর্যন্ত আমার কোন হুশ থাকে না। কিন্তু আমি বড় চিন্তিত হয়ে পড়েছি, মৃত্যু তো অবশ্যই আমার কাছেও আসবে, আপনার কাছেও আসবে। আপনি তো জান্নাতে চলে যাবেন , আমি তো আর আপনাকে দেখতে পাব না। এ কথা শুনে রাসূল (সাঃ) চুপ রইলেন, ইত্যবসরে হযরত জিব্‌রাঈল আলাইহি সাল্লাম এসে এ আয়াত পাঠ করলেন।

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاۤءِ وَالصّٰلِحِيْنَ وَحَسُنَ اُولٰٓئِكَ رَفِيْقًا ذٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللّٰهِ وَكَفٰى بِاللّٰهِ عَلِيْمًا ـ

অর্থ ঃ যাঁরা আল্লাহ্ ও রাসূলের তাবেদারী করবে তাঁরা পরকালে ঐসমস্ত লোকের সাথে থাকবে যাঁদেরকে আল্লাহ্ পুরস্কৃত করেছেন। (আর তাঁরা হলেন) আম্বিয়া, সিদ্দীকীন, শহীদান ও নেককারগণ এবং এসব লোক তাঁদের সাথী হবেন। তাঁদের সাথে হাশর হওয়াটা আল্লাহ্‌র মেহেরবাণীতে হবে। আল্লাহ্ তাআলা প্রত্যেকের আমল সর্ম্পকে যথেষ্ট অবগত আছেন। রাসূল (সাঃ) উক্ত সাহাবীকে এ আয়াত শুনালেন। অপর একজন সাহাবীও রাসূল (সাঃ)-এর খিদমতে এসে আরয করলেন, আমি আপনাকে এত বেশী মহব্বত করি যে, আপনার কথা মনে পড়লেই আমি দরবারে হাযির হয়ে এক নজর না দেখলে আমার জান বের হয়ে যাবে। ইয়া রাসূলুল্লাহ! (সাঃ) আমার চিন্তা হচ্ছে যে, আমি যদি জান্নাতেও যাই তবুও তো আপনার নীচেই থাকব। তখন আপনার যিয়ারত ব্যতীত আমি জান্নাতে কি করে থাকব? রাসূল (সাঃ) তাঁকেও উপরোক্ত আয়াত শুনালেন। একটি হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (সাঃ) একজন আনসারীকে খুবই চিন্তাযুক্ত দেখে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এত চিন্তিত কেন? তিনি আরয করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! (সাঃ) প্রত্যেহ সকাল বিকাল খিদমতে হাযির হয়ে আপনার দর্শন লাভে ধ্যন্য হই। কিন্তু কাল কিয়ামতে আপনি তো আম্বিয়াদের স্থানে পৌছে যাবেন। আমরা তো সেখানে পৌছতে পারব না। রাসূল (সাঃ) চুপ রইলেন, যখন এ সম্পর্কিত আয়াত অবতীর্ণ হল, তখন তাঁকে সুসংবাদ দিলেন। রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেন, আমার পরে এমন লোক সৃষ্টি

হবে যারা আমাকে এতই মহব্বত করবে যে, তারা আপন পরিবার পরিজন এবং জান মালের বিনিময়ে হলেও আমাকে এক নজর দেখার আকাংখা করবে।

হযরত আবদাহ্ বিন্‌তে খালেদ রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা বলেন, আমার পিতা রাতে যখন বিছানায় যেতেন তখন শুধু রাসূল (সাঃ) এবং আনসার ও মুহাজের সাহাবীদের নাম নিয়ে বলতেন, এরাই আমার মূল ও শাখা। অর্থাৎ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বংশধর। তাঁদের প্রতি আমার অন্তর আকৃষ্ট হচ্ছে। হে আল্লাহ্! শ্রীঘ্র মৃত্যু দান করে আমাকে তাঁদের সাথে মিলিত কর। তিনি এসব কথা বলতে বলতে নিদ্রা যেতেন।

একবার হযরত ওমর (রাঃ) হযরত আব্বাস (রাঃ)-কে বললেন, আমার পিতার চেয়ে আপনার ইসলাম গ্রহণে আমি বেশী আনন্দিত। কেননা আমার পিতার চেয়ে আপনার ইসলাম গ্রহণ রাসূল-এর কাছে অধিক প্রিয়। একবার হযরত ওমর (রাঃ) তাঁর অভ্যাস অনুযায়ী রাতের বেলায় পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে মহল্লায় বের হন। তিনি এক ঘরে বাতির আলো এবং এক বৃদ্ধার কণ্ঠস্বর শুনতে পান। মেয়েলোকটি পশম বুনার তালে তালে কবিতা আবৃত্তি করছিল। যার অর্থ এ নেককার ও বুজুর্গ লোকদের পক্ষ থেকে মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উপর দরূদ বর্ষিত হোক! হে আল্লাহর নবী! নিশ্চয় আপনি রাতের বেলায় ইবাদত করতেন এবং শেষ রাত্রে উঠে কান্নাকাটি করতেন। হায় আমি যদি জানতাম, আমি আর আমার মাহবুব নবী একত্রিত হব না? কেননা মৃত্যু যে কোন অবস্থায় এসে পড়ে জানা নেই, আমার মৃত্যু কি অবস্থায় আসবে? আর আমি রাসূল (সাঃ) -এর সাথে সাক্ষাতের সুযোগ পাব কি না? হযরত ওমর (রাঃ) কবিতাগুলো শুনে কাঁদতে কাঁদতে সেখানেই বসে গেলেন।

হযরত বেলাল হাব্‌শী (রাঃ)-এর মৃত্যুকালে তাঁর স্ত্রী দুখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বলতে লাগলেন, হায় আফসোস! এ কথা শুনে তিনি (রাঃ) বললেন, সোবহানাল্লাহ! তুমি আফ্‌সোস করছ? অথচ কি মজার ব্যাপার যে, আগামীকাল আমার প্রিয়নবীর যিয়ারত করব এবং তাঁর সাথীদের সাক্ষাত করব। হযরত যায়েদ (রাঃ) এর এক ঘটনা, যখন তাঁকে শূলে চড়ানো হল, তখন আবু সুফিয়ান বলেছিল, হে যায়েদ! তুমি কি এটা পছন্দ করবে যে, তোমাকে ছেড়ে দেয়া হোক আর (নাউযুবিল্লাহ) মুহাম্মদকে (সাঃ) তোমার পরিবর্তে শূলে চড়ানো হোক। তখন নবীর জন্য জীবন উৎসর্গকারী হযরত যায়েদ (রাঃ) বলেছিলেন,

আল্লাহ্‌র কসম খেয়ে বলছি, আমি এতটুকু সহ্য করব না যে, আমার মাহবুব নবী ঘরে থাকা অবস্থায় ও তাঁর পায়ে একটা কাঁটা বিদ্ধ হোক আর আমি নিজ ঘরে আরামে বসে থাকি। এ কথা শুনে আবু সুফিয়ান বলে উঠল, আমি কোথাও কাকেও এত বেশী মহব্বত করতে দেখিনি, যেরূপ মুহাম্মদকে তাঁর অনুসারীরা মহব্বত করে থাকে। ওলামায়ে কিরামগণ রাসূল (সাঃ)-এর সাথে মহব্বতের কয়েকটি নির্দশন লিখেছেন–কাজী আয়ায (রহঃ) বলেন, যে ব্যক্তি কোন জিনিসকে ভালবাসে সে যাবতীয় বস্তু থেকে তাকে প্রধান্য দিয়ে থাকে। এটাই মহব্বতের প্রকৃত অর্থ, নচেত তা মহব্বত নয়, এবং মহব্বতের দাবী মাত্র। রাসূল (সাঃ)-এর সাথে মহব্বতের সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, তাঁর নির্দেশনা অবলম্বন করা, তাঁর আচার ব্যবহার, চাল চলনের অনুসারী হওয়া, তাঁর প্রতিটি আদেশ-নিষেধ পুংখাঁনো পুংখরূপে পালন করা। সুখে-দুখেঃ সর্বাবস্থায় তাঁর পথে চলা। আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন–

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَ اللهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ -

অর্থ ঃ হে নবী! আপনি বলে দিন, যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে ভালবাসতে চাও, তবে আমার অনুসরণ কর। তাতেই আল্লাহ্ তায়ালা তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহসমূহ মাফ করে দিবেন এবং আল্লাহ্ তায়ালা বড় ক্ষমাশীল, বড় দয়ালু।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

কয়েকজন নিষ্ঠাবান সাহাবা পরিচিতি

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ)

রাসূল (সাঃ)-এর অন্যতম সহচর এবং তাঁর বাণী ও কর্মের উৎসাহী প্রচারক ও প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর প্রকৃত নাম নিয়ে সর্বাধিক মতানৈক্য বিদ্যমান। ইসলাম পূর্ব যুগে তিনি 'আবদু শামস্' বা 'আবদু ওমর' নামে খ্যাত ছিলেন। ইসলাম-উত্তর তাঁর নাম রাখা হয়েছিল 'আবদুর রহমান ইবনে সাখর' অথবা 'উমায়ের ইবনে আমির'। অবশ্য তিনি ইসলামী জগতে "আবু হুরায়রা" এ উপনামে সমধিক পরিচিত। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) ৬২৯ ঈসায়ী সনে ৭ হিজরী হুদায়বিয়ার সন্ধি এবং খায়বার যুদ্ধের অন্তবর্তী সময় মদীনায় আগমন করে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ত্রিশ বছরের মত। তিনি প্রখ্যাত সাহাবী তুফায়িল ইবনে আমর আদ্‌দাওসীর হাতে ইসলামে দীক্ষিত হন। এর পর হতে তিনি রাসূল (সাঃ)-এর পবিত্র মুখনিঃসৃত বাণী শোনার ঐকান্তিক আগ্রহ নিয়ে ছায়ার ন্যায় সর্বদা তাঁর সাহচর্য গ্রহণ করেন। তিনি আসহাবুস্ সুফ্‌ফার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

তিনি ইসলাম গ্রহণ করার পর গোটা জীবন রাসূল (সাঃ)-এর একান্ত সান্নিধ্যে কাটিয়েছেন। ফলে রাসূলের কাছ থেকে যত হাদীস শোনার সৌভাগ্য তাঁর হয়েছে অন্য কোন সাহাবীর তা হয়নি। হাদীসের প্রসার ও প্রচারের এক বিরাট খিদমত তিনি আঞ্জাম দিয়েছেন। তিনি সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের মোট সংখ্যা ৫,৩৭৫টি। রাসূল (সাঃ)-এর কাছ থেকে সরাসরি হাদীস শ্রবণ ছাড়াও আবু হুরায়রা (রাঃ) বিশিষ্ট সাহাবীদের মধ্যে আবু বকর, উমর, ফাদল ইবনে আব্বাস, উবাই ইবনে কা'ব, উসামা, আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) প্রমুখ হতে হাদীস গ্রহণ করেন এবং বর্ণনা করেন। বুখারীর বর্ণনা মতে আটশত রাবী তাঁর কাছ থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন। সাহাবীদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, ইবনে উমর, জাবির, আনাস, ওয়াসীল ইবনে আসকা (রাঃ) প্রমুখ তাঁর কাছ থেকে হাদীস শুনেছেন।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর ইসলামী শরীয়তে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল এবং বিদ্যাবুদ্ধি ছিল অত্যন্ত প্রখর। এ কারণে হযরত উমর (রাঃ) তাঁকে

বাহরাইন প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছিলেন। তাঁর সরলতা, সততা এবং বিশ্বস্ততা ছিল প্রশ্নাতীত। রাসূল (সাঃ)-এর বহু গুরুত্বপূর্ণ হাদীস তথা ইসলামের বহু অমূল্য শিক্ষার প্রসারদানে তাঁর অবদান অতুলনীয়। তাঁর এ কীর্তি মানুষ কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করবে। হাদীসে নববীর এ মহান খাদেম ৭৮ বছর বয়সে মদীনার অদূরে 'কাস্‌বা' নামক স্থানে ইন্তিকাল করেন। তাঁর মৃত্যুসন সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। বিভিন্ন বর্ণনা মতে তিনি ৫৭ অথবা ৫৮ অথবা ৫৯ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। ওয়ালীদ ইবনে উকবা ইবনে আবী সুফিয়ান তাঁর নামাযে জানাযার ইমামতি করেন। সাহাবীদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনে উমর এবং আবু সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) তাঁর জানায়ায় শরীক হন। তাঁকে মদীনায় জান্নাতুল বাকীতে সমাহিত করা হয়।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)

রাসূল (সাঃ)-এর হিযরাতের তিন বছর পূর্বে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) মক্কার "শিয়াবে আবী তালিব"-এর জন্মগ্রহণ করেন। জন্মের পর পরই তাঁকে রাসূলের কাছে নেয়া হলে তিনি শিশু আবদুল্লাহর মুখে একটু থুথু দিয়ে তাঁর 'তাহনীক' করেন। (তাহনীক অর্থ কোন বস্তু চিবিয়ে নরম করা এবং শিশুকে সভ্য করা) এর ফলশ্রুতিতে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস পরবর্তী জীবনে অঘাধ জ্ঞান ও হিকমতের অধিকারী হয়েছিলেন। তাঁর মাতা লুবাবা বিন্‌তুল হারিস হিযরতের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ বিধায় হযরত আবদুল্লাহকে আশৈশব মুসলিম হিসাবে গণ্য করা হয়। ইব্‌নে আব্বাস (রাঃ) বাল্যকাল হতে রাসূল (সাঃ)-এর ইন্তিকাল পর্যন্ত আট অথবা দশ বছর হযরতের গভীর সান্নিধ্যে কাটিয়েছেন। রাসূল (সাঃ)-এর ওফাতের সময় তিনি ছিলেন তের কিংবা পনের বছরের বালক। অপরিণত বয়সের কারণে তিনি রাসূলের জীবদ্দশায় কোন যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে পারেননি। রাসূল (সাঃ)-এর তিরোধানের পর তিনি খ্যাতনামা সাহাবীদের সাহচর্য লাভ করেন এবং তাঁদের কাছ হতে রাসূলের হাদীস শ্রবণ ও কণ্ঠস্থ করার সৌভাগ্য লাভ করেন।

তিনি দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রাঃ) ও তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান (রাঃ)-এর বিশেষ পরামর্শ দাতা ছিলেন। হযরত উসমান (রাঃ) যখন বিদ্রোহীগণ কর্তৃক মদীনায় স্ব-গৃহে অবরুদ্ধ ছিলেন, সে বছর ইব্‌নে আব্বাসকে আমীরুল হজ্ব নিযুক্ত করা হয়েছিল বিধায় তিনি উসমান (রাঃ)-এর শাহাদাতকালে মদীনায় উপস্থিত ছিলেন না। এর কিছু দিন পর মদীনায় পত্যাবর্তন করে তিনি হযরত আলী (রাঃ)-এর কাছে বয়াত হন। তিনি ৩৭ ও ৩৮ হিজরীতে সংঘটিত

যথাক্রমে জঙ্গে জামাল এবং জঙ্গে সিফ্ফীনে হযরত আলী (রাঃ)-এর সেনাদলের একটি অংশের সেনাপতিত্বের দাযিত্ব পালন করেন। আবদুল্লাহ ইব্‌নে আব্বাস (রাঃ) সিফ্ফীনে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিলেন। তিনি হযরত আলী (রাঃ)-এর শাসনামলে বসরার গভর্নর ছিলেন। অবশ্য পরবর্তীতে কতিপয় কারণে তিনি বসরা পরিত্যাগ করে মক্কা চলে যান। ইব্‌নে আব্বাস আশৈশব রাসূলের গভীর সান্নিধ্য ও তাঁর পবিত্র খিদমতে কাটিয়েছেন। তাঁর জ্ঞান ও হিকমতের পরিপূর্ণতার জন্য রাসূল (সাঃ) আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করেছিলেন। এ দোয়ার বদৌলতে এবং প্রখর মেধা ও অসাধারণ মুখস্থ শক্তির কারণে তিনি রাসূলের কাছে হতে বহু হাদীস হৃদয়পটে সংরক্ষিত করে রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। আবদুল্লাহ ইব্‌নে আব্বাস (রাঃ) সর্বমোট ২,৬৬০ টি হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি যুবায়রের শাসনামলে ৬৮ হিজরীতে তায়েফে ইন্তিকাল করেন। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ৭১ বছর। মুহাম্মদ ইব্‌নে হানফিয়া তাঁর নামাযে জানাযার ইমামতি করেন।

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ)

নাম আনাস, পিতার নাম মালেক, মাতার নাম উম্মে সুলায়ম। তিনি রাসূল (সাঃ)-এর খালা ছিলেন। এ হিসাবে সম্পর্কের দিক দিয়ে আনাস রাসূল (সাঃ)-এর খালাত ভাই। রাসূল (সাঃ) যখন মদীনায় হিযরত করেন তখন আনাসের বয়স মাত্র দশ বছর। এ সময় তাঁর মাতা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। স্ত্রীর ইসলাম গ্রহণে অসন্তুষ্ট হয়ে আনাসের পিতা শামে চলে যায় এবং তথায় ইন্তিকাল করে। আনাসের পিতার মৃত্যুর পর উম্মে সুলায়ম ইসলাম গ্রহণের শর্তে হযরত আবু তালহার সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। এরপর বালক আনাসের লালন-পালনের ভার আবু তালহার উপর অর্পিত হয়। হযরত আবু তালহা (রাঃ) বালক আনাসকে রাসূল (সাঃ)-এর খিদমতে পেশ করলে তিনি তাঁকে সাদরে গ্রহণ করেন। রাসূল (সাঃ)-এর ইন্তিকালের পূর্ব পর্যন্ত দীর্ঘ দশটি বছর তিনি তাঁর একনিষ্ঠ খিদমতে অতিবাহিত করেন।

ইসলামের প্রথম যুদ্ধ বদরে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশ নিতে পারেননি। কেননা তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ১২ বছর। অবশ্য এ সময় তিনি রাসূল (সাঃ)-এর ব্যক্তিগত খিদমতে নিয়োজিত ছিলেন। অল্প বয়সের কারণে তিনি উহুদে অংশ নিতে পারেননি। খায়বরসহ পরবর্তী সকল সমরাভিযানে তিনি অংশ গ্রহণ করেছিলেন। প্রথম খলীফা আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) তাঁকে প্রথমে বাহরাইনের আমেল এবং পরে তথাকার গভর্নর নিযুক্ত করেছিলেন। হযরত

উমর (রাঃ)-এর খিলাফতকালে তিনি ইলমে হাদীসের খিদমতে বসরায় ছিলেন। হযরত আলী (রাঃ)-এর সময় মুসলমানদের পরস্পরের মধ্যে ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি হলে তিনি সম্পূর্ণ নীরব জীবন-যাপন করেন। তিনি দীর্ঘ দশটি বছর রাসূল (সাঃ)-এর গভীর সান্নিধ্যে অতিবাহিত করেন। ফলে বহু হাদীস শিক্ষার সৌভাগ্য তাঁর হয়েছিল। তিনি ইলমে হাদীসের বিশেষ খিদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। প্রায় সমগ্র জীবন তিনি হাদীস প্রচারের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। শেষ জীবনে বসরায় জামে মসজিদ ছিল তাঁর হাদীস প্রচারের কেন্দ্র। তিনি অত্যন্ত বৃদ্ধ বয়সে বসরায় ইন্তিকাল করেন। তখন তাঁর বয়স বিভিন্ন বর্ণনা মতে ৯৭ হতে ১০৭ বছরের মধ্যে ছিল। সর্বাধিক প্রসিদ্ধ বর্ণনায় তাঁর মৃত্যুর তারিখ ৯১ বা ৯৩ হিজরী উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর ইন্তিকালের সময় বসরায় অন্য কোন সাহাবী জীবিত ছিলেন না। আরো জানা যায় যে, তাঁর মৃত্যুর পর হযরত আবু তোফায়েল (রাঃ) ব্যতীত দুনিয়াতে রাসূল (সাঃ)-এর অন্য কোন সাহাবী জীবিত ছিলেন না। কাতান ইব্‌নে মুদরাক তাঁর জানাযার ইমামতি করেন। হযরত আনাস (রাঃ)-কে তাঁর বাসভবনের পাশে সমাহিত করা হয়।

হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌নে মাসউদ (রাঃ)

নাম আবদুল্লাহ। পিতার নাম মাসউদ। কুনিয়াত আবু আবদির রহমান আল-হুজালী। মাতার নাম উম্মু আব্‌দ। রাসূল (সাঃ) যে দিন দ্বারে আরকামে প্রবেশ করেন তার পূর্বে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি নিজে গৌরব দীপ্তকণ্ঠে বলতেন "আমি ৬ষ্ঠ মুসলিম হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছি।" ঐতিহাসিক মুহাম্মদ ইব্‌নে ইসহাক তাঁকে ৩৩তম এবং সিয়ারে আলামুন্নুবালা গ্রন্থে ১৭তম মুসলিম হিসাবে উল্লেখ করেছেন। তিনি যখন ইসলাম গ্রহণ করেন, তখন মক্কা নগরীতে রাসূলুল্লাহ ব্যতীত অন্য কেহ উচ্চঃস্বরে কোরআন তিলাওয়াত করার সাহস পেত না। ইব্‌নে মাসউদ মক্কার প্রথম মুসলমান যিনি কোরেশদের পক্ষ থেকে মারাত্মক বিপদের আশংকা সত্ত্বেও উচ্চঃস্বরে কোরআন তিলাওয়াত করেন। অবশ্য এ জন্য তাঁকে নির্মম নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছে। কোরেশদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে তিনি দু' দুবার আবিসিনিয়ায় হিযরত করেন। পরে তিনি স্থায়ীভাবে মদীনায় হিযরত করেন। তথায় তিনি হযরত মায়ায ইব্‌নে জাবাল (রাঃ)-এর আতিথ্য গ্রহণ করেন এবং পরে রাসূল (সাঃ) তাঁদের উভয়ের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন করে দেন।

তিনি প্রসিদ্ধ সকল যুদ্ধে অসীম শৌর্য-বীর্য নিয়ে রাসূল (সাঃ)-এর সাথে অংশ গ্রহণ করেন এবং বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা প্রদর্শন করেন। হুনায়ন যুদ্ধে তাঁর

বিশেষ ভূমিকা ছিল। উমর (রাঃ)-এর খিলাফত আমলে ১৫ হিজরীতে সংঘটিত ঐতিহাসিক ইয়ারমুক যুদ্ধে তিনি অংশ গ্রহণ করেন। ৬৪০ ঈসায়ী সন ২০ হিজরীতে তিনি কুফার কাজী নিযুক্ত হন। একই সাথে কোষাগার, মুসলমানদের ধর্মীয় শিক্ষা এবং কুফা প্রশাসকের মন্ত্রীত্বের দায়িত্বও তাঁর উপর ন্যস্ত হয়। তিনি পরিপূর্ণ সততা, ন্যায়নিষ্ঠা ও দক্ষতার সাথে দীর্ঘ দশ বছর এ কর্তব্য ও দায়িত্ব পালন করেন। হযরত উসমান (রাঃ)-এর খিলাফতের শেষ দিকে যখন গোলযোগ ও ষড়যন্ত্র প্রবল হয়ে উঠে, তখন ইব্‌নে মাসউদ (রাঃ)-কে হঠাৎ বরাখাস্ত করা হয়। এ নির্দেশ তিনি নির্দ্বিধায় মেনে নিয়েছিলেন। ইব্‌নে মাসউদ (রাঃ) সর্বমোট ৮৪৮টি হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি হযরত উসমান (রাঃ)-এর খিলাফত আমলে হিজরী ৩২ অথবা ৩৩ সনের ৯ই রমযান ভিন্ন মতে ৮ই রমযান ইন্তিকাল করেন। এ সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৬০ বছরের অধিক। নির্ভরযোগ্য বর্ণনা মতে খলীফা উসমান (রাঃ) তাঁর নামাযে জানাযার ইমামতি করেন। তাঁর অন্তিম অসীয়ত অনুসারে জান্নাতুল বাকীতে উসমান ইব্‌নে মাজউন (রাঃ)-এর কবরের পার্শ্বে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়।

হযরত আবু বকরাহ (রাঃ)

রাসূল (সাঃ) যখন তায়েফ অবরোধ করলেন, তখন তিনি তায়েফ-বাসীদেরকে উদ্দেশ্য করে সাধারণ ঘোষণা দিলেন যে, যে সমস্ত স্বাধীন ব্যক্তিরা স্বেচ্ছায় আমাদের সাথে মিলিত হবে, তারা নিরাপদ থাকবে এবং যে সমস্ত ক্রীতদাস তাদের মালিকদেরকে পরিত্যাগ করে চলে আসবে তাদেরকে আযাদ বা মুক্ত ঘোষণা করা হবে। এ ঘোষণা তায়েফের বুকে প্রচারিত হওয়ার সাথে সাথে বহু গোলাম ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে গোলামীর জিঞ্জির থেকে মুক্তি লাভ করেন। এদের মধ্যে হযরত আবু বকরাহ (রাঃ)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অবশ্য পরম আযাদী লাভ করেও তিনি আজীবন নিজেকে রাসূলের গোলাম হিসাবে পরিচয় দিয়েছেন এবং এর মাঝেই আনন্দ খুঁজে পেয়েছেন। ইসলাম গ্রহণের পর হযরত আবু বকরাহ (রাঃ)-এর পূর্ব মনিব রাসূল (সাঃ)-এর দরবারে এসে তাকে মুক্তির জন্য আবেদন জানিয়েছিল, কিন্তু রাসূল (সাঃ)-এর তা প্রত্যাখ্যান করেন। হযরত উমর (রাঃ)-এর খিলাফতের পূর্ব পর্যন্ত তিনি ইরাকের বসরা নগরীতে স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করেন।

ইসলামের তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান (রাঃ)-এর মর্মান্তিক শাহাদতের পর সৃষ্ট সম্ভাব্য ফিতনা থেকে তিনি দূরে থাকেন। আর এ কারণে তিনি আত্মঘাতী উষ্ট্রের যুদ্ধে অংশ নেননি। পরবর্তীতে হযরত আলী (রাঃ) এবং হযরত

মুয়াবিয়া (রাঃ)-এর মধ্যকার অনুষ্ঠিত অনাকাংখিত সিফ্‌ফীন যুদ্ধে তিনি অংশ গ্রহণ করেননি এবং সম্ভাব্য পরিমাণ অন্যান্যদেরকেও এ যুদ্ধে অংশ নেয়া থেকে বিরত রাখেন। হযরত আবু বকরাহ (রাঃ) উন্নত চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। ইবাদত-বন্দেগী, তাকওয়া পরহেযগারীতে তিনি ছিলেন অতুলনীয়।

হযরত আবু বকরাহ (রাঃ)অনেক বিলম্বে ইসলাম গ্রহণ করে থাকলেও তিনি রাসূল (সাঃ)-এর গভীর সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন এবং রাসূলের মুখ নিঃসৃত বাণীর এক বিশাল ভাণ্ডার আত্মস্থ করেছিলেন। তিনি সর্বমোট ১৩২টি হাদীস রেওয়ায়েত করেন।

হযরত আবু মাসউদ (রাঃ)

আবু মাসউদ (রাঃ) হিযরতের দু' এক বছর পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন। নবুওয়াতের ১৩তম বছর তিনি মক্কায় গিয়ে বাইয়াতে আকাবায় অংশ গ্রহণের সৌভাগ্য অর্জন করেন। রাসূলের হাতে এ বাইয়াতের সর্ব কনিষ্ঠ সাহাবী ছিলেন তিনি। তিনি বদর, উহুদসহ সকল ইসলামী যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। আবু মাসউদ (রাঃ) হযরত উসমান (রাঃ)-এর খিলাফতের শেষ দিকে মদীনা হতে কুফা চলে যান। এক বর্ণনা মতে সেখানে তিনি বসতি স্থাপন করেছিলেন। উষ্ট্রের যুদ্ধে তিনি অংশ নিয়েছেন কিনা তা জানা যায়নি। হযরত আলী (রাঃ) এবং হযরত মুবাবিয়া (রাঃ)-এর মধ্যে মতপার্থক্য সৃষ্টি হলে আবু মাসউদ হযরত আলী (রাঃ)-এর পক্ষ অবলম্বন করেন। সিফ্‌ফীনের যুদ্ধে যাত্রার প্রক্কালে আলী (রাঃ) তাঁকে কুফায় স্থলাভিষিক্ত করে যান। এ সময় তিনি ইমামতের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করেন। সিফ্‌ফিনের যুদ্ধের পর তিনি কুফা হতে মদীনা চলে যান এবং সেখানে জীবনে অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করেন। আবু মাসউদ (রাঃ)-এর হাদীস বর্ণনাকারীদের তৃতীয় পর্যায়ভুক্ত। তিনি ১০২টি হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন। তিনি হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ)-এর শাসনামলে ৪১ থেকে ৫০ হিজরীর মধ্যে কোন এক সময় ইন্তিকাল করেন বলে চরিতকাররা উল্লেখ করেন।

হযরত আবদুর রহমান ইব্‌নে আউফ (রাঃ)

ইসলাম পূর্ব যুগে তাঁর নাম ছিল আবদু আমর অথবা আবদুকা'বা। পিতার নাম আউফ। মাতার নাম শিফা বিন্‌তু আউফ। তাঁর মাতা-পিতা উভয় ছিলেন যুহরা গোত্রের লোক। তিনি আমুলফীলের দশ বছর পর জন্ম গ্রহণ করেন। এ হিসাবে তিনি রাসূলের দশ বছরের ছোট। অবশ্য ইব্‌নে হাজার তাঁকে রাসূলের তের বছরের ছোট বলে অভিমত প্রকাশ করেন। তিনি আশারায়ে মুবাশ্‌শারার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

হযরত আবদুর রহমান ইব্‌নে আউফ (রাঃ) প্রথম স্তরের ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর দাওয়াতে ইসলামে দীক্ষিত হন। নবুওয়াতের পঞ্চম বছর রযব মাসে হাবশায় প্রথম যে মুসলিম কাফেলাটি হিযরত করেন তিনি তাঁদের সাথে ছিলেন। তিনি মদীনাতেও হিযরত করেন। এভাবে তিনি 'সাহিবুল হিযরাতাইনে'র গৌরব অর্জন করেন। মদীনায় রাসূল (সাঃ) তাঁকে সা'দ ইবনে রাবী আল খাযরাজীর সাথে ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক স্থাপন করে দেন। মদীনাতে তিনি এক আনসারী মহিলার সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন।

হযরত আবদুর রহমান বদর, উহুদ ও খন্দকসহ সকল অভিযানে রাসূলের সাথে ছিলেন। উহুদ যুদ্ধে তিনি একত্রিশটি আঘাতপ্রাপ্ত হন। ষষ্ঠ হিজরীর শাবান মাসে 'দুমাতুল জান্দালে' প্রেরিত অভিযানে রাসূল (সাঃ) তাঁকে সৈন্য বাহিনীর পরিচালনার ভার প্রদান করেছিলেন। মক্কা বিজয়ের সময় তিনি রাসূলের সাথে ছিলেন। নবম হিযরীতে তাঁবুক অভিযান কালে এক ফযরের নামাযের তিনি ইমামতি করেন এবং রাসূল (সাঃ) তাঁর ইক্তিদা করেন। হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর খিলাফতকালে তিনি ফাতওয়া দানকারী মাত্র আটজন বিশিষ্ট সাহাবীদের অন্যতম একজন ছিলেন। হযরত উমর (রাঃ) তাঁকে বিশেষ উপদেষ্টা নিযুক্ত করেন। খলীফা উমর (রাঃ) খিলাফতের প্রথম বছর আবদুর রহমান (রাঃ)-কে আমীরে হজ্ব নিয়োগ করে মক্কায় পাঠান। হযরত উমরের ছুরিকাহত হওয়ার পর থেকে পরবর্তী খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি জামায়াতের ইমামতি করেন এবং প্রশাসনের যাবতীয় দায়িত্ব পালন করেন। তিনি তৃতীয় খলীফা হিসাবে হযরত উসমান (রাঃ)-এর নাম ঘোষণা দেন। তিনি আমরণ খলীফা উসমানের মজলিসে শূরার সদস্য থেকে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরামর্শ দিতেন। হযরত আবদুর রহমান রাসূল (সাঃ) হতে সরাসরি হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি সর্বমোট ৬৫টি হাদীস রেওয়ায়েত করেন। তাঁর থেকে ইবরাহীম, হুমায়েদ, উমর, মুসয়াব, আবু সালামা, মিসওয়াব, ইবনে আব্বাস, ইবনে উমর, জুবাইর, জাবির, আনাস, মালিক ইবনে আওস প্রমুখ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ইব্‌নে সা'দের মতে হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) ৩২ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। অবশ্য ইব্‌নে হাজারের মতে তিনি ৭২ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। হযরত উসমান (রাঃ) অথবা যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রাঃ) তাঁর জানাযার ইমামতি করেন। তাঁকে মদীনার জান্নাতুল বাকীতে সমাহিত করা হয়।

হযরত আদী ইব্‌নে হাতেম (রাঃ)

হযরত আদী (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণের পিছনে এক দীর্ঘ ঘটনা বিদ্যমান রয়েছে। তাঁর বংশ দীর্ঘদিন ধরে তয়ী গোত্রের উপর শাসন কর্তৃত্ব চালাচ্ছিল। ইসলামের আবির্ভাবে শঙ্কিত হয়ে হযরত আদী স্বগোত্রীয়দেরকে নিয়ে শামের ঈসায়ী বন্ধুদের কাছে গমন করেন। ঘটনাক্রমে আদী (রাঃ)-তাঁর এক পত্নীকে ফেলে রেখে যান। সে মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়ে রাসূল (সাঃ)-এর কাছে অর্পিত হয়। কয়েক দিনের মধ্যে রাসূল (সাঃ) তাকে নিরাপত্তার সাথে তার স্বামী আদীর কাছে প্রেরণ করেন। স্ত্রীর কাছে নতুন রাসূল (সাঃ)-এর বিস্তারিত ঘটনা শুনে তাঁর অন্তরে রেখাপাত করে। ফলে তিনি অনতিবিলম্বে রাসূল (সাঃ)-এর দরবারে এসে ইসলাম গ্রহণ করেন। হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর খিলাফত কালে স্বধর্ম ত্যাগীদের এবং যাকাত প্রদানে অস্বীকারকারীদের প্রাদুর্ভাব ঘটলে হযরত আদী (রাঃ) তাঁর গোত্রকে কঠোর শাসনের মাধ্যমে এটা থেকে নিভৃত রাখেন। এমনকি তিনি নিজে যাকাত আদায় করে খলীফার কাছে উপস্থিত করতেন। হযরত উমর (রাঃ)-এর খিলাফতকালে ১৩ হিজরীতে ইরাক বিজয় অভিযানে হযরত আদী (রাঃ) তাঁর তায়ী গোত্রকে নিয়ে অংশ নিয়েছিলেন। তিনি মুসাল্লার নেতৃত্বে হিরার যুদ্ধেও শরীক ছিলেন। কাদেসিয়ার যুদ্ধে তিনি অসীম বীরত্বের পরিচয় রেখেছিলেন। এ সময় তিনি ছোট বড় সকল যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। শামের কোন কোন বিজয় অভিযানে তিনি হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালিদের সাথে ছিলেন। তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান (রাঃ)-এর শাসন পদ্ধতিতে হযরত আদী (রাঃ)-এর মতানৈক্য থাকার কারণে এ সময় তিনি সম্পূর্ণ নীরব জীবন-যাপন করেন। তাঁর শাহাদতের পর তিনি হযরত আলী (রাঃ)-এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেন এবং উষ্ট্রের ও সিফ্‌ফীনের যুদ্ধে তিনি হযরত আলী (রাঃ)-এর পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করেন। সিফ্‌ফীনের পরে অনুষ্ঠিত নাহরাওন যুদ্ধে তিনি আলী (রাঃ)-এর পক্ষে ছিলেন। তিনি ছিলেন রাসূল চরিত্রের এক বাস্তব বহিঃপ্রকাশ। তাঁর দানশীলতা, বদান্যতা ছিল বর্ণনাতীত। ইবাদত-বন্দেগী খোদাভীতি এবং রাসূল প্রেমে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। তিনি ছিলেন স্বগোত্রের একজন ন্যায়বান ও দয়ালু শাসক।

হযরত আদী (রাঃ) সর্বমোট ৬৬টি হাদীস রেওয়ায়েত করেন। তিনি সিফ্‌ফীনের যুদ্ধের পরও ৩০ বছর জীবিত ছিলেন। ইবনে সা'দের বর্ণনা মতে হযরত আলী (রাঃ)-এর শাহাদতের পর তিনি কুফায় নির্জন জীবন-যাপন করেন এবং এখানে তিনি ৬৭ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।

হযরত আবু উমামা বাহেলী (রাঃ)

হযরত আবু উমামা (রাঃ) হুদায়বিয়ার পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম

গ্রহণ করে তিনি সর্ব প্রথম হুদায়বিয়ার যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। বাইয়াতে রেওয়ানে উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য তাঁর হয়েছিল। ইসলাম গ্রহণের পর রাসূল (সাঃ) তাঁকে স্বগোত্রে ইসলাম প্রচারের দায়িত্ব দিয়ে তথায় প্রেরণ করেন। তাঁর আহ্বানে এবং আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলশ্রুতিতে তাঁর সম্প্রদায়ের সমস্ত লোক এক পর্যায়ে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে। খিলাফতের প্রথম দিকের তাঁর জীবন প্রবাহ সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না। হযরত আলী (রাঃ)এবং হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ)-এর মধ্যে অনুষ্ঠিত সিফ্ফীন যুদ্ধে তিনি আলী (রাঃ)-এর পক্ষ অবলম্বন করেন। এরপর তিনি শামে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। হাদীস প্রচার এবং প্রসারের নিমিত্বে স্বীয় জীবনকে উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। হাদীসের এক বিশাল ভাণ্ডার তাঁর করায়ত্ব ছিল। তিনি সর্বমোট ২৫০টি হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি উমাইয়া শাসক আবদুল মালেকের শাসনামলে ৮৬ হিজরীতে শামে ইন্তিকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ১০৬ বছর।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল (রাঃ)

হযরত আবদুল্লাহ ইব্নে মুগাফ্ফাল (রাঃ) ৬ষ্ঠ হিজরীতে ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণ করে সর্ব প্রথম তিনি হাদায়বিয়ার যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। বাইয়াতে রেযওয়ানে উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য তাঁর হয়েছিল। খায়বার যুদ্ধে তিনি শরীক ছিলেন। মক্কা বিজয়ের সময় তিনি রাসূল (সাঃ)-এরসাথে ছিলেন। নবম হিজরীতে অনুষ্ঠিত তাঁবুক যুদ্ধ সওয়ারী এবং মাল-সম্পদের অভাবে অংশ নিতে পারবেন না, এ দুঃখে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েন। কিন্তু ইব্নে ইয়াসিন নামে এক ব্যক্তির সাহায্যে তিনি এবং তাঁর এক সাথী আবদুর রহমান ইব্নে কা'ব তাঁবুক যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। তাঁদের এ নিঃস্বতার বর্ণনায় সূরায় তওবায় নিম্নোক্ত আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

রাসূল (সাঃ) যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন তিনি মদীনাতে ছিলেন। হযরত উমর (রাঃ)-এর সময় বসরা বিজিত হলে তিনি বসরার লোকদেরকে শিক্ষা-দীক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যে যে ছ'জন বিশিষ্ট সাহাবীদের তথায় প্রেরণ করেছিলেন তিনি ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি তথায় অবস্থান করেছিলেন। ইরাকী বাহিনীতে তিনি বীরচিত অংশ নিয়েছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পর কয়েক বছর তিনি রাসূল (সাঃ)-এর গভীর সান্নিধ্য লাভ করেন। তাঁর থেকে তিনি বহু হাদীস মুখস্থ করেন। হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) সর্বমোট ৪৩টি হাদীস রেওয়ায়েত করেন। তিনি দীর্ঘ জীবন লাভ করেছিলেন।

তিনি মতান্তরে ৫৯ অথবা ৬০ হিজরীতে বসরায় ইন্তিকাল করেন। তাঁর অসিয়ত অনুযায়ী সাহাবী আবু বরজাহ আসলামী (রাঃ) তাঁর নামাযে জানাযার ইমামতি করেন। তাঁকে বসরাতে সমাহিত করা হয়। মৃত্যুকালে তিনি সাতজন সন্তান-সন্ততি রেখে যান।

হযরত আবদুল্লাহ ইব্নে উনাইস জুহানী (রাঃ)

হযরত আবদুল্লাহ ইব্নে উনাইস (রাঃ) দ্বিতীয় আকাবার পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি মক্কা এসে রাসূল (সাঃ)-এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেন এবং এখানেই বসবাস করতে থাকেন। তিনি মদীনায় হিযরত করেছিলেন। আর এজন্যই তাঁকে 'মুহাজিরী আনসার' বলা হত। তিনি বিশিষ্ট সাহাবী মাযায ইব্নে জাবালের সাথে মদীনায় বনু সালামার প্রতিমা ভেঙ্গে ছিলেন। বদর, উহুদসহ ইসলামের যাবতীয় যুদ্ধে তিনি অংশ গ্রহণ করেন। তাঁর দ্বারা রাসূল (সাঃ) ইসলামের ঘোরতর শত্রু খুলদ ইব্নে শায়খ আম্বরীকে হত্যা করান। রাসূল (সাঃ)-এর ওফাতের পর তিনি ব্যথিত হৃদয়ে মদীনা ছেড়ে ভূমধ্যসাগরের তীরে উপকূলীয় সিরিয়ার গাজা শহরে বসতি স্থাপন করেন। সম্ভবত যুদ্ধাভিযানে তিনি মিসর ও আফ্রিকা ভ্রমণ করেছিলেন। তাঁর মৃত্যু সন নিয়ে কিছুটা দ্বিমত পরিলক্ষিত হয়। এ বর্ণনা মতে তিনি মুয়াবিয়া (রাঃ)-এর শাসনামলে হিজরী ৫৪ সনে ইন্তিকাল করেন। এক বর্ণনা মতে তিনি ৮০ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। মৃত্যুকালে তিনি চার সন্তান রেখে যান। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি অত্যন্ত ইবাদত গুযার ছিলেন। হাদীস বর্ণনার ব্যাপারে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ কোন অবদান পরিলক্ষিত না হলেও তিনি যে রাসূল (সাঃ)-এর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহাবী ছিলেন এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নাই। বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থে তাঁর থেকে বর্ণিত সর্বমোট ২৪টি হাদীসের সন্ধান পাওয়া যায়। অবশ্য হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি অত্যন্ত সতর্কবান ছিলেন। সম্ভবত এজন্যই তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা এত কম। রাসূল (সাঃ) ও হযরত উমর (রাঃ) হতে হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন। তাঁর থেকে যারা হাদীস বর্ণনা করেছেন তাদের মধ্যে জাবের ইব্নে আবদুল্লাহ (রাঃ), আবু উমামা (রাঃ), বুসর ইব্নে সায়ীদ (রাঃ), আবদুল্লাহ ইব্নে উমাইয়া, আবদুর রহমান, আবদুল্লাহ প্রমুখ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

হযরত আবদুল্লাহ ইব্নে হুযাফা (রাঃ)

হযরত আবদুল্লাহ ইব্নে হুযাফা প্রাথমিক পর্যায় ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি আপন ভ্রাতা কায়সের সাথে আবিসিনিয়ায় হিযরত করেছিলেন। হযরত

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)-এর মতে তিনি বদর যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন, কিন্তু এ মত শুদ্ধ নহে। রাসূল (সাঃ) পারস্য সম্রাট কিস্‌রার কাছে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানিয়ে যে পত্রখানা প্রেরণ করেছিলেন এটা হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌নে হুযাফা (রাঃ) বহন করে সেই সুদূর পারস্যে গিয়েছিলেন। রাসূল (সাঃ) কোন এক যুদ্ধে তাঁকে সেনাপতির দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন। তিনি মিসর বিজয়েও অংশ নেন। দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রাঃ) রোম অভিযানে যে বিশাল সেনাবাহিনী প্রেরণ করেছিলেন এতে আবদুল্লাহ ইব্‌নে হুযাফা (রাঃ) ছিলেন। এ যুদ্ধে রোমক বাহিনী কর্তৃক কিছু সংখ্যক মুসলিম সেনাবাহিনীর সাথে তিনিও বন্দী হন। রোমানরা তাঁকে খৃষ্টধর্ম গ্রহণের জন্য বিভিন্ন প্রলোভন দেখায়, কিন্তু সব তিনি দৃঢ়তার সাথে প্রত্যাখ্যান করেন। এদিকে অতি বিচক্ষণতার সাথে স্বীয় ও অন্যান্য ৮০ জন মুসলিম বন্দীর মুক্তির ব্যবস্থা করেন। মুক্তিপ্রাপ্ত সকল বন্দীসহ তিনি হযরত উমর (রাঃ)-এর কাছে প্রত্যাগমন করলে খলীফা দাঁড়িয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানান। তিনি হযরত উসমান (রাঃ)-এর খিলাফত কালে মিসরে ইন্তিকাল করেন। এখানেই তাঁকে সমাহিত করা হয়।

হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌নে যায়দ (রাঃ)

হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌নে যায়দ (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণ করার সঠিক সন তারিখ পাওয়া যায় না। তবে এতটুকু পাওয়া যায় যে, তিনি বাইয়াতে আকাবায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁর জন্য সবচেয়ে সৌভাগ্যের ঘটনা হল, বর্তমানে আমরা যে আযানের শব্দ শুনতে পাই এটা তাঁর স্বপ্নযোগে প্রাপ্ত। তিনি ইসলামের প্রথম যুদ্ধ বদরসহ সকল যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। মক্কা বিজয়ে তিনি রাসূল (সাঃ)-এর সাথে ছিলেন। এ সময় বনু হারিসের পতাকা তাঁর হাতে ছিল বিদায় হজ্বের সময়ও রাসূর (সাঃ)-এর সাথে থাকার সৌভাগ্য তাঁর হয়েছিল। তিনি হিজরী ৩২ সনে ইন্তিকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৪ বছর। হযরত উসমান (রাঃ) তাঁর জানাযা নামাযের ইমামতি করেন। কারো কারো মতে তিনি উহুদের যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন। ইমাম বুখারীর মতে তাঁর থেকে আযান সম্পর্কিত শুধুমাত্র একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। ইমাম তিরমিযীও এ অভিমত সমর্থন করেছেন। কিন্তু হাফেয ইব্‌নে হাজার তাঁর থেকে বর্ণিত ৬/৭টি হাদীস সংগ্রহ করে তা একত্রে সংকলন করেছেন। হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে যাঁরা হাদীস বর্ণনা করেছেন তাঁদের মধ্যে মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইব্‌নে মুহাম্মদ, সায়ীদ ইবনে মুসাইয়্যাব, আবদুর রহমান ইব্‌নে আ'বী লায়লা প্রমুখ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

হযরত আবু সালাবা খাশানী (রাঃ)

ইসলাম প্রচারের প্রাথমিক যুগে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় তিনি রাসূল (সাঃ)-এর সাথে ছিলেন। বাইয়াতে রেদওয়ানে উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য তাঁর হয়েছিল। তিনি ইসলামী কোন যুদ্ধ-বিগ্রহে অংশ নিয়েছিলেন কিনা সে সম্পর্কে ইতিহাসে তেমন কোন তথ্য পাওয়া যায় না। তবে রাসূল (সাঃ) তাঁকে খয়বরের গনীমতের মাল প্রদান করেছিলেন। এর উপর ভিত্তি করে বলা হয় যে, তিনি এ যুদ্ধে শরীক ছিলেন। অবশ্য তিনি ইসলাম প্রচার ও প্রসারের মহান কাজে জীবনের বেশী সময় ব্যয় করেন। রাসূল (সাঃ) তাঁকে ইসলাম প্রচারক হিসাবে স্ব-গোত্রের কাছে প্রেরণ করেছিলেন। তাঁর অক্লান্ত চেষ্টা-সাধনার ফলশ্রুতিতে রাসূল (সাঃ)-এর জীবদ্দশাতেই তারা ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং বিশেষ মর্যদার অধিকারী হন। শাম বিজয় হওয়ার পর তিনি সেখানে বসবাস আরম্ভ করেন। সিফ্‌ফিনের যুদ্ধে তিনি নীরব ভূমিকা পালন করেন। হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ)-এর শাসনামলে তিনি শুধু মাত্র ইবাদত বন্দেগীতেই মশগুল থাকেন। জীবনের শেষ প্রহরগুলো তিনি আল্লাহ্‌র আরাধনায় কাটিয়ে দিয়েছেন। কোন এক গভীর রাতে তিনি নামায আদায়ে নিমগ্ন ছিলেন। এ সময় তাঁর পুত্র স্বপ্নে দেখলেন যে তার পিতা ইন্তিকাল করেছেন। হতবিহবলিত কণ্ঠে পিতাকে ডাক দিলে তাঁর সাড়া পাওয়া গেল, কিন্তু পরক্ষেণেই যখন ডাক দেয়া হল তখন আর কোন আওয়াজ পাওয়া গেল না। কাছে গিয়ে দেখল সিজদা অবস্থাতেই তিনি আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে চলেন গিয়েছেন। চরিতকারদের মতে তিনি হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ)-এর রাজত্ব কালে, মতান্তরে ৭৫ হিজরীতে খলীফা আবদুল মালেক ইব্‌নে মাওয়ানের রাজত্বকালে ইন্তিকাল করেন। তিনি সাহাবাদের যাবতীয় গুণাবলীরই অধিকারী ছিলেন। তবে তাঁর বিশেষ একটি গুণ ছিল যে, তিনি ছিলেন সত্য কথনে নির্ভীক দুর্জয় সৈনিক। কখনও জিহ্বা মিথ্যা দ্বরা কলঙ্কিত হয়নি। বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থে তাঁর থেকে বর্ণিত সর্বমোট ৪০টি হাদীসের সন্ধান পাওয়া যায়।

হযরত আবু মাহযুরা (রাঃ)

হযরত আবু মাহযুরা (রাঃ) অষ্টম হিজরীতে ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণের পিছনে সুন্দর একটি ঘটনা বিদ্যমান রয়েছে। অষ্টম হিজরীতে অমুসলিম অবস্থায় আবু মাহযুরা কয়েকজন মুশরিকের সাথে কোথাও যাচ্ছিলো। ঠিক তখনই রাসূল (সাঃ) হুনাইনের যুদ্ধাভিযানের পর ফিরছিলেন। পথিমধ্যে নামাযের হলে রাসূল (সাঃ) এক স্থানে বিরতি নিলেন এবং মুযাযনিকে আযান দিতে বললেন। মুযাযিন আযান দিলে আবু মাহযুরা এবং তার সঙ্গী-সাথীরা বিদ্রূপাত্যক ও ব্যঙ্গস্বরূপ এটা প্রতিধ্বনিত করতে লাগল। আবু মাহযুরার

বিদ্রুপাত্যক মনোভাব থাকলেও তার আওয়াজ অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী এবং সুমধুর ছিল। সুমধুর কণ্ঠ শুনে রাসূল (সাঃ) তাদেরকে ডাকলেন এবং এ কণ্ঠ কার সে সম্পর্কে তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন। সকলে আবু মাযহুরাকে দেখিয়ে দিল। তার সাথী অন্যান্যরা সকলে চলে গেলে রাসূল (সাঃ) তাঁকে আযান দিতে বলেন। আযানের অনেক শব্দ তার জানা থাকায় রাসূল (সাঃ) তাঁকে এটা শিখিয়ে দেন। আযানের বাক্য "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু" মৌখিকভাবে উচ্চারণের সাথে সাথে তার অজান্তেই তার হৃদয়ে গিয়ে লাগে। আর তখনই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি রাসূল (সাঃ)-এর অনুমতি পেয়ে মক্কায় আযান দেয়ার দায়িত্ব নিয়ে তথায় ফিরে আসেন। সেখানে তিনি রাসূল (সাঃ)-এর আমেল ইতাব ইব্‌নে উসাইরের কাছে অবস্থান করেন। তিনি শুধু আযানের দায়িত্বেই নিয়োজিত ছিলেন। মক্কা বিজয়ের পর রাসূল (সাঃ) তাঁকে সেখানকার নির্ধারিত মুয়াযযিন পদে নিয়োগ করেন। তিনি অত্যন্ত সুললিত কণ্ঠের অধিকারী ছিলেন। তিনি যেহেতু মক্কার নির্ধারিত মুয়াযযিন ছিলেন বিধায় তথায় তিনি সর্বদা বসবাস করতেন। এখানেই তিনি ৫৯ হিজরীতে হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ)-এর শাসনামলে ইন্তিকাল করেন। তিনি কিছু সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করেন। তবে এর সু-নির্দিষ্ট কোন সংখ্যা পাওয়া যায়না।

হযরত আবু হুযায়ফা (রাঃ)

ইসলাম গ্রহণ করার দায়ে কাফের কর্তৃক তাঁকে নির্মম অত্যাচার আর অমানুষিক নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে। কুফরী থেকে পরিত্রাণের নিমিত্তে তিনি হাবশায় হিযরত করেন। হিযরতের সেই কঠিনতম মুহূর্ত তাঁর স্ত্রী সোহায়লাহ বিন্‌তে সোহাইল সাথে ছিলেন। সোহায়লা ছিলেন গর্ভবতী। পথিমধ্যে পুত্র মুহাম্মদ জন্মগ্রহণ করেন। কিছুদিন পর তিনি হাবশা থেকে এমন এক সময় মক্কায় প্রত্যাবর্তন করেন যখন মুসলমানগণ মদীনা হিযরতের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। বদর যুদ্ধে তিনি শরীক হন। এ যুদ্ধে তিনি বীরবিক্রমে কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন। এরপর সকল যুদ্ধে তিনি রাসূল (সাঃ)-এর সাথে ছিলেন। রাসূল (সাঃ)-এর তিরধানে তিনি বিরহ ব্যথায় মুহ্যমান হয়ে পড়েন এবং আমরণ রাসূল (রাঃ)-এর স্মরণে অতিবাহিত করেন।

রাসূল (সাঃ)-এর ইন্তিকালের পর হযরত আবু বকর (রাঃ) মুসলিম বিশ্বের খলীফা নির্বাচিত হন। তাঁর আমলে স্ব-ধর্ম ত্যাগী আন্দোলন, যাকাত প্রদানে অস্বীকারকারী এবং ভণ্ড নবীদের আবির্ভাবসহ বিভিন্ন সংকট দেখা দেয়। বিশেষ করে ভণ্ড নবী মুসায়লামাতুল কায্‌যাবের বিদ্রোহ ছিল অত্যন্ত ভয়াবহ। এ বিদ্রোহীদেরকে মূলৎপাটনের উদ্দেশ্যে হযরত আবু বকর (রাঃ) মদীনা হতে এক

বিশাল বাহিনী প্রেরণ করেন। এর একটি অংশের বিশেষ দায়িত্বে হযরত আবু হুযায়ফা (রাঃ) নিয়োজিত ছিলেন। উভয় দলের মধ্যে এক তুমুল রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ চলে। এ যুদ্ধে ইসলামের সাহসী সৈনিক আবু হাযায়ফা (রাঃ) শাহাদাত বরণ করেন। এ সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৪ বছর। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন উত্তম চরিত্রের অধিকারী। শরয়ী হুকুম আহকাম পালনের ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত যত্নবান ছিলেন। যখনই যে হুকুম অবতীর্ণ হত তিনি এটা যথাযথভাবে পালনে সচেষ্ট হতেন। সাহাবাদের মধ্যে তিনি বিশেষ মর্যদার অধিকারী ছিলেন। তাঁর দু'জন স্ত্রী ছিল। তাঁদের গর্ভে আসেম এবং মুহাম্মদ নামে দু'পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁর বংশ পরম্পরা এ পুত্র দু'জন পর্যন্তই শেষ হয়ে যায়। হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে তাঁর বিশেষ অবদান পরিলক্ষিত হয়না। তবুও তাঁর থেকে বর্ণিত মোট ৪৫টি হাদীসের সন্ধান বিভিন্ন গ্রন্থে পাওয়া গিয়েছে।

হযরত আবু বুরদা ইব্‌নে নাইয়ার (রাঃ)

হযরত আবু বুরদা (রাঃ) আকাবায়ে সানীতে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি বদর, উহুদ, খন্দকসহ ইসলামের সকর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। উহুদ যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর কেবলমাত্র যে দু'টি অশ্ব ছিল, এর একটির মালিক ছিলেন হযরত আবু বুরদা (রাঃ)। ৮ম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের সময় বনু হারিসার দলীয় পতাকা তিনিই ধারণ করেছিলেন। তিনি চতুর্থ খলীফা হযরত আলী (রাঃ)-এর পক্ষ অবলম্বন করে তাঁর সাথে সকল যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। তিনি উমাইয়া শাসক হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ)-এর শাসনামলে হিজরী ৪১ সনে এ নশ্বর দুনিয়া ত্যাগ করেন। হাদীসে নববীর খিদমতের ব্যাপারে তাঁর যৎসামান্য কৃতিত্ব রয়েছে। বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থে তাঁর থেকে বর্ণিত ২০টি হাদীসের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে।

হযরত আসেম ইব্‌নে আদী (রাঃ)

হযরত আসেম (রাঃ) হিযরতের পর ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে রাসূল (সাঃ)-এর সাথে রওয়ানা হন। মসজিদে দেরার পর্যন্ত পৌঁছে মুনাফিকদের খবর অবহিত হয়ে রাসূল (সাঃ) তাঁকে কোবা ও আওয়ালীর আমীর নিযুক্ত করে তথায় প্রেরণ করেন। তাই তিনি সক্রিয়ভাবে বদরে অংশ নিতে পারেননি। অবশ্য রাসূল (সাঃ) তাঁকে বদরে প্রাপ্ত গনীমতের অংশ প্রদান করেছিলেন। তিনি উহুদ ও খন্দকসহ পরবর্তী সকল যুদ্ধে শরীক ছিলেন। তিনি চার খলীফার পূর্ণ যুগ পেয়েছিলেন। তিনি হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ)-এর শাসনামলে হিজরী ৪৫ সনে ইন্তিকাল করেন। তিনি কত বছর বেঁচে ছিলেন এ ব্যাপারে চরিতকারদের মধ্যে

মত বিরোধ বিদ্যমান। বিভিন্ন বর্ণনা মতে মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ১১৫ হতে ১২০ বছরে মধ্যে ছিল। হাদীস শাস্ত্রে তাঁর বিশেষ ভূমিকা পরিলক্ষিত হয় না। তাঁর থেকে মাত্র ছ'টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

হযরত আসমা বিন্‌তে উমাইস্‌ (রাঃ)

হযরত আলী (রাঃ)-এর ভ্রাতা যাফর (রাঃ)-এর সাথে তাঁর বিয়ে হয়। মদীনায় আরকামের গৃহে রাসূল (সাঃ)-এর অবস্থান গ্রহণের পূর্বে আসমা ইসলাম গ্রহণ করেন। উল্লেখ্য, তাঁর স্বামী যাফরও তখন ইসলাম গ্রহণ করেন। আসমা আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। সেখানে কয়েক বছর অবস্থান করেন। সপ্তম হিযরীতে খায়বার বিজয়ের পর মদীনায় আসেন। হিজরী ৮ম সনে মুতার যুদ্ধে হযরত যাফর (রাঃ) শাহাদাত বরণ করেন। স্বামী হারানো মর্মবেদনা যে কত নিদারুন যাতনাদায়ক তা সেদিন তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। প্রায় ৬ মাস পর ৮ম হিযরীর শাওয়াল মাসে হুনায়ন যুদ্ধের সময় রাসূল (সাঃ) তাঁকে হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর কাছে বিয়ে দিয়ে দেন। (ইসাবা) বিয়ের দু'বছর পর ১০ম হিজরীতে হজ্বের সময় যুল-হুলায়ফা নামক স্থানে যুলকা'দাহ মুহাম্মদ ইব্‌নে আবু বকর জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস, এ ঘরেও তাঁর অবস্থান বেশী দিন স্থায়ী হয়নি। ১৩ হিজরীতে হযরত আবু বকর (রাঃ) ইনতিকাল করেন। তারপর হযরত আসমা (রাঃ)-কে হযরত আলী (রাঃ) বিবাহ করেন। মুহাম্মদ ইব্‌নে আবু বকরও মায়ের সাথে আসেন এবং হযরত আলী (রাঃ)-এর যত্নে লালিত-পালিত হন। হিজরী ৩৮ সনে মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর (রাঃ) মিসরে শহীদ হন। এতে আসমা (রাঃ) অত্যন্ত দুঃখ পেয়েছিলেন, তবে ধৈর্যধারণ করে নামাযের মুসাল্লায় দাঁড়িয়ে যান। (ইসাবা) ৪০ হিজরীতে হযরত আলী (রাঃ) শহীদ হন। তারপর হযরত আসমা (রাঃ) ইন্তিকাল করেন। হযরত আসমা (রাঃ) হতে ৬০ খানা হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

হযরত ইমরান ইবনে হোসাইন (রাঃ)

হযরত ইমরান (রাঃ) হিযরতের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন। একই সাথে তাঁর পিতা এবং ভগ্নিও ইসলাম গ্রহণ করেন। মক্কা বিজয়ের সময় রাসূল (সাঃ)-এর সাথে থাকার সৌভাগ্য তাঁর হয়েছিল। তিনি হুনাইন এবং তায়েফ অভিযানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। রাসূল (সাঃ)-এর জীবদ্দশায় হযরত ইমরান (রাঃ) সদাসর্বদা মদীনা আসা যাওয়া করতেন। রাসূল (সাঃ)-এর বিয়োগে তাঁর হৃদয়ে এত আঘাত পেয়েছিলেন যে তিনি মদীনায় যাওয়া পর্যন্ত ছেড়ে দেন এবং সাধারণ জীবন ধারণ করতে থাকেন। এ কারণে তিনি হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর খিলাফত কালে রাষ্ট্রীয় সকল কার্যাবলী থেকে দূরে থাকেন। হযরত

উমর (রাঃ)-এর খিলাফতকালে বসরা নগরী ইসলামী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হলে তিনি তথায় গিয়ে আবাস গৃহ নির্মাণ করে ভিন্নভাবে বসবাস আরম্ভ করেন। হযরত উমর (রাঃ) তাঁকে বসরার মুফতি নিয়োগ করেছিলেন। দ্বিতীয় খলীফার ইন্তিকালের পর যে সমস্ত ফিতনা-ফাসাদের সৃষ্টি হয়েছিল এতে অনেক সাহাবী জড়িয়ে পড়লেও তিনি তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন।

বনী উমাইয়াদের শাসনামলের প্রথম দিকে তিনি জীবিত ছিলেন। উমাইয়া শাসক যিয়াদ তাঁকে খোরাসানের গভর্নর পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার অনুরোধ জানিয়েছিল। কিন্তু সত্য ও ন্যায়ের পরাকাষ্ঠা এ মহান সাহাবী এটা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। সম্মান, মর্যদা ও মহত্বের দিক দিয়ে তিনি বিশিষ্ট সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। বসরার কোন সাহাবী তাঁর সমপর্যায়ের ছিলেন না। তিনি ইসলাম গ্রহণ করার পর অনেক সময় রাসূল (সাঃ)-এর সান্নিধ্যে কাটিয়েছেন। রাসূল (সাঃ)-এর অনেক হাদীস শ্রবণ করার সৌভাগ্য তাঁর হয়েছে। তাঁর মুখস্থ শক্তি ছিল অত্যন্ত প্রখর। এজন্য রাসূল (সাঃ)-এর বহু হাদীস তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল। তিনি বলেন আমি যদি ইচ্ছা করি তাহলে পরাপর দু'দিন হাদীস বর্ণনা করতে পারি, যার মধ্যে একটি হাদীস দ্বিতীয়বার বলার প্রয়োজন হবেনা। এতদসত্ত্বেও তিনি হাদীসের প্রতি অত্যন্ত সতর্ক থাকার কারণে সর্বমোট ১৩০টি হাদীস রেওয়ায়েত করেন। তিনি ৫২ হিজরীতে বসরায় ইন্তিকাল করেন।

হযরত ইব্‌নে আবি আওফা (রাঃ)

ষষ্ঠ হিজরীতে হুদায়বিয়ার সন্ধির পূর্বে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। সুলহে হুদায়বিয়াতে তিনি রাসূল (সাঃ)-এর সাথে ছিলেন। বাইয়াতে রেযওয়ানে উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য তাঁর হয়েছিল। খায়বর যুদ্ধে সকলের পূর্বে তিনি রণাঙ্গনে অবতরণ করেন। হুনাইন যুদ্ধেও তিনি অংশ গ্রহণ করেন এবং অত্যন্ত বীরত্বের পরিচয় দেন। এ যুদ্ধে তিনি হাতে আঘাত পেয়েছিলেন। মক্কা বিজয়ে তিনি রাসূল (সাঃ)-এর সাথে ছিলেন। প্রাথমিক জীবনে ইসলামের বিরুদ্ধে সাতটি যুদ্ধে তাঁর তলোয়ার কোষমুক্ত হয়েছিল। ইসলাম গ্রহণের পর থেকে হযরত উমর (রাঃ)-এর খিলাফতের প্রাথমিক সময় পর্যন্ত তিনি মদীনাতে অবস্থান করেন। উমর (রাঃ)-এর সময় কুফা ইসলামী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হলে তিনি তথায় চলে যান এবং স্বীয় আসলাম গোত্র এলাকায় বসতি স্থাপন করেন। তিনি হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর খিলাফত কাল হতে হযরত আলী (রাঃ)-এর খিলাফত পর্যন্ত দীর্ঘ দিন কোষাধ্যক্ষের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। হযরত আলী (রাঃ)-এর সময় খারেজীদের উদ্ভব ঘটলে তিনি রাসূল (সাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী

মোতাবেক তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। অন্যান্য মুসলমানদেরকেও তিনি এ ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করেন। ইসলাম গ্রহণ করার পর দীর্ঘদিন মদীনাতে রাসূল (সাঃ)-এর একান্ত সাহচর্য লাভ করার কারণে তিনি হাদীসের এক বিশাল ভাণ্ডার হৃদয়পটে গ্রথিত করে রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। অবশ্য বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থে তাঁর থেকে বর্ণিত সর্বমোট ৯৫টি হাদীসের সন্ধান পাওয়া যায়।

হযরত ইব্‌নে আবি আওফা (রাঃ) দীর্ঘ জীবন লাভ করেছিলেন। উমাইয়াদের শাসনামলে তিনি জীবিত ছিলেন। শেষ জীবনে তিনি চোখের দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন। এ অবস্থায় তিনি ৮৬ থেকে ৮৮ হিজরীর মধ্যে ইন্তিকাল করেন। কুফায় মৃত্যুবরণকারী সাহাবীদের মধ্যে তিনি হলেন সর্বশেষ সাহাবী।

হযরত উবাদা ইবনুস সামিত (রাঃ)

নবুওয়াতের একাদশ বর্ষে মক্কায় হজ্বের মৌসুমে রাসূল (সাঃ)-এর দাওয়াতে সর্ব প্রথম যে ছ'জন আনসার সাহাবী ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন হযরত উবাদা ইবনুস সামিত (রাঃ) ছিলেন তাঁদের অন্যতম। অন্য এক বর্ণনা মতে তিনি আকাবায়ে সানীতে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি তৃতীয় আকাবাতেও উপস্থিত ছিলেন। এ আকাবায় রাসূল (সাঃ) তাঁকে কাওয়াফেল গোত্রের প্রতিনিধ নিযুক্ত করেছিলেন। বদর, উহুদসহ তিনি সকল যুদ্ধে রাসূল (সাঃ)-এর সাথে ছিলেন। বাইয়াতে রেদওয়ানে উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য তাঁর হয়েছিল। প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর খিলাফত কালে সিরিয়ার কয়েকটি যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেন। হযরত উমর (রাঃ)-এর সময় মিসর বিজয়ে তাঁর বিশেষ ভূমিকা ছিল। সিরিয়া বিজয়ের পর তিনি তথায় কাজী ও মুয়াল্লিম পদে দায়িত্ব পালন করেন। পরে তিনি হিমসে বসবাস করতেন। খলীফা উমর (রাঃ) তাঁকে ফিলিস্তিনের প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত করেন। আওযাঈর মতে তিনি ছিলেন ফিলিস্তিনের প্রথম বিচারপতি। তখনকার সিরিয়ার শাসনকর্তা হযরত আবু উবাইদা (রাঃ) তাঁকে মিসরের গভর্নর নিযুক্ত করেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি সিরিয়ায় বসবাস করতেন। তিনি রাসূল (সাঃ) হতে সর্বমোট **১৮১টি** হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি ৩৮ হিজরীতে হযরত উসমান (রাঃ)-এর খিলাফতকালে সিরিয়ার রামলায় ইন্তিকাল করেন। তাঁর মৃত্যুর স্থান সম্পর্কে যেমন মতবিরোধ রয়েছে ঠিক তেমনি তাঁকে সমাহিত করার ব্যাপারেও মতভেদ বিদ্যমান।

হযরত উম্মে হাবীবা (রাঃ)

হযরত উম্মে হাবীবা (রাঃ) স্বীয় স্বামীর সাথে একত্রে ইসলাম গ্রহণ করেন। তারা উভয় হাবশায় হিযরত করেছিলেন। তথায় তাঁর কন্যা হাবীবার জন্ম হয়।

হাবশায় অবস্থান কালে তাঁর স্বামী ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। ফলে উম্মে হাবীবা তথায় নিঃসঙ্গ জীবন-যাপন করতে থাকেন। এরই মধ্যে রাসূল (সাঃ)-এর সাথে বিবাহের পয়গাম তাঁর কাছে পৌঁছে। ৬ অথবা ৭ হিজরীতে এ বিবাহ সম্পন্ন হয়। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ৩৬ অথবা ৩৭ বছর। বিবাহের পর উম্মে হাবীবা হাবশা হতে জাহাজযোগে মদীনায় আগমন করেন,, তখন রাসূল (সাঃ) খায়বরে অবস্থান করছিলেন। রাসূল (সাঃ)-এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পর তাঁর পিতা আবু সুফিয়ান ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি মজবুত ঈমানের অধিকারী ছিলেন। তিনি হাদীসে নববীর উপর অত্যন্ত কঠোর আমল করতেন। তিনি ৬৫টি হাদীস রেওয়ায়েত করেন। তিনি রাসূল (সাঃ) এবং উম্মুল মু'মেনীন হযরত যয়নব বিন্‌তে জাহাশ (রাঃ) থেকে হাদীস গ্রহণ করেন। তিনি হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ)-এর শাসনামলে ৪৪ হিজরীতে ইনতিকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর। তাঁকে মদীনা মুনাওয়ারাতে সমাহিত করা হয়।

হযরত উম্মে আতিয়্যাহ (রাঃ)

হযরত উম্মে আতিয়্যাহ (রাঃ) হিযরতের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি রাসূল (সাঃ)-এর সাথে ইসলামী কয়েকটি যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। খায়বরের যুদ্ধে তাঁর অংশগ্রহণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যুদ্ধের ময়দানে তিনি খাবার তৈরী করা, মালামাল সংরক্ষণ করা, রুগীদের সেবা করা এবং যুদ্ধাহতদের পট্টিবাধা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব পালন করতেন। সমাজ সেবমূলক কাজে তিনি সদা-সর্বদা নিয়োজিত থাকতেন। এলাকার মহিলা মৃতদের গোসলের কাজ তিনিই করতেন। মেয়ে সুলভ সামাজিক কাজে তিনি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। খোলাফায়ে রাশেদার দীর্ঘ শাসনামলের কোন এক যুদ্ধে তাঁর এক পুত্র আহত হয়ে বসরায় গেলে তিনিও তথায় গমন করেন। কিন্তু বসরায় পৌছার একদিন পূর্বে তাঁর পুত্র ইন্তিকাল করেন। হযরত উম্মে আতিয়্যাহ (রাঃ) বসরার বনু খলফের প্রাসাদে অবস্থান করেন। তাঁর মৃত্যু সন সম্পর্কে সঠিক কোন তথ্য পাওয়া যায়না। হযরত উম্মে আতিয়্যাহ (রাঃ) রাসূল (সাঃ) এবং হযরত উমর (রাঃ) হতে হাদীস বর্ণনা করেন। তাঁর রেওয়ায়েতকৃত হাদীসের সংখ্যা ৪১টি।

হযরত উম্মে হানী (রাঃ)

হুবায়রা ইবনে আমর ইব্‌নে আয়েয আল মাখযুমীর সাথে উম্মে হানীর বিয়ে হয়। হিজরী ৮ সনে মক্কা বিজয়ের পর তিনি মুসলমান হন। রাসূল (সাঃ) সে দিন তাঁর গৃহে গোসল করেন এবং চাশতের নামায আদায় করেন। তিনি নিজ গৃহে আত্মীয় সম্পর্কিত দু'জন মুশরিককে আশ্রয় দিয়েছিলেন। রাসূল (সাঃ) তাদের এ আশ্রয় মুঞ্জুর করেন। (মুসনাদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড) তাঁর স্বামী হুবায়রা মক্কা

বিজয়ের দিন নাজরানে পালিয়ে যায়। তিনি রাসূল (সাঃ) হতে ৪৬টি হাদীস বর্ণনা করেন। বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থে তা সংগৃহীত হয়েছে। তাঁর ইন্তিকালের সঠিক সময় জানা যায়না।

হযরত কাতাদা ইব্‌নে নোমান (রাঃ)

হযরত কাতাদা (রাঃ) আকাবায়ে সানীতে ইসলাম গ্রহণ করেন। বদর ও উহুদ যুদ্ধে তিনি অংশ গ্রহণ করেন। উহুদ যুদ্ধে খোদাদ্রোহী শক্তির বিরুদ্ধে লড়ার সময় এক পাষণ্ড মুশরিকের আঘাতে তাঁর এক চক্ষু উপড়ে পড়ে। কিন্তু দেহচ্ছুত চক্ষুটি যথাস্থানে রাখার পর রাসূল (সাঃ) দোয়া করলে আল্লাহ্‌র অপার মহিমায় এটা পূর্ণ ভাল হয়ে যায়। এটা এক অত্যাশ্চার্য ঘটনা। কোন কোন চরিতকার এ ঘটনাকে বদরের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। কিন্তু এটা যথার্থও সঠিক নয়। মূলতঃ এটা উহুদেরই ঘটনা। ইমাম মালেক, দারকুতনী, বায়হাকী এবং হাফেয ইব্‌নে আবদুল বার এ অভিমতকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। মক্কা বিজয়ের সময় তিনি রাসূল (সাঃ)-এর সাথে ছিলেন। এ সময় তাঁর হাতে বনু বকরের পতাকা ছিল। হুনাইনের যুদ্ধে তিনি শরীক ছিলেন এবং বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা প্রদর্শন করেন। রাসূল (সাঃ) হিজরী ১১ সনে উসামা ইব্‌নে যায়দ (রাঃ)-এর নেতৃত্বে যে সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন হযরত কাতাদা (রাঃ) এটাতে শরীক ছিলেন। তিনি হযরত উমর (রাঃ)-এর খিলাফতকালে হিজরী ২৩ সনে ইন্তিকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর। খলীফা উমর (রাঃ) তাঁর জানাযা নামাযের ইমামতি করেন। তাঁকে কবরে রাখার জন্য হযরত উমর (রাঃ), হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) এবং হযরত মুহাম্মদ ইব্‌নে মুসলিম (রাঃ) তাঁর কবরে অবতরণ করেন। এটা ছিল তাঁর জন্য বিশেষ সৌভাগ্যের ব্যাপার। মৃত্যুকালে তিনি উমর ও উবাইদ নামে দু'পুত্র রেখে যান।

হযরত কা'ব ইব্‌নে উযরা (রাঃ)

হযরত কা'ব ইব্‌নে উযরা (রাঃ) হিযরতের পর ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি ইসলামের সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। কোন এক যুদ্ধে তাঁর একটি হাত কেটে গিয়েছিল। হুদায়বিয়ার ওমরাতে তিনি রাসূল (সাঃ)-এর সাথে ছিলেন। এ সময় তাঁর মাথায় এত বেশী উকুন হয়েছিল যে, উকুন তাঁর নাকে মুখে এসে পড়ত। রাসূল (সাঃ) এটা দেখে তাঁকে মস্তক মুণ্ডন করতে বললেন। হযরত কা'ব (রাঃ) তখন যদিও ইহরাম অবস্থায় ছিলেন, তবুও রাসূল (সাঃ)-এর নির্দেশ পালনার্থে মস্তক মুণ্ডন করেন এবং কষ্ট হতে মুক্তি লাভ করেন। ন্যায়ের সমর্থন ও রাসূল প্রীতি–এ দু'টি বস্তু তাঁর চরিত্রের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল। তিবরানীর "কিতাবুল আউসাত" গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে, একদিন কা'ব রাসূল (সাঃ)-এর

খেদমতে হাযির হয়ে দেখতে পেলেন যে, ক্ষুধায় রাসূল (সাঃ)-এর চেহারা মোবারক বিবর্ণ হয়ে গিয়েছে। তিনি তাড়াতাড়ি ফিরে আসেন। পথে এক ইহুদীর সাক্ষাত ঘটে। সে তার উটকে পানি পান করাতে ছিল। তখন কা'ব ইহুদীর সাথে প্রতি বালতির বিনিময়ে একটি খেজুর চুক্তি করে কিছুক্ষণ কূপ থেকে পানি উঠালেন এবং এটাতে যে খেজুর তিনি পেয়েছিলেন, তাই নিয়ে রাসূল (সাঃ)-এর খেদমতে হাজির হলেন। এটা দ্বারাই প্রতীয়মান হয় যে, তাঁর মধ্যে রাসূল প্রীতি কত প্রগাঢ় ছিল। রাসূল (সাঃ)-এর ইনতিকালের পর তিনি কুফায় বসতি স্থাপন করেন। তিনি হযরত কা'ব (রাঃ), রাসূল (সাঃ), হযরত ওমর (সাঃ) এবং হযরত বিল্লাল (রাঃ) হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি ৫১ হিজরীতে ৭৫ বছর বয়সে মদীনায় ইনতিকাল করেন। মৃত্যুকালে তিনি চার পুত্র রেখে যান। তাঁরা প্রত্যেকেই হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁরা হলেন–ইসহাক, আবদুল মালেক, মুহাম্মদ ও রাবী।

হযরত খালিদ ইব্‌নে ওয়ালিদ

হযরত খালিদ ইব্‌নে ওয়ালিদের সঠিক জন্ম তারিখ জানা যায়না। বিভিন্ন বর্ণনা মতে রাসূল (সাঃ)-এর নবুওয়াত প্রাপ্তির সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ২৪ অথবা ২৫ বছর। এ হিসাবে তিনি নবুওয়াতের ১৫ অথবা ১৬ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। ইব্‌নে আসাকির বলেন, হযরত খালিদ (রাঃ) হযরত ওমরের সমবয়সি ছিলেন। হযরত খালিদের নসবনামা হল–খালিদ ইব্‌নে ওয়ালিদ ইব্‌নে মুগিরাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমর অথবা আমর ইব্‌নে মাখজুম ইব্‌নে ইয়াকজাহ ইব্‌নে মাররাহ ইব্‌নে কা'ব ইবনে লুববীউল কারাশী। হযরত খালিদ (রাঃ)-এর উর্ধ্বতন সপ্তম পুরুষ মাররাহ ইব্‌নে কা'ব পর্যন্ত গিয়ে তাঁর বংশধারা রাসূল (সাঃ) এবং হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর বংশের সাথে মিলিত হয়েছে। প্রাথমিক জীবনে খালিদ ছিলেন ইসলামের ঘোর শত্রু। বদর, উহুদ এবং খন্দকে তিনি মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। তাঁর ভাই ওয়ালিদের আহবানে তিনি ইসলামের প্রতি ক্রমান্নয়ে আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। তিনি অষ্টম হিজরী মক্কা বিজয়ের পূর্বে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণ করে সর্ব প্রথম তিনি মু'তার যুদ্ধে অংশ নেন। এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল তাঁর ইসলাম গ্রহণের মাত্র দু'মাস পরে। এ যুদ্ধে তিনি অসামান্য বীরত্ব প্রদর্শন করে রাসূল (সাঃ)-এর কাছে সাইফুল্লাহ উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। তিনি মক্কা বিজয়, হুনাইন, তায়েফ এবং তাঁবুক অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। দমম হিজরীতে বিদায় হজ্বে তিনি রাসূল (সাঃ)-এর সহযাত্রী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন।

হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর খিলাফতকালে হযরত খালিদের অসাধারণ সামরিক কৃতিত্বের বিকাশ ঘটে। এ সময় তিনি বহু অঞ্চল বিজয় করতে সক্ষম

হন। প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর (রাঃ) তাঁকে সেনাপতি নিযুক্ত করে ইয়ারমুক অভিযানে প্রেরণ করেছিলেন। অবশ্য যুদ্ধ চলাকালীন অবস্থায় প্রথম খলীফার ইন্তিকাল হলে হযরত উমর (রাঃ) খলীফা পদে অধিষ্ঠিত হন এবং ১৩ হিজরীতে তাঁকে সেনাপতির পদ থেকে সাময়িকভাবে বরাখাস্ত করেন। হযরত খালিদ (রাঃ) এ আদেশ স্বাভাবিক ভাবেই মেনে নেন এবং সাধারণ সৈনিক বেশে বাকী যুদ্ধে শরীক থাকেন। কিন্তু হযরত খালিদ কবি আশয়াছ ইবনে কায়েসকে এক হাজার দিনার উপঢৌকন প্রদানের অভিযোগে হযরত উমর (রাঃ) ১৭ হিজরীতে তাঁকে সম্পূর্ণভাবে পদচ্যুত করেন। এর কিছুদিন পর খলীফা তাঁকে রাহা, হিরান, আমদ এবং লারতার অঞ্চল সমূহের গভর্নর নিয়োগ করেন। এ দায়িত্বে এক বছর বহাল থাকার পর তিনি পদত্যাগ করেন। উল্লেখ্য, হযরত খালিদ (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করার পর মাত্র ১৪ বছর জীবিত ছিলেন। এ সময়ের মধ্যে তিনি সোয়াশ ভিন্ন বর্ণনায় তিনশত যুদ্ধে সফল অংশ নেন। মহান দ্বিগ্বিজয়ী সেনাপতি হযরত খালিদ (রাঃ) ২১ অথবা ২২ হিজরী মোতাবেক ৬৪৩ খৃষ্টাব্দে ইন্তিকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬০ বছর। অধিকাংশ চরিতকারদের মতে তিনি হেমসে ইন্তিকাল করেন এবং তথায়ই তাঁকে সমাহিত করা হয়। তিনি অধিকাংশ সময় ইসলামী সমরাভিযানে কাটিয়ে দেয়ার ফলে হাদীসে নববীর তেমন একটা খিদমত আঞ্জাম দিয়ে যেতে পারেননি। তবুও তাঁর থেকে বর্ণিত ১৮টি হাদীসের সন্ধান পাওয়া যায়।

হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ)

হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) পিতার সাথে মক্কা বিজয়ের দিন ইসলাম গ্রহণ করেন। অন্য এক বর্ণনা মতে মুয়াবিয়া (রাঃ) হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় ইসলাম গ্রহণ করেন কিন্তু পিতার ভয়ে তা প্রকাশ করেননি। তিনি হুনাইন এবং তায়েফের যুদ্ধে রাসূল (সাঃ)-এর সাথে ছিলেন। তিনি ছিলেন রাসূল (সাঃ)-এর কাতিবে অহীর অন্যতম একজন। প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর খিলাফতকালে মুয়াবিয়া (রাঃ)-এর প্রতিভার বিকাশ ঘটে। তিনি শামের অভিযানসমূহে অংশগ্রহণ করেন। হযরত উমর (রাঃ)-এর খিলাফতের শেষের দিকে রোমীয়রা শামের কোন কোন এলাকা দখল করে নিলে হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) রোমীয়দের পরাজিত করে সে এলাকা পুনঃদখল করেন। হযরত উমর (রাঃ) তাঁকে কাইসারিয়ার অভিযানে প্রেরণ করলে অতি সহজে তিনি তা দখল করেন। ১৮ হিজরীতে খলীফা উমর (রাঃ) তাঁকে দামেস্কের গভর্নর নিযুক্ত করেন। তিনি চার বছর এ পদে বহাল ছিলেন। তাঁর অসাধারণ রাজনৈতিক প্রজ্ঞা এবং অসীম সাহসের জন্য হযরত উমর (রাঃ) তাঁকে "আরবের কিসরা" উপাধিতে ভূষিত করেন।

তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান (রাঃ) তাঁকে গোটা শাম দেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। এ সময় তিনি সর্ব প্রথম সমুদ্র পথে অভিযান পরিচালনা করেন। হযরত উসমান (রাঃ)-এর খিলাফতকালে বিভিন্ন রাজ্য বিজয়ে হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ)-এর বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। হযরত আলী (রাঃ)-এর খিলাফতকালে অনুষ্ঠিত উষ্ট্রের যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেননি। হযরত আলী (রাঃ) খিলাফতে আসীন হয়ে প্রশাসনের বহু রদবদল করেন। খলীফা তদানীন্তন শামের গভর্নর হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ)-এর স্থলে সহল ইব্‌নে হানীফকে তথাকার গভর্নর নিযুক্ত করে প্রেরণ করেন। কিন্তু মুয়াবিয়া (রাঃ) এ সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যান করেন। এখান থেকেই উভয়ের মাঝে মতপার্থক্যের সূচনা হয়। তাঁদের অন্তরকলহের ফলশ্রুতি স্বরূপ মর্মান্তিক সিফ্‌ফীনের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যার করুণ পরিণতি মুসলিম উম্মাহ আজও ভোগ করছে। হিজরী ৪০ সালে হযরত আলী (রাঃ) শাহাদতবরণ করলে হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) মুসলিম বিশ্বের একচ্ছত্র আমীর নিযুক্ত হন। তিনি ক্ষমতায় আসীন হয়ে কুফার পরিবর্তে দামেস্ককে ইসলামী সাম্রাজ্যের কেন্দ্রীয় রাজধানীতে রূপান্তরিত করেন। হযরত উমর (রাঃ)-এর পর একমাত্র তিনি ইসলামী রাজ্যের বিশাল বিস্তৃতি ঘটিয়েছিলেন। রাষ্ট্রোন্নয়নেও তিনি বহু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত প্রায় ২০ বছর ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) শুধু রাজনৈতিক প্রতিভায় প্রজ্ঞাবান ছিলেন না, বরং তিনি হাদীসশাস্ত্রেও প্রজ্ঞাবান ছিলেন। তিনি সর্বমোট ১৩০টি হাদীস বর্ণনা করেন। এটা বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য হাদীস গ্রন্থে স্থাপন পেয়েছে। তাঁর থেকে বহু সংখ্যক রাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি ৬০ হিজরী রযব মাসে দামিস্কে ইন্তিকাল করেন। ইব্‌নে কাইস তাঁর জানাযার নামায পড়ান। তাঁকে দামেস্কে সমাহিত করা হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর।

হযরত মায়মুনা (রাঃ)

উম্মুল মু'মেনীন হযরত মায়মুনা (রাঃ)-এর পূর্ব নাম ছিল বাররা। রাসূল (সাঃ)-এর সাথে বিয়ের পর তাঁর নাম রাখা হয় মায়মুনা। পিতার নাম হারেস। মাতার নাম হিন্দ। মাসউদ ইব্‌নে উমাইর সাকাফীর সাথে তাঁর প্রথম বিয়ে হয়। তাঁর দ্বিতীয় স্বামীর নাম ছিল আবু রেহেম ইব্‌নে আবদুল উয্‌যা। আবু রেহেমের মৃত্যুর পর হযরত মায়মুনা (রাঃ) মক্কায় বিধবা জীবন-যাপন করতে থাকেন। এ অবস্থায় রাসূল (সাঃ) হযরত যাফর ইব্‌নে আবু তালিবকে বিবাহের পয়গাম নিয়ে তাঁর কাছে পাঠান। সপ্তম হিজরীতে শাওয়াল মাসে রাসূল (সাঃ)-এর সাথে তাঁর বিবাহের মাধ্যমে তিনি উম্মুল মুমেনীন হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন। মক্কার সন্নিকটে সারিফ নামক স্থানে ইহরাম অবস্থায় এ বিবাহ সম্পন্ন হয়। হযরত মায়মুনা (রাঃ)-এর ভগ্নীপতি হযরত আব্বাস ইব্‌নে আবদুল মোত্তালিব

(রাঃ) এ বিবাহের ওয়ালী নিযুক্ত হন এবং তিনি বিবাহ পড়ান। বিবাহের মোহর নির্ধারিত হয়েছিল পাঁচশত দিরহাম। তিনি ছিলেন রাসূল (সাঃ)-এর সর্বশেষ স্ত্রী। হযরত মায়মুনা (রাঃ) ৪৬টি হাদীস বর্ণনা করে। তিনি ৬১ হিজরী মোতাবেক ৬৮১ খৃষ্টাব্দে 'সারিফ' নামক স্থানে ইনতিকাল করেন। এ সারিফেই রাসূল (সাঃ)-এর সাথে তাঁর বিবাহ হয়েছিল। এখানে তাঁকে সমাহিত করা হয়। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) তাঁর জানাযা পড়ান এবং তাঁকে কবরে শায়িত করেন। উল্লেখ্য রাসূল (সাঃ)-এর সাথে তাঁর বিবাহ হয়েছিল রাসূল (সাঃ)-এর সকল স্ত্রীদের শেষে এবং তিনি তাঁদের সর্বশেষে ইন্তিকাল করেন।

হযরত মিসওয়ার ইব্‌নে মাখরামা (রাঃ)

রাসূল (সাঃ)-এর হিযরতের পর মক্কা নগরীতে তাঁর জন্ম হয়। জন্মগতভাবে তিনি ছিলেন মুসলমান। কেননা পিতা-মাতা উভয় ছিলেন মুসলমান। অষ্টম হিজরীতে তাঁর পিতা-মাতা তাঁকে নিয়ে মদীনায় হিজরত করেন। রাসূল (সাঃ)-এর ইন্তিকালের সময় মিসওয়ার (রাঃ) ছিলেন ৮ বছরের বালক। এতদসত্ত্বেও তিনি সাহাবী হওয়ার মর্যদা লাভে ধন্য হয়েছিলেন। হযরত উসমান (রাঃ)-এর শাহাদত পর্যন্ত এ দীর্ঘ সময় মদীনাতে অবস্থান করেন। তাঁর শাহাদতে তিনি এতই মর্মাহত হয়েছিলেন যে অবশেষে মদীনা ছেড়ে মক্কাতে প্রত্যাবর্তন করেন। ইয়াযিদ ক্ষমতাসীন হলে তিনি তার হাতে বায়য়াত করাকে অপছন্দ করেন। পরবর্তীতে তিনি পুনরায় মক্কা হতে মদীনায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ইয়াদিয খিলাফত আসীন হওয়ার পর সকলের বায়য়াত চাইলে হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌নে যুবাইর (রাঃ) এটা অস্বীকার করেন। ফলে প্রতিহিংসার দাবানলে প্রজ্জ্বলিত হয়ে ইয়াযিদ ৬৪ হিজরীতে হাজ্জাজ ইব্‌নে ইউসুফকে তাদেরকে অবরোধ করার নির্দেশ দেয়। এ অবরোধে হযরত মিসওয়ার ইবনে মাখরামা (রাঃ) ও অবরুদ্ধ হন। কা'বার চত্বরে অবরুদ্ধ অবস্থায় হযরত মিসওয়ার (রাঃ) হাজরে আসওয়াদের পার্শ্বে নামাযরত ছিলেন। এমতাবস্থায় শত্রু বাহিনীর নিক্ষিপ্ত পাথরে তিনি আঘাতপ্রাপ্ত হন। আঘাতের ঠিক পাঁচ দিন পর অবরুদ্ধ অবস্থায়ই তিনি ইন্তিকাল করেন। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৬২ বছর। রাসূল (সাঃ)-এর ইন্তিকালের সময় তিনি মাত্র ৮ বছরের বালক ছিলেন। এতদসত্ত্বেও তিনি রাসূল (সাঃ)-এর মুখনিঃসৃত বাণী গভীর আগ্রহ নিয়ে শ্রবণ ও মুখস্থ করতেন। তিনি সর্বমোট ২২ খানা হাদীস বর্ণনা করেন।

হযরত মুহাম্মদ ইব্‌নে মাসলামা (রাঃ)

তিনি প্রাথমিক পর্যায় মুসয়াব ইব্‌নে যুবাইর (রাঃ)-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি আশারায়ে মুবাশ্‌শারা হযরত আবু উবায়দা

ইব্‌নে জাররাহ (রাঃ)-এর সাথে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হন। বদর যুদ্ধে তিনি শরীক ছিলেন। বদর যুদ্ধের পর বিখ্যাত ইহুদী কবি কা'ব ইবনে আশরাফকে তিনি রাসূল (সাঃ)-এর নির্দেশে এক বিশেষ কৌশল অবলম্বন করে হত্যা করেছিলেন। ঘটনাটি বুখারী শরীফে বিস্তারিতভাবে বিধৃত হয়েছে। উহুদ যুদ্ধে তিনি মুসরিম সৈন্যবাহিনীর সংরক্ষণে নিয়োজিত ছিলেন। রাসূল (সাঃ)-এর সাথে প্রবঞ্চনা ও প্রতারণাকারী নাযীর গোত্রকে তিনি ৪র্থ হিজরীতে মদীনা থেকে বিতাড়িত করেন। বনী কুরায়যার যুদ্ধেও তাঁর বিরাট ভূমিকা ছিল। ৯ম হিজরীতে অনুষ্ঠিত তাঁবুক যুদ্ধে গমনের পূর্বে রাসূল (সাঃ) তাঁর উপর মদীনার রাষ্ট্র পরিচালনার ভার অর্পণ করেন। হযরত উমর (রাঃ) হযরত মুহাম্মদ ইব্‌নে মাসলামা (রাঃ)-কে রাষ্ট্রীয় কর্মচারীদের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের তদারকীর গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করেন। তিনি উমর (রাঃ)-এর খিলাফতের শেষ পর্যন্ত মদীনাতেই ছিলেন। এর পর রাবযায় গিয়ে বসবাস করতে থাকেন। হযরত আলী (রাঃ)-এর সময় সংঘটিত আত্মঘাতী উষ্ট্রের এবং সিফ্‌ফিনের যুদ্ধে নিরপেক্ষ ভূমিকা অবলম্বন করেন। তিনি হিজরী ৪৬ সনে হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) এর শাসনামলে নিজ গৃহে সিরীয় কোন্ এক ব্যক্তির তলোয়ারের আঘাতে শাহাদত বরণ করেন। এ সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৭ বছর। তদানীন্তন মদীনার শাসনকর্তা মারওয়ান তাঁর জানাযার নামায পড়ান। তাঁকে মদীনার জান্নাতুল বাকীতে দাফন করা হয়। তিনি সু-দীর্ঘকাল রাসূল (সাঃ)-এর গভীর সাহচর্যে কাটান এবং তাঁর থেকে অগণিত হাদীস শ্রবণ করেন। কিন্তু তাঁর মাত্র ৬টি রেওয়ায়েত হাদীসের কিতাবসমূহে পাওয়া যায়।

হযরত যায়েদ ইব্‌নে খালেদ আল জুহানী (রাঃ)

৬ষ্ঠ হিজরীতে অনুষ্ঠিত হুদায়বিয়ার সন্ধির পূর্বে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। এর পর তিনি মদীনাতে চিরস্থায়ী ভাবে বসবাস করতে থাকেন। হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় তিনি তথায় উপস্থিত ছিলেন। মক্কা বিজয়ের সময় তিনি স্ব-গোত্রের সাথে ছিলেন। তিনি সর্বমোট ৮১টি হাদীস বর্ণনা করেন। তাঁর মৃত্যু সন নিয়ে বহু মতানৈক্য রয়েছে। তবে বিশুদ্ধ বর্ণনা মতে তিনি ৭৮ হিজরীতে মদীনায় ইন্তিকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর।

হযরত যেহ্‌হাক ইবনে সুফইয়ান (রাঃ)

মক্কা বিজয়ের পূর্বে তিনি ইসলামে দীক্ষিত হন। ইসলাম গ্রহণের পর রাসূল (সাঃ) তাঁকে তাঁর সম্প্রদায়ের নব মুসলিমদের নেতা নির্ধারণ করেন। মক্কা বিজয়ের সময় যখন মুসলমানদের সমস্ত গোত্র একত্রিত হতে লাগল তখন তিনি স্বীয় গোত্রের ন"শত মুসলমানদের এক বিরাট দল নিয়ে তথায় আসেন। তিনি

প্রখ্যাত বীর ও সাহসী ব্যক্তি ছিলেন। এজন্য সকল সঙ্কটময় মুহূর্ত উত্তরণের জন্য তিনি নির্বাচিত হতেন। প্রমান স্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে, রাসূল (সাঃ) ৯ম হিজরীতে হযরত যেহ্হাক (রাঃ)-এর কাবীলা বনী কেলাবের উদ্দেশ্যে যে সারিয়া প্রেরণ করেছিলেন এটা তাঁরই নেতৃত্বাধীন ছিল। বিভিন্ন যুদ্ধ-বিগ্রহে অংশ গ্রহণ ছাড়াও তিনি বিশেষভাবে রাসূল (সাঃ)-এর নিরাপত্তার খিদমত আঞ্জাম দিতেন। এমনকি কোন কোন সময় তিনি কোষমুক্ত তলোয়ার নিয়ে রাসূল (সাঃ)-এর পাশে দাঁড়িয়ে থাকতেন। যার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি রাসূল (সাঃ) কর্তৃক 'সিয়াফে রাসূল' বা রাসূল (সাঃ)-এর তলোয়ার এ সম্মানিত উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। হাদীস রেওয়ায়েতের ক্ষেত্রে তাঁর বিশেষ ভূমিকা পরিলক্ষিত হয়না। তিনি মাত্র চারটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

হযরত সালমা ইব্‌নে আকওয়া (রাঃ)

তিনি ৬ষ্ঠ হিজরীতে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়-স্বজন ত্যাগ করে মদীনায় হিযরত করেন। ইসলাম গ্রহণের পর সর্ব প্রথম বাইয়াতে রেজওয়ানে উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য তাঁর হয়েছিল। ৬ষ্ঠ হিজরীর পর অনুষ্ঠিত সকল যুদ্ধে তিনি অংশ গ্রহণ করেন। এতে তিনি বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। হাওয়াজেন যুদ্ধে তিনি কাফেরদের গুপ্তচরকে হত্যা করেছিলেন। তিনি কয়েকটি সারিয়্যাতেও অংশ নেন। এর মধ্যে বনী কিলাব সারিয়্যা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এতে তিনি সাধারণ সৈনিক বেশে অংশ নিয়েছিলেন। রাসূল (সাঃ)-এর ইন্তিকালের পরও তিনি মদীনাতে ছিলেন। হযরত উসমান (রাঃ)-এর শাহাদতের পর তিনি মদীনা থেকে 'রবজাহ' নামক স্থানে চলে যান। এখানে তিনি বিবাহ করে বসবাস করতে থাকেন। তিনি ছিলেন জ্ঞানে-গুণে অতুলনীয়। রাসূল (সাঃ) থেকে তিনি বহু হাদীস মুখস্থ করেন। তাঁর রেওয়ায়েতকৃত ৭৭টি হাদীসের সন্ধান বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থে পাওয়া যায়। তাঁর কাছ হতে বহু সংখ্যক রাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন। একদিন তিনি কোন এক কাজের জন্য রবজাহ থেকে মদীনা আগমন করেন। এর পর তিনি আর রবজায় ফিরে যেতে পারেননি। আল্লাহ্‌র ডাকে লাববাইক বলে তিনি ৭৪ হিজরী মদীনাতে ইন্তিকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর।

হযরত সফওয়ান ইব্‌নে উমাইয়্যা (রাঃ)

জাহেলী যুগে সফওয়ানের বংশধর অত্যন্ত সম্মানিত ও প্রভাবশালী ছিল। সে এবং তাঁর পিতা উমাইয়্যা ইসলামের ঘোরতর শত্রু ছিল। হযরত বিলাল (রাঃ) তাদের গোলাম ছিল। বিলালের ইসলাম গ্রহণের দায়ে তারা তাঁকে অমানষিক নির্যাতন করে। বদর যুদ্ধে উমাইয়্যা নিহত হলে সফওয়ান পিতৃ

হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার দৃঢ় সংকল্প ব্যক্ত করে। তাই সে তৃতীয় হিজরীতে সাহাবী যায়দ ইব্‌নে দাসনা (রাঃ)-কে ক্রীতদাস রূপে ক্রয় করে হত্যা করত প্রতিশোধ গ্রহণ করে। মক্কা বিজয়ের সফওয়ান (রাঃ)-এর অন্তর ক্রমশঃ ইসলামের দিকে ঝুঁকতে থাকে। হুনাইনের যুদ্ধে অর্জিত গনীমতের মাল থেকে রাসূল (সাঃ) তাকে একশত উট উপঢৌকন প্রদান করেছিলেন। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই তার হৃদয় রাসূল (সাঃ)-এর উপর দুর্বল হয়ে পড়ে। তাই তিনি গোযওয়ায়ে তায়েফের অব্যবহিত পরই পবিত্র ইসলামে দীক্ষিত হন। অবশ্য তাঁর স্ত্রী তাঁর পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও রাসূল (সাঃ) তাঁদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেননি। এমনকি উভয়ের বিবাহ পুনঃ নবায়নও করেননি। হিযরতের ফযিলত অবহিত হয়ে তিনি ইসলাম গ্রহণের পর পরই হিযরত করে মদীনায় চলে আসেন। তথায় তিনি হযরত আব্বাস (রাঃ)-এর কাছে আশ্রয় গ্রহণ করেন। মদীনায় তাঁর পদার্পণের খবর রাসূল (সাঃ) জানতে পেরে তাঁকে বললেন, ফতেহ মক্কার পর কোন হিযরত নেই। তাই তুমি মক্কায় চলে যাও। রাসূল (সাঃ) এ নির্দেশ পেয়ে তিনি মক্কায় চলে আসেন এবং বাকী জীবন এখানেই অতিবাহিত করেন।

হযরত উমর (রাঃ)-এর খিলাফতকালে সিরিয়ায় অভিযান পরিচালিত হলে তিনি এতে অংশ গ্রহণ করেন। মৃত্যুকালে তিনি উমাইয়্যা এবং আবদুল্লাহ নামে দু'পুত্র সন্তান ইয়াদগার রেখে যান। তিনি শেষ দিকে ইসলাম গ্রহণ করলেও রাসূল (সাঃ)-এর গভীর সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন। যার পরিপ্রেক্ষিতে কিছু সংখ্যক হাদীসে নববী তিনি রেওয়ায়েত করেন।

হযরত সুরাকা ইব্‌নে মালেক (রাঃ)

ইসলাম দীক্ষিত হওয়ার পূর্বে তিনি ইসলাম বৈরী এবং রাসূল (সাঃ)-এর চরম শত্রু ছিলেন। মক্কা থেকে হিযরতের পরপরই কুরাইশ কর্তৃক মুহাম্মদের দ্বি-খণ্ডিত শির আনার পুরস্কার ঘোষণা হলে তিনি কোষমুক্ত তলোয়ার নিয়ে ঘোড়ায় সাওয়ার হয়ে পুরস্কার লাভের উন্মত্ততায় তাঁর পিছনে ছুটেছিল। এতই চরম ছিল তার ইসলাম বিদ্বেষ। হযরত সুরাকা (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে দু'টি অভিমত পাওয়া যায়। এক বর্ণনা মতে রাসূল (সাঃ) হুনায়ন এবং তায়েফের যুদ্ধ শেষে ফেরার পথে জি'রানা নামক স্থানে সুরাকার সাথে সাক্ষাত ঘটে এবং এ সময় তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। অপর এক বর্ণনা অনুযায়ী মক্কা বিজয়ের দিন তিনি ইসলামে দীক্ষিত হন। অবশ্য প্রথম অভিমতটি অধিক গ্রহণযোগ্য। বিদায় হজ্বে তিনি রাসূল (সাঃ)-এর সাথে ছিলেন। তিনি শেষের দিকে ইসলাম গ্রহণ করলেও রাসূল (সাঃ)-এর গভীর সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন।

অধিকাংশ সময় তিনি মদীনায় রাসূল (সাঃ)-এর কাছে কাটাতেন। তিনি তাঁকে শিক্ষা-দীক্ষা প্রদান করে শিষ্টাচার এবং যাবতীয় গুণে গুণান্বিত করে তোলেন। অনেক সময় হযরত সুরাকা (রাঃ) নিজেও রাসূল (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করে অনেক জিনিস জেনে নিতেন। যার ফলশ্রুতিতে তিনি অল্প সময় ইলমের এক বিশাল ভাণ্ডার করায়ত্ব করতে সক্ষম হন। তিন একজন কবিও ছিলেন। তিনি হযরত উসমান (রাঃ)-এর খিলাফতকালে ২৪ হিজরীতে তিনি ইন্তিকাল করেন। তিনি অল্প সময় রাসূল (সাঃ)-এর গভীর সান্নিধ্য লাভ করলেও তাঁর থেকে তিনি মাত্র ১৯টি হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন।

হযরত হাফ্‌সা (রাঃ)

উম্মুল মু'মেনীন হযরত হাফসা (রাঃ) হলেন মুসলিম জাহানের দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)-এর কন্যা। তাঁর মাতার নাম যয়নব বিন্‌তে মায্‌উন। তিনি নবুওয়াতের পাঁচ বছর পূর্বে মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি স্বীয় পিতা হযরত উমর (রাঃ)-এর সাথে ইসলাম গ্রহণ করেন। প্রথমে তাঁর কুরাইশ বংশের খুনাইস ইব্‌নে হোযাফার সাথে বিবাহ হয়। হযরত হাফসা (রাঃ) স্বামীর সাথে মদীনা হিযরত করেন। খুনাইস বদর যুদ্ধে আহত হয়ে মদীনায় ইন্তিকাল করলে হাফসা বিধবা হন। হযরত উমর (রাঃ) হযরত আবু বকর (রাঃ) এবং হযরত উসমান (রাঃ)-এর কাছে তাঁর বিবাহের পয়গাম প্রদান করেন। তাঁদের সাথে বিবাহ বন্ধন না হওয়ায় স্বয়ং রাসূল (সাঃ) হাফসার সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। এ শুভ বিবাহ সম্পন্ন হয় তৃতীয় হিজরীতে উহুদ যুদ্ধের পরের দিন। রাসূল (সাঃ) ঔরসে তাঁর কোন সন্তান জন্মেনি। তিনি ছিলেন তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অধিকারীণী। তিনি ছিলেন অত্যন্ত ইবাদত গুজার এবং ধর্মপরায়ন রমণী। তিনি রাতে নামায আদায় করতেন আর দিনে রোযা রাখতেন। তিনি সাধারণত নির্লিপ্ত জীবন-যাপন করতেন। তনি রাসূল (সাঃ)-এর অন্যান্য সহধর্মিনীদের ন্যায় খায়বার যুদ্ধের গণীমতের অংশ পেয়েছিলেন। তিনি রাসূল (সাঃ)-এর ইন্তিকালের পর কোষাগার হতে প্রায় এক হাজার দিরহাম ভাতা লাভ করেন। কুরআন সংগ্রহে তাঁর ভূমিকা বিশেষভাবে স্মরণীয়। তিনি সর্বমোট ৬০টি হাদীস বর্ণনা করেন।

চতুর্দশ অধ্যায়

সিহাহ্-সিত্তার হাদীস সংকলন

ইমাম বুখারী (রঃ)

তিনি মুসলিম অধ্যুষিত এবং ইসলামী সংস্কৃতি ও সভ্যতার লীলাক্কেদ্র কুভারা নগরে ১৯৪ হিজরীর ১৩ই শাওয়াল ৮১০ ঈসায়ী সনের ২১শে জুলাই শুক্রবার জুমুআর নামাযের কিছু পরে জন্মগ্রহণ করেন। (উল্লেখ্য, বুখারা নগর উজবেকিস্তান প্রজাতন্ত্রে অবস্থিত। বর্তমানে এ নগরটি মধ্য এশিয়ার রুশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। ইরানের সমরকন্দ হতে ৩০০ কিলোমিটার উত্তর পূর্ব কোণে অবস্থিত।) শৈশবকালে তাঁর পিতা ইহকাল ত্যাগ করেন। মায়ের কাছে তিনি শৈশব লালিত পালিত হন। শৈশবে রোগাক্রান্ত হয়ে ইমাম বুখারীর চোখ বিনষ্ট হয়ে যায়। অনেক চিকিৎসার ফলেও দৃষ্টিশক্তি ফিরে না আসায় তাঁর মা হৃদয়ের আকুতি নিয়ে আল্লাহ্‌র দরবারে দিবানিশি কান্নাকাটি ও দু'আ করতে থাকেন। এক রাতে তিনি স্বপ্ন দেখেন যে তাঁর পুত্রের চোখ ভাল হয়ে গিয়েছে। সকালে উঠে তিনি দেখতে পেলেন পুত্রের চোখের দৃন্টিশক্তি ফিরে এসেছে। বিস্ময় ও আনন্দে তিনি আল্লাহ্‌র দরবারে দু' রাকআত শোকরানা সালাত আদায় করেন। পাঁচ বছর বয়সে তাঁকে বুখারার একটি প্রাথমিক মাদ্রাসায় ভর্তি করা হয়। বাল্যকাল থেকেই তিনি প্রখর স্মৃতিশক্তি ও অসাধারণ মেধার অধিকারী ছিলেন। ছয় বছর বয়সে সমগ্র কুরআন মুখস্থ করেন এবং দশ বছর বয়সে প্রাথমিক শিক্ষার পরিসমাপ্তি ঘটন। এগার বছর বয়সে তিনি হাদীস শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং এজন্য তিনি তৎকালীন বুখারার শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ইমাম (রহঃ) এর হাদীস শিক্ষালয়ে প্রবেশ করেন। ষোল বছর বয়সে ইমাম বুখারী (রহঃ) বুখারা ও এর নিকস্থ্ শহরের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসগণের বর্ণিত প্রায় সকল হাদীস মুখস্থ্ করেন।

হাদীস সংগ্রহের জন্য বিদেশ গমন ঃ সর্বপ্রথম হাজ্বের মাধ্যমে ইমাম বুখারী (রঃ)-এর হাদীস সংগ্রহের জন্য বিদেশযাত্রা শুরু হয়। ১৬ বছর বয়সে তাঁর মা ও বড় ভাই আহ্‌মদ সহ হজ্বের উদ্দেশ্যে মক্কায় গমন করেন। মা এবং ভাই দেশে ফিরে আসলেও তিনি তথায় থেকে যান। তিনি মক্কা ও মদীনায় কয়েক বছর অবস্থান করে তথাকার প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসগণের নিকট থেকে হাদীস শিক্ষা লাভ করতে থাকেন। এ সময় তিনি 'কাযায়াস সাহাবা ওয়াত তাবিঈন'

নামে তাঁর প্রথম গ্রন্থ রচনা করেন। এরপর মদীনায় অবস্থান কালে তিনি চাঁদের আলোতে তারিখে কাবীর রচনা করেন। ইমাম বুখারী হাদীস সংগ্রহের উদ্দেশ্য তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের বিখ্যাত জ্ঞান কেন্দ্র কূফা, বসরা, বাগদাদ, সিরিয়া, মিসর, খুরাসান প্রভৃতি শহরে বহুবার সফর করেন।

ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর মুখস্থ শক্তি ঃ অসাধারণ স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছিলেন ইমাম বুখারী (রঃ) । এক লাখ সহীহ ও দু'লাখ গায়রে হাদীস তাঁর মুখস্থ ছিল। তাঁর তীক্ষ্ণ স্মরণশক্তির কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে 'তিনি একবার মাত্র কিতাব পড়তেন এবং একবার দেখেই সমস্ত কিতাব মুখস্থ করে ফেলতেন।' ইমাম বুখারী (রঃ) এগার বছর বয়সে বুখারার বিখ্যাত মুহাদ্দিস দাখেলীর হাদীস বর্ণনাকালে যে ভুল সংশোধন করেছেন, হাদীস বিশারদগণের কাছে তা সত্যিই বিস্ময়কর । মাত্র ষোল বছর বয়সে মুসলিম বিশ্বের খ্যাতিমান মুহাদ্দিস আবদুল্লাগ ইবনুর মুবারক ও ওয়াকী ইবনুল জাররাহ (রহঃ) এর সংকলিত হাদীস গ্রন্থসমূহ মুখস্থ করেন। ইমাম বুখারী (রহঃ) একবার সমরকন্দে ও বাগদাদে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিলেন। তখনকার বিখ্যাত মুহাদ্দিসগণ কতকগুলো হাদীসের সনদ ও সতন উলট পালট করে ইমাম বুখারী (রহঃ) এর সামনে পাঠ করেন এবং এর সত্যতা ও যথার্থতা যাচাই করার জন্য তাঁকে অনুরোধ করেন। তিনি তা যথাযথ ভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে উপস্থাপন করেন। এতে তাঁর অসাধারণ স্মৃতিশক্তির পরিচয় ঘটে। সাথে সাথে তাঁরা বুখারী (রহঃ) এর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নেন। ইমাম বুখারী (রহঃ) এক হাজারেরও বেশী সংখ্যক মুহাদ্দিস থেকে হাদীস শিক্ষা লাভ করেছেন। তাঁদের মধ্যে মাক্কী ইবনে ইবরাহীম, আবু আসিম, ইমাম আহমদ ইব্‌নে হাম্বল, আলী মাদানী, ইসহাক সালাম আল-বায়কান্দী ও মুহাম্মদ ইউনুস আল-ফারইয়াবী (রাঃ) প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর থেকে বুখারী শরীফ শ্রবণকারীর সংখ্যা নব্বই হাজারের ও অধিক। তা ছাড়াও তাঁর অনেক ছাত্র ছিল। এঁদের মধ্যে ইমাম মুসলিম, ইমাম তিরমিযী, আবু হাতিম আররাযী (রহঃ) প্রমুখ খ্যাতনামা মুহাদ্দিসের নাম উল্লেখযোগ্য।

ইমাম বুখারী (রহঃ) এর অবদান জামে সহীহ বুখারী সংকলন। এটা তিনি সর্বপ্রথম মক্কা মুকাররমায় মসজিদে হারামে প্রণয়ন শুরু করে ষোল বছরে তা সমাপ্ত করেন। তাছাড়া ও তিনি অনেক গুলো কিতাব প্রণয়ন করেন। ইমাম বুখারী (রহঃ) পবিত্র চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। উত্তরাধিকারী সূত্রে প্রাপ্ত পিতার বিশাল ধন-ভান্ডার দুস্থ অসহায় ও হাদীস শিক্ষার্থীদের মাঝে অকাতরে বিলিয়ে

দিয়েছেন। তাঁর সততা জনশ্রুতিতে পরিণত হয়েছিল। ইমাম বুখারী (রহঃ) রমযান মাসে পুরো তারাবীতে এক খতম, প্রতিদিন দিবাভাগে এক খতম এবং প্রতি রাতে কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করতেন। তা্ওয়া-পরহেযগারী, ইবাদত-বন্দেগী, দান-খায়রাতের বহু ঘটনা তাঁর জীবনে রয়েছে। ইমাম বুখারী (রহঃ)-কে জীবনে বহু ঘত-প্রতিঘাত ও কঠিন বিপদ-আপদের সম্মুখীন হতে হয়েছে। তৎকালীন বুখারার গভর্নর তার দু' পুত্রকে প্রাসাদে এসে হাদীস পড়ানোর জন্য ইমাম বুখারী (রহঃ)-কে নির্দেশ দিয়েছিলেন। এটা পবিত্র হাদীস শরীফের অবমাননার নামান্তর ভেবে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। ফলে তাঁকে প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের শিকার হতে হয়েছিল। প্রাসাদবর্গের চক্রান্তে অত্যন্ত পরিণত বয়সে তাঁকে আপন জন্মভূমি বুখারা পরিত্যাগ করতে হয়েছিল। এ সময় সমরকন্দবাসীদের আহবানে তিনি সেখানে রওয়ানা হন। পথিমধ্যে খারতাংগ পল্লীতে তাঁর এক আত্মীয়ের বাড়িতে অবস্থান করেন। এখানে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ২৫৬ হিজরীর ১লা শাওয়াল শনিবার ইন্তিকাল করেন। এ সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৬২ বছর। সর্বাধিক খ্যাতিসম্পন্ন ও সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ হাদীসগ্রন্থ ইমাম বুখারী সংকলিত 'সহীহুল বুখারীর পূর্ণ নাম আল-জামিউল মুস্‌নাদুস্ সহীহ আল-মখতাসার মিন উমুরি রাসূলিল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওয়া সুননিহী আয়্যামিহী।

এতে হাদীসের প্রধান প্রধান বিষয়াবলী স্থান লাভ করায় একে জারি বা পূর্ণাঙ্গ বলা হয়, শুধুমাত্র বিশুদ্ধ হাদীস সন্নিবেশিত হওয়ায় সহীহ্ এবং মারফু মুত্তসিল হাদীস উল্লেখিত হওয়ায় মুসনাদ ইব্‌নে রাহওয়াইর মজলিস হতে লাভ করে ছিলেন। বুখারী শরীফ সংকলনে উদ্যেগী হওয়ার পিছনে ইমাম বুখারী হতে অন্য আর একটি কারণেরও উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি বলেন, একবার আমি স্বপ্নে দেখি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দেহ মুবারকের উপর মাছির আনাগোনাকে পাখা দ্বারা বাতাস দিয়ে তাড়িয়ে দিচ্ছেন। স্বপ্নের তাবীরকারীগণ এর ব্যাখ্যায় ইমাম বুখারীকে জানালেন, আপনার দ্বারাই রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সহীহ্ হাদীস একটি গ্রন্থ সংকলনের প্রবল বাসনা জাগ্রত হবে। তাই তিনি দীর্ঘ ষোল বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমে সাধনার ফলে এ বিশাল সংকলনটি সমাপ্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ইমাম বুখারী 'বায়তুল হারাম' অভ্যন্তরে বসে বুখারী শরীফ প্রণয়নের কাজ শুরু করেন। আর মসজিদে নববীর অভ্যন্তরে মিম্বর ও রাসূলের রওযা মুবারকের মধ্যবর্তী স্থানে বসে এর বিভিন্ন অধ্যায় ও 'তারজুমাতুল বাব' সংযোজনের কাজ সমাপ্ত করেন। এ বিশাল গ্রন্থ প্রণয়নে তিনি অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করেন। এ সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেন, 'আমি এ সহীহ্ গ্রন্থে এক

একটি হাদীস লিখার পূর্বে গোসল করেছি ও দু'রাকাত নফল নামায পড়ে নিয়েছি। তা ব্যতীত আমি একটি হাদীসও লিখিনি।'

ইমাম বুখারী প্রত্যেকটি হাদীস লিপিবদ্ধ করার পূর্বে ইস্তেখারার মাধ্যমে এর বিশুদ্ধতা সম্পর্কে দৃঢ়নিশ্চিত হয়েই তা লিপিবদ্ধ করেছেন। এরূপ অনন্য সাধারণ সতর্কতা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে তিনি এ বিশাল সংকলনটি প্রণয়ন করেন।

বুখারী শরীফের হাদীসের সংখ্যা ঃ ইমাম বুখারী (রহঃ) ছয় লাখ হাদীস সামনে রেখে বুখারী শরীফ প্রণয়নের কাজে হাত দেন। এ ছয় লাখের মধ্যে এক লাখ সহীহ্ হাদীস ইমাম বুখারীর মুখস্থ ছিল। এ ছাড়াও প্রায় দু'লাখ গায়রে সহীহ্ হাদীসও তাঁর মুখস্থ ছিল। বুখারী শরীফে একাদিকবার উদ্ধৃত হাদীসসহ সর্বমোট হাদীস হচেছ ৯০৮২টি। এতে মুয়াল্লিক, মুতাবিয়াত ও মওকুফাত বাদ দিলে হাদীসের সংখ্যা দাঁড়ায় ৭৩৯৭টি। একধিকবার উল্লেখিত হাদীস ব্যতীত এর সংখ্যা হল ২৬০২টি। অপর এক হিসেব মতে এ পর্যায়ের হাদীসের সংখ্যা হল ২৭৬১টি । (মুকাদ্দামাহ ফাতহুল বারী)।

আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (রহঃ) বুখারী শরীফের হাদীসের সংখ্যা সম্পর্কে বলেন, এতে ৭২৭৫টি হাদীস সন্নিবেশিত হয়েছে। এতে পুনরুল্লিখিত হাদীসসমূহ গণ্য। তা বাদে হাদীসের সংখ্যা হয় প্রায় চার হাজার। (মুকাদ্দমাহ উমদাতুলকারী)। বুখারী শরীফ হল দীন-ইসলামের এক অক্ষয় স্তম্ভ। প্রত্যেক যুগের আলেম ও মুহদ্দিসগণ এর শ্রেষ্ঠত্ব ও বিশেষ বৈশিষ্ট্য মন্ডিত বলে অকাতরে ঘোষণা দিয়েছেন। এ পর্যায়ে নিম্নোদ্ধৃত উক্তিটি সর্বজন বিধিত।

'আল্লাহর কিতাবের পর আকাশের নীচে সর্বাদিক সহীহ্ গ্রন্থ হল সহীহুল বুখারী।' (মুকাদ্দমাহ ফাতহুল বারী ও উমদাতুল কারী)।

এ সম্পর্কে ইমাম নাসায়ী (রহঃ) বুখারী শরীফ প্রণয়নের পর তারজমাতুল বাব বা শিরোনাম কায়েম করেন। তা কায়েম করতে তিনি গভীর জ্ঞান, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও অসাধারণ পান্ডিত্যের পরিচয় দিয়েছেন। যুগে যুগে সকল আলিম মুহাদ্দিস ও পন্ডিতবর্গ এর মর্ম অনুধাবনের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা সাধনা অব্যাহত রেখেছেন। কিন্তু অদ্যবধি সম্পূর্ণভাবে এর মর্ম উৎঘাটিত হয়নি। আর এ জন্য বলা হয়ে থাকে 'ফিকহুল বুখারী ফী তারাজিমিহী'। অর্থাৎ ইমাম বুখারী (রহঃ) এর জ্ঞান, বুদ্ধি ও অসাধারণ পান্ডিত্য তাঁর গ্রন্থের তারজমা বা শিরনামের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে।

সহীহ্ মুসলিম শরীফ ঃ ইমাম মুসলিম ২০৪ হিজরী সনে ৮১৭ ঈসায়ী সনে খোরাসানের প্রধান নগর নিশাপুরের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। কোন কোন বর্ণনায় ২০৩ হিজরীর কথাও পাওয়া যায়। অবশ্য প্রথম অভিমতটিই অধিকতর বিশুদ্ধ। কথিত আছে, ২০৪ হিজরী সনের যে দিন ইমাম শাফেয়ী ইন্তেকাল করেন, সে দিনেই ইমাম মুসলিমের জন্ম হয়।

নাম মুসলিম। কুনিয়াত আবুল হুসাইন। উপাধি আসাকেরুদ্দীন। পূর্ণনাম হল আবুল হুসাইন ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী আন-নিশাপুরী। ইমাম মুসলিম আরবের প্রসিদ্ধ ঐতিহ্যবাহী গোত্র বনু কুশায়রের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন বিধায় তাঁকে আল-কুরাশয়ীরী এবং খোরাসানের নিশাপুরে জন্মগ্রহণ করেন বিধায় আন-নিশাপুরী বলা হয়। তিনি ইমাম মুসলিম নামেই সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। শৈশবকালে তাঁর পিতা বিখ্যাত হাদীস বর্ণনাকারী হাজ্জাজ আল-কুশায়রীর কাছে হাদীস সম্পর্কে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। হাদীস শিক্ষার উদ্দেশ্য তিনি তৎকালীন মুসলিম জাহানের সকল শিক্ষাকেন্দ্রে গমন করেন। ইরাক, হিজায, সিরিয়া, মিসর প্রভৃতি শহরে উপস্থিত হয়ে তথায় অবস্থানকারী হাদীসের উস্তাত ও মুহাদ্দিসগণের কাছ থেকে হাদীস শিক্ষা ও সংগ্রহ করেন। তাঁর প্রখ্যাত উস্তাদের মধ্যে ছিলেন ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, ইমাম বুখারী, ইয়াহ্ইয়া ইব্নে ইয়াহ্ইয়া আত-তামিমী, সাঈদ ইব্নে মানসুর প্রমুখ। সারা জীবন তিনি হাদীস সংগ্রহে ও সংকলনের কার্যে অতিবাহিত করেন। উল্লেখ্য, ইমাম মুসলিম ইমাম বুখারীর সমসাময়িক ছিলেন। বুখারীর প্রতি তাঁর অগাধ শ্রদ্ধাবোধ ছিল। তাঁর বিশাল হাদীসের জ্ঞান-ভান্ডার হতে তিনিও যথেষ্ট মাত্রায় সঞ্চয় করেন।

ইমাম মুসলিম যে বিশাল জ্ঞানের অধিকারী এবং হাদীস শাস্ত্রের ইমাম ছিলেন যে কথা বিশ্বের হাদীস বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ শ্রদ্ধাভরে স্বীকার করে নিয়েছেন। সেকালের বড় বড় মুহাদ্দিসগণ তাঁর কাছ থেকে হাদীস শিক্ষা করেছেন। এ পর্যায়ে আবু হাতিম আর-রাযী, মুসা ইব্নে হারুন, আহমদ ইব্নে সালামা, মুহাম্মদ ইব্নে মাখলাদ এবং ইমাম তিরমিযী প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁরা সকলেই ইমাম মুসলিমের জ্ঞান, শ্রেষ্ঠত্ব ও অতি উচ্চ মর্যাদার কথা স্বীকার করেছেন। ইমাম মুসলিম ২৬১ হিজরী সনে ৫৭ বছর বয়সে নিশাপুরে ইন্তেকাল করেন। তাঁর মৃত্যুর ঘটনাটি অত্যন্ত আশ্চার্যজনক। একবার তাঁকে একটি হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তাৎক্ষণিকভাবে এর সমাধান দিতে পারেননি। পরক্ষণেই ঘরে এসে সংগৃহীত পান্ডুলিপির মধ্যে তিনি হাদীসটি অনুসন্ধান করতে লাগলেন। তাঁর পাশেই একটি পাত্র ভর্তি খেজুর ছিল। তিনি এক একটি করে খেজুর খাচ্ছিলেন আর হাদীসটি অনুসন্ধান করেছিলেন। এতে তিনি এত গভীর মনোনিবেশ করেছিলেন যে, যখন হাদীসটি

পেলেন তখন পাত্রের খেজুরও শেষ হয়ে গিয়েছে। অতিরিক্ত খেজুর খাওয়ার কারণে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং এ অসুস্থ অবস্থাতেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

বিশুদ্ধ ছ'খানা হাদীস সংকলনের মধ্যে সহীহ্ মুসলিম শরীফ অন্যতম। এটা ইমাম মুসলিমের শ্রেষ্ঠ অবদান। দীর্ঘ পনেরো বছরের অবিশ্রান্ত সাধনা, গবেষণা ও যাচাই বাছাইর পর সহীহ হাদীস সমূহের এক সুসংবদ্ধ সংকলন হল মুসলিম শরীফ। ইমাম মুসলিম সরাসরি উস্তাদের কাছ থেকে শ্রুত তিন লাখ হাদীস থেকে বাছাই করে গ্রন্থখানি সংকলন করেছেন। এতে তাকবার বা একাধিকাবার উদ্ধৃত হাদীস সহ মোট বার হাজার হাদীস সন্নিবেশিত হয়েছে। তাকবার বাদে হাদীসের সংখ্যা প্রায় চার হাজার। (তাদরীবুর রাবী)

মুসলিম শরীফ সংকলনের সময় তিনি অত্যন্ত সতর্কতা ও বিচক্ষণতার পরিচয় দেন। কেবলমাত্র নিজের খেয়াল খুশি ও বুদ্ধির বিবেচনায় যে কোন হাদীসকে তিনি সন্নিবেশিত করেননি। প্রত্যেকটি হাদীসের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে সমসাময়িক অন্যান্য মুহাদ্দিসদের মধ্যে পরামর্শ সাপেক্ষে ঐক্যমতে তিনি এ অমূল্য গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করেছেন। প্রণয়নের কাজ পরিসমাপ্তির পর তিনি তা তদানীন্তন প্রখ্যাত হাফেয হাদীস ইমাম আবু যুরয়ার সামনে উপস্থাপন করেন। প্রত্যেকটি হাদীসের উপর তিনি যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন তাই ইমাম মুসলিম গ্রহণ করেন। মুসলিম শরীফে সংকলিত হাদীস সমূহের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে ইমাম মুসলিম নিজেই বলেনঃ "মুহাদ্দিসগণ দু'শত বছর পর্যন্ত যদি হাদীস লিখতে থাকেন, তবুও এ বিশুদ্ধ গ্রন্থের ওপর অবশ্যই নির্ভর করতে হবে।" (মুকাদ্দামাহ মুস্‌লিম; নববী)

হাফেয মুসলিম ইব্‌নে কুরতবী সহীহ্ মুসলিম সম্পর্কে বলেন, 'ইসলামের এরূপ আর একখানি গ্রন্থ কেহই প্রনয়ন করতে পারেননি।' (মুকাদ্দামাহ ফাতহুল বারী।)

কোন কোন বিজ্ঞ মুহাদ্দিস বুখারী শরীফের উর্ধে মুসলিম শরীফ বিশুদ্ধ ও শ্রেষ্ঠ বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। ইমাম মুসলিমের বহু ছাত্র তাঁর কাছ থেকে এ সংকলিত হাদীস শ্রবণ করেছেন এবং তার সূত্রে বর্ণনাও করেছেন। বর্তমানে আমরা যে সংকলনটি দেখতে পাচ্ছি তা প্রখ্যাত মুহাদ্দিস শায়খ আবু ইসহাজ ইব্রাহীম ইব্‌নে মুহাম্মদ ইবনে সুফইয়ান নিশাপুরীর সূত্রে বর্ণিত হয়ে আসছে। তিনি ৩০৮ হিজরী সনে ইন্তেকাল করেন।

সুনানে নাসায়ী ঃ সিহাহ্ সিত্তাহর অন্যতম গ্রন্থ 'সুনানে নাসায়ী' এর সংকলকের নাম আহমদ। কুনিয়াত আবু আবদুর রহমান। পিতার নাম

শুয়াইব। নসবনামা হলঃ আবু আবদুর রহমান আহমদ ইবনে শুয়াইব ইবনে আলী ইব্‌নে বাহর ইব্‌নে মান্নান ইব্‌নে দীনার আন্‌নাসায়ী। খোরাসানের অন্তর্গত নাসা নামক স্থানে হিজরী ২১৪ মতান্তরে ২১৫ সনের তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি পনেরো বছর বয়সে হাদীস শিক্ষা ও সংগ্রহের উদ্দেশ্যে হাদীসের সকল গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রসমূহ সফর করেন। প্রথমে তিনি কুতাইবা ইব্‌নে সায়ীদুল বালখীর কাছে গমন করেন এবং সেখানে এক বছর দু' মাস অবস্থান করে তাঁর কাছ থেকে হাদীস শিক্ষা ও সংগ্রহ করেন। অতঃপর তিনি মিসরে যান এবং সেখানে তিনি দীর্ঘকাল অবস্থান করেন। মিসরে অবস্থান কালে তিনি বেশ কয়েকখনি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এ সময় হতে মানুষেরা তাঁর কাছ থেকে হাদীস শ্রবণ করত। ইমাম হাকেম আবু আলী নিশাপুরী হতে বর্ণনা করেন যে, প্রসিদ্ধ চারজন হাফেযে হাদীসের মধ্যে ইমাম নাসায়ী ছিলেন অন্যতম একজন। তিনি শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। তিনি অত্যন্ত পরহেযগার ও মুত্তাকী ছিলেন। ইমাম নাসায়ী হাদীস ও ইলমে হাদীস সম্পর্কিত বিষয়ে বহু মূল্যবান গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। 'সুনানে কুবরা' ও 'সুনানে সুগরা' যাকে 'আল মুজতাবা বলা হয় প্রভৃতি তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। ৩০২ হিজরীতে তিনি মিসর ত্যাগ করে দামেশক যান। এখানে অবস্থানকালে তিনি হযরত আলী ও খান্দানে রাসূলের প্রশংসামূলক গ্রন্থ রচনা সমাপ্ত করেন। এখানে তিনি উমাইয়াদের দ্বারা খান্দানে রাসূলের অবমাননার মানসিকতা দেখে অত্যন্ত মর্মাহত হন। তিনি খান্দানে রাসূলের প্রশংসায় লিখিত পুস্তকখানি দামেশকের জামে মসজিদে সমবেত লোকদেরকে পাঠ করে শুনান। এতে উমাইয়া শাসকদের প্রশংসা না থাকায় উপস্থিত লোকেরা ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁর উপর চড়াও হয়ে বেদম প্রহার করতে থাকে। অমানুষিক নির্যাতনের ফলে মারাত্মক আহত ও কাতর হয়ে পড়েন। অবসন্ন অবস্থায় তাঁর অন্তিম বাসনা ও নিবেদন ছিল, তোমরা আমাকে মক্কা শরীফে পৌঁছে দাও, আমি যেন সেখানে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে পারি। তাঁকে মক্কায় পৌঁছানো হয়েছিল। সেখানে তিনি ৩০৩ হিজরীতে ৮৯ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। তাঁকে সাফাও মারওয়ার মধ্যবর্তী স্থানে দাফন করা হয়। (তাযকিরাতুল হুফ্‌ফায)।

ইমাম নাসায়ী প্রথমে 'সুনানুল কুবরা' নামে একখানা হাদীস গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এ সংকলনে সহীহ্ ও গায়রে সহীহ উভয় প্রকারের হাদীস সন্নিবেশিত হয়েছিল। পরে তিনি শুধুমাত্র সহীহ হাদীস সম্বলিত একটি সংকলন তৈরী করেন। এর নাম 'আস্‌সুনানুস্ সুগরা'। এর অপর এক নাম হল, "আল মুজতবা" সঞ্চয়িতা। সুনানে নাসায়ী দ্বারা 'আল মুজতবা'ই উদ্দেশ্য। ইমাম নাসায়ী 'আল মুজতবা' প্রণয়নের সময় ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের গ্রন্থ প্রণয়ন রীতির

অনুসরণ করেছেন। এ গ্রন্থখানির বিশুদ্ধতা সম্পর্কে ইমাম নাসায়ী নিজেই বলেছেন ঃ 'হাদীসের সঞ্চয়ন মুবতাবা নামের গ্রন্থখানিতে উদ্ধৃত সমস্ত হাদীসই বিশুদ্ধ।'

আবু আলী বলেন, ইমাম মুসলিমের চেয়েও ইমাম নাসায়ী হাদীস গ্রহণে রিজাল সম্পর্কে কঠিন শর্তারোপ করেন। কিন্তু তা সঠিক নয়। কেননা ইব্‌নে কাসির বর্ণনা মতে সুনানে নাসায়ীতে 'মাজহুল' ও 'মাজরূহ' রাবী রয়েছে এবং এতে 'যয়ীফ' 'মুয়ালয়াল' ও মুনকার হাদীস রয়েছে। ইমাম নাসায়ীর সুনান সংকলনে ৪,৪৮২ টি হাদীস স্থান পেয়েছে। সমস্ত হাদীসগুলোকে ১৫টি শিরনামায় এবং ১৭৪৪ অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। ইমাম নাসায়ীর কাছ থেকে এ গ্রন্থ বহু সংখ্যক ছাত্র শ্রবণ করে থাকলেও বড় বড় দশজন মুহাদ্দিস এ গ্রন্থের ধারাবাহিকতা বর্ণনা করেছেন।

আবু দাউদঃ ইমাম আবু দাউদের পূর্ণ নাম হল, সুলায়মান ইবনুল আশয়াস ইব্‌নে ইসহাক আল আসাদী আস-সিজিস্তানী। আবু দাউদ নামেই তিনি সমধিক পরিচিত। তিনি বান্দাহার ও চিশ্‌তি এর নিকটস্থ সীস্তান নামক স্থানে ২০২ হিজরী মুতাবিক ৮১৭ ঈসায়ী সনে জন্ম গ্রহণ করেন। (আল হাদীস ওয়াল মুহাদ্দেসুন, পৃঃ ৩৫৮)।

ইমাম আবু দাউদ নিজ জন্ম স্থানে প্রাথমিক শিক্ষা জীবন শুরু করেন। অতঃপর হাদীস শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে তিনি মিসর, সিরিয়া, হিজাজ, ইরাক ও খুরাসান প্রভৃতি প্রখ্যাত হাদীস কেন্দ্র সমূহ পরিভ্রণ করেন। যেখানে তিনি যে হাদীসের সন্ধান পেয়েছেন সেখান থেকেই তিনি তা সংগ্রহ করেছেন। তদানীন্তন সুবিখ্যাত মুহাদ্দিসের কাছ থেকে হাদীস শ্রবণ ও সংগ্রহ করেন। ইমাম আবু দাউদের উস্তাদের মধ্যে যুগশ্রেষ্ঠ কয়েকজন মুহাদ্দিস হলেন- ইমাম আহম্মদ ইব্‌নে হাম্বল, উসমান ইব্‌নে আবু সাইবা, কুতাইবা ইব্‌নে সায়ীদ প্রমুখ। হাদীসে তাঁর যে অসাধারণ জ্ঞান ও গভীর পারদর্শীতা ছিল, তা এ যুগের সকল বিজ্ঞ জনেরা উদাত্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন এবং তাঁর তীক্ষ্ম স্মরণশক্তির প্রশংসা করেছেন। তাঁর গভীর তাকওয়া ও পরহেযগারীর কথাও সর্বজন স্বীকৃত। ইমাম তিরমিযী ও ইমাম নাসায়ী তাঁর ছাত্র ছিলেন। তিনি ২৭৫ হিজরীর ১৬ শাওয়াল বসরা নগরে ইন্তিকাল করেন। ইমাম আবু দাউদের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান হল 'সুনান' যা হাদীসের ক্ষেত্রে তৃতীয় প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের পরেই "সুনানে আবু দাউদ" এর স্থান। হাদীস সংকলনের ইতিহাসের এর স্থান তৃতীয়। তিনি এ গ্রন্থখানির সংকলন কার্য যৌবন বয়সেই সমাপ্ত করেছেন। তাঁকে দীর্ঘ বিশ বছর সংকলনের কাজে ব্যয় করতে হয়েছে। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) তাঁর সংগৃহীত পাঁচ লক্ষ

হাদীস হতে ছাঁটাই বাছাই ও চয়ন করত ৪৮০০টি হাদীস তাঁর সংকলনে স্থান দিয়েছেন। এ হাদীস সমূহ সবই আহ্‌কাম সম্পর্কিত এবং এর অধিকাংশ 'মহহুর' পর্যায়ের হাদীস। (আল হাদীস ওয়াল মুহাদ্দেসুন, পৃঃ ৪১১)।

ইমাম আবু দাউদ ফিক্‌হর দৃষ্টিভংগিতে হাদীস সমূহ চয়ন করেছেন। ফিক্‌হর সমস্ত বিষয় এতে আলোচিত হয়েছে। আর একারণেই ফিকহ্‌বিদগণ মনে করে-'একজন মুজতাহিদের পক্ষে ফিকহ্‌র মাসয়ালা বের করার জন্য আল্লাহ্‌র কিতাব কুরআন মজীদের পরে সুনানে আবু দাউদ গ্রন্থই যথেষ্ট।' (আল হাদীস ওয়াল মুহাদ্দেসুন, পৃঃ ৪১১)।

ইমাম হাফেয আবু ইব্‌নে যুবাইর গরনাতী (মৃঃ ৭০৮ হিঃ) সুনানে আবু দাউদ সম্পর্কে বলেন, "ফিকহ্ সম্পর্কিত হাদীস সমূহ সামগ্রিক ও নিরংকুশভাবে সংকলিত হওয়ার কারণে সুনানে আবু দাউদের যে বিশেষত্ব, তা সিহাহ সিত্তার অপর কোন গ্রন্থের নেই। (তদারীবুর রাবী, পৃঃ ৫৬)।

ইমাম গাযযালী (রহঃ) বলেন, 'হাদীসের মধ্যে এ গ্রন্থই মুজতাহিদের জন্য যথেষ্ট।' (ফাতহুল মুগীস, পৃঃ ২৮)

ইমাম আবু দাউদ গ্রন্থখানির সংকলন সমাপ্ত করে একে তাঁর উস্তাদ ইমাম আহম্মদ ইব্‌নে হাম্বলের সমীপে পেশ করেন। তিনি একে উত্তম হাদীসগ্রন্থ বলে প্রশংসা করেন। (গুরুতুল আয়েম্মা, পৃঃ ১৭ ও তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ্)। এ গ্রন্থে সন্নিবেশিত হাদীস সমূহ সম্পর্কে ইমাম আবু দাউদ নিজেই দাবী করে বলেছেন, -'জনগণ কর্তৃক সর্বসম্মত ভাবে পরিত্যাক্ত কোন হাদীস আমি এতে উদ্ধৃত করিনি।' (মুকাদ্দামা মুয়ালেমুস্ সুনান, পৃঃ ১৭)।

জামে তিরমিযী ঃ সিহাহ্ সিত্তাহ্‌র চতুর্থ গ্রন্থ 'জামে তিরমিযী'র সংকলকের প্রকৃত নাম মুহাম্মদ। কুনিয়াত আবু ঈসা। লকব ইমামুল হাফেয। তাঁর পূর্ণনাম ও নসবনামা হল আল ইমামুল হাফেয আবু ঈসা মুহাম্মদ ইব্‌নে ঈসা ইব্‌নে সওরাতা ইব্‌নে মুসা ইব্‌নে জাহাকুস সুলামী আত্‌তিরমিযী আল বুখারী। তিনি ট্রান্সঅক্সিয়ানার তিরমিয নামক প্রাচীন শহরে ২০৯ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন। তিরমিয শহরটি জীহুল নদীর বেলাভূমে অবস্থিত। এ শহরে যুগ শ্রেষ্ঠ অগণিত মুহাদ্দিস ও প্রখ্যাত উলামাদের জন্মগ্রহণের কারণে এটা 'মাদীনাতুর রিজাল' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। ইমাম তিরমিযী প্রাথমিক শিক্ষা নিজ গৃহে সমাপন করেন। অতঃপর তিনি মুসলিম জাহানের প্রখ্যাত হাদীস কেন্দ্র সমূহ পরিভ্রমণ করে হাদীস শ্রবণ ও সংগ্রহ করেন। কুফা, বসরা, রাই, খুরাসান, ইরাক ও হিজাযে হাদীস সংগ্রহের জন্য তিনি বছরের পর বছর সফর করতে থাকেন।

ইমাম তিরমিযী তাঁর সময়কার বড় বড় হাদীসবিদদের কাছ থেকে হাদীস শ্রবণ ও গ্রহণ করেছেন। তিনি সর্বমোট এক হাজার হাদীসের উস্তাদ থেকে হাদীস সংগ্রহ করেন। তাঁদের মধ্যে কুতাইবা ইব্‌নে সায়ীদ, ইসহাক ইব্‌নে মুসা, মাহমুদ ইব্‌নে গীলান, সায়ীদ ইবনে আবদুর রহমান, মুহামম্‌বিনে বিশর, আলীর ইব্‌নে হাজার, আহমদ ইব্‌নে মুনী, মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না সুফিয়ান ইব্‌নে অকী এবং মুহাম্মদ ইব্‌নে ইসমাঈলুল বুখারী প্রমুখ মুহাদ্দিস ইমাম তিরমিযীর উস্তাদ। (আল হাদীস ওয়াল মুহাদ্দেসুন পৃঃ ৩৬০)।

ইমাম তিরমিযী তীক্ষ্ম স্মরণশক্তির অধিকারী ছিলেন। কোন হাদীস একবার শুনলে দ্বিতীয়বার শুনার আর প্রয়োজন হত না। সাথে সাথে তা তাঁর মুখস্থ হয়ে যেত। ইমাম তিরমিযী জনৈক এক মুহাদ্দিসের বর্ণিত কয়েকটি হাদীস শ্রবণ করেছিলেন, কিন্তু তাঁর সাথে কোনো দিন সাক্ষাত ঘটেনি। এজন্য সে মুহাদ্দিসের সাক্ষাত লাভের উদগ্রীব বাসনা তাঁর হৃদয় জাগ্রত ছিল। একদিন পথিমধ্যে হঠাৎ তাঁর সাক্ষাত পান এবং তাঁর কাছ থেকে সমস্ত হাদীস শ্রবণের বাসনা প্রকাশ করেন। তিনি বিশেষ অনুরোধক্রমে পথের মধ্যে দাঁড়িয়েই সমস্ত হাদীস মুখস্থ পাঠ করেন। তা শ্রবণমাত্রই সকল হাদীস ইমাম তিরমিযীর মুখস্থ হয়ে যায়। তা দেখে সে মুহাদ্দীস বিস্মিত হয়ে পড়েন। তাঁর মেধা পরীক্ষর জন্য তিনি আরো চল্লিশটি হাদীস পাঠ করেন তাও সাথে সাথে ইমাম তিরমিযীর মুখস্থ হয়ে যায় এবং পুনরায় উস্তাদকে শুনিয়ে দেন। অথচ ইতিপূর্বে এ হাদীসগুলো তিনি আর কখনও শ্রবণ করনি। এটাই ছিল তাঁর অসাধারণ মেধার পরিচয়। এছাড়াও তাঁর স্মৃতিশক্তির ব্যাপারে অনেক ঘটনা বিদ্যমান রয়েছে। অসাধারণ মেধার কারণে ইমাম বুখারী তাঁর সম্পর্কে অনেক প্রশংসাসূচক কথা বলতেন। ইমাম তিরমিযী বহু মূল্যবান গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। আল জামেউত্ তিরমিযী, কিতাবুল আসমা, আল কুনী, শামায়েতুলত তিরমিযী, তাওয়ারীখ ও কিতাবুল যুহদ প্রভৃতি তাঁর যুগান্তকারী গ্রন্থ। শেষ জীবনে ইমাম তিরমিযী দৃষ্টিশক্তি সম্পূর্ণ হারিয়ে যায়। তিনি ২৮৯ হিজরীতে ৭০ বছর বয়সে তিরমিয শহরে ইন্তেকাল করেন। (আল বেদায়া অন্ নেহায়া, মিযানুল এতেদাল)।

ইমাম তিরমিযীর হাদীসগ্রন্থ 'জামে তিরমিযী' নামে খ্যাত। একে 'সুনান'ও বলা হয়। অবশ্য প্রথমোক্ত নামই অধিকাংশ হাদীসবিদগণ গ্রহণ করেছেন।

ইমাম তিরমিযী তাঁর সংগৃহীত পাঁচ লাখ হাদীস হতে বাছাই করে ১৬০০ হাদীস তার সুনানের মধ্যে সংকলন করেছেন। তিনিই সর্বপ্রথম তাদীস বর্ণনাকারীদের নাম, উপনাম ও খেতাব নির্ধারণ করেননি এবং প্রত্যেক হাদীসের

বিচিত্র নাম সমূহ উদ্ভাবন করে নির্ভরযোগ্য মাত্রা স্থির করার চেষ্টা করেন। ইমাম তিরমিযী তাঁর 'জামে' গ্রন্থখানি ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম বুখারী অনুসৃত গ্রন্থ প্রণয়ন রীতি অনুযায়ী সংকলন করেছেন। তিনি এ গ্রন্থে বিভিন্ন বিষয়ের হাদীস সন্নিবেশিত করেছেন। আর এ কারণে তাকে 'জামে' নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। হাফেয আবু তাহের ইব্‌নে যুবাই (মৃঃ ৭০৮হিঃ) এ সম্পর্কে বলেন—"ইমাম তিরমিযী বিভিন্ন বিষয়ের হাদীস একত্র করে গ্রন্থখানি প্রনয়ন করার যে বৈশিষ্ট্য লাভ করেছেন, তাতে তিনি অবিসংবাদিত।" ইমাম তিরমিযী তাঁর এ গ্রন্থখানি সম্পর্কে অত্যন্ত হৃদয়ের সাথে দাবী করে বলেন—"যার ঘরে এ কিতাবখানি থাকবে, মনে করা যাবে যে তাঁর ঘরে স্বয়ং নবী করীম(সাঃ) অবস্থান করছেন ও নিজে কথা বলছেন।" বস্তুতঃ সহীহ হাদীস গ্রন্থ সমূহের এটাই সঠিক মর্যাদা। তিরমিযী শরীফের সহজবোধ্যতা সর্বজন বিধিত। একারণে শায়খুল ইসলাম হাফেয ইমাম আবু ইসমাঈল আবদুল্লাহ্ আনসারী (মৃঃ ৪৮১ হিঃ) তিরমিযী শরীফকে বুখারী ও মুসলিম গ্রন্থদ্বয় অপেক্ষা অধিক ব্যবহারোপযোগী বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। কেননা তিরমিযী শরীফ হতে সাধারণ পাঠকও ফায়দা অর্জন করতে পারে। কিন্তু বুখারী ও মুসলিম শরীফ হতে কেবলমাত্র বিশেষ পারদর্শী আলেম ভিন্ন অপর কেহ ফায়দা লাভ করতে সমর্থ হয় না। ইমাম তিরমিযীর বহু সংখ্যক ছাত্র তাঁর কাছ থেকে এ গ্রন্থখানি শ্রবণ করেছেন। কিন্তু এর বর্ণনা পরম্পরা অব্যাহত ও ধারাবাহিকভাবে মাত্র ছ'জন প্রখ্যাত মুহাদ্দিস হতে চলে আসছে। ইমাম ইব্‌নে মাজাহ (রঃ) সুনানে ইব্‌নে মাজাহ্ সংকলকের প্রকৃত নাম মুহাম্মদ কুনিয়াত আবু আবদুল্লাহ্। তাঁর পূর্ণ নাম ও নসবনামা হলঃ আবু আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্‌নে ইয়াযিদ ইব্‌নে আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে মাজাহ আল কাজভীনী।

তিনি ২০৯ হিজরী ৮২৮ ঈসায়ী কাজভীন নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। (মু'জামুল বুলদান; পৃঃ ৮২)

ইমাম ইব্‌নে মাজাহর জন্মস্থান কাজভীন শহরটি তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান (রাঃ)-এর সময় বিজিত হওয়ার পর হতেই ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞানের কেন্দ্র হিসেবে পরিগণিত হয়। হিজরী তৃতীয় শতকের প্রারম্ভ হতে সেখানে হাদীস চর্চার বিশেষ কেন্দ্র বিন্দুতে পরিণত হয়; ফলে এখানেই অতি শৈশব হতে ইবনে মাজাহ ইলমে হাদীস শিক্ষায় আত্মনিয়োগ করেন। এ সময় কাজভীন শহর যুগশ্রেষ্ঠ কয়েকজন মুহাদ্দিস হাদীসের দরস দিতেন। ইব্‌নে মাজাহ তাঁদের থেকে হাদীস শ্রবণ ও সংগ্রহন করেন। ইমাম ইব্‌নে মাজাহ অগনিত মুহাদ্দিসের কাছ থেকে হাদীস শিক্ষা লাভ করেন। তন্মধ্যে আলী ইব্‌নে মুহাম্মদ আবুল

হাসান তানফেসী (মৃঃ ২৩৩), আমর ইব্‌নে রাফে আবু হাজার বিযলী (মৃঃ ২৩৮ হিঃ), ইসমাঈল ইব্‌নে মূসা ইব্‌নে হায়ান তামীমী (মৃঃ ২৮৮ হিঃ এবং মুহাম্মদ ইবনে আবু খালেক আবু বকর কাজভীনী প্রমুখ বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

ইমাম ইব্‌নে মাজাহ হাদীস শিক্ষা ও সংগ্রহের জন্য ইলমে হাদীসের বিভিন্ন কেন্দ্রভূমিতে ভ্রমণ করেন। তিনি মদীনা, মক্কা, কূফা, বসরা, বাগদাদ, ওয়াসত, দামেশ্‌ক, হিমস, মিসর, তিন্নীস, ইসফাহা, নিনাপুর প্রভৃতি হাদীসের কেন্দ্র সমূহের সফল করে হাদীস শিক্ষা ও সংগ্রহ করেন। ইমাম ইবনে মাজাহ একজন বিখ্যাত লেখক ছিলেন। তিনি বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। 'সুনানে ইব্‌নে মাজাহ' হাদীসশাস্ত্র তাঁর এক অমর সংকলন। তিনি হাদীসের ভিত্তিতের কুরআনের একখানি বিরাট তফসীর গ্রন্থ রচনা করেন। এছাড়া তারিখে মলীহ নামে তিনি একখানা ইতিহাস রচনা করেন। এতে সাহাবাদের যুগ হতে গ্রন্থকারের সময় পর্যন্ত বিস্তারিত ইতিহাস আলোচিত হয়েছে। তিনি ২৭৩ হিজরী ৮৮৬ ঈসায়ী সোমবার ৬৪ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। ইমাম ইবনে মাজাহ অপরিসীম শ্রম-সাধনা ও পরীক্ষা নিরীক্ষার পর এ গ্রন্থখানির প্রণয়নকার্য সম্পন্ন করেন। লক্ষ লক্ষ হাদীস হতে ছাটাই বাছাবই করে মাত্র চার হাজার হাদীসকে তিনি তাঁর সুনানে সংকলিত করেছেন। এ গ্রন্থে মোট ৩২টি পরিচ্ছেদ, পনের শত অধ্যায় রয়েছে। (আল বিদায়রা আন নিহায়াহ)। ইমাম ইব্‌নে মাজাহ তা প্রণয়ন করে তাঁর উস্তাদ ইমাম আবু যুরয়ার কাছে পেশ করেন। তিনি এর ভূয়সী প্রশংসা করেন। এ গ্রন্থখানি দু'টি দিকের বিবেচনায় সিহাহ সিত্তাহ্‌র মধ্যে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী।

প্রথমতঃ এর রচনা, সংযোজন, সজ্জায়ন ও সৌকর্য। এতে হাদীস সমূহ এক বিশেষ সজ্জায়ন পদ্ধতিতে ও অধ্যায় ভিত্তিতে সাজানো হয়েছে। কোথাও পুনরাবৃত্তি ঘটেনি। সিহাহ সিত্তার অপর গ্রন্থে এ সৌন্দর্য অনুপস্থিত।

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল, এতে এমন সব হাদীস উল্লেখিত হয়েছে, যা সিহাহ সিত্তার অপর কোন গ্রন্থে উল্লেখিত হয়নি। এ কারণে এর ব্যবহারিক মূল্যায়ন অন্যান্য গ্রন্থাবলীর তুলনায় অনেক বেশী। সিহাহ্ সিত্তাহর অপর পাঁচখানি গ্রন্থের তুলনায় ইব্‌নে মাজায় যয়ীফ হাদীসের সংখ্যা তুলনামুলক বেশী হওয়ার কারণে এর স্থান ষষ্ঠতম।

সমাপ্ত